স ম্পূ র্ণ উ প ন্যা স

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

কাকাবাবু ও জলদস্যু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সকাল সাড়ে ছ'টায় সন্তু তৈরি হয়ে নিল বাড়ি থেকে বেরোবার জন্য। কাঁধে ঝুলিয়ে নিল একটা কিট ব্যাগ। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে সদর দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই টুং টাং করে বেজে উঠল ডোরবেল। এত সকালে তো কেউ আসে না। কাজের মেয়েটাও আসে সাতটার পর। তবে খবরের কাগজওয়ালা বাইরে কাগজগুলো রেখে বেল বাজিয়ে জানান দিয়ে যায়। বাবা আর কাকাবাবু

দু'জনেই বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কাগজ পড়তে ভালবাসেন। প্রতিদিন রাখা হয় তিনখানা খবরের কাগজ, ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে। বাবা প্রথমেই বাংলা কাগজ পড়েন আর কাকাবাবু পড়েন ইংরেজি। রঘু এর মধ্যেই রান্নাঘরে চায়ের জল চাপিয়েছে। সেই-ই রোজ দরজা খুলে ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেয় কাগজ। রঘুর আগে সন্তুই গিয়ে খুলল দরজা। তারপরই অবাক।

হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে জোজো।

জোজো দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে, আটটার আগে তো নয়ই। ছুটির দিন হলে ন'টার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠে না। আজ হঠাৎ তার কী হল?

সন্তু কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই জোজো একগাল হেসে বলল, "বল তো সন্তু, মার্ক টোয়েনের আসল নাম কী?"

এই কথাটা জিজ্ঞেস করার জন্য জোজো তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে এখানে ছুটে এসেছে?

দরজাটা টেনে বন্ধ করে সন্তু বাইরে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। রাস্তাটা এখন বেশ ঠান্ডা। বেশি মানুষজন বেরোয়নি। ঠিক পাশেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে দু'টো পাখি ডাকছে। সেই ডাক শুনেই সন্তু চিনতে পারল। বুলবুলি পাখি।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তোর আসল কথাটা কী বল তো?"

জোজো বলল, "এটাই তো আসল কথা। তুই তো জানিস আমি প্রত্যেকদিন ভোরের দিকে অনেক স্বপ্ন দেখি। অন্তত সাতটা। আজ আমি লাস্ট স্বপ্নটায় দেখলাম, আমেরিকান রাইটার মার্ক টোয়েনকে। কেন আমি ওঁকে স্বপ্ন দেখলাম বল তো?"

সন্তু বলল, "তুই কাকে কেন স্বপ্ন দেখবি, তা আমি কী করে জানব?"

জোজো বলল, "একজন রাইটারকে মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে? যখন তার বই পড়ে। কালই আমি মার্ক টোয়েনের একটা বই পড়ছিলাম। টম সইয়ারের অ্যাডভেঞ্চার, বাংলায় নয়, ইংলিশে। ইংলিশে... সেটা পড়তে-পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছি। ব্যস, অমনি ভোররাতে আমি সেই রাইটারকে দেখলাম স্বপ্নে। আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লেও রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্নে দেখি। তিন-চারবার দেখেছি। একবার তো রবীন্দ্রনাথ আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'তুই তো বেশ ভালই পোয়েট্রি লিখিস রে জোজো।'"

সন্তু বলল, "রবীন্দ্রনাথ 'পোয়েট্রি' বললেন? কবিতা নয়?"

জোজো বললেন, "আহা, আমি তো ইংলিশে লিখি। তাই পোয়েট্রিই তো বলবেন।"

সন্তু বলল, "রবীন্দ্রনাথ তোর ডাকনামও জানেন? যাকগে। মার্ক টোয়েন তোকে স্বপ্নে কী বললেন?"

জোজো বলল, "স্বপ্নে ওঁকে দেখলাম, ঠিক যেন জীবন্ত! ওঁকে কী যেন একটা কোয়েশ্চেন করতে যাচ্ছিলাম, যেই বলেছি, 'মিস্টার টোয়েন...,' অমনি উনি ভেংচি কেটে আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার নাম জানো না?' ধমক খেয়ে আমি চুপ করে গেলাম। সত্যিই তো ওঁর আসল নামটা আমার মনে নেই। তারপরেই ঘুম ভেঙে গেল। তুই নামটা জানিস?"

সন্তু বলল, "জানতাম, এখন মনে পড়ছে না। কিন্তু তুই তো আমার কাছে ছুটে না এসে..."

জোজো বলল, "এনসাইক্লোপিডিয়া দেখার কথা বলছিস তো? আমাদের বাড়িতে পুরো সেট আছে। কিন্তু সব বইয়ের আলমারিতে তো তালা দেওয়া, সেই চাবি খুঁজে পাচ্ছি না।"

সন্তু বলল, "বই দেখতে হবে কেন? তোদের তো কম্পিউটার আছে, ইন্টারনেট খুললেই সব পাওয়া যায়।"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "বাবা কাল রাত্তির থেকে কম্পিউটারে কাজ করছেন। এখন ওতে হাত দেওয়া নিষেধ।"

সন্তু বলল, "ঠিক আছে, আমি ঘুরে আসি। তারপর আমার কম্পিউটারে ইন্টারনেট দেখে দেব। তুই উপরে গিয়ে বোস।"

এতক্ষণ পর জোজো জিজ্ঞেস করল, "তুই এত সকালে কোথায় যাচ্ছিস?"

সন্তু বলল, "সাঁতার কাটতে।"

জোজো বলল, "কোথায় সাঁতার কাটবি? গঙ্গায়?"

সন্তু বলল, "না। লেকে, আমাদের ক্লাবে। অনেক দিন যাওয়া হয়নি।"

জোজো বলল, "আমিও যাব তোর সঙ্গে।"

সন্তু বলল, "তুই তো সাঁতার কাটবি না। তুই গিয়ে কী করবি?"

জোজো বলল, "দেখব। লেকের ধারের টাটকা হাওয়া খাব। আর গরম-গরম জিলিপিও খেতে পারি।"

সন্তু পাশের গ্যারাজের দরজাটা খুলল। সেখানে রয়েছে তার বাবার একটা অনেক কালের পুরনো গাড়ি, তার একপাশে চেন দিয়ে বাঁধা সন্তুর সাইকেল।

সাইকেলটা বের করে এনে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই আমার পিছনে বসে যেতে পারবি?"

জোজো বলল, "অ্যাট ইজ। নো প্রবলেম।"

সে পিছনের ক্যারিয়ারে বসে দু' হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে রইল সন্তুর কাঁধ।

একটুক্ষণ যাওয়ার পর সন্তু বলল, "তুই সাঁতারটা শিখে নিস না কেন, জোজো? আজ থেকে শুরু করবি? আমি তোকে শিখিয়ে দিতে পারি।"

জোজো নাক কুঁচকে বলল, "এঃ, লেকে হাজার-হাজার লোক সাঁতার কাটে। তাদের গায়ের ময়লা জলে মিশে যায়। এই জলে নামতে আমার ঘেন্না করে। আমি সাঁতার কাটব সমুদ্রে।"

সন্তু বলল, "গত বছর তো পুরীতে গিয়েছিলি। সেখানে সাঁতার কেটেছিস?"

জোজো বলল, "পুরীতে বড্ড ভিড়। আমার ইচ্ছে করে, মাঝসমুদ্রে, যেখানে জলের রং নীল আর খুব শান্ত, সেখানে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে নেমে বেশ সাঁতার কাটব।"

সন্তু বলল, "মাঝসমুদ্রে লাফ দিলে হাঙর এসে খেয়ে ফেলবে।"

সে কথাটা গ্রাহ্য না করে জোজো বলল, "ওই মোড়ের দোকানটায় এই সময় খুব ভাল কচুরি আর শিঙাড়া ভাজে। সন্তু, তোর খিদে পায়নি?"

সন্তু বলল, "সাঁতার কাটার আগে আমি কিছু খাই না। আর সাঁতার কাটার পর এমন রাক্ষুসে খিদে পায় যে, ইচ্ছে করে বাগানের গাছের পাতা আর ফুলও খেয়ে ফেলি।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "তুই সত্যি-সত্যি ফুল খেয়েছিস কখনও?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ খেয়েছি। তবে কাঁচা নয়। কুমড়োফুল ভাজা, বকফুল ভাজা!"

জোজো বলল, "গোলাপফুল খাসনি? ভাজা-ফাজা নয়, ফ্রেশ। একটা-একটা পাপড়ি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে, দারুণ টেস্ট। খেয়ে দেখিস!"

সন্তু বলল, "তুই আগে একদিন আমার সামনে খেয়ে দেখাস। তারপর আমি ফুল খাওয়ার চেষ্টা করব।"

জোজো হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "এই, এই, এই..."

সন্তু ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

জোজো বলল, "সামনে দ্যাখ, উলটো দিক থেকে একটা ট্রাক আসছে, খুব জোরে।"

সন্তু বলল, "আসছে তো কী হয়েছে? আমি সাইড দিয়ে বেরিয়ে যাব।"

জোজো বলল, "এপাশে যে একটা গোরু!"

সন্তু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "গোরু! হাতি হলে তবু না হয় কিছুটা অসুবিধে হতে পারত!"

সন্তু সাইকেলটার গতি কমিয়ে পাশ কাটানোর চেষ্টা করল। তখনই জোজো আবার চেঁচিয়ে সন্তুর পিঠ থেকে হাত ছেড়ে দিল। ধপাস করে পড়ে গেল রাস্তায়!

সন্তু ঘাবড়ে গিয়ে কোনও রকমে সাইকেলটা থামিয়ে তুলে নিল ফুটপাথে। সেটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ছুটে গেল জোজোর কাছে।

জোজো রাস্তার উপরে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছে।

সন্তু তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, "তুই কী রে? এতটুকু মনের জোর নেই?"

জোজো উঠে পড়ে জামার ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, "মনটা অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। আমার মনের জোর খুবই আছে। কিন্তু মাঝে-মাঝে কন্ট্রোল থাকে না। ওই দ্যাখ!"

পাশেই একটা দোকানের সামনে কিছু লোক ভিড় করে আছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী দেখব?"

জোজো বলল, "দেখতে হবে কেন? গন্ধ পাচ্ছিস না? ওরকম জিলিপি ভাজার গন্ধ পেলে মাইন্ডের উপর কোনও কন্ট্রোল থাকে?"

সন্তু আর কিছু না বলে সেই দোকানটায় গিয়ে দশখানা জিলিপি কিনে নিয়ে এল।

ঠোঙাটা জোজোর হাতে দিয়ে বলল, "আমি যখন সাঁতার কাটব, তখন তুই বসে-বসে এগুলো খাবি। সব ক'টাই খেয়ে ফেলতে পারিস, আর যদি ইচ্ছে হয়, আমার জন্যও দু'-একটা রাখতে পারিস।"

জোজো আমার সাইকেলের পিছনে চাপতে-চাপতে বলল, "আ ফ্রেন্ড ইন নিড ইজ আ ফ্রেন্ড ইনডিড! তোর মতন বন্ধুর জন্য আমার সব সময় ফিফটি-ফিফটি। আদ্ধেক তোর জন্য রেখে দেব।"

লেকে পৌঁছে, জোজোকে একটা বেঞ্চে বসিয়ে সন্তু সাঁতারের ক্লাবের মধ্যে ঢুকে গেল।

রবিবার সকালে লেকে বেশ ভিড় থাকে। অনেক লোক মর্নিংওয়াক করে। বেশ কিছু নৌকোও চলে। আজ বোধ হয় রোয়িং কম্পিটিশন আছে, কিছু লোক চ্যাঁচাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে।

একটা ঝাঁকড়া গাছে দু'টো কোকিল ডাকছে তারস্বরে। কোকিলের ডাক শোনা গেলেও তারা এমন পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে যে, সহজে দেখাই যায় না।

ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে সন্তু সাঁতার কেটে ফিরে এল। চিরুনি আনতে ভুলে গিয়েছে, তাই ভিজে চুল আঁচড়ানো হয়নি। সেই জন্য তার মুখটা অন্য রকম দেখাচ্ছে।

উঠে দাঁড়িয়ে জোজো জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে সন্তু, সাঁতার না জানলেও নৌকো চালাতে দেয়? এখানে রোয়িং দেখে আমার খুব ইচ্ছে করছে।"

সন্তু বলল, "সাঁতার না জানলে এখানকার ক্লাবে তোকে কোনও বোটে উঠতেই দেবে না।"

জোজো অবজ্ঞার সঙ্গে ঠোঁট উলটে বলল, "ক্লাবে কেন, যদি নদীতে গিয়ে নৌকো চালাই?"

সন্তু বলল, "তা পারবি না কেন? সমুদ্রেও ট্রাই করতে পারিস।"

জোজো বলল, "এই যাঃ! খুব ভুল হয়ে গিয়েছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

জোজো বলল, "কখন মনের ভুলে সব ক'টা জিলিপি খেয়ে ফেলেছি! তোর জন্য রাখা হয়নি। দু'টো কোকিল এমন ডাকাডাকি করছিল, তাতেই অন্যমনস্ক হয়ে... কোকিল ডাকলে কি মাইন্ডের ওপর কন্ট্রোল রাখা যায়? চল, আমি তোর জন্য জিলিপি কিনছি।"

সন্তু বলল, "থাক, তার আর দরকার নেই। ছুটির দিনে আমাদের বাড়িতে লুচি আর মোহনভোগ হয়, সেটাই খাব।"

জোজো চোখ বড়-বড় করে বলল, "মোহনভোগ? তাতে কিশমিশ দেয়? কত দিন খাইনি। খিদেও পেয়েছে খুব।"

বাড়ি ফিরে তেতলার ঘরে এসে সন্তু কম্পিউটার খোলার আগেই বলল, "এইমাত্র মনে পড়ে গেল। মার্ক টোয়েনের আসল নাম, স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স!"

জোজো বলল, "ঠিক বলেছিস, আমারও এই নামটা পেটে আসছিল, মুখে আসছিল না।"

সন্তু ইন্টারনেট খুলে দেখতে-দেখতে বলল, "তোর কেন নৌকো চালাতে ইচ্ছে করছিল জানিস? মার্ক টোয়েনও মিসিসিপি নদীতে নৌকো চালাতেন। জোজো, তুই হ্যালিজ কমেট-এর নাম শুনেছিস?"

জোজো বলল, "কমেট মানে ধূমকেতু, তাই না?"

সন্তু বলল, "এই ধূমকেতুটা বেশ মজার। ঠিক পঁচাত্তর বছর অন্তর-অন্তর পৃথিবীর আকাশে দেখা যায়। মার্ক টোয়েন যে বছর জন্মান, সে বছর ওই ধূমকেতুটা এসেছিল। আবার তাঁর যে বছর মৃত্যু হল, সে বছরেও এসেছিল ওই ধূমকেতু।"

জোজো বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন ইন্টারনেটে দ্যাখ তো, সুন্দরবন সম্পর্কে কী-কী লেখা আছে?"

সন্তু মুখ ফিরিয়ে বলল, "সুন্দরবন? হঠাৎ সুন্দরবন কেন?"

জোজো বলল, "আমরা সুন্দরবন যাচ্ছি। কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে যাব।"

এবার সন্তু হেসে ফেলে বলল, "ধরে নিয়ে যাবি মানে? আমি তো শুনছি, কাকাবাবু দু'-তিন মাসের জন্য অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন।"

জোজো বলল, "ওসব অস্ট্রেলিয়া-ফস্ট্রেলিয়া যাওয়া চলবে না। আমি কাকাবাবুর উপর খুব চটে গিয়েছি। কাকাবাবু অনেকদিন কোনও অ্যাডভেঞ্চারে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন না। সেই যে আফ্রিকায় কী একটা আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে নামলেন, সেবারে আমাদের সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল না?"

সন্তু বলল, "সেবারে আমাদের পরীক্ষা ছিল।"

জোজো বলল, "পরীক্ষা ছিল তো কী হয়েছে? আর দু' সপ্তাহ পরে যেতে পারতেন। আর এই যে আরব দেশে গেলেন, সেবারেও তুই স্বার্থপরের মতন আমায় ফেলে গেলি?"

সন্তু বলল, "তুই যে তখন বলেছিলি, তোর বাবার সঙ্গে হনলুলু যাবি?"

জোজো বলল, "ঠিক সেই মাসেই হনলুলুতে যে বিরাট ভূমিকম্প হল, তোর মনে নেই? সেই জন্যই তো আমাদের যাওয়াটা ক্যানসেল হয়ে গেল। তা ছাড়া অমিতাভ বচ্চন তাঁর ছেলের বিয়েতে আমাদের বাড়িসুদ্ধ সবাইকে নেমন্তন্ন করলেন। সে বিয়েতে বাবাই তো ছিলেন চিফ কন্ডাক্টর।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কন্ডাক্টর মানে? বিয়ের সময়..."

জোজো বলল, "বিয়ের সময় অনেক পুজো-টুজো আর মন্ত্র-ফন্ত্র পড়া হয়, অনেক পুরুত থাকে, বাবা তাদের ঠিক মতন চালিয়েছেন।"

সন্তু বলল, "ও। তা তুই হঠাৎ কাকাবাবুকে সুন্দরবন নিয়ে যেতে চাইছিস কেন?"

জোজো বলল, "বাঃ! সুন্দরবন চমৎকার জায়গা। আমরা নৌকোয় চড়ে বেড়াব। নদীতে চাঁদের দোল খাওয়া দেখব রাত্তিরবেলা। আজকাল ওখানকার নদীতে জলদস্যু, মানে পাইরেট্স ঘোরাফেরা করে। কাকাবাবু তাদের ধরে-ধরে..."

সন্তু বলল, "শোন জোজো, জলদস্যু মানে পাইরেট্স নয়। পাইরেট্স মানে জলদস্যু। আর জলদস্যু ধরা তো কাকাবাবুর কাজ নয়। সে তো পুলিশের দায়িত্ব।"

জোজো বলল, "মোট কথা, আমি কাকাবাবুকে এবার সুন্দরবনে নিয়ে যাবই!"

সন্তু বলল, "কাকাবাবুর যদি অন্য কাজ থাকে, যদি যেতে রাজি না হন, তা হলেও তুই নিয়ে যাবি কী করে?"

জোজো বলল, "খুব সিম্পল। কাকাবাবুকে আমাদের বাড়িতে একদিন কফি খাওয়ার নেমন্তন্ন করব। সেই কফি বানানো হবে কী দিয়ে জানিস? আমাদের বাড়িতে কয়েক বোতল জর্ডন নদীর জল আছে। সেই জল দিয়ে বানানো কফি খেলেই মানুষের দারুণ ঘুম পায়। চব্বিশ ঘণ্টা টানা ঘুম। সেই অবস্থায় কাকাবাবুকে গাড়িতে চাপিয়ে সোজা ডায়মন্ড হারবার। তারপর নৌকোয় তুলে... কাকাবাবুর যখন ঘুম ভাঙবে, তখন সুন্দরবন পৌঁছে গিয়েছি!"

সন্তু বলল, "তুই কাকাবাবুকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চাস?"

জোজো জোর দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাকাবাবুকে ইলোপ করব। না, না, ইলোপ নয়, কী যেন কথাটা, অ্যাবডাকশন! অ্যাবডাকশনের বাংলা কী রে সন্তু?"

সন্তু বলল, "গুম।"

জোজো ভুরু তুলে বলল, "গুম? কখনও শুনিনি তো কথাটা।"

সন্তু বলল, "কাউকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখলে তাকে গুম করাই বলে। যাই হোক, তুই কাকাবাবুকে ওইসব করতে চাইলেও তাতে আমি রাজি হব কেন? নিজের কাকাকে কেউ গুম করে? আমি তোকে বাধা দেব। তাতে তোর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবে।"

জোজো বলল, "তুই হাজার চেষ্টা করলেও আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারবি না।"

এই সময় রঘু নিয়ে এল দু'টো প্লেটে লুচি আর মোহনভোগ।

সেগুলো ছোট টেবিলে নামিয়ে রাখতে-রাখতে রঘু বলল, "সন্তুসোনা, তোমাকে কাকাবাবু একবার ডেকেছেন।"

সন্তু বলল, "এই রঘুদা, তোমাকে কত বার বলেছি না, আমাকে 'সন্তুসোনা' বলবে না? শুধু 'সন্তু' বলে ডাকতে পার না?"

রঘু বলল, "অ, তুমি তো এখন বড় হয়ে গিয়েছ। অবশ্য তত বড় এখনও হও নাই।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু ডাকছেন? এক্ষুনি যেতে বলেছেন?"

রঘু বলল, "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কেউ যায়? ঠান্ডা হয়ে যাবে না। আগে খেয়ে নাও। কাকাবাবুর কাছে দু'জন বাইরের ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁদেরও খেতে দিয়েছি। তোমাদের চারখানা করে লুচি দিয়েছি, আর লাগবে?"

জোজো বলল, "আরও দু'খানা করে দিতে পার, যদি তোমার ইচ্ছে হয়।"

রঘু বলল, "সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি..."

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে সন্তু জোজোকে নিয়ে নেমে এল দোতলায়।

কাকাবাবুর ঘরে দু'জন অচেনা ভদ্রলোক বসে আছেন। সদ্য লুচি খাওয়া শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। দু'জনেই পুরোদস্তুর সুট-টাই পরা।

কাকাবাবু জোজোকে দেখে বললেন, "এই যে জোজোসাহেব, তোমার ইংরেজিতে কবিতা লেখা কেমন চলছে?"

জোজো বলল, "ছাপ্পান্নটা, মানে ফিফটি সিক্স পোয়েম লিখে ফেলেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "গুড, গুড। পুরো একশোটা লিখে ফ্যালো।"

তারপর সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সন্তু, এই ভদ্রলোকের নাম বিবস্বান দত্ত।"

ভদ্রলোকটি বললেন, "সবাই আমাকে 'বিব দত্ত' বলেই ডাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "প্রথমে উনি সেই নামই বলেছিলেন। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি ইংরেজি নাম না বাংলা নাম? এখন তো অনেকে ইংরেজি নামও রাখে। তখন উনি আসল নামটা বললেন।"

সে ভদ্রলোক বললেন, "দেখুন না, আমার গ্র্যান্ডফাদার এই খটোমটো নামটা রেখেছিলেন। কেউ এর মানেও বোঝে না। ঠিক মতন উচ্চারণও করতে পারে না। তাই আমি ছোট করে নিয়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ করেছেন, আজকাল এই সব নাম অনেকেই তো বুঝবে না। সন্তু, এই দত্তসাহেব আমাদের দেবলীনার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

বিব দত্ত বললেন, "হ্যাঁ স্যার, আমরা একেবারে বুজুম ফ্রেন্ড। এক পাড়ায় থাকতুম, একেবারে চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড।"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধু বললে ঠিক বোঝায় না, বুজুম ফ্রেন্ডই ঠিক কথা। আচ্ছা, চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড যে বলছেন, তা ঠিক কত বছর বয়স থেকে?"

বিব দত্ত বললেন, "আমরা এক পাড়াতেই থাকতুম তো, ওরাও দত্ত, আমিও দত্ত, একেবারে দু'-তিন বছর বয়স থেকেই..."

কাকাবাবু বললেন, "অত ছোটবেলাকার বন্ধুদের আগেকার দিনে বলত, 'ন্যাংটো বয়সের বন্ধু'। এখন বোধ হয় আর বলে না। সে যাই হোক, ইনি একজন মস্ত ব্যবসায়ী। তিনখানা হোটেল চালান। আর এঁর সঙ্গের ভদ্রলোক..."

সেই লোকটি হেসে বলল, "আমার নামটা খুব সোজা, ইহ রায়। 'ইহ' কিন্তু ইংরেজি নয়, বাংলা।"

কাকাবাবু বললেন, "সে তো নিশ্চয়ই। ইহকাল আর পরকাল বলে না? ইহ বেশ ভাল নাম। ইহবাবুও একজন..."

তিনি বললেন, "স্যার, আমাকে 'বাবু-টাবু' বলবেন না। 'তুমি'-ই বলবেন। আমি ছোটবেলা থেকে আপনার ভক্ত।"

কাকাবাবু বললেন, "ইনিও একজন বড় ব্যবসায়ী। ইনি গঙ্গার বুকে লঞ্চ চালান। ডায়মন্ড হারবার, হলদিয়ায় এঁর পাঁচটা লঞ্চ চলে। সকালবেলাতেই দু'-দু'জন এত বড় ব্যবসায়ী এসে হাজির হয়েছেন আমার মতন একজন সামান্য লোকের কাছে, আমার কী সৌভাগ্য বল তো! হ্যাঁ, এই আমার ভাইপো সন্তু, আর তার বন্ধু জোজো, শুধু জোজো বললে ঠিক বোঝায় না, এ হচ্ছে জোজো দ্য গ্রেট।"

বিব দত্ত বললেন, "সন্তুকে তো আমি ভালই চিনি। কয়েকবার দেখা হয়েছে। আর এই জোজো, এর কথাও অনেক শুনেছি দেবলীনার কাছে। তবে..."

হঠাৎ হেসে ফেলে বিব দত্ত বললেন, "দেবলীনার কেন যেন এই জোজোর উপর খুব রাগ।"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো হতেই পারে। জোজোর উপর যারা প্রথমে খুব রেগে যায়, পরে তারাই... আচ্ছা সেসব কথা পরে হবে। হ্যাঁ রে সন্তু, তোদের এখন পরীক্ষা-টরিক্ষার কী অবস্থা?"

সন্তুর আগেই জোজো বলে উঠল, "পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। এখন ছুটি। আমি তো ভাবছিলুম..."

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কী ভাবছিলে, সেটা একটু পরে শুনছি। এখন এই ভদ্রলোক দু'জনের প্রস্তাবের কথা আগে বলি। বিব দত্ত সুন্দরবনে একটা দ্বীপে রিসর্ট খুলেছেন। এখন নাকি ওখানে এরকম হচ্ছে। আমি এতটা জানতাম না। খুবই আরামদায়ক থাকার ব্যবস্থা, ঘরে-ঘরে এসি-টেসি আছে, কল খুললেই গরম জল। আর এই ইহ রায়, লঞ্চে করে সুন্দরবনের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নদীনালায় ঘোরাবেন, 'ক্রুজ' যাকে বলে। এই একটা ট্রিপে আমাদের যেতে বলছেন। মন্দ নয় ব্যাপারটা। কী বল? তোরা যাবি নাকি?"

জোজো বলল, "যাবই তো! যাবই তো!"

তারপর সে সন্তুর দিকে ফিরে দারুণ একখানা হাসি দিল। 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' গল্পে বিড়ালটা যেরকম হাসি দিয়েছিল।

সন্তু বলল, "কিন্তু কাকাবাবু, তোমার যে খুব জরুরি একটা কাজে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার কথা ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সেটা সামনের মাসের তিন তারিখে গেলেই হবে। মাঝখানে দিন পনেরো সময় আছে। অনেক দিন সুন্দরবন যাইনি, এখন একবার ঘুরে এলে ভালই হয়।"

জোজো বলল, "কী রে সন্তু, তোকে বলেছিলাম না, কাকাবাবুকে এখন একবার সুন্দরবন যেতেই হবে? মিলে গেল কি না দ্যাখ।"

কাকাবাবু চশমার ফাঁক দিয়ে জোজোর দিকে কৌতূহলী ভাবে তাকিয়ে বললেন, "যেতেই হবে? তা বোধ হয় ঠিকই বলেছ।"

এবার বিব দত্ত আর ইহ রায় উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিতে চাইলেন। দু'জনেই কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, "তা হলে স্যার, ওই কথাই রইল, পরশু সকালে আমাদের গাড়ি এসে আপনাদের তুলে নিয়ে যাবে।"

কাকাবাবু ওঁদের দু'জনকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন।

তারপর ফিরে এসে জোজোর কাঁধ চাপড়ে বললেন, "জোজোমাস্টার, তুমি অনেকটা ঠিকই বলেছ। ওরা আমাদের ভাল জায়গায় রাখবে, খাওয়াবে-দাওয়াবে, লঞ্চে করে ঘোরাবে, শুধু এই কথা বলতেই তো আসেনি। ওদের ব্যবসায় একটা বিপদ দেখা দিয়েছে, সেইজন্যই ওরা..."

জোজো বলল, "জলদস্যু, মানে পাইরেট্স? তারা খুব ঝামেলা করছে, আমি শুনেছি।"

সন্তু বলল, "জোজো, তোকে বলেছি না জলদস্যু মানে পাইরেট্স নয়। জলদস্যুর ইংরেজি হচ্ছে পাইরেট্স!"

কাকাবাবু বললেন, "জলদস্যু-টলদস্যু নয়। সেসব তো আছেই। বর্ডার সিকিওরিটি ফোর্স তাদের সামলাবে, সেটা তাদের দায়িত্ব। সমস্যাটা অন্য। ওদের রিসর্টে প্রায় প্রত্যেকদিন গভীর রাতে একটা অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়। দারুণ জোরে। সে আওয়াজটা কিসের, তা কেউ বুঝতে পারে না। তাই ভয় পেয়ে টুরিস্টরা পরদিনই পালিয়ে যায়।"

জোজো বলল, "বাঘের ডাক?"

কাকাবাবু বললেন, "না হে, সুন্দরবনে তো লোকে বাঘের ডাক শুনতে পাওয়ার আশাতেই যায়। বাঘের দেখা পাওয়া তো ভাগ্যের কথা, কিংবা দুর্ভাগ্যের কথাও হতে পারে। লোকে বলে, সুন্দরবনে গিয়ে কোনও মানুষ বাঘ দেখার আগেই যদি বাঘ তাকে দেখে ফেলে, তা হলে দারুণ বিপদ হতে পারে। সেই জন্য এই সব রিসর্ট কিংবা গেস্ট হাউসগুলোতে চারদিকে উঁচু তারের বেড়া দেওয়া থাকে, তাতে আবার বিদ্যুতের ছোঁয়া দেওয়া থাকে। বাঘ সেই বেড়া ডিঙোতে গেলেই শক খায় আর পালিয়ে যায়। তাই দূর থেকে বাঘের ডাক শুনলে ভয়ের কিছু নেই।"

সন্তু বলল, "সুন্দরবনে এখন মানুষের চেয়ে বাঘের অবস্থা অনেক ভাল, তাই না? বাঘ ইচ্ছে করলে মানুষ মারতে পারে। মানুষ কিন্তু বাঘ মারতে পারবে না, সেটা বেআইনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আজ থেকে পঞ্চাশ কিংবা একশো বছর পরে পৃথিবীতে আর একটাও বাঘ থাকবে কি না, তাতে সন্দেহ আছে। এদের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। তবু আমাদের উচিত, ওদের বাঁচিয়ে রাখা। পৃথিবীতে সব প্রাণীরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে।"

জোজো বলল, "শুধু পাঁঠা আর মুরগি ছাড়া। আর মাছ। না হলে আমরা খাব কী?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "ওদের সংখ্যা অবশ্য এখনও একেবারে কমে যাওয়ার আশঙ্কা নেই।"

জোজো বলল, "ডিসকভারি চ্যানেলে দেখি, সমুদ্রে কত মাছ, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি। সেসব তো এখনও ধরাই হয় না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তা হলে ওখানে আওয়াজটা কিসের?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা তো ওরা বুঝিয়ে বলতে পারল না। বারবার বলতে লাগল, খুব জোরে আর বিকট আওয়াজ। মাঝরাত্তিরের পর। শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে। যাই হোক, তোরা দু'জনে যদি আমার সঙ্গে যাস, তা হলে তোদেরই সেটা খুঁজে বের করতে হবে। আমি আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না।"

জোজো বলল, "না, না, আপনাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি আর সন্তু ঠিক খুঁজে বার করব। দেবলীনাও আমাদের সঙ্গে যাবে নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "তা যেতেই পারে। ওর বাবার বন্ধুদের ব্যাপার।"

জোজো বলল, "এই রে!"

সন্তু বলল, "সে কী রে জোজো, তুই দেবলীনাকে ভয় পাস নাকি?"

জোজো বলল, "ভয় পাব কেন? আমি পৃথিবীতে কাউকেই ভয় পাই না। ও তো একটা পুঁচকে মেয়ে। কিন্তু দেখা হলেই বড্ড ঝগড়া করে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঝগড়া তো দু'জনে মিলে হয়। ও একলা কী করে ঝগড়া করবে, তুমিও যদি...। না, না, ঝগড়া-টগড়া কিছু হবে না। চলো, কয়েকদিন বেশ খোলা মনে বেড়িয়ে আসি।"

॥ ২ ॥

লঞ্চটির নাম 'বার্ড অফ প্যারাডাইজ'। বেশ বড়, স্টিমারও বলা যেতে পারে। ছ'খানা শোওয়ার ঘর, লম্বা ডাইনিং রুম, দোতলার ডেকে বসার সুন্দর ব্যবস্থা। অনেক চেয়ার তো আছেই, তা ছাড়া দু'খানা আরামকেদারা, তাতে শুয়ে-শুয়েও সব কিছু দেখা যায়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও এই লঞ্চেই, যখন খুশি চা, কফি, কোল্ড ড্রিংক্স চাইলেই এসে যায়।

উপরের ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে সন্তু আর জোজো। কলকাতা থেকে সকালে বেরিয়ে গাড়িতে এসেছে বাসন্তীতে। সেখান থেকে এই লঞ্চ।

সারাদিন মাতলা নদী থেকে অন্যান্য নদী আর খাঁড়ি ঘোরা হচ্ছে, তারপর অন্ধকার হয়ে গেলে থাকতে হবে গেস্ট-হাউসে।

সন্তু আর জোজো দু'জনেরই ইচ্ছে, গেস্ট-হাউসের বদলে রাত্তিরে এই লঞ্চেই থেকে যাওয়ার। ঘর তো আছেই, বিছানা-টিছানা পাতা। কিন্তু তা হলে যে সেই রহস্যময় বিকট শব্দটা শোনা হবে না! ওদের দু'জনকেই তো সেটার সমাধান করতে হবে।

জোজো অবশ্য বলেছে, প্রথম রাত্তিরেই ব্যাপারটা ধরে ফেলবে। তারপর বাকি কয়েকটা রাত নদীর উপরেই কাটাবে।

জোজো হঠাৎ বলে উঠল, "ওই দ্যাখ, ওই দ্যাখ সন্তু, একটা কুমির।"

সন্তু বলল, "কোথায়, কোথায় রে?"

জোজো বলল, "দেখতে পাচ্ছিস না! ডান দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, কুমিরটা ওর মাথাটা শুধু জলে ভাসিয়ে রেখেছে।"

সন্তু বলল, "কুমির কোথায়, ওটা তো মনে হচ্ছে পোড়া কাঠ।"

জোজো বলল, "কুমিরকে একটু দূর থেকে ওইরকমই মনে হয়।"

সন্তু ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, "অনেক সময় সেরকম মনে হতে পারে, কিন্তু ওটা একটা কাঠই ভেসে যাচ্ছে, কুমির নয়।"

জোজো বলল, "তুই কি বলতে চাস, এ নদীতে কুমির নেই? আমার এক পিসতুতো দাদা সুন্দরবনের কুমিরের ফোটো তুলে নিয়ে গিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

সন্তু বলল, "এখানে কুমির থাকবে না কেন? আছে নিশ্চয়ই। তবে আমরা তাকালেই যে কুমির দেখতে পাব, তার কোনও মানে আছে কী?"

জোজো জোর দিয়ে বলল, "আমি বলছি, ওটা কুমির। কত বাজি ধরবি বল!"

সন্তু বলল, "কথায়-কথায় বাজি ধরা খুব ব্যাড হ্যাবিট। শোন জোজো, 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' বলে একটা কথা আছে শুনেছিস তো? জল-কাদার মধ্যে হঠাৎ একটা মোটা দড়ি দেখলে সাপ বলে ভুল হতে পারে। তেমনি এটাও হল কাষ্ঠে কুমিরভ্রম। কুমিরের পিঠটা অনেকটা পোড়া কাঠের মতন। তবে তাকিয়ে থাক, একবার হয়তো আসল কুমির দেখা যেতেও পারে।"

জোজো কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, বাঘ কি সাঁতার কাটতে পারে?"

সন্তু বলল, "বাঘ তো পারেই। পিঁপড়ে কিংবা হাতি পর্যন্ত সব প্রাণীই নিজে-নিজে সাঁতার কাটে, শিখতে হয় না। শুধু মানুষকেই সাঁতার শিখতে হয়।"

জোজো বলল, "মানুষ কেন নিজে-নিজে পারে না? এ তো ভারী অন্যায়!"

সন্তু বলল, "কার অন্যায়?"

জোজো বলল, "ভগবানের। কিংবা নেচার, যাই বলিস। মানুষের উপর এরকম অবিচার করা হয়েছে কেন?"

সন্তু বলল, "অবিচার কী রে! বরং পক্ষপাতিত্ব বলতে পারিস। পৃথিবীর সব প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই একমাত্র দেহের তুলনায় মাথাটা বেশি বড়। হাতির অত বড় চেহারা, কিন্তু সেই তুলনায় মাথাটা ছোট। মানুষের বুদ্ধি বেশি, তাই মাথাটা বড় ও ভারী। সেই জন্যই সাঁতার না জেনে জলে পড়লেই মানুষ মাথার ভারে জলে ডুবে যায়। সাঁতার শেখা মানে, মাথাটা জলের উপর তুলে রাখা। যাতে নিশ্বাস বন্ধ না হয়ে যায়।"

জোজো বলল, "বাঘ যদি সাঁতার কাটতে পারে, তা হলে তো চুপিচুপি রাত্তিরবেলা সাঁতরে লঞ্চে উঠে আসতে পারে।"

সন্তু বলল, "অনেক গল্পে পড়েছি, রাত্তিরবেলা বাঘ সাঁতরে এসে নৌকো থেকে কোনও মানুষের ঘাড় কামড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু লঞ্চে উঠতে পারবে কি না, তা জানি না।"

জোজো বলল, "নৌকোয় যদি উঠতে পারে, তা হলে লঞ্চেই বা উঠতে পারবে না কেন? না রে সন্তু, ভেবে দেখলাম, রাত্তিরবেলা লঞ্চে থাকাটা ঠিক হবে না। কুমিরও তো লঞ্চে উঠে আসতে পারে?"

সন্তু বলল, "সেরকম কখনও শুনিনি। কুমির বোধ হয় নৌকোতেও উঠতে পারে না। একটা সিনেমায় দেখেছিলাম, আফ্রিকায় একটা নদীতে নৌকোর পাশে-পাশে কুমির ঘুরছে, আর নৌকোর লোকেরা বৈঠার বাড়ি মেরে কুমিরটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে। তুই আগেই এত ভয় পাচ্ছিস কেন?"

জোজো চোখ গোল-গোল করে বলল, "ভয়? আমি বাঘ-কুমির-টুমিরকে কিন্তু ভয় পাই না। সামনে এলে এমন কায়দা করে কাত করে ফেলব... আমি চিন্তা করছি তোর জন্য।"

সন্তু মুচকি হেসে বলল, "তুই সঙ্গে থাকলে আমার তো ঘাবড়ানোর কোনও কারণ নেই। বিপদে পড়লে তুই বাঁচাবি।"

জোজো বলল, "অফকোর্স। বন্ধুর জন্য আমি সব কিছু করতে

পারি। জানিস তো সন্তু, আমি একবার একটা বাঘের সামনাসামনি পড়ে গিয়েছিলাম।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তাই নাকি? কোথায়? এই সুন্দরবনে?"

জোজো বলল, "না, আমি আগে কখনও সুন্দরবনে আসিনি। আফ্রিকায়।"

সন্তু বলল, "আফ্রিকায় তো বাঘ নেই!"

জোজো বলল, "বাঘ নেই, কে বলেছে তোকে? বাঘ মানে টাইগার নেই। কিন্তু চিতা? চিতাকেও আমরা চিতাবাঘ বলি না? টাইগারের চেয়েও চিতা আরও সাংঘাতিক। কী জোরে দৌড়য়। ফাস্টেস্ট অ্যানিম্যাল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।"

সন্তু বলল, "তা ঠিক।"

জোজো বলল, "কিন্তু সেই চিতাকেও কী করে জব্দ করা যায়, তা জানিস? আমি একদিন সেরেংগেটি ফরেস্টের কাছে একটা মরুভূমিতে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ একটা বাতাবি লেবুগাছের আড়াল থেকে ফস করে বেরিয়ে এল একটা চিতাবাঘ। তেড়ে এল আমার দিকে। এরা দারুণ স্পিডে দৌড়য় বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ পারে না। তুই যদি কয়েক মিনিট দৌড় করাতে পারিস, তা হলেই এরা হাঁপিয়ে গিয়ে থেমে যায়। তখন এদের বুক ধড়ফড় করে খুব। বেশিক্ষণ দৌড়লে চিতাবাঘ হার্ট ফেলও করতে পারে।"

সন্তু বলল, "বাঘে হার্ট ফেল করে কখনও শুনিনি। তা করতেও পারে। তুই দৌড়ে চিতাবাঘটাকে হারিয়ে দিলি?"

জোজো বলল, "ভ্যাট! কোনও মানুষই চিতার সঙ্গে দৌড়ে পারবে না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রথমেই কচ কচ করে কান দু'টো খেয়ে ফেলবে। ওরা মানুষের কান খেতে খুব ভালবাসে। আমি কি এমনি-এমনি পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম নাকি? আফ্রিকার জঙ্গলে কোনও ইডিয়টও পায়ে হেঁটে ঘোরে না। আমি যাচ্ছিলাম, একটা এমু'র পিঠে চেপে। এমু কাকে বলে, জানিস তো? বাংলায় যাকে বলে উটপাখি। মস্ত বড় হয়, আর এমুও খুব জোরে দৌড়তে পারে। চিতাটা তাড়া করেছে, আমিও এমুটাকে খুব জোরে ছোটাতে লাগলাম। একবার চিতাটা প্রায় ধরে ফেলেছিল আর কী, সেটাও জাম্প করেছে, আমিও ঝট করে ডান দিকে ঘুরে গিয়েছি। চিতাটা হাঁপিয়ে থেমে গেল। এই রকম দু'-তিনবার করার পর চিতাটার আর দৌড়নোর ক্ষমতাই রইল না। এত বড় জিভ বার করে হ্যা হ্যা করে হাঁপাতে-হাঁপাতে ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "হার্ট ফেল করল?"

জোজো বলল, "তা জানি না। আমি কী আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে গিয়েছি নাকি? সোজা ফিরে গিয়েছি তাঁবুতে।"

সন্তু বলল, "এমু তো অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। আফ্রিকায়ও থাকে?"

জোজো বলল, "অস্ট্রেলিয়ার পাখি আফ্রিকায় থাকতে পারবে না কেন? আমাদের দেশে কাক আছে, আমেরিকায়ও কাক নেই? আফ্রিকায় আমার বাবার এক বন্ধুর ছ'খানা পোষা উটপাখি আছে।"

সন্তু বলল, "জোজো, তুই কি গল্পটা এইমাত্র বানালি, না আগে থেকেই..."

জোজো যেন কথাটা শুনতেই পেল না। সে বলল, "উঃ, যা তেষ্টা পেয়েছে, গলা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। চল, কোল্ড ড্রিংক্‌স খেয়ে আসি।"

ওরা নীচে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির দিকে এগোতেই দেখল, কাকাবাবু একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। হাতে ধরা একটা বই। কিন্তু বইটা পড়ছেন না।

ওদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "খাওয়ার ঘরে যাচ্ছিস বুঝি?"

জোজো বলল, "একটু আগে একটা কুমির দেখলাম তো, তাই খুব তেষ্টা পেয়ে গিয়েছে। কোল্ড ড্রিংক্‌স আনতে যাচ্ছি।"

কাকাবাবু খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, "কুমির দেখতে পেলে তো গলা শুকিয়ে যাবেই। না দেখতে পেলেও গলা শুকিয়ে যায়।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে কফি দিতে বলব?"

কাকাবাবু বললেন, "না, এখন দরকার নেই। সন্তু দ্যাখ তো, একটা লঞ্চ বোধ হয় আমাদের কাছেই আসছে, ডেকে দাঁড়িয়ে কেউ হাত নাড়ছে। আমি চশমাটা খুঁজে পাচ্ছি না।"

সন্তু দেখল, আর একটা লঞ্চ এই দিকেই আসছে। ডেকে দু'-একজন দাঁড়িয়েও আছে। আকাশটা ক্রমশ মেঘলা হচ্ছিল, এখন আরও কালো হয়ে যাওয়ায় দূরের কিছু ভাল দেখা যাচ্ছে না।

লঞ্চটি আরও কাছে আসার পর বোঝা গেল, সেটা একটা সরকারি লঞ্চ। উপরে পতাকা উড়ছে। ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন দু'জন মাঝবয়সি লোক, আর একটি মেয়ে। একজন লোক অচেনা, অন্যজন শৈবাল দত্ত আর তাঁর মেয়ে দেবলীনা।

জোজো বলল, "এই রে, দেবলীনা এসে গিয়েছে?"

সন্তু তাকে ধমক দিয়ে বলল, "আবার 'এই রে' বলছিস? ও এসেছে তো তোর কী ক্ষতি হয়েছে?"

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, "ক্ষতি আবার কী? ও মেয়েটা বড্ড গুল মারে।"

কাকাবাবু এবারে সত্যিকারের অবাক হয়ে বললেন, "দেবলীনা তোমার সামনে গুল মারে? ওর এত সাহস!"

অন্য ডেক থেকে শৈবাল দত্ত চেঁচিয়ে বললেন, "কাকাবাবু, আপনাদের লঞ্চের ইঞ্জিনটা থামাতে বলুন। আমরা ওই লঞ্চে আসছি।"

তারপর পাশের লোকটিকে দেখিয়ে বললেন, "ইনি আমাদের বিশেষ বন্ধু, সেলিম চৌধুরী, এখানকার ডি এফ ও।"

দেবলীনা চেঁচিয়ে বলল, "কী রে সন্তু, কী রে জোজো। তখন থেকে হাত নাড়ছি, দেখতে পাচ্ছিস না?"

জোজো ফিসফিস করে বলল, "আরম্ভ হয়ে গেল ঝগড়া!"

দু'টো লঞ্চ একেবারে পাশাপাশি এনে মাঝখানে একটা তক্তা পাতা হচ্ছে, যাতে ওই লঞ্চের সবাই এটায় চলে আসতে পারে।

প্রথমে পার হল দেবলীনা, তারপর তারই বয়সি আর একটা মেয়ে।

উপর থেকে উঁকি মেরে দেখতে-দেখতে জোজো বলল, "সর্বনাশ, আরও একটা মেয়ে!"

এবারে কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, "আমাদের জোজো বাঘ-সিংহ দেখলে ভয় পায় না, কিন্তু বাচ্চা মেয়েদের দেখলেই ভয় পায়।"

জোজো বলল, "ভয় পাই না ছাই। আমি গ্রাহ্যই করি না। তবে ওরা বড় বেশি কথা বলে, অন্যদের কথা শুনতেই চায় না।"

কাকাবাবু মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন। যেন আরও কিছু বলতে গিয়েও বললেন না।

মেয়ে দু'টি আর শৈবাল দত্ত উঠে এলেন উপরে।

অন্য মেয়েটি সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "কী সন্তু, তোমার পরীক্ষা কেমন হল?"

সন্তু বলল, "ভাল।"

সে বলল, "কেমিস্ট্রিটা একটু খারাপ হয়েছে, তাই না? অ্যাই, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না নাকি?"

সন্তু বলল, "কেন চিনতে পারব না, তোমাকে তো আগে দেখেছি।"

"আমার নাম কী বলো তো?"

সন্তু একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। মেয়েটিকে সে চেনে, কিন্তু নাম মনে করতে পারছে না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় সে বলল, "তোমার নাম তো মৌমাছি।"

মেয়েটি বলল, "ভ্যাট! মৌমাছি আবার কোনও মানুষের নাম হয় বুঝি?"

জোজো বলল, "কেন হবে না, নাম একটা দিলেই হল!"

দেবলীনা বলল, "নাম একটা দিয়ে দিলেই হল? জোজো, তোর নাম যদি ভজহরি দিই?"

মেয়েটি বলল, "আমার নাম অলি।"

সন্তু এবার প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "তবে? আমি তো প্রায় ঠিকই বলেছি। অলি মানেই তো মৌমাছি।"

অলি বলল, "মোটেই অলি মানে মৌমাছি নয়।"

সন্তু কাকাবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, অলি আর মৌমাছি এক নয়?"

কাকাবাবু বললেন, "তুই প্রায় কান ঘেঁষে গিয়েছিস সন্তু। অলি মানে ভ্রমর। ওর আর একটা খুব ভাল নাম আছে। রূপকথা। এরকম নাম আগে আমি শুনিনি।"

অলি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না, কাকাবাবু, ওটা ভাল নাম নয়। আমার ক্লাসের মেয়েরা পুরোটা না বলে আমায় বলে, রুপো, রুপিয়া! অলি নামটাই ভাল।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার দু'টো নামই আমার ভাল লাগে।"

দেবলীনা বলল, "আমার নামটা কি খারাপ?"

সন্তু বলল, "অমনি তোর বুঝি হিংসে হচ্ছে? একজনেরটা ভাল বললেই অন্যেরটা যে খারাপ হবে, তার কী মানে আছে?"

কাকাবাবু পাশের লঞ্চটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ কী, সেলিমসাহেব এলেন না? আপনি আসুন।"

সেলিম বললেন, "আমি এখন আসতে পারছি না। পরে এলে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "এখন দেড়টা বাজে। আমাদের সঙ্গে খেয়ে যান।"

সেলিম বললেন, "তাতে দেরি হয়ে যাবে। আমি একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি।"

শৈবাল বললেন, "কাকাবাবু, সেলিম একটা বাঘ ধরতে যাচ্ছে!"

সবাই সচকিত হয়ে সেলিমের দিকে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "বাঘ ধরতে? এই দিন-দুপুরে?"

সেলিম বললেন, "একটা বাঘ নদী সাঁতরে ভোলাখালি নামে একটা গ্রামে ঢুকে পড়েছিল কাল রাত্তিরে। এখন সে একটা বাড়ির গোয়ালঘরে বসে আছে। গ্রামের লোক সেই বাড়িটা ঘিরে রেখে ঢাক-ঢোল বাজাচ্ছে, তাই সে আর বেরিয়ে পালাতে পারছে না।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী করে বাঘটা ধরবেন?"

সেলিম বলল, "আমি কী আর বাঘটাকে ধরব? আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আর একটা লঞ্চ আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে কয়েকজন ট্রেন্ড স্টাফ আছে। তারা গিয়ে বাঘটাকে গুলি করবে। গুলি মানে ঘুমপাড়ানি গুলি। আজকাল কাজটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। দু'টো গুলিতেই বাঘটা ঘুমিয়ে পড়বে। তখন চ্যাংদোলা করে তুলে ভরে রাখতে হবে একটা খাঁচায়। তারপর ওর যখন ঘুম ভাঙবে, তখন একটা জঙ্গলে গিয়ে খাঁচার দরজাটা খুলে দিলেই ও পালাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "খবরের কাগজে ফোটো দেখিসনি? খাঁচা থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়ছে জলে। আজকাল এরকম প্রায়ই হয়।"

সন্তু বলল, "আমরা বাঘটাকে ধরা দেখতে পারি না?"

জোজো বলল, "কেন পারব না। চল, আমরা ওই লঞ্চটায় উঠে পড়ি।"

দেবলীনা বলল, "আর আমরা বুঝি এখানে এমনি-এমনিই বসে থাকব। আমরাও যাব।"

এই সময় তলা থেকে এই লঞ্চের একজন কর্মী উপরে উঠে এল।

কাঁচুমাচু মুখে সে সেলিমকে জিজ্ঞেস করল, "সাহেব, কোন গ্রামে বাঘটা ঢুকেছে বললেন?"

সেলিম বললেন, "ভোলাখালি।"

সেই লোকটি বলল, "ভোলাখালি না, ভোলাখালি না, ভোল্লাখালি। সেটাই তো আমার গ্রাম। সব্বোনাশ! বাঘটা কার বাড়িতে ঢুকেছে জানেন?"

সেলিম বললেন, "খবর যা এসেছে, বাড়ির মালিকের নাম করিম শেখ।"

এবারে লোকটি চেঁচিয়ে উঠে বলল, "হায় আল্লা, সেটা তো আমার চাচার বাড়ি! আমাদের বাড়ি পাশাপাশি। বাঘটা কাউরে অ্যাটাক করেছে?"

সেলিম বললেন, "একটা গোরু মেরেছে। মানুষ মারেনি। তবে একটা আশ্চর্য ঘটনাও শুনলাম, একটা বাচ্চা ছেলে নাকি বাঘটার একেবারে সামনে পড়ে গিয়েছিল, বাঘটা তাকে কিছু করেনি। পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে। অনেকেই নাকি এটা দেখেছে। সত্যি কিনা কে জানে!"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যি হতেও পারে। বাঘ-সিংহরা মানুষের বাচ্চাদের কোনও ক্ষতি করে না। এমন শোনা গিয়েছে মাঝে-মাঝে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, দু'টো লঞ্চই তা হলে এক সঙ্গে যাবে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, শুধু-শুধু দু'টো লঞ্চের তেল পুড়িয়ে কী হবে? আমি বাঘ-টাঘ দেখতে চাই না। সেলিমসাহেব যদি রাজি থাকেন, তা হলে তোরা ওই লঞ্চে যেতে পারিস।"

সেলিম বললেন, "আমার আপত্তি নেই। তা হলে তাড়াতাড়ি করতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "খাওয়া-টাওয়া যে কিছু হল না। চটপট করে কিছু খেয়ে নিক, যারা যেতে চায়।"

দেবলীনা বলল, "আমরা এখন কিছু খেতে-টেতে চাই না।"

সেলিম বললেন, "যেতে তো অনেকটা সময় লাগবে। আমার লঞ্চে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

অলি নরম গলায় বলল, "আমিও যাব না। কাকাবাবুর সঙ্গে থাকব। আমার বাঘ দেখতে ভাল লাগে না।"

দেবলীনা তার হাত ধরে টেনে বলল, "না, না, তুই চল আমাদের সঙ্গে। বাঘটা যখন বেরোবে, আমরা দেখব, তুই চোখ বুজে থাকবি।"

এটাই ঠিক হল যে, কাকাবাবুদের লঞ্চটা কাছাকাছি কোথাও নোঙর করে থাকবে। সেলিমের লঞ্চে যাবে চারটি ছেলেমেয়ে, ওরা ফিরে আসবে সন্ধের মধ্যে। দেবলীনার বাবা শৈবালও থেকে যাবেন কাকাবাবুর সঙ্গে।

এই লঞ্চের কর্মচারীটিও হাত জোড় করে কাঁদো-কাঁদো গলায় সেলিমকে বলল, "সাহেব, দয়া করে আমারেও নিয়ে চলেন আপনার সাথে। আমি নিজের চক্ষে একবার না দেখে এলে শান্তি পাব না।"

সেলিম বললেন, "চলে এসো।"

এরা সবাই অন্য লঞ্চটিতে উঠতেই সেটি ছেড়ে দিল।

॥ ৩ ॥

এই লঞ্চটি একটু ছোট, কিন্তু চলে বেশি জোরে।

চারটি ছেলেমেয়ে এসে বসল দোতলার ডেকে। সেলিম তাদের বললেন, "আমাদের পৌঁছতে আরও ঘণ্টাদুয়েক লাগবে। তোমরা গল্প-টল্প করো। একটা ক্যারম বোর্ড আছে, খেলতেও পার। আমি তোমাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করছি।"

দেবলীনা বলল, "সে সব কিছু করতে হবে না। আমাদের খিদে নেই। বিকেলে কিছু খেয়ে নিলেই হবে।"

জোজো বলল, "অ্যাই, তুই কেন বললি, আমাদের খিদে নেই? তোর খিদে না পেতে পারে, তা বলে আমাদের খিদে পাবে না?"

দেবলীনা একগাল হেসে বলল, "আমি ঠিক জানতুম, জোজো এই কথাটা বলবে। খাবারের কথা শুনলেই ওর খিদে পায়।"

জোজো বলল, "তোরা নিশ্চয়ই সকালবেলা গান্ডেপিন্ডে খেয়ে এসেছিস। আমি তো মোটে একটা ডবল ডিমের অমলেট আর চারখানা টোস্ট উইথ বাটার খেয়েছি। আর একখানা সন্দেশ। এতক্ষণে হজম হয়ে গিয়েছে।"

দেবলীনা আবার হেসে বলল, "এই তোর মোটে হল? আমি কী খেয়েছি জানিস?"

"মোটে একখানা পরোটা আর একটুখানি আলুর দম। আর এক কাপ কোকো।"

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সে আবার বলল, "যারা বেশি খায়, তাদের বুদ্ধিটাও মোটা হয়।"

এই বলে যে তাকিয়ে রইল জোজোর দিকে।

জোজো মনে-মনে ভাবল, এই মেয়েটার কাছে সে হেরে যাচ্ছে। একটা কিছু দারুণ উত্তর দিতে হবে। কিন্তু তক্ষুনি কিছু মনে এল না।

দেবলীনা বলল, "কম খাবার খেলে বুদ্ধি বেশি হয়, তার প্রমাণ দেখতে চাস? এই যে আমার বন্ধুটা, অলি, ও তো পুরো একটা পরোটা কিংবা টোস্টও খেতে চায় না, একটুখানি ছিঁড়ে মুখে দেয়। আজ সকালে ও পরোটা ছোঁয়নি, শুধু আলুর দমের দু'টো আলু খেয়েছে। আমাদের ক্লাসের মধ্যে ওর বুদ্ধি সবচেয়ে বেশি। এমনকী, আমার চেয়েও বেশি।"

অলি লাজুক গলায় বলল, "মোটেই না।"

দেবলীনা বলল, "আর একটা ব্যাপার দেখবি। তুই অলির হাতটা একবার ধর। অলি, তোর ডান হাতটা এগিয়ে দে। এই জোজো, হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কী, হাতটা ধরতে বলছি, ধর!"

জোজো অলির ডান হাতটা ধরল। ধরেই রইল। একটু পরে বলল, "হাতটা ধরে কী করব? আমি কি ওর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ব নাকি?"

দেবলীনা বলল, "ধ্যাত, পাঞ্জা-ফাঞ্জা না। তোর কিছু হচ্ছে?"

জোজো বলল, "হচ্ছে মানে? কী হবে? কিছুই হচ্ছে না।"

অলির ঠোঁটে পাতলা হাসি মাখা। সে মাথা নাড়ছে দু' দিকে। তার হাতটা বেশ নরম। দেবলীনা বলল, "কিছুই হচ্ছে না তো? এই কথাটাই মনে রাখিস। পরে কাজে লাগবে। অলি, এবার হাত ছেড়ে দে।"

জোজো কিছুই বুঝতে পারল না। ব্যাপারটা তার কাছে ধাঁধার মতন লাগল।

আকাশে মেঘ আরও কালো হয়ে এসেছে। একটু পরেই বৃষ্টি নামবে মনে হয়।

উপরে সারেংসাহেবের একটা ঘর রয়েছে। তাঁকে দেখলেই মনে হয়, মানুষটি খুব গম্ভীর।

আরও একটা ঘর আছে, সেখানে একটা মাত্র বিছানা পাতা। বৃষ্টি শুরু হলে ওই ঘরে ঢুকে বসা যাবে।

সন্তু সেই ঘরে একবার উঁকি মেরে দেখল, "একটা বাইনোকুলার ঝুলছে দেওয়ালে।"

সেটা নিয়ে এসে সন্তু চোখে লাগাতেই দেবলীনা ধমক দিয়ে বলল, "এই সন্তু, তুই ওটা দিয়ে আগেই নিজে দেখতে শুরু করলি? মেয়েদের আগে দিতে হয়, জানিস না?"

সন্তু সেটা দেবলীনার দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে বলল, "ইয়েস মিস! এই নিন।"

নদী এখানে বেশ চওড়া হয়ে গিয়েছে। এক দিকটা প্রায় ঝাপসা মতন দেখায়।

দেবলীনা সেদিকটা দেখতে-দেখতে বলল, "এখানে আর কোনও বাড়ি-ঘর নেই মনে হচ্ছে। শুধু জঙ্গল। মাঝে-মাঝে নদীতে দু'টো-একটা মাছ ধরার নৌকো দুলছে। পাশ দিয়ে লঞ্চ গেলে সেগুলো আরও জোরে দোলে।"

একটু পরে দূরবিনটা অলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দেবলীনা বলল, "এবার তুই দ্যাখ!"

অলি সেটা নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখতে-দেখতে বলল, "একটা কী সুন্দর পাখি।"

দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "কী পাখি রে?"

অলি বলল, "তা জানি না। নাম না-জানা পাখিই দেখতে ভাল লাগে। কত দূরে রয়েছে পাখিটা। ও কি বুঝতে পারছে যে, আমি ওকে দেখছি? এমনি-এমনি উড়ে গেল।"

অলি বেশিক্ষণ রাখল না, দূরবিনটা সন্তুদের দিকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এবার কে নেবে?"

সন্তু বলল, "তুই নে জোজো।"

জোজো সেটা নিয়ে আর ছাড়তেই চায় না। নদীর দু' দিকেই দেখছে, আর শিস দিচ্ছে।

এক সময় সে আপন মনে বলে উঠল, "আর একটা পোড়া কাঠ ভেসে যাচ্ছে। ওই দ্যাখ সন্তু, তোর ডান দিকে।"

সন্তু খালি চোখেই সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠে বলল, "পোড়া কাঠ তো নয়। ওটা একটা কুমির। সত্যিই কুমির!"

অমনি দূরবিনটা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। তাতে স্পষ্ট দেখা গেল, কুমিরটা শুধু তার পিঠটা ভাসিয়ে রেখেছে। সেটা একটা পোড়া কাঠের মতনই দেখায়। তবে জলের উপর ভেসে থাকা গোল-গোল চোখ দু'টো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।"

একটু পরেই কুমিরটা পারের দিকে ফিরে উপরে উঠতে লাগল। তখন দেখা গেল তার সারা শরীর। এতই স্পষ্ট যে, দেবলীনা তার মোবাইল ফোনে একটা ফোটোও তুলে ফেলল।

কাদার মধ্যে দিয়ে কুমিরটা উঠে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

সন্তু বলল, "জোজো, এবার তোর কুমিরে কাষ্ঠভ্রম হয়েছে।"

জোজো বলল, "মোটেই না, আমি তো জানিই। তোদের কী রকম সারপ্রাইজ দিলাম বল? আমি তো কুমিরটাকে জলে ভাসিয়ে তুললাম।"

দেবলীনা বলল, "অ্যাঁ!"

জোজো বলল, "আমি শিস দিচ্ছিলাম, শুনতে পাসনি? ওটা একটা স্পেশ্যাল ধরনের শিস, ওতে সাউন্ড ওয়েভ তৈরি হয়, তাতে জলের তলার প্রাণীরা উপরে উঠে আসে।"

অলি সরল ভাবে জিজ্ঞেস করল, "তুমিই কুমিরটাকে জলের উপরে তুলে আনলে? সত্যি বুঝি?"

জোজো বলল, "সত্যি কিনা তার তো প্রমাণ পেলে এক্ষুনি। তোমরা যখন বাইনোকুলার চোখে লাগিয়েছিলে, কেউ ওই পোড়া কাঠটা দেখতে পেয়েছিলে?"

জোজো তাকাল দেবলীনার দিকে। যেন বলতে চাইল, 'এবার?'

দেবলীনা সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "কাকতালীয় বলে একটা কথা আছে, না রে?"

সন্তু তার উত্তর না দিয়ে অলিকে বলল, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তখন থেকে ভাবছি, তুমি কী করে জানলে যে, আমার কেমিস্ট্রি পরীক্ষাটা খারাপ হয়েছে?"

অলি বলল, "কেমিস্ট্রি পরীক্ষাটা খারাপ হয়েছে, তাই নিয়ে তুমি খুব চিন্তা করো, তাই না?"

সন্তু বলল, "তা করি। কিন্তু তা অন্য কেউ বুঝবে কী করে?"

অলি বলল, "তোমাকে আমি যেই পরীক্ষার কথা জিজ্ঞেস করলাম, এমনি তোমার মুখে একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তাতে লেখা দেখলাম, কেমিস্ট্রি।"

সন্তু বলল, "তুমি সত্যিই এরকম দেখতে পেলে?"

জোজো বলল, "যতসব আজগুবি কথা। এরকম আবার দেখা যায় নাকি?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ রে, জোজো। কেউ-কেউ নাকি কারও মুখ দেখলেই তার মনের ছবিটা দেখতে পায়। একে বলে একস্ট্রাসেনসরি পারসেপশন, ই এস পি। দশ লক্ষ লোকের মধ্যে একজনের এরকম ক্ষমতা থাকে।"

জোজো বলল, "আমি বিশ্বাস করি না।"

সন্তু বলল, "তোর মনে আছে, একবার কাকদ্বীপে একটা ম্যাজিশিয়ান মানুষ অদৃশ্য করার খেলা দেখানো নামে তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা দ্বীপে চালান করে দিয়েছিল?"

জোজো বলল, "মোটেই আমাকে কেউ চালান করে দেয়নি। আমি অদৃশ্য হয়ে উড়তে-উড়তে চিটাগাঙের কাছে একটা দ্বীপে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে।"

সন্তু বলল, "সে যাই হোক, আমরা তোকে খুঁজে পাচ্ছি না, কিছুই বুঝতে পারছি না, তখন এই অলি বলেছিল, তোর বয়সি একটা ছেলে একটা দ্বীপে বন্দি হয়ে আছে।"

জোজো বলল, "তা কী করে হবে? তখন তো ও আমাকে চিনতই না, ও আমাকে দেখেইনি। এটা আবার কিসের ই এস পি?"

সন্তু বলল, "এটাকে বলে ভিশন। কেউ-কেউ অনেক দূরের কোনও দৃশ্যও দেখতে পায়। ওর জন্যই সেবার তোকে খুঁজে পেয়েছি।"

দেবলীনা তার একটা হাত জোজোর মুখের সামনে এনে বলল, "আমার বন্ধুটির আরও অনেক গুণ আছে, আস্তে-আস্তে টের পাবি!"

অলি বলল, "না গো, আমার সেরকম গুণ নেই। মাঝে-মাঝে উলটো-পালটা কথা বলে ফেলি।"

সেলিম এই সময় উঠে এলেন উপরে। তার সঙ্গে ভোল্লাখালির সেই লোকটি, তার দু' হাতে দু'টো বড়-বড় থালা, তাতে ভর্তি গরম-গরম ধোঁয়া ওঠা লুচি আর বেগুন ভাজা।

সেলিম বললেন, "তোমরা এখন এই সব খেয়ে নাও। সন্ধের সময় আবার জলখাবারের ব্যবস্থা হবে। এই জাভেদ মিয়া চটপট লুচি ভেজে ফেলল।"

জাভেদ বলল, "আমি তো সাহেব প্যারাডাইজ লঞ্চে কুকেরই কাজ করি। আমি তো আমার মাকে দেখি নাই, তাই খুব ছোট বয়স থেকেই রান্না করা শিখেছি।"

সেলিম বললেন, "মা থাক বা না থাক, সবারই রান্না করা শিখে রাখা উচিত। আমিও কিছুটা রান্না জানি!"

দেবলীনা বলছিল বটে যে, তার খিদে নেই, এখন সন্তু-জোজোর সঙ্গে সে দিব্যি সমান তালে খাচ্ছে। শুধু অলি হাতে নিয়ে বসে আছে একখানা লুচি, খাওয়ার দিকে তার মন নেই।

সেলিম বললেন, "শোনো তোমরা, একটু পরেই আমরা এই নদী ছেড়ে একটা খাঁড়িতে ঢুকে পড়ব। সেখান দিয়ে শর্টকাট হবে। ভোল্লাখালিতে পৌঁছে যাব প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে। একটা কথা বলে রাখছি, তোমরা কিন্তু লঞ্চ থেকে নামতে পারবে না।"

একসঙ্গে দু'-তিনজন বলে উঠল, "কেন, কেন?"

সেলিম বললেন, "ঘুমপাড়ানি গুলির ব্যাপারটা সব সময় অত সহজ হয় না। উলটোপালটা কিছু হয়ে যেতে পারে। আমি তোমাদের নিয়ে এসেছি নিজের দায়িত্বে।"

দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "তা হলে আমরা বাঘ দেখব কী করে?"

সেলিম বললেন, "ঘুমন্ত বাঘটাকে যখন তুলে আনা হবে, তখন এই লঞ্চ থেকেই দেখতে পাবে। আর যদি এর মধ্যেই গুলি করা হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে খাঁচার মধ্যে দেখবে।"

দেবলীনা বলল, "খাঁচার মধ্যে? সে তো চিড়িয়াখানাতেও দেখা যায়। আমি কখনও খোলা জায়গায় বাঘ দেখিনি।"

অলি নীচের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলল, "আমাদের বাঘ দেখা হবে না!"

দেবলীনা বলল, "তুই বাঘ দেখতে চাস না, দেখিস না। আমি দেখবই। তেমন বুঝলে আমি সেলিমদার কথা মানবই না, আমি নেমে পড়ব।"

সেলিম হেসে বললেন, "তা হলে দেখছি, তোমাকে এই ছোট ঘরটায় আটকে রাখতে হবে। সন্তু, তুমি আমাকে সাহায্য করবে নিশ্চয়ই।"

জোজো বলল, "বাঘের ডাক শোনা যাবে না?"

সেলিম বললেন, "ঘুমোবার আগে বাঘ ডাকে কি না, তা জানি না।"

সন্তু বলল, "ঘুমোবার আগে আমরা হাই তুলি। বাঘও হাই তুলতে পারে।"

দেবলীনা বলল, "এই সন্তু, হাই মানে কী রে? কথাটা শুনেছি, কিন্তু হাই বলে কেন?"

সন্তু বলল, "হাই মানে হাই। হাই তোলা দেখিসনি? এই দ্যাখ।"

সন্তু হাই তোলার ভঙ্গি করে দেখাল।

সেলিম বললেন, "সংস্কৃত 'হাফিকা' থেকে এসেছে হাই। সংস্কৃতে আর একটা শক্ত কথা আছে, জৃম্ভণ। মজাটা কী জানো, একজন যদি তোমার সামনে হাই তোলে, অমনি তোমারও হাই উঠবে।"

সেলিম নিজেই এবার একটা হাই তুললেন।

লঞ্চটা ভোঁ ভোঁ করে দু' বার শব্দ করে বেঁকে গেল একটা খাঁড়িতে। এবারে দু' পাশেই জঙ্গল, বেশ কাছ থেকে দেখা যায়। একটু আগেই জোয়ার এসেছে, তাই দু' দিকেই ছলাৎ ছলাৎ করে আওয়াজ হচ্ছে জলের।

দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "সেলিমদা, এই জঙ্গলে বাঘ থাকতে পারে?"

সেলিম বললেন, "থাকতে তো পারেই। এই সব এলাকাকে বলে কোর এরিয়া। বাঘেদের জন্যই রিজার্ভ করা। তবে বাঘ এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে চলে যায় যখন-তখন। এই সুন্দরবন একটা আশ্চর্য বন। এখানে সমুদ্রের নোনাজল উপরে উঠে যায়, তবু গাছগুলো মরে না। এখানে এত বাঘ এলই বা কী করে, কে জানে। এই বাঘরাও নোনাজল খায়, হরিণ না পেলে মাছ ধরেও খায়। ওই যে মাঝে-মাঝে হলদে-সবুজ বড়-বড় ঝোপ দেখছ, ওগুলোকে বলে ম্যানগ্রোভ। খুব শিগগিরই এই সুন্দরবনকে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটা বলে ঘোষণা করা হতে পারে।"

সন্তু বলল, "ওই ম্যানগ্রোভের আড়ালে কোনও বাঘ লুকিয়ে থাকলে বোঝাই যায় না।"

জোজো বলল, "হয়তো এখনই কোনও টাইগার, ঝোপের আড়াল থেকে আমাদের দেখছে। সেলিমদা, আপনার কাছে রাইফেল আছে।"

সেলিম বললেন, "লঞ্চে আছে। তা কিন্তু বাঘ কিংবা অন্য পশুপাখি মারার জন্য নয়। মাঝে-মাঝে ডাকাতের উপদ্রব হয়। তখন আত্মরক্ষার জন্য..."

জোজো বলল, "দ্যাট্স রাইট, ডাকাত মানে পাইরেট্স। এক-একটা দলে কতজন থাকে?"

সেলিম বললেন, "আমার ভাগ্যে এখনও ডাকাত দেখা হয়নি। আমি আগে ছিলাম নর্থ বেঙ্গলে, ওখানকার জঙ্গলে চোরাশিকারি আছে, তাদের ঠিক ডাকাত বলা যায় না। এখানেও এ পর্যন্ত... তবে আমার আগে যিনি ডি এফ ও ছিলেন, সেই মিস্টার সামন্তকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি। ওরা এক-একটা দলে সাত-আটজন থাকে। মজা কী জানো, পাশেই তো বাংলাদেশ। ওখানকার ডাকাতরা এদিকে এসে ডাকাতি করে পালিয়ে যায়। আর আমাদের এদিকের ডাকাতরা বাংলাদেশে গিয়ে ডাকাতি করে আসে। তাই এদের ধরা মুশকিল।"

খাঁড়িটা শেষ হওয়ার পর লঞ্চটা এসে পড়ল একটা বড় নদীতে। তারপর কোনাকুনি চলল অন্য পারের দিকে। এর মধ্যে বৃষ্টি নেমে গিয়েছে।

অলি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "কী সুন্দর, কী সুন্দর দেখাচ্ছে!"

জোজো বলল, "আমার একটা পোয়েট্রি লিখতে ইচ্ছে করছে। শুনবে?"

কেউ কিছু বলল না, জোজো নিজেই বলতে শুরু করল:

"রেইন ইজ বিউটিফুল, বিউটিফুল ইজ রেইন
দা রিভার ইজ প্রেয়িং, এগেইন অ্যান্ড এগেইন।"

সেলিম বললেন, "বাহ, বেশ ভাল তো! তুমি বুঝি কবি?"

দেবলীনা বলল, "বেশ ভাল কিছু নয়। মন্দ নয় বলা যায়।"

অলি আপন মনে বলল, "হ্যাঁ ঠিক, নদীরা বৃষ্টি চায়। নদীরা বৃষ্টি খায়!"

সন্তু বলল, "সেলিমদা, আপনি যে বললেন, আগেকার ডি এফ ও মিস্টার সামন্তকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সেটা কতদিন আগে?"

সেলিম বললেন, "সাত মাস হয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছে। অনেক সময় ডাকাতরা মুক্তিপণ চেয়ে চিঠি দেয়, সেরকম কোনও চিঠিও আসেনি।"

জোজো বলল, "মুক্তিপণ মানে র‍্যানসম, তাই না?"

সন্তু বলল, "অ্যাই জোজো, তোকে কত বার বলেছি না, বাংলা কথার ইংরেজি মানে হয় না। বাংলায় যাকে বলে মুক্তিপণ, ইংরেজিতে তাকেই বলে র‍্যানসম।"

দেবলীনা বলল, "কত টাকা চেয়েছিল?"

সেলিম বললেন, "বললাম তো, টাকা চায়নি, কোনও চিঠিও আসেনি। তাঁর কোনও ট্রেসই পাওয়া যায়নি।"

দেবলীনা বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই বাঘে খেয়ে ফেলেছে।"

সেলিম বললেন, "সেটা তো খুব সহজ গল্প হয়ে গেল। আসলে ঠিক এই রকমই একটা লঞ্চে দেবেন সামন্ত একদিন মাঝরাতে ঘুমিয়ে ছিলেন। অন্য একটা নদীতে, সেখানে বাঘ-টাঘের উপদ্রবের কথা কখনও শোনা যায়নি। তা ছাড়া বাঘ লঞ্চে ওঠে না, এমনি নৌকো থেকে কখনও-সখনও মানুষ তুলে নিয়ে যায়। সে রাতে দেবেনবাবুর কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই তিনি দেখলেন, তাঁর মাথার কাছে তিনজন মুখোশ পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনেরই হাতে বন্দুক। একজন দেবেনবাবুর মাথায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বলেছিল, 'ওঠো, চলো আমাদের সঙ্গে।' দেবেনবাবুর হাত বেঁধে ওরা পাশের একটা অন্য লঞ্চে তুলল। ততক্ষণে আমাদের লঞ্চের কয়েকজন স্টাফ জেগে গিয়েছে। তারা নিজেদের অস্ত্র ধরারই সুযোগ পেল না, ওদের বন্দুক তাক করা ছিল। ওদের চোখের সামনেই ডাকাতরা দেবেনবাবুকে ধরে নিয়ে গেল। তারপর আর তাঁর সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তারা লঞ্চে লুঠপাটও করেনি?"

সেলিম বললেন, "নাঃ! টাকা-পয়সা নেয়নি, শুধু যেন কোনও কারণে দেবেন সামন্তের উপরই ওদের রাগ ছিল।"

জোজো বলল, "দুর ছাই! আমার মাথায় বেশ পোয়েট্রি আসছিল, এর মধ্যে গুমের গল্প শুরু হয়ে গেল।"

দেবলীনা একটু অবাক ভাবে জিজ্ঞেস করল, "গুমের গল্প কী রে?"

জোজো ভুরু নাচিয়ে বলল, "এই দ্যাখ সন্তু, এ মেয়েটা বাংলা জানে না। গুম মানে জানে না। তুই অ্যাবডাকশন মানে জানিস?"

দেবলীনা একটু চুপসে গিয়ে বলল, "থাক, তোকে আর শেখাতে হবে না।"

সেলিম চেয়ার ছেড়ে রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমরা প্রায় এসে গিয়েছি মনে হচ্ছে।"

লঞ্চটা নদীর এপাশে এসে ধার ঘেঁষে চলছে। আর একটুক্ষণ পরে সেটা আবার একটা ছোট নদীতে ঢুকে পড়ল। এবার দেখা গেল, কিছু-কিছু ঘরবাড়ি।

এক জায়গায় একটা লঞ্চ থেমে আছে, সেটা দেখে এ লঞ্চের সারেংসাহেব কয়েকবার প্যাঁ প্যাঁ করে হর্ন বাজালেন।

অলি ছাড়া অন্য তিনজন পারের দিকের রেলিঙে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এবার, এবার বাঘ দেখা যাবে!

থেমে থাকা লঞ্চটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কিছু লোক। গ্রামের মানুষ কোথাও এক জায়গায় জমায়েত হলেই সবাই মিলে বড্ড চেঁচামেচি করে। এখানে সবাই যেন অস্বাভাবিক ভাবে চুপচাপ। কোনও রকম উত্তেজনার চিহ্ন নেই।

সেলিমের বুকটা একবার কেঁপে উঠল, এই রে, বাঘটা এর মধ্যে কোনও মানুষকে মেরে ফেলেছে নাকি?

তিনি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ দাস কোথায়? দাসবাবু?"

ভিড়ের মধ্যে থেকে ঠেলেঠুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন একজন মোটাসোটা মানুষ, মাথায় টাক। তিনি হাত জোড় করে বললেন, "নমস্কার স্যার।"

সেলিম নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "দাসবাবু, আপনার

অ্যাকশন কমপ্লিট?"

দাসবাবু বললেন, "নো স্যার।"

"এর মধ্যে কোনও ক্যাজুয়ালটি, মানে, কোনও মানুষের ক্ষতি-টতি হয়েছে নাকি?"

"নো স্যার।"

"বাঘটা কি তা হলে এখনও গোয়ালঘরে রয়েছে নাকি?"

"নো স্যার।"

"তবে কি বাঘটা পালিয়ে গিয়েছে?"

"নো স্যার।"

সেলিম এবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, "কী শুধু-শুধু 'নো স্যার, নো স্যার' করে যাচ্ছেন! কী হয়েছে, খুলে বলুন।"

দাসবাবু বললেন, "অদ্ভুত মানে, স্ট্রেঞ্জ একটা ব্যাপার হয়েছে স্যার। বাঘটাকে আগেই এসে কেউ নিয়ে গিয়েছে।"

সেলিম বললেন, "আগেই নিয়ে গিয়েছে মানে? বাঘ কি রসগোল্লা-সন্দেশ নাকি? দাঁড়ান, আমি আসছি।"

তিনি তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন নীচে। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে তিনটি ছেলেমেয়ে।

সেখানে গিয়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা শোনা গেল। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অন্য লঞ্চটি এখানে এসে পৌঁছেছে আধ ঘণ্টা আগে। তাদের দেখে গ্রামের লোকেরা অবাক। কারণ, আরও এক ঘণ্টা আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আরও একটা লঞ্চ এসেছিল। তারা বাঘটাকে ঘুমপাড়ানি গুলি মেরে, বেঁধে-ছেঁদে বাঘটাকে লঞ্চে তুলে নিয়ে গিয়েছে। তা হলে আর একটা লঞ্চ আসার দরকারটা কী? গ্রামের লোক বলছিল, "ফরেস্ট গার্ড কিংবা পুলিশের লোক অনেক দরকারের সময় আসে না, তো আসেই না। আর যখন আসে, তখন পরপর দু'টো?

কিন্তু এই জেলায় এরকম বাঘ-ধরা লঞ্চ একটিই আছে। ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়তেও ট্রেনিং লাগে, সেরকম ট্রেন্ড লোক দু'জনই আছে এই লঞ্চে। তা হলে আগের লঞ্চটা এল কোথা থেকে? এই লঞ্চের বনরক্ষীরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছে।

সেলিম সদলবলে করিম শেখের বাড়ির গোয়ালঘরে এসে দেখলেন, সেখানে একটা গোরুর আধখানা দেহ পড়ে আছে। যারা বাঘটা ধরতে এসেছিল, তারা নিখুঁত ভাবেই সেরেছে কাজ। দুই গুলিতে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে বাঘটাকে। তারপর হাসপাতালের রোগীদের যেরকম স্ট্রেচারে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সেরকম একটা স্ট্রেচারে বাঘটাকে শুইয়ে তোলা হয়েছে লঞ্চে।

তারা কারা? এ তো বাঘচুরি!

দাসবাবু সেলিমের পাশে এসে বললেন, "স্যার, একটা কথা বলতে পারি?"

"বলুন।"

"আমার তো মনে হয়, পাশে বাংলাদেশের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকরাই এসে বাঘটাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। ওদেরও এই ব্যাপারে ট্রেনিং নেওয়া আছে। যার-তার পক্ষে তো এ কাজ করা সম্ভব নয়।"

সেলিম অবাক হয়ে বললেন, "বাংলাদেশ? সুন্দরবনের অনেকখানি অংশ, আমাদের চেয়েও বেশি, ওদের ভাগে পড়েছে। ওদিকে বাঘের সংখ্যাও আমাদের চেয়ে বেশি। ওরা হঠাৎ এদিকে এসে বাঘ ধরে নিয়ে যাবে কেন? আমাদের না জানিয়ে ওরা তো সীমান্ত ক্রস করতেও পারে না।"

দাসবাবু বললেন, "তা হলে আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে বলুন?"

সেলিম বললেন, "কী জানি, আমার মাথায় তো কিছু ঢুকছে না! তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করতে হবে। বনমন্ত্রীর সঙ্গেও যদি দেখা করতে পারি..."

একজন অল্পবয়সি সাংবাদিক সেলিমকে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা তো বাঘটাকে ধরতে পারলেন না, তা হলে কারা এসে বাঘটাকে নিয়ে গেল?"

সেলিম বললেন, "আমরা ধরতে পারিনি, একটু দেরি হয়েছে, তা স্বীকার করছি। কিন্তু কারা নিয়ে গেল, তা এখন বলতে পারছি না।"

সে আবার বলল, "তবু, আপনার অনুমান, কারা নিতে পারে?"

সেলিম বললেন, "আমার অনুমানের কথা আমি খবরের কাগজের লোকদের বলতে যাব কেন? সরকারকে বলব।"

দেবলীনারা গোয়ালঘরটার এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। দেবলীনা বলল, "বাঘ দেখা হল না, কিন্তু এখনও বাঘের গন্ধ রয়ে গিয়েছে।"

জোজো বলল, "তুই এত পারফিউম মেখেছিস, তাই আমি অন্য কোনও গন্ধ পাচ্ছি না।"

সন্তু বলল, "আমি লঞ্চে ফিরে যাচ্ছি। তোরা যাবি?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ চল, আমার তেষ্টা পেয়ে গিয়েছে। একটা কোল্ড ড্রিংক্স খেতে হবে।"

লঞ্চের উপরে উঠে এল তিনজন। অলি এই প্রথম এই গ্রামের দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। গুনগুন করে আপন মনে গাইছে কী একটা গান।

সন্তু তার কাছে গিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "অলি, তুমি আগেই জানতে যে আমরা বাঘ দেখতে পাব না, তাই না? তুমি কী করে জানলে?"

অলি বলল, "না, না, আমি তা জানব কী করে?"

সন্তু বলল, "তুমি যে তখন বললে, আমাদের বাঘ দেখা হবে না!"

অলি লাজুক ভাবে বলল, "বলেছি বুঝি? আমার মনে নেই তো! ও আমি এমনি মাঝে-মাঝে কী সব যেন বলে ফেলি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "দেবেন সামন্ত নামে আগেকার ফরেস্ট অফিসারকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গিয়েছে। তিনি এখন কোথায়, কিংবা বেঁচে আছেন কি না, তা তুমি বলতে পার?"

অলি সন্তুর চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল।

তারপর মাথা দুলিয়ে বলল, "না। আমি জানি না। আচ্ছা সন্তু, এই নদীটা কি খুব গভীর?"

সন্তু বলল, "মনে হয় না। এটা ছোট নদী। তবে এখানে জোয়ারের সময় অনেক জল আসে, আবার ভাটার সময় অনেক জল কমে যায়।"

অলি জিজ্ঞেস করল, "সুন্দরবনে কোনও গভীর নদী আছে?"

সন্তু বলল, "রায়মঙ্গল নদী শুনেছি খুব গভীর। কেন?"

অলি বলল, "এমনি জিজ্ঞেস করলাম।"

এই লঞ্চটা আবার চলতে শুরু করেছে। সেলিম ওদের বললেন, "শোনো, বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। তোমাদের কাকাবাবুর কাছে জমা করে দিয়ে চলে যাব ক্যানিং। কত রাত হবে কে জানে। এই ব্যাপারটা নিয়ে কাগজওয়ালারা খুব মাতামাতি করবে বলে মনে হচ্ছে। তোমাদের জন্য এখন চিঁড়েভাজা আর ডিমভাজার ব্যবস্থা করেছি, তাই খেয়ে নাও। রাত্তিরের ডিনারে তোমরা গেস্ট-হাউসে গিয়ে খাবে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "চিঁড়েভাজার সঙ্গে কাঁচালঙ্কা পাওয়া যাবে তো?"

সেলিম বললেন, "তা পাবে নিশ্চয়ই। লঞ্চের খালাসিরা খুব ঝাল খায়।"

অলি জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা সেলিমদা, সমুদ্র থেকে তো অনেক প্রাণীই এই সব নদীতে আসে। কখনও তিমি আসে না?"

সেলিম বললেন, "হ্যাঁ, অনেক কিছুই তো আসে। এক সময় এখানে খুব ডলফিন দেখা যেত, বাংলায় যাদের আমরা শুশুক বলি। এখন অনেক কমে গেলেও কিছু আছে। আরও নানা রকম সব অদ্ভুত মাছ কিংবা অন্য রকম প্রাণী আসে। একবার জেলেদের জালে একটা কচ্ছপ ধরা পড়েছিল, সেটার ওজন পঁয়তাল্লিশ কেজি! তা হলেই বুঝে দ্যাখো, কত বিরাট। হাঙর-টাঙরও দু'-চারটে হঠাৎ চলে আসে। কিন্তু তিমি আসবে কী করে? অত বিরাট চেহারা এই সব নদীতে আঁটবে না।"

জোজো বলল, "তিমিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী।"

দেবলীনা বলল, "মোটেই না। হাতি? হাতির চেয়েও বড় নাকি?"

জোজো বলল, "এক-এক জাতের তিমি আছে, যাদের ওজন হাতির চেয়েও তিন গুণ বেশি। পৃথিবীর ল্যান্ডের উপর এক সময়

ডাইনোসর, টেরোড্যাকটিল এই সব বিশাল-বিশাল প্রাণী ছিল। সাড়ে পাঁচ কোটি বছর আগে দারুণ উল্কাপাতে সেই সব প্রাণী ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু জলের তলার জানোয়াররা তখন মরেনি। জল থেকেই পৃথিবীতে নতুন করে লাইফ-এর সৃষ্টি হয়েছে।"

দেবলীনা ঠোঁট উলটে বলল, "এ তো সবাই জানে। তুই এমন বিজ্ঞের মতন বললি, যেন খুব একটা নতুন জ্ঞানের কথা!"

জোজো বলল, "মানুষও এক সময় জলে থাকত।"

সন্তু বলল, "মানুষ মানে, আমাদের মতন চেহারার মানুষ?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ। যাদের বলে হোমো সেপিয়েন্স!"

দেবলীনা বলল, "এই শুরু হল জোজোর গুল। মানুষ আবার জলে থাকতে পারে নাকি? শ্বাস না নিলে মানুষ বাঁচে?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, বাঁচবে না কেন? সারা গা জলে ডুবিয়ে নাকটা শুধু উঁচু করে রাখত। শুধু মাঝে-মাঝে রাত্তিরের দিকে উঠে আসত উপরে। কেন জানিস?"

কেউ কোনও সাড়াশব্দ করল না। তবু জোজো বলে চলল, "মানুষ যতদিন ছিল বাঁদরের মতন, শিম্পাঞ্জির মতন প্রাণী, ততদিন থাকত গাছের উপরে। তারপর যখন চেহারাটা আলাদা হয়ে গেল, দু' পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা শিখল, তখন গাছের ফলমূল আর পাতা-টাতা খেয়ে থাকতে ভাল লাগল না। নেমে পড়ল মাটিতে। খরগোশ-টরগোসের মতন ছোটখাটো প্রাণী মেরে মাংস খেতে শিখল। কিন্তু বাঘ-সিংহ-চিতার মতন হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে তো মানুষ পারে না, তখনও তো অস্ত্র ধরতে শেখেনি, তাই ওইসব জন্তুর ভয়ে জলে নেমে গেল। কয়েক হাজার বছর সেই রকমই ছিল, তার প্রমাণ কী জানিস? বাঁদর-টাঁদরের মতো প্রাণীদের সারা গা লোমে ঢাকা। মানুষের তো সারা গায়ে লোম থাকা উচিত ছিল, গরিলাদের মতন। মানুষের গায়ে এখন শুধু এখানে-সেখানে ছাবড়া-ছাবড়া কিছু লোম আছে, বুকে খুব কম, পিঠে নেই একেবারে। জলে থাকতে-থাকতে আস্তে-আস্তে মানুষের অনেক লোম উঠে গিয়েছে। জলের প্রাণীদের গায়ে লোম থাকে?"

দেবলীনা হি হি করে হেসে বলল, "মানুষের সারা গায়ে লোম ছিল? মেয়েদের তখন দাড়ি-গোঁফ ছিল নাকি রে?"

সে কথা অগ্রাহ্য করে জোজো আবার মাস্টারমশাইয়ের ভঙ্গিতে বলল, "বেশি দিন জলে থাকা মানুষের পক্ষে ঠিক সুবিধেজনক হল না। তারা আবার ডাঙায় উঠে এল। কিন্তু বড়-বড় হিংস্র জন্তুর ভয়ে খোলা জায়গায় থাকতে সাহস পেল না। মানুষ লুকোল ঘাসবনে, যেখানে খরগোশ, হরিণ-টরিন মেরে খেতে পারে। কিন্তু সেখানেও মানুষের কম্পিটিটর হলো নেকড়ে বাঘ, মানে উল্‌ফ। ওরাও বড় জানোয়ারদের ভয় পায়। উল্‌ফগুলো হিংস্র হলেও তত বড় তো নয়। মানুষ লাঠি ধরা শিখে গেলে উল্‌ফগুলোকে পিটিয়ে মারতে পারত। তখন উল্‌ফগুলোও বাঁচার জন্য কী করল জানিস? তারা মানুষের ন্যাওটা হয়ে গেল। তারা আর মানুষকে কামড়াতে আসে না, কাছে গিয়ে পা চাটে। মানুষও পুষতে লাগল তাদের, শিকার করার সময় ওদের সাহায্য নিত। আরও কয়েক হাজার বছর পর সেই নেকড়েগুলোই হয়ে গেল আজকের কুকুর। বুঝলি?"

দেবলীনা আবার হেসে বলল, "নেকড়ে হয়ে গেল কুকুর? ছিল বেড়াল, হয়ে গেল রুমাল। আর কত গুল ঝাড়বি রে জোজো? তোর লেকচার এবার বন্ধ কর!"

সেলিম সব শুনছিলেন, এবার বললেন, "এটা কিন্তু জোজো মোটেই বানিয়ে বলেনি। মানুষ কিছুদিন, মানে কয়েক হাজার বা লক্ষ বছর জলে নেমে লুকিয়ে থাকত, এরকম একটা থিয়োরি আছে। ডেসমন্ড মরিসের লেখা একটা বই আছে, 'দ্য নেকেড এপ', তোমরা পড়ে দেখতে পার। আর নেকড়ে থেকেই যে কুকুর হয়েছে, তা তো ঠিকই। অ্যালসেশিয়ান কুকুর তো প্রায় উল্‌ফের মতনই দেখতে!"

সন্তু বলল, "জোজোর এটাই মজা। ওর কোনটা যে গুল আর কোন কথাটা সত্যি, তা অনেক সময় বোঝা যায় না।"

জোজো দেবলীনার থুতনিটা ধরে নেড়ে দিয়ে বলল, "হাসছ? আগে একটু পড়াশুনো করো, তারপর হেসো।"

মুখটা সরিয়ে নিয়ে দেবলীনা বলল, "খুব তো বিদ্যে ফলাচ্ছিস? তুই বল তো হনুমানের বাবা কে?"

জোজো বলল, "এটা আবার একটা প্রশ্ন হল নাকি? হনুমানের বাবাও হনুমান।"

দেবলীনা ভেংচি কেটে বলল, "কাঁচকলা। তার মানে তুই রামায়ণ পড়িসনি। সন্তু, তুই জানিস?"

সন্তু বলল, "জানি। হনুমানের বাবার নাম হাওয়া।"

সেলিম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হাওয়া? হাওয়া কারও নাম হয়?"

সন্তু বলল, "হাওয়ার দেবতার নাম পবনদেব। হনুমান তার ছেলে।"

অলি বলল, "ভীমও তাই। সেই জন্য হনুমান আর ভীম দুই ভাই।"

তারপর সে কথা ঘুরিয়ে বলল, "নদীতে তিমি ঢুকতে পারে না, তাই ডুবোজাহাজও ঢুকতে পারে না।"

সেলিম ভুরু কুঁচকে বললেন, "ডুবোজাহাজ, অর্থাৎ সাবমেরিন? তা হঠাৎ এখানে আসতে যাবে কেন? বড়-বড় যুদ্ধ-টুদ্ধর সময় সাবমেরিন লাগে শুনেছি।"

অলি বলল, "আচ্ছা।"

দেবলীনা তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোর মাথায় হঠাৎ সাবমেরিনের কথা এল কেন রে?"

অলি বলল, "কী জানি! এমনি।"

আড্ডা চলতে লাগল। এর মধ্যে সন্ধে নেমে এসেছে। লঞ্চটা সার্চ লাইট ফেলে-ফেলে এগিয়ে চলেছে। খুব জোর আলো। সামনে কোনও নৌকো দেখলে জোর হর্ন বাজাচ্ছে সারেংসাহেব।

অন্ধকারে সব কিছুই বদলে যায়। পাশের জঙ্গলকে মনে হয় আরও রোমাঞ্চকর।

কঁক কঁক করে কী যেন একটা পাখি ডাকতে-ডাকতে উড়ছে লঞ্চটার সঙ্গে-সঙ্গে। পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না।

খানিক পরে হঠাৎ শোনা গেল, পরপর দু'টো গুলির শব্দ।

সারেংসাহেব সার্চ লাইটটা এদিক-ওদিক ঘোরালেন। তখন দেখা গেল, একটা ভটভটি নৌকোর উপরে কয়েকজন লোক ঝটাপটি করছে। একজন যেন কী বলছে চেঁচিয়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে সেই নৌকোর একজন লোককে ছুড়ে ফেলা হল জলে। কিংবা সে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ল, তা ঠিক বোঝা গেল না।

জোজো বলে উঠল, "ডাকাত? পাইরেট্‌স?"

একজন লোককে জলে ভাসতে দেখা গেল, কিন্তু নৌকোটা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। সম্ভবত একটা খাঁড়িতে ঢুকে পড়েছে।

সেলিম বললেন, "সারেংসাহেব, লোকটার কাছে চলুন তো। ও বেঁচে আছে, না মরে গিয়েছে?"

সন্তু অলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "লোকটি বেঁচে আছে?"

অলি শুধু মাথা নেড়ে বোঝাল, হ্যাঁ।

জোজো বলল, "নদীতে কুমির আছে। বেঁচে থাকলেও ওকে তো কুমিরে খেয়ে ফেলবে!"

লঞ্চটি গতি খুব কমিয়ে চলে এল সেই ভাসমান লোকটির পাশে। কিন্তু তাকে তোলা হবে কী করে?

প্রথমে একটা বাঁশ আলতো করে এগিয়ে দেওয়া হল তার দিকে। যদি তার জ্ঞান থাকে, তা হলে সে বাঁশটা ধরলেই টেনে আনা যাবে। সে ধরল না। তা হলে কি সে মরে গিয়েছে?

তখন লঞ্চের দু'জন খালাসি একটু পাশের দিকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। তারপর ভাসমান দেহটার উলটো দিকে গিয়ে ঠেলে-ঠেলে আনতে লাগল।

জোজো সন্তুকে বলল, "লোক দু'টোর কী সাহস দেখলি, এই রাত্তিরবেলা, নদীতে..."

সন্তু বলল, "সে তো নিশ্চয়ই। এখানে সবাই-সবাইকে বাঁচানোর জন্য সাহায্য করে।"

সেলিম নিজে ঝুঁকে আর একজনের সাহায্য নিয়ে লোকটিকে টেনে

তুললেন।

তুলেই বললেন, "বেঁচে আছে।"

বেশ লম্বা, ছিপছিপে চেহারার মানুষ, প্যান্ট-শার্ট পরা, মাঝবয়সি। তার উরু থেকে এখনও রক্ত বেরোচ্ছে, সম্ভবত ওখানে একটা গুলি লেগেছে।

লোকটির বুক ধুকপুক করছে, নিশ্বাসও পড়ছে নাক দিয়ে, কিন্তু জ্ঞান নেই। লোকটি কে, কাদের সঙ্গে মারামারি হয়েছে, তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

এই লঞ্চের কোনও কর্মীও ওকে চিনতে পারল না।

দেবলীনা বলল, "রক্ত বেরোচ্ছে, এখনই তো ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে হবে। আমি ব্যান্ডেজ বাঁধতে জানি।"

প্রত্যেক লঞ্চেই একটা ফার্স্ট এড বক্স থাকে। সেটা আনা হল তক্ষুনি। একটা কাঁচি দিয়ে ওর প্যান্টের খানিকটা কেটে ফেলা হল। যেখানে গুলি লেগেছে।

দেখা গেল, ওর বাঁ পায়ের উরুতে একটা গুলি বিঁধে আছে, গুলিটা দেখাও যাচ্ছে।

অলি দু' হাতে মুখ ঢেকে কাতর গলায় বলল, "ও মা! আমি দেখতে পারছি না।"

সে সরে গেল খানিকটা দূরে।

সেলিম একটা ছোট্ট স্টিলের সাঁড়াশি দিয়ে একটানে গুলিটা তুলে ফেললেন। অমনি গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল সেখান দিয়ে। খানিকটা তুলো অ্যান্টিসেপটিকে ভিজিয়ে চেপে দেওয়া হল সেই ক্ষতস্থানে।

দেবলীনা গজ-ব্যান্ডেজ দিয়ে বেশ ভাল করে বেঁধে দিল।

সেলিম বললেন, "বাঃ, তুমি তো রীতিমতন এক্সপার্ট দেখছি।"

দেবলীনা বলল, "আমি গার্ল গাইডে ফার্স্ট এডের ট্রেনিং নিয়েছি।"

সেলিম বললেন, "আমিও হাফ-ডাক্তার। দু' বছর ডাক্তারি পড়েছি। তারপর আর নানা অসুবিধের জন্যে হয়নি আর কী। এই লোকটিকে এখন হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

সন্তু বলল, "ওর ডান কাঁধেও রক্ত।"

সে জায়গাটায় দেখা গেল, সেখানেও একটা ক্ষত, কিন্তু গুলি নেই। হয়তো গুলিটা পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছে।

লোকটিকে ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দেওয়া হল একটা বিছানায়।

দেবলীনা একটা ন্যাকড়া গরম জলে ডুবিয়ে আস্তে-আস্তে বুলিয়ে দিতে লাগল তার চোখে।

একটু পরে সে চোখ মেলল। ফিসফিস করে বলল, "আমি মরে গিয়েছি?"

দেবলীনা বলল, "না, আপনি মরেননি। আপনার আর কোনও ভয় নেই।"

লোকটি বলল, "আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। চোখে অন্ধকার।"

দেবলীনা বলল, "পাবেন, একটু পরে পাবেন। চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার নাম কী?"

সে বলল, "নাম? কার নাম? জানি না তো!"

সে আবার চোখ বুজল, হয়তো অজ্ঞান হয়েই গেল।

এই সময় দু'বার ভ্যাঁপ ভ্যাঁপ করে বেজে উঠল এই লঞ্চের হর্ন।

সেলিম বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, "মনে হচ্ছে আমরা এসে গিয়েছি। ইয়েস, ওই তো কাকাবাবুদের লঞ্চ দেখা যাচ্ছে।"

সন্তু কাকাবাবুকে সব ঘটনা বলার জন্য ছটফট করছে। সেও ছুটে গেল রেলিংয়ের দিকে।

সেলিম বললেন, "আমি তোমাদের সবাইকে ওই লঞ্চে নামিয়ে দেব। আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। আমাকে ক্যানিং পৌঁছে গভর্নমেন্টের কাছে সব রিপোর্ট করতে হবে।"

তারপর একটু চিন্তিত ভাবে বললেন, "এই আহত লোকটিকে নিয়ে কী করা যাবে? ওর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা করা দরকার। ওকে আমি ক্যানিং-এ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তাতেও অনেক দেরি হয়ে যাবে। কাছাকাছির মধ্যে গোসাবায় হাসপাতাল আছে। তোমরা যে আইল্যান্ডটায় গেস্ট-হাউসে যাচ্ছ, সেখানেও একটা নতুন হেল্থ সেন্টার তৈরি হয়েছে। শুনেছি, একজন ভাল ইয়ং ডাক্তার এসেছেন সেখানে। দেখি, কাকাবাবু কী বলেন।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দু'টো লঞ্চ পাশাপাশি লেগে গেল।

কাকাবাবু আর শৈবাল দত্ত দাঁড়িয়ে আছেন উপরের ডেকে।

সেলিম বললেন, "গুড ইভনিং, কাকাবাবু। বাঘটাকে নিয়ে তো এক অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছে, সেসব আপনি শুনে নেবেন সন্তুদের কাছ থেকে। এর মধ্যে আমরা নদী থেকে একজন লোককে উদ্ধার করেছি, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে।"

সব শুনে কাকাবাবু বললেন, "লোকটিকে এই লঞ্চেই তুলে দাও। তোমার চেয়ে আমরাই আগে পৌঁছব।"

সন্তুরা ধরাধরি করে অজ্ঞান লোকটিকে নিয়ে গেল অন্য লঞ্চে।

সেলিম বললেন, "কাকাবাবু, আপনারা তো তিন-চারদিন থাকবেন। আমি সম্ভব হলে এর মধ্যে ফিরে এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব। আপনারা ভাল ভাবে কাটান। শুধু একটা কথা বলি, আপনারা যেখানে যাচ্ছেন, সেই মোহিনী দ্বীপটা খুবই সুন্দর। খুবই নির্জন। ওদিকটায় এখনও পাহারার ভাল ব্যবস্থা নেই। আমার অনুরোধ, রাত্তিরের দিকটায় সাবধানে থাকবেন। ছেলেমেয়েদের বাইরে ঘোরাঘুরি করতে দেবেন না।"

সেলিমের লঞ্চ ছেড়ে চলে গেল।

॥ ৪ ॥

অজ্ঞান লোকটির এখনও জ্ঞান ফেরেনি।

খাটে শুইয়ে দেওয়ার পর দেবলীনা এখনও তার চোখের পাতায় গরম জলে ভেজানো কাপড় বুলিয়ে যাচ্ছে। কাকাবাবু বসে আছেন পাশে।

একটু পরে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে সন্তু, ডাকাতরা কি ও মরে গিয়েছে ভেবে ওকে জলে ফেলে দিয়েছিল?"

সন্তু বলল, "তা তো জানি না। আমরা দু'টো গুলির শব্দ শুনলাম। তারপরই দেখলাম, এই লোকটিকে জলে পড়ে যেতে।"

দেবলীনা বলল, "আমার মনে হয়, লোকটি নিজেই বাঁচার জন্য লাফ দিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ডাকাত-টাকাত না-ও হতে পারে, হয়তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া। এখানে এরকম প্রায়ই হয়, এমনকী, বন্ধুরাও ঝগড়া করতে-করতে ফট করে রাগের মাথায় একজন আর-একজনের দিকে গুলি চালিয়ে দেয়।"

দেবলীনা বলল, "লোকটির মুখ দেখলে তো ভাল মানুষই মনে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হতেই পারে। মন্দ মানুষেরা ওকে মারতে চেষ্টা করেছে। ওর জ্ঞান না ফিরলে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওকে একটু গরম দুধ খাওয়াতে পারলে ভাল হত। দ্যাখ না চেষ্টা করে।"

এক কাপ গরম দুধ আনা হল।

সন্তু লোকটিকে মাথা উঁচু করে তুলে ধরল। দেবলীনা তার মুখের কাছে নিয়ে এল দুধের কাপ।

প্রথমে কষের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল কিছুটা দুধ, তারপর ঠোঁট একটু ফাঁক হল। কিছুটা গরম দুধ ভিতরে যেতেই সে চোখ মেলল।

তারপর আগের মতনই ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, "আমি কোথায়? আমি কি মরে গিয়েছি?"

দেবলীনা বলল, "না, আপনি মরবেন কেন? আপনার কোনও ভয় নেই। আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।"

লোকটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "আমি বাঁচব? ওরা যে আমার বুকে গুলি করল?"

সন্তু বলল, "না, আপনার বুকে গুলি লাগেনি। লেগেছে আপনার উরুতে আর কাঁধে।"

লোকটি উঠে বসার চেষ্টা করতেই সন্তু তাকে চেপে ধরে বলল, "এখন উঠবেন না। একটু বিশ্রাম করুন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নাম কী?"

লোকটি একটুক্ষণ থেমে বলল, "সুবল! সুবল দাস। ওরা আমাকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা কারা?"

লোকটি বলল, "ওরা, ওরা, ওই যে ওরা।"

কাকাবাবু বললেন, "থাক, এখন কথা বলার দরকার নেই। উঠবেন না, শুয়ে থাকুন। আমরা মোহিনী দ্বীপে যাচ্ছি, সেখানে আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে।"

কাকাবাবু সেই কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতেই বেজে উঠল তাঁর মোবাইল ফোন।

একটুক্ষণ কথা বলে তিনি সন্তুকে বললেন, "বিমল দত্ত ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে আমাদের পৌঁছতে দেরি হচ্ছে বলে। ওখানেই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। তা হলে তোদের আজ বাঘ দেখা হল না।"

সন্তু বলল, "নাঃ। কী যে ব্যাপারটা হল, তা বোঝাই যাচ্ছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "বাংলাদেশের ফরেস্ট বিভাগের লোক কাউকে কিছু না জানিয়ে এখান থেকে একটা বাঘ ধরে নিয়ে যাবে, তা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, এমন হতে পারে কী, ওই বাঘটা বাংলাদেশের যে সুন্দরবন, সেইখান থেকে পালিয়ে চলে এসেছে। ওরা এসে নিজেদের বাঘ ফেরত নিয়ে গেল।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "বাঘ দেখে কি চেনা যায়, কোনটা বাংলাদেশের আর কোনটা ইন্ডিয়ার? জন্তুজানোয়াররা কি মানুষের তৈরি এইসব বর্ডার-টর্ডার বোঝে? তারা অনবরত এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়। আকাশের পাখিরা দেখিস না, সব সময় উড়ে এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে?"

সন্তু বলল, "অনেক সময় কোনও বাঘকে ধরে তার গলায় একরকম কলার পরিয়ে দেওয়া হয় শুনেছি। তার সিগনাল দেখে বোঝা যায়, বাঘটা কোথায়, কখন যাচ্ছে। যদি সে রকম হয়..."

কাকাবাবু বললেন, "তা বোঝা যায় ঠিকই। কিন্তু এক দেশের সরকারি কর্মীরা কিছু না জানিয়ে কিংবা বিনা অনুমতিতে তো অন্য দেশে যেতে পারে না? সেটা হয় না। শুধু-শুধু একটা বাঘ ধরার জন্য তারা নিয়ম ভাঙবে কেন?"

একটু থেমে, ভুরু কুঁচকে কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু বাঘটা কারা নিয়ে গেল? সাধারণ লোক তো এভাবে পারবে না। যাক গে, সেসব পুলিশ বুঝবে। আমাদের আর মাথা ঘামানোর কী দরকার!"

কাকাবাবু উপরে উঠে আসার একটু পরে দেবলীনা হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বলল, "ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে ভাল করে। অনেক কথা বলছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলছে? ওর পরিচয় কিছু জানতে পারলি?"

দেবলীনা বলল, "ও বলল, ও একজন ব্যবসায়ী। মদের ব্যবসা। আজ বিকেলবেলা হাট থেকে ফিরছিল, সঙ্গে অনেক টাকা ছিল। হঠাৎ কয়েকজন ডাকাত ওকে ধরে নিয়ে একটা, ওই যে কী যেন, কী যেন নাম বলে, নৌকোর..."

সন্তু বলল, "ভটভটি।"

দেবলীনা বলল, "হ্যাঁ, ভটভটি। তাতে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝনদীতে এসে ওকে গুলি করে মেরে ফেলতে যায়। তারপর আর কিছু ওর মনে নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁঃ! ভাগ্যিস তোরা ওঁকে দেখতে পেয়েছিলি। নইলে, রাত্তির বেলা এই নদীতে পড়লে ওঁর প্রাণে বাঁচার কোনও

আশাই ছিল না।"

দেবলীনা বলল, "ও খাট থেকে নেমেছেও একবার। বাথরুমে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, দ্যাখ, ওর যদি খিদে-টিদে পায়, ওকে কিছু খেতে দে। হ্যাঁ রে, অলি কোথায়? তাকে অনেকক্ষণ দেখছি না।"

সন্তু বলল, "সে তো অন্ধকার এক কোণে বসে আছে, আর আকাশের চাঁদ দেখছে।"

অলি সেখান থেকেই বলল, "আমি চাঁদ দেখছি না। আমি জলের শব্দ শুনছি।"

দেবলীনা বলল, "জলের শব্দ তো একঘেয়ে। এতক্ষণ ধরে শোনার কী আছে?"

অলি বলল, "মোটেই না। জলের আওয়াজ অনেক রকম। আলোর মধ্যে এক রকম। অন্ধকারে আর-এক রকম।"

জোজো অনেকক্ষণ চুপ করেছিল, এবার সে বলল, "এই মেয়েটাও পোয়েট্রি লেখে নাকি?"

দেবলীনা বলল, "না, ও পোয়েট্রি লেখে না। কবিতা লিখতে পারে বাংলায়।"

কাকাবাবু বললেন, "গেস্ট-হাউসে পৌঁছে আমরা দু'জনেরই কবিতা শুনব। বাংলা আর ইংরেজি।"

দেবলীনা চমকে বলে উঠল, "এ কী?"

সুবল দাস নামে সেই আহত লোকটি উঠে এসেছে উপরে।

সবাই তার দিকে তাকাতেই সে বলল, "আমার ব্যথা অনেক কমে এসেছে। শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না।"

কাকাবাবু একটা চেয়ার দেখিয়ে তাকে বললেন, "ঠিক আছে, বসুন এখানে। আপনার বাড়ি কোন গ্রামে?"

সুবল বলল, "বোয়ালমারি। সজনেখালির দিক দিয়ে যেতে হয়। স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? রান্নাঘরের লোকেরা বলল, আপনারা নাকি মোহিনী দ্বীপে বেড়াতে যাচ্ছেন? কেন স্যার? সে স্থান তো ভাল নয়।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন, খারাপ কিসে?"

সুবল বলল, "বড় সাপের উপদ্রব। সব সময় সাপ হিলহিল করে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেখানে একটা গেস্ট-হাউস দু' মাস ধরে চালু আছে, অনেক লোকজন যায়, কাউকে সাপে কামড়েছে বলে তো শুনিনি।"

সুবল বলল, "স্যার, আমাদের এই সুন্দরবনে অনেক লোককে সাপে কাটে, বাঘে ধরে নিয়ে যায়, সেসব সংবাদ আপনাদের কাছে পৌঁছয় না। শুধু দু'-একটা ঘটনাই আপনারা জানতে পারেন। অত দূর না গিয়ে আপনারা সজনেখালির বাংলোয় থাকুন না। সেখানে খুব ভাল ব্যবস্থা।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি গিয়েছেন সেই মোহিনী দ্বীপে?"

সুবল বলল, "নাঃ! সে তো একেবারে সমুদ্দুরের কাছে। মাছ-ধরা জেলেরা ওইদিকে যায়। তাদের মুখে গল্প শুনি। তারা কেউ ভয়ে উপরে ওঠে না। শুধু সাপ তো নয়, ওখানে জোঁক আছে হরেক রকম। আগে তো ওইসব দিকে জনমনুষ্যি ছিল না।"

কাকাবাবু ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, তোরা ভয় পাচ্ছিস নাকি?"

জোজো বলল, "আমি সাপ মোটেই গ্রাহ্য করি না। তবে জোঁক জিনিসটা খুব বিচ্ছিরি!"

দেবলীনা বলল, "কারবলিক অ্যাসিড ছড়ালেই সব সাপ পালিয়ে যায়। সে ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়ই। আর জোঁকের গায়ে নুন ছিটিয়ে দিলে দেখতে যা মজা লাগে!"

একটু পরেই কাকাবাবুর মোবাইল ফোন বেজে উঠল আবার।

কথা শুনতে-শুনতে কাকাবাবু বলতে লাগলেন, "না, আর বেশি দেরি হবে না, বড়জোর ঘণ্টাখানেক... হেল্‌থ সেন্টারটা খোলা থাকবে তো?... সব ব্যবস্থা করে রাখবেন। একজনের জরুরি চিকিৎসা করাতে হবে... সেসব পরে বলব।"

ফোন রেখে কাকাবাবু বললেন, "এ জেলার পুলিশের এস পি সমর ঘোষ অপেক্ষা করে আছেন আমাদের জন্য। আজ রাত্তিরেই তাঁকে আবার ফিরে যেতে হবে ক্যানিং। আরও তো একঘণ্টা সময় লাগবে আমাদের পৌঁছতে, এর মধ্যে একটু কফি খেলে কেমন হয়?"

সুবলকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি কফি খান? নাকি আর এক কাপ দুধ খাবেন? শরীর ঠিক লাগছে তো? আপনার চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে ওখানে।"

সুবল বিনীত ভাবে বলল, "আপনারা আমার জন্য কেন আর কষ্ট করবেন? আমার মনে হচ্ছে আর কিছু করতে হবে না। এমনি-এমনি ঠিক হয়ে যাবে। বুকে তো আর গুলি লাগেনি!"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার উরুতে গুলি ঢুকেছিল। ঠিক মতন ওষুধ না লাগালে সেপটিক হয়ে যেতে পারে। এসব অবহেলা করতে নেই।"

সন্তু বলল, "আপনি ওখানে যেতে সাপের ভয় পাচ্ছেন নাকি? আমরা এতজন মিলে যাচ্ছি, বেশি লোকের পায়ের আওয়াজ পেলে সাপ পালিয়ে যায়।"

সুবল বলল, "না, সাপের ভয় নয়। সাপ আর বাঘ নিয়েই তো আমাদের দিন কাটাতে হয়। বাড়ির জন্য মনটা কেমন করছে। সাত-আটদিন বাড়ি যাওয়া হয়নি।"

উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, "নাঃ, আমি বাড়িই চলে যাই। সারেংসাহেব, আপনি আমাকে সামনের দ্বীপটায় নামিয়ে দেন।"

সারেংসাহেব বললেন, "ওই দ্বীপে? ওখানে তো কিছু নাই!"

সুবল বলল, "ওইখানেই আমার গ্রাম।"

সারেং বললেন, "গ্রাম মানে? ওখানে বাড়িঘর কিছুই নাই। আমি জানি।"

সুবল এবার বেশ কড়া গলায় বলল, "যা বলছি, তাই শোনো। ওই দ্বীপেই আমাকে নামিয়ে দিতে হবে। লঞ্চ থামাও!"

এবারে সারেংসাহেবও গম্ভীর ভাবে বললেন, "তুমি বললেই তো হবে না! ওখানে জেটি নাই, কিছু নাই, লঞ্চ ভেড়াব কী করে? কাদায় আটকে গেলে সারা রাতেও আর ছাড়াতে পারব না!"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এই দ্বীপটায় কোনও আলো-টালো দেখছি না!"

সুবল বিকট চিৎকার করে বলল, "চোপ! আর কোনও কথা শুনতে চাই না!"

তারপর সে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করল। সে তার জামার তলা থেকে পেটে গোঁজা একটা মস্ত বড় ছুরি বের করে হিংস্রভাবে তাকাল এদিক-ওদিক। কাছাকাছি দেবলীনাকে দেখে তাকে এক হ্যাঁচকা টানে কাছে টেনে নিল, তার গলার কাছে চেপে ধরল ছুরিটা।

চোখ পাকিয়ে সে বলল, "এই সারেঙের পো, আমি যা বলি, তাই কর, নইলে এই মেয়েটার গলা কেটে ফেলব। এই খোঁড়াবাবু, সারেংকে বল, লঞ্চটা থামাতে।"

কাকাবাবু একটুও উত্তেজিত হলেন না।

প্রথমে তিনি ভাবলেন, লোকটা ওই ছুরিটা পেল কোথায়? ওকে যখন নীচে দেখতে গিয়েছিলেন, তখন তো ওর কাছে ছুরি ছিল না।

তারপর তিনি জোরে-জোরে বললেন, "আজ অনেক সিনেমাতেই এরকম গলার কাছে ছুরি চেপে ধরা দেখায়। তাই দেখে বুঝি এটা শিখেছ?"

সে আবার খুব জোরে চেঁচিয়ে বলল, "চোপ! যা বলছি, তাই কর! এক্ষুনি! না হলে এ মেয়েটাকে..."

সন্তু এবার কাকাবাবুর দিকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিতে শুধু বলল, "কাকাবাবু?"

কাকাবাবু মাথা নাড়লেন।

সন্তু উঠে সুবলের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে একবার অলির দিকে তাকাল।

অলির মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই, বরং যেন মজার হাসি ছড়ানো।

সন্তু সুবলকে বলল, "খুব বীরপুরুষ, তাই না? একটা মেয়ের গলায় ছুরি ধরা। আমরা দু'জন ছেলে তো রয়েছি। আমাদের একজনের গলায় ধরতে পারলে না?"

সুবল বলল, "চোপ, এদিকে আসবি না, তা হলে তোকেও শেষ করে দেব।"

সন্তু তবু দু' পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "দেবলীনাকে ছাড়ো। আমার গলায় ছুরিটা ধরো। এই যে আমি গলাটা এগিয়ে দিচ্ছি।"

সুবল বলল, "তোকে মারব, মারব বলছি।"

সন্তু আর একটু এগিয়ে বলল, "মারো না!"

সুবল তখন দেবলীনার গলা থেকে ছুরিটা সরিয়ে এনে একটা জোরে কোপ মারতে গেল সন্তুকে।

সন্তু তক্ষুনি স্প্রিং-এর মতন লাফিয়ে উঠল।

এমনিতে সন্তুকে দেখলে মনে হয় একটি শান্তশিষ্ট ছেলে। সে যে এমন কাণ্ড করতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। সে একজন জাপানি মাস্টারের কাছে কারাটে শিখে ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছে।

লাফিয়ে উঠে সে সুবলের কাঁধের কাছে এত জোরে একটা লাথি কষাল যে, আঁ-আঁ-আঁ করে আর্তনাদ করে উঠল সুবল, তার হাত থেকে খসে পড়ল ছুরিটা। সেটা প্রায় জলেই পড়ে যেত, জোজো দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলল।

কাকাবাবু এক হাতে তখনও মোবাইল ফোনটা ধরে আছেন, অন্য হাতে এর মধ্যেই পকেট থেকে তুলে নিয়েছেন রিভলভার।

কিন্তু তাঁকে কিছু করতেই হল না।

সন্তু এর মধ্যেই সুবলকে উপুড় করে শুইয়ে ফেলে তার হাত দু'টোকে আড়াআড়ি ভাবে মুচড়ে ধরেছে। দেবলীনাও চেপে ধরেছে তার চুলের মুঠি।

সুবল এবার হাউহাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, "উঃ উঃ, ছেড়ে দাও, আমার হাত ভেঙে যাবে, বড় লাগছে, দয়া করো, আমি মাফ চাচ্ছি, ক্ষমা করো, হাতটা ভেঙে যাবে!"

কাকাবাবু বললেন, "ওকে ছেড়ে দে সন্তু। তোরা দু'জনেই সরে আয়।"

সন্তু আর দেবলীনা এদিকে চলে আসতেই সুবল হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে কাকাবাবুকে বলল, "আমি অন্যায় করেছি স্যার। বাড়ির কথা চিন্তা করে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি একটি নরাধম! ওরা তোমাকে নদী থেকে তুলে যদি না বাঁচাত, তা হলে তুমি আজ নির্ঘাত মরতে। এই তার প্রতিদান! এখনও এক গুলিতে তোমার মাথাটা ফুটো করে জলে ফেলে দিতে পারি।"

সুবল বলল, "এইবারটার মতন ক্ষমা করে দেন। আর কোনওদিন হবে না..."

কাকাবাবু বললেন, "তুমি বাড়ি চলে যেতে চাইলে আমরা আটকাব কেন? তোমাকে বাড়িই পৌঁছে দিতাম। কিন্তু তুমি এই দ্বীপটায় নামতে চাইলে কেন, বুঝলাম না। এখানে কোনও গ্রাম নেই, আলো নেই। ঠিক আছে। তোমাকে এখানেই নামিয়ে দেওয়া হবে। সারেংসাহেব..."

সারেংসাহেব বললেন, "এখানে জেটি নেই, লঞ্চ ভেড়াব কী করে? বেশি কাছে গেলে কাদায় আটকে যেতে পারে।"

সুবল বলে উঠল, "বেশি কাছে যেতে হবে না, পানির উপরেই নামিয়ে দাও, আমি ঠিক পৌঁছে যাব।"

সারেং লঞ্চটাকে কয়েকবার সামনে-পিছনে করে এক জায়গায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আর যাবে না।"

সুবল তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। সেখানে কোমর-জলের বেশি নয়। সার্চলাইটের আলোয় দেখা গেল, লোকটি কাদার মধ্য দিয়ে থপথপিয়ে পারে উঠে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের অন্ধকারে।

কাকাবাবু বিরক্ত ভাবে বললেন, "যত্ত সব বাজে ব্যাপার! শুধু-শুধু দেরি হয়ে গেল আমাদের।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, তুমি ওকে ছেড়ে দিলে?"

কাকাবাবু বললেন, "ওকে ধরে রাখতে যাব কেন?"

দেবলীনা বলল, "আচ্ছা কাকাবাবু, ও তো বেশ কথাবার্তা বলছিল। হঠাৎ বাড়ি যাওয়ার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন?"

জোজো বলল, "সেটা বুঝলি না? কাকাবাবু যেই পুলিশ অফিসারের ফোনের কথা বললেন, তারপরই ও ছটফট করতে লাগল। নিশ্চয়ই ও পুলিশকে খুব ভয় পায়।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা তুই ঠিক ধরেছিস, জোজো। পুলিশের কথা শুনেই ও আর যেতে চাইল না। পুলিশকে ভয় পায়। কেন পুলিশকে ভয় পায়, তা পুলিশ বুঝবে! আমরা ওকে আটকে রাখতে যাব কেন?"

জোজো বলল, "বাঃ! ও যে দেবলীনার গলার কাছে ছুরি ধরেছিল, সে জন্য ওর শাস্তি পাওয়া উচিত নয়?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, শাস্তি দেওয়া যেতে পারত, আবার ক্ষমাও করে দেওয়া যায়। কী গো দেবলীনা, ওকে যে ক্ষমা করা হল, তাতে তোমার আপত্তি আছে?"

দেবলীনা ঠোঁট উলটে বলল, "নাঃ!"

কাকাবাবু এবার হেসে বললেন, "তবে সন্তু ওর ঘাড়ে এত জোর লাথি কষিয়েছে, সেটাই ওর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। ওর সারাজীবন মনে থাকবে!"

দেবলীনা বলল, "আমিও ওর চুল ধরে খুব টেনেছি।"

জোজো বলল, "এরকম একটা কাণ্ড হল, তবু অলি হাসছিল কেন? ও কিছু সাহায্য করতেও চায়নি।"

কাকাবাবু বললেন, "সে কী! ও হাসছিল, সেটাই যে সবচেয়ে বড় সাহায্য, তা তুই বুঝিসনি?"

সন্তু বলল, "অলির হাসি মুখ দেখেই আমি বুঝে ফেললাম, কাজটা আমার পক্ষে খুব শক্ত নয়।"

জোজো বলল, "তার মানে? ঠিক বুঝলাম না। এই অলি, তুমি ওই সময় হাসছিলে কেন?"

অলি বলল, "হাসছিলাম বুঝি? কই, না তো!"

জোজো বলল, "হ্যাঁ হাসছিলে। সন্তু বলছে, সবাই বলছে।"

অলি বলল, "লোকটা যখন চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছিল, তখন আমি হঠাৎ দেখলাম, ও হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদছে। তাই দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল!"

জোজো অবিশ্বাস করা গলায় বলল, "কাকাবাবু, এটা কি সম্ভব? লোকটা একটু পরে হাত জোড় করে কাঁদল ঠিকই, কিন্তু সেটা অলি আগে থেকে দেখে ফেলতে পারে? ইজ দ্যাট পসিবল?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি পারবে না, আমি পারব না, পৃথিবীর লক্ষ-লক্ষ মানুষ পারবে না। কিন্তু অলির মতন দু'-একজন পরের ঘটনা আগে দেখে ফেলতেও পারে। এটা একটা বিশেষ ক্ষমতা। আমি আগেও দেখেছি, অলি এরকম বলে দিয়েছে।"

জোজো বলল, "এই অলি, বলো তো, আজ রাত্তিরে আমরা কী-কী খাব? ভাত না পোলাও! চিকেন না মাটন!"

অলি লাজুক ভাবে বলল, "ভ্যাট! ওরকম ভাবে বলা যায় নাকি? কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি কিছুই বলতে পারি না। এমনিই মাঝে-মাঝে..."

এই সময় টং টং করে লঞ্চের বেল বেজে উঠল। সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, এক জায়গায় বিন্দু-বিন্দু আলো। এসে গিয়েছে মোহিনী দ্বীপ।

এখানে জেটি আছে, তাই লঞ্চ তার গায়ে ভেড়াতে কোনও অসুবিধে হল না। সবাই নেমে এল একে-একে। এখানে একটা টালির চালের বড় ঘর রয়েছে, খুব সম্ভবত বৃষ্টির সময় যাতে লোকজন দাঁড়াতে পারে।

এখন তার এক ধারে একটা ছোটখাটো ভিড়। সেখানে পুলিশের পোশাক পরা তিন-চারজন রয়েছে। একজন সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরা ভদ্রলোক সেখান থেকে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে এসে বলল,

"নমস্কার কাকাবাবু! আমি সমর ঘোষ। আপনাদের অনেক দেরি হল। কই, রোগী কোন জন? আমি হেল্‌থ সেন্টার খুলিয়ে রেখেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "রোগী মানে অসুস্থ লোকটি মাঝপথে ভেগে গিয়েছে। সে আসতে চাইল না এখানে।"

সমর ঘোষ অবাক হয়ে বলল, "অসুস্থ লোক, আসতে চাইল না কেন? এত রাতে আর কোথায় চিকিৎসা করাবে?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার নাম শুনেই তার চিকিৎসার ইচ্ছে ঘুচে গেল। তবে রোগীটিকে সঙ্গে আনিনি বটে, তার ফোটো এনেছি, দেখুন তো চিনতে পারেন কি না!"

কাকাবাবু মোবাইল ফোনটা বের করলেন পকেট থেকে। একটু দূরে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, সেখানে সরে গিয়ে সমর ঘোষ মোবাইল ফোনে ফোটোটা দেখে চমকে উঠে বলল, "এ কী? এ তো রুস্তম!"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের কাছে নাম বলেছে সুবল দাস।"

সমর ঘোষ বলল, "ও এক-এক জায়গায় এক-একরকম নাম বলে। তবে বেশিরভাগ লোক ওকে 'রুস্তম' নামেই চেনে। ও একটা কুখ্যাত ক্রিমিনাল। দু' বার পুলিশের হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছে। আপনারা ওকে পেয়েও ছেড়ে দিলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ক্রিমিনাল ধরা তো আমার কাজ নয়। আমাদের কাছে তো সেরকম কোনও ক্রাইম করেনি। লঞ্চের রান্নাঘর থেকে একটা ছুরি চুরি করে সে খানিকটা লম্ফ-ঝম্প করেছিল বটে, সেই জন্য তাকে অল্প শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবার আপনারা তাকে আবার ধরুন। সে কোথায় নেমে গেল, তা বলে দিতে পারি।"

সমর ঘোষ হতাশ ভাবে বলল, "যাঃ! এবারেও ফসকে গেল! কাকাবাবু, আপনি আমাকে 'তুমি' বলুন। আপনি তো ধ্রুব রায়কে চেনেন, সে আমার বিশেষ বন্ধু।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওই কোণে ক'জন পুলিশ দেখছি। ওখানে কী হচ্ছে?"

সমর বলল, "তিন ব্যাটা ডাকাত ধরা পড়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমার লঞ্চে হ্যান্ডকাফ নেই, তাই ওদের ওখানে দাঁড় করিয়ে পাহারা দেওয়া হচ্ছে।"

ছেলেমেয়ে চারজন কাকাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এবার জোজো উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, "ডাকাত, মানে জলদস্যু! মানে পাইরেটস। আমি দেখব!"

চারজনই দৌড়ে গেল সেদিকে।

কাকাবাবু হেসে বললেন, "ওরা খুব হতাশ হবে। গল্পের বইয়ে পড়েছে, সিনেমাতেও দেখেছে, পাইরেটস মানে বিশাল চেহারা, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, পোশাকেরও খুব বাহার। হাতে তলোয়ার... আর এখানকার ডাকাতরা রোগা-রোগা, লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা, শুধু গোটাকতক গাদাবন্দুক সম্বল। তাই না?"

সমর বলল, "ঠিকই বলেছেন। এখানকার বেশিরভাগ মানুষই গরিব। ডাকাতগুলোও গরিব।"

কাকাবাবু বললেন, "পাশের বাংলাদেশ থেকেও তো ডাকাত এদিকে চলে আসে, তাই না?"

সমর বলল, "তা আসে। আবার আমাদের ডাকাতরাও ওদিকে যায়। তবে বাঘের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। বাংলাদেশের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক আমাদের এদিকে এসে বাঘ ধরে নিয়ে যাবে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সত্যি কঠিন।"

কাকাবাবুর কথামতন ছেলেমেয়ে চারজন ডাকাত দেখতে গিয়ে হেসে ফেলেছে। ফিরে এসে দেবলীনা বলল, "ওমা, এরা আবার ডাকাত নাকি? প্যাংলা-প্যাংলা চেহারা!"

জোজো বলল, "আমি একটা মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলেই তো এই তিনটে ডাকাত উড়ে যাবে। একবার কী হয়েছিল জানিস, আমি আমার বড়মামার সঙ্গে জাহাজে করে যাচ্ছি... একদিন খুব ঝড় আর বৃষ্টি, তার মধ্যেই একটা সরু জাহাজে করে কয়েকটা সোমালিয়ার পাইরেটস এসে অ্যাটাক করল, তারা আবার ভূতের মুখোশ পরে থাকে... তখন আমার বড়মামা..."

॥ ৫ ॥

জেটিঘাট থেকে গেস্ট-হাউসটা বেশ খানিকটা দূরে। মাটি ফেলে উঁচু রাস্তা তৈরি করে ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলোও আছে মাঝে-মাঝে। আলো মানে ইলেকট্রিকের আলো নয়, মাঝে-মাঝে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা এক-একটা হারিকেন। তাতে খুব একটা আলো হয়নি, তবে মোটামুটি দেখা যায়।

ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে কাকাবাবুর একটু অসুবিধে হচ্ছে। ইটের ফাঁকে-ফাঁকে ক্রাচ আটকে গেলে হোঁচট খাওয়ার মতন অবস্থা হয়।

সন্তু সমর ঘোষকে জিজ্ঞেস করল, "গেস্ট-হাউস এত দূরে কেন? নদীর ধারে করলেই তো বেশ ঘরে শুয়ে-শুয়ে নদী দেখা যেত!"

সমর বলল, "না, না, নদীর কাছাকাছি বাড়ি করা বিপজ্জনক। জোয়ারের সময় বড়-বড় ঢেউ উপরে উঠে আসে কখনও-কখনও। আর যদি সেরকম ঝড় ওঠে, তোমরা আয়লা ঝড়ের কথা শুনেছ নিশ্চয়ই, বছর দু'-এক আগে আয়লা ঝড়ের সময় নদীর জলে কত বাড়ি ভেঙে গিয়েছে। কত মানুষ এখনও তাঁবুতে থাকে। তাদের জিনিসপত্তর সব ভেসে গিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সুন্দরবনে লোকে জঙ্গলের কথা আর বাঘ-কুমিরের কথাই জানে। কিন্তু এখানে যে মানুষও থাকে, কত কষ্ট করে থাকে, তা অনেকেই জানে না।"

সমর বলল, "আমাদের মুশকিল কী জানেন? এই জঙ্গল বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বাঘদেরও রক্ষা করতে হবে। আবার এখানকার মানুষজনও যাতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারে, তাও তো দেখা দরকার। এই তিন দিক সামলাতে আমাদের একেবারে হিমশিম অবস্থা। প্রকৃতির দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করাই সবচেয়ে শক্ত।"

সন্তু বলল, "এখন তো এখানে অনেক টুরিস্টও আসে। তারা ঝড়-বৃষ্টির সময় কী করে? ঘরে বসে থাকতে হয়? লঞ্চে করেও কি তখন বেড়ানো যায়?"

সমর বলল, "বর্ষাকালে টুরিস্ট খুব কম আসে। ঝড়-বৃষ্টির সময় লঞ্চে করে ঘোরাও বিপজ্জনক। যদিও বর্ষাকালে নদীগুলো জলে ভরে যায়, তখন দেখতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু তেমন ঝড় উঠলে লঞ্চ উলটেও যেতে পারে। তাই শীতকালেই টুরিস্ট বেশি আসে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে নাকি রাত্তিরে কিসের একটা আওয়াজ হয়?"

সময় বলল, "ও হ্যাঁ। দেখুন না, দত্তবাবুরা এখানে কত টাকা খরচ করে এত বড় একটা গেস্ট-হাউস বানালেন। সাজিয়েছেনও খুব সুন্দর ভাবে। প্রথম-প্রথম এখানে অনেক টুরিস্ট আসছিল। তারপর ওই যে একটা বিকট আওয়াজ শুরু হল, তা শুনে ভয় পেয়ে এখন আর অনেকেই আসতে চায় না।"

দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "যারা এখানে একবারও আসেনি, তারা কী করে ওই আওয়াজের কথা জানবে?"

সমর বলল, "ও কীরকম যেন মুখে-মুখে রটে যায়। রাত্তিরের দিকে এদিকে কোনও নৌকো-টৌকোও আসতে চায় না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আওয়াজটা শুনেছ? ঠিক কীরকম সেটা?"

সমর বলল, "না, আমি শুনিনি, মানে রোজ রাতে হয় না, দিনেরবেলাও হয় না। আমি এখানে একবারই মাত্র রাত্তিরে ছিলাম। সে রাতে কিন্তু আওয়াজ-টাওয়াজ কিছু হয়নি।"

জোজো বলল, "আজ রাত্তিরে তো আমরা সবাই থাকব, আজ যদি আওয়াজটা হয়..."

সমর বলল, "আমার থাকা হবে না রাত্তিরবেলা। একটু পরেই ফিরে যেতে হবে। কাল সকালেই ক্যানিং-এ জরুরি মিটিং আছে। এই ডাকাত তিনটেকেও আজ রাত্তিরেই থানায় ভরে দিতে হবে। তবে

অনেকের মুখেই শুনেছি, আওয়াজটা সত্যি বীভৎস। যেন বিরাট কোনও জন্তু খিদের চোটে চেঁচাচ্ছে। বাঘ-টাঘের ডাকের সঙ্গে কোনও মিল নেই। এই জায়গাটা কিন্তু সত্যি খুব সুন্দর। কাছেই সমুদ্র। গেস্ট-হাউসের পিছনের বারান্দায় দাঁড়ালে, ভোরবেলা সমুদ্রে সূর্য-ওঠা দেখা যায়। ভয় পেয়ে লোকে যদি এখানে আসা বন্ধ করে, তা হলে তো গেস্ট-হাউসটাও বন্ধ হয়ে যাবে!"

কাকাবাবু বললেন, "এই যে চারটে ছেলেমেয়ে এসেছে আমার সঙ্গে, ওদের অনেক গুণ। ওরাই ওই আওয়াজ-টাওয়াজের রহস্য ধরে ফেলবে। এই দ্বীপটায় ওই গেস্ট-হাউস ছাড়া আর কী আছে? অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে সবদিকই তো ফাঁকা-ফাঁকা মনে হচ্ছে।"

সমর বলল, "এদিকটা ফাঁকাই। আরও খানিকটা গেলে কিছু বাড়িঘর আছে, জঙ্গল আছে, আর ওই হেল্থ সেন্টারটা নতুন হয়েছে। একসময় এই দ্বীপটা পুরো ফাঁকাই ছিল। শুধু ছিল এক সাহেবের একটা বাংলো। তখন এর নাম ছিল 'রোজ আইল্যান্ড'। এখন নাম দেওয়া হয়েছে 'মোহিনী দ্বীপ'।"

জোজো বলল, "মনে হচ্ছে আমরা এসে গিয়েছি। মাংস রান্নার গন্ধ পাচ্ছি। অলি, বলো তো কী মাংস?"

অলি বলল, "আমি কী করে জানব? আমি কিছু গন্ধই পাচ্ছি না!"

জোজোর কথা ঠিক। অন্য কেউ মাংস রান্নার গন্ধ না পেলেও সবাই দেখতে পেল এক জায়গায় জোরালো আলো।

গেস্ট-হাউসটা সত্যিই বেশ বড়, সামনে অনেকটা বাগান। এখানে হারিকেনের বদলে দাউ দাউ করে জ্বলছে দু'টো মশাল। তার পাশেই একটা খুঁটির সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা আছে একটা বিশাল কুকুর।

বিব দত্ত হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে বলল, "আসুন কাকাবাবু, আসুন, আসুন। আমি অনেকক্ষণ আপনাদের জন্য জেটিঘাটে অপেক্ষা করছিলাম। তারপর দেরি দেখে ভাবলাম, এখানে এসে খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা করে রাখি।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, দেরিই হয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা বাঘ দেখতে চাইল।"

বিব দত্ত বলল, "বাঘ তো দেখা হয়নি শেষ পর্যন্ত, সে খবরও পেয়ে গিয়েছি। বাঘ চুরি হয়ে গিয়েছে। হে হে হে হে..."

কাকাবাবু বললেন, "তোমার এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই? মশাল জ্বলছে দেখছি।"

বিব দত্ত বলল, "আছে, জেনারেটরও আছে, সব ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যারা টুরিস্ট হয়ে আসে, তারা রাত্তিরে ইলেকট্রিকের আলো পছন্দ করে না। তারা বলে যে, মশাল-টশাল জ্বললে বেশ অন্যরকম দেখায়, একটু গা ছমছম করে। তবে রাত্তিরে গরম লাগলে ঘরের মধ্যে এসি চালিয়ে দিই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এখন ক'জন টুরিস্ট আছে?"

বিব দত্ত বলল, "মাত্র দু'জন। এরা নরওয়ে থেকে এসেছে, খুব বুড়ো-বুড়ি। কালই তো আটজন একসঙ্গে চলে গেল ভয় পেয়ে। রাত্তিরে সেই সাংঘাতিক আওয়াজ!"

কাকাবাবু বললেন, "আওয়াজটা কি রোজ রাত্তিরে হয়?"

বিব দত্ত বলল, "তার কোনও ঠিক নেই। কখনও পরপর দু'-তিন দিনও হয়, আবার দু'-তিন দিন কিছু হয় না।"

দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "অন্যরা ভয় পেয়ে চলে গেল, আর নরওয়ের দু'জন গেল না কেন?"

বিব দত্ত বলল, "ওদের তো অনেক বয়স। কানে ভাল শুনতে পায় না। কাকাবাবু, খাবার সব রেডি। এখন খেয়ে নেবেন?"

কাকাবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, "এখন ক'টা বাজে? ন'টা দশ। ঠিক আছে, খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তারপরেই শুতে যাওয়া চলবে না। কিছুক্ষণ গল্প আর গান-টান হবে।"

ভিতরে ডাইনিং রুমে মস্ত বড় একটা লম্বা টেবিল, তাতে একসঙ্গে বোধ হয় কুড়িজন খেতে বসতে পারে। সেখানে প্লেট সাজানো রয়েছে, সবাই হাত ধুয়ে এসে বসে পড়ল।

সমর বলল, "আমার খুব ইচ্ছে করছে, রাত্তিরটা এখানে থেকে যেতে। কিন্তু উপায় নেই। খেয়ে উঠেই আবার স্টার্ট করতে হবে! আপনারা রাত্তিরে কেউ একা-একা বেরোবেন না। আমি দু'জন পুলিশ রেখে যাচ্ছি। তারা সারারাত পাহারা দেবে।"

রুটি আর ঘি-ভাত দু'রকমই আছে, আলু-ফুলকপির তরকারি, ফিশ ফ্রাই, চিংড়িমাছ, মুরগির ঝোল, চাটনি, নতুন গুড়ের সন্দেশ। একটার পর একটা আসছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বব, টুরিস্টদের তুমি রোজ এত রকম খেতে দাও নাকি?"

বব বলল, "না, না। এসব আজ আপনাদের জন্য স্পেশ্যাল।"

কাকাবাবু বললেন, "কাল থেকে আর এত কিছু স্পেশ্যাল কোরো না। এত কে খাবে। এক যদি জোজো খেতে পারে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, জোজো যত খাবারের কথা বলে, তত কিন্তু ও খেতে পারে না! একটু-একটু চেখে দ্যাখে।"

দেবলীনা বলল, "অ্যাই সন্তু, তুই তোর বন্ধুকে আড়াল করার চেষ্টা করছিস! আমি নিজে ওকে একদিন দশ-বারোটা জিলিপি খেতে দেখেছি।"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, জিলিপির উপর ওর খুব দুর্বলতা আছে ঠিকই, কিন্তু মাছ-মাংস বেশি খায় না।"

জোজো দেবলীনাকে বলল, "তুই তো তিনখানা ফিশ ফ্রাই খেয়ে নিলি দেখলাম!"

দেবলীনা বলল, "আমারও ফিশ ফ্রাই-এর উপর দুর্বলতা, চিকেন কারি খাই না।"

বাগানের মধ্যে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো গোল একটা বেঞ্চের মতন জায়গা করা রয়েছে। খাওয়ার পর সকলে গিয়ে সেখানে বসল।

সমর বলল, "আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে, তবে খুব চেষ্টা করব কাল-পরশু আবার এদিকে ফিরে আসার।"

সমর চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "লঞ্চের মালিক ইহ রায়েরও আসার কথা ছিল, তার কী হল?"

বিব বলল, "তার হঠাৎ জ্বর হয়ে গিয়েছে। সে আসতে পারেনি, ক্ষমা চেয়েছে আপনার কাছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সে খুব ভাল গান করে শুনেছি। যাই হোক, আজ আমাদের ছেলেমেয়েরাই গান গাইবে, কবিতা পড়বে। রাতটা বেশ সুন্দর। বিকেলে বৃষ্টি হয়েছে বলে বেশ একটু ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব আছে। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ উঁকি মারছে মাঝে-মাঝে। প্রথম কে গান গাইবে? অলি?"

অলি বলল, "আমি আগে না, আমি তো গান শিখি না। দেবলীনা গান শেখে।"

কাকাবাবু দেবলীনার দিকে চাইতেই সে বলল, "আমি গান গাইছি। কাকাবাবু, তোমাকেও কিন্তু গান গাইতে হবে আজ।"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই আমি গাইব। পা ভাঙা না হলে নেচেও দিতাম। মাঝখানে একটু আগুন জ্বেলে দাও, তা হলেই ক্যাম্প ফায়ার হবে। ক্যাম্প ফায়ারে যার যা খুশি করতে পারে।"

দেবলীনা গান গাইল:

"অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে।
তবে তো ফুল বিকাশে॥
অলি বারবার ফিরে যায়..."

অলি লজ্জায় মুখ নিচু করে ফেলল।

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আমি একটা ইংলিশ গান গাইতে পারি?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই। ইংলিশ, হিন্দি, স্প্যানিশ, যা খুশি।" জোজো প্রথমে গাইল, "*দেয়ার ইজ আ গোল্ড মাইন ইন দা স্কাই ফার অ্যাওয়ে...*"

তারপর আরও দু'খানা।

জোজো বেশ ভালই গাইতে পারে, কিন্তু একবার শুরু করলে

সহজে থামে না। একটার পর-একটা গাইতেই থাকে।

কাকাবাবু বললেন, "এবার সন্তু।"

এই সব ব্যাপারে সন্তু খুব লাজুক। সে মাথা নিচু করে বলতে লাগল, "আমি গান গাইতে পারি না। কবিতাও লিখতে পারি না।"

জোজো বলল, "তুই তো পারিস অনেক কিছু। তাই থেকে কিছু একটা বল।"

একটু চুপ করে থেকে সন্তু নজরুল ইসলামের একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল, "*বল বীর, চির উন্নত মম শির...।*"

সেটা শেষ হতেই জোজো বলল, "আর একটা কর, আর একটা।"

সন্তু তাতে মোটেই রাজি নয়।

এবার অলির পালা।

অলি বাংলায় কবিতা লেখে। কিন্তু নিজের কবিতা সে কাউকে শোনাতে চায় না। দেবলীনার অনেক অনুরোধেও সে কবিতা পড়ল না, একসময় একটা গান ধরল।

কাকাবাবু সে গান শুনে চমকে উঠলেন। একটু আগেই অলি বলেছে যে, সে কোথাও গান শেখেনি। কিন্তু সে এদের সবার চেয়ে ভাল গান গায়। কী মিষ্টি গলা! সে যে গান গাইছে, সে গান আগে কেউ শোনেনি।

তার গান শেষ হলে কাকাবাবু বললেন, "এই মেয়েটার কত গুণ। তোরা জানিস কি, গত মাসে ফরাসি দেশ থেকে একজন খুব নামী বিজ্ঞানী এসেছিলেন কলকাতায়। অলির কথা শুনে তিনি অলিকে দেখতে এসেছিলেন। ওর কথাবার্তা শুনে তিনি এমনই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তখনই ওকে নিজের দেশে নিয়ে যেতে চাইলেন। সেখানে ওকে একটা কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হবে, ওর সব খরচ দেবে ফরাসি সরকার। ও সেখানে পড়াশুনো করবে, আর বিজ্ঞানীরাও ওকে স্টাডি করবেন। তুই যেতে রাজি হলি না কেন রে অলি?"

অলি বলল, "এখানে আমার মা রয়েছেন, দাদা, দুই দিদি আর একটা ছোট ভাই, এই সবাইকে ছেড়ে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। বাড়িতে সবাই মিলে কত আনন্দ হয়।"

দেবলীনা বলল, "কাকাবাবু, একদিন অলিদের বাড়ি যাবে? বেশ মজার বাড়িটা। অনেক লোক, আর মনে হয় যেন সবাই মিলে সব সময় কিছু না-কিছু খেলা খেলছে।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, এবার তোমার গান।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, গাইছি।"

রীতিমতন গলাখাঁকারি দিয়ে তিনি গান ধরলেন,

"*বাবুরাম সাপুড়ে,*
কোথা যাস্ বাপুরে?
আয় বাবা দেখে যা, দু'টো সাপ রেখে যা!"

দেবলীনা হইহই করে উঠল, "এ কী, এ কী, এটা তো গান নয়, এ তো সুকুমার রায়ের কবিতা!"

কাকাবাবু বললেন, "কবিতাতে সুর দিলেই তো গান হয়। আমি এই সুর দিয়েছি। বাকিটা শোন:

যে সাপের চোখ্ নেই,
শিং নেই, নোখ্ নেই,
ছোটে না কি হাঁটে না,
কাউকে যে কাটে না, তারপর কী যেন?"

সন্তু বলল, "*করে নাকো ফোঁস ফাঁস,*
মারে নাকো ঢুঁশ ঢাঁশ,
নেই কোনও উৎপাত,
খায় শুধু দুধভাত,"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে।"

তারপর তিনি সুর দিয়ে এই লাইনগুলো গাইলেন। আবার ভুলে

গিয়ে বললেন, "তারপর? তারপর?"

এবার দেবলীনা আর সন্তু একসঙ্গে গেয়ে দিল,

"সেই সাপ জ্যান্ত,
গোটা দুই আনত!
তেড়ে মেরে ডান্ডা,
করে দিই ঠান্ডা!"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "কেমন? খুব ভাল গান না?"

বিব দত্ত একটু দূরে বসে আছে। সে বলল, "এই রে, কাকাবাবু, সাপের গান গাইলেন। রাত্তিরবেলা সাপের নাম নিতে নেই। আজ দুপুরেই এখানে একটা সাপ ধরা পড়েছে। খাঁচায় ভরে রেখেছি।"

ছেলেমেয়েরা অমনি চেঁচিয়ে উঠল, "কোথায়, কোথায়? আমরা সাপটা দেখব।"

রান্নার জায়গার পাশে একটা গ্যারাজ বানানো হয়েছে, যদিও গাড়ি নেই। সেখানে একটা জালের খাঁচা। বিব টর্চ জ্বালল। কাকাবাবু খাঁচাটার দিকে তাকিয়েই বললেন, "এ কী, এটা তো সাপ নয়।"

জোজো বলল, "এটা তো কুমিরের বাচ্চা।"

দেবলীনা বলল, "না, না, কুমির নয়। বিরাট বড় একটা গিরগিটি।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই তো জানিস এটা কী?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ জানি। এটা কুমিরের বাচ্চাও নয়, গিরগিটিও নয়। একে বলে গোসাপ, কিন্তু এটা সাপও নয়, তবু কেন গোসাপ বলে সবাই, তা জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "গোরুর সঙ্গেও সম্পর্ক নেই, সাপের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই। তবু এর নাম গোসাপ। তবে এরা খুব নিরীহ প্রাণী, মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। মানুষ দেখলেই পালায়। সাপরাও এদের দেখলে পালায়। এরা সাপ খেয়ে ফেলে।"

তারপর তিনি বিবের দিকে ফিরে বললেন, "তুমি এটাকে আটকে রেখেছ কেন? এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে খুব। এদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। তুমি ওকে ছেড়ে দাও। তাতে একটা সুবিধে হবে এই যে, এদিকে কাছাকাছি আর সাপ আসবে না।"

বিব বলল, "ছেড়ে দেব?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। এদের ধরে রাখা এখন বে-আইনি।"

বিব বলল, "আমি এটাকে সাপই ভেবেছিলাম। দু'-একজন বলল বটে যে, এর নাম গোসাপ, কিন্তু নামের মধ্যে সাপ তো আছে! আমার বড্ড সাপের ভয়।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, খাঁচাটাকে নিয়ে আয় তো বাইরে।"

খানিকটা ফাঁকা জায়গায় খাঁচাটাকে এনে তার দরজাটা খুলে দিল সন্তু।

গোসাপটা প্রথমে খাঁচা থেকে একটু মুখ বের করে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপরই দারুণ জোরে দৌড় লাগাল, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

দেবলীনা বলল, "একেই বলে প্রাণপণ দৌড়।"

অলি বলল, "মুক্তির আনন্দ!"

কাকাবাবু বললেন, "বিব, তুমি যে বললে, তুমি খুব সাপের ভয় পাও। সুন্দরবনে তো অনেক সাপ আছে ঠিকই। তবে তোমার এই গেস্ট-হাউস এলাকায় যাতে একটাও সাপ না থাকে, সে পরামর্শ আমি তোমাকে দিতে পারি।"

বিব ব্যগ্র ভাবে বলল, "বলুন কাকাবাবু, কী করতে হবে? এখনও পর্যন্ত আমার এখানে কিছু হয়নি, কিন্তু গত সপ্তাহেই বোয়ালমারি গ্রামে সাপের ছোবলে দু'জন মারা গিয়েছে। এদিকে বাঘের কামড়ে যত লোক মরে, তার চেয়ে ঢের বেশি লোক মরে সাপের কামড়ে।"

কাকাবাবু বললেন, "কলকাতায় নিউ মার্কেটের পিছন দিকে কিছু-কিছু পশু-পাখি বিক্রি হয়। সেখান থেকে ছ'খানা বেজি আর তিন জোড়া ময়ূর কিনে আনবে। বেজিরা থাকবে ঝোপে-ঝাড়ে আর ময়ূরগুলো এই বাগানে ঘুরে বেড়াবে। বেশ সুন্দর দেখাবে। বেজি আর ময়ূর যেখানে থাকে, সেখান থেকে সব সাপ ভয়ে পালিয়ে যায়।"

বিব বলল, "এটা তো খুবই ভাল আইডিয়া। এ সপ্তাহেই কলকাতা থেকে বেজি আর ময়ূর কিনে নিয়ে আসব। এদের পোষার কোনও ঝামেলাও নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "এবার একটু মাস্টারি করি। বেজির আর একটা নাম কে বলতে পারবে? সন্তু, তুই জানলেও বলবি না।"

জোজো, দেবলীনা এমনকী, বিব দত্তও মাথা নাড়ল দু' দিকে।

অলি বলল, "নকুল। অহি-নকুলের যুদ্ধ হয়। অহি মানে সাপ।"

কাকাবাবু বললেন, "চমৎকার। কবিতা লিখতে গেলে এসব জানতে হয়। নকুলকে এখন অনেকে বলে নেউল, সেই থেকে সাপে-নেউলে যুদ্ধ। বেশিরভাগ সময় নেউলই জেতে।"

এরপর কাকাবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, "পৌনে এগারোটা বাজে। বিব, তোমার এখানে সেই বিদঘুটে আওয়াজটা কখন হয়?"

বিব বলল, "সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটা, ঠিক ডিনার খাওয়ার সময়। এখনও তো হল না, তা হলে বোধ হয় আজ আর হল না।"

কাকাবাবু বললেন, "কম লোকজন থাকলেই কি হয়?"

বিব বলল, "তার কোনও মানে নেই। গত সপ্তাহেই তো আঠারোজন খাবার টেবিলে বসে খাচ্ছে, সেই আওয়াজ শুনে সবাই খাওয়া ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল, দু'-তিনজন তো এমন ভয় পেল যে, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। পরদিন সকালেই সবাই একসঙ্গে ফিরে চলে গেল।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কোন দেশের মানুষ?"

বিব বলল, "দশজনই আমেরিকান, আর কয়েকজন জার্মান।"

কাকাবাবু বললেন, "আমেরিকান-জার্মানরা এত ভিতু হয়? শুধু আওয়াজ শুনে পালিয়ে যায়? কিছু তো তাড়া করে আসে না।"

বিব বলল, "না, কাকাবাবু, সবাই ভিতু নয়। কয়েকজন আমাকে বলেছে যে, তাদের কাছে যদি অস্ত্র থাকত, তা হলে তারা খুঁজে দেখত, কে শব্দ করছে, কোথা থেকে আসছে। কিন্তু সুন্দরবনে তো টুরিস্টদের বন্দুক-পিস্তল আনতে দেওয়া হয় না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে বোঝা যাচ্ছে, আজ আর কোনও আওয়াজ-টাওয়াজ হবে না। চলো, তা হলে এবার শুতে যাওয়া যাক।"

॥ ৬ ॥

এত বড় গেস্ট-হাউসের অনেক ঘরই ফাঁকা পড়ে আছে। তবু ওরা কাছাকাছি তিনটে ঘর নিল। সন্তু-জোজো এক ঘরে, অলি-দেবলীনা এক ঘরে, কাকাবাবু একলা।

পুরোপুরি চাঁদ উঠেছে এতক্ষণে। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে। সব দিক এখন নিথর নিস্তব্ধ, শুধু মাঝে-মাঝে একটা পাখি ডাকছে। কাকাবাবু আগেও সুন্দরবনে এসে এই পাখিটার ডাক শুনেছেন, এ রাত্তিরেও খুব ডাকে। এখানকার লোক বলে 'জলতরঙ্গ পাখি', কাকাবাবু অবশ্য পাখিটাকে দেখতে পাননি কখনও।

রোজই ঘুমোবার আগে কাকাবাবুর একটা কোনও বই পড়ার অভ্যেস। বই সঙ্গে আছে, কিন্তু ঘরে আলো জ্বালার ব্যবস্থা নেই। তার আছে, সুইচ আছে, বাল্বও ঝুলছে, এখনও কারেন্ট আসেনি নাকি? কিংবা রাত্তিরবেলা কারেন্ট অফ করে রাখা হয়।

কাকাবাবু জানলার ধারে গিয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় বই পড়ার চেষ্টা করলেন। ঠিক মতন পড়া যায় না, বেশ কষ্ট করতে হয়। একটুক্ষণ জানলার ধারে বসে থেকে কাকাবাবু শুয়ে পড়লেন বিছানায়। ব্যাগ থেকে বের করে টর্চটা রাখলেন বালিশের এক পাশে। কোটটা খুলে রেখে রিভলভারটাও মাথার কাছে রাখলেন। সুন্দরবনে বন্দুক-রিভলভার আনা নিষেধ, কিন্তু কাকাবাবুকে কেউ বারণ করেনি। তিনিও প্রত্যেকদিনের অভ্যেস মতন পকেটে রেখেছেন রিভলভারটা।

পাখিটা ডেকেই চলেছে।

কাকাবাবুর ঘুম আসছে না। নতুন জায়গায় এলে এরকম হয়।

মাঝে-মাঝে তিনি টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখছেন।

সন্তু আর জোজো পাশাপাশি দু'টো খাটে কিছুক্ষণ আড্ডা দিতে-

দিতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

অন্য একটা ঘরে দেবলীনা আর অলি গল্প করল অনেকক্ষণ। দেবলীনারই চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল আগে।

আরও খানিকক্ষণ পর অলি পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বারান্দা পেরিয়ে চলে এল বাগানে। একটা বেঞ্চে বসে পড়ল, তার পাশেই অনেক রজনীগন্ধা ফুল ফুটে আছে। চাঁদটা এখন ঠিক মাথার উপরে।

খানিকক্ষণ সে খুব আস্তে প্রায় ফিসফিস করে গান গাইল আপন মনে।

তারপর একটু উঁচু গলায় বলল, "কাকাবাবু, ওটা কী দৌড়ে আসছে আমার দিকে?"

খানিকটা দূরে, একটা গাছতলার বেঞ্চে বসে আছেন কাকাবাবু। তিনি বললেন, "ওটা একটা বেড়াল!"

অলি বলল, "ওটার চোখ দু'টো কীরকম জ্বলজ্বল করছে। তাই বেড়াল বলে বুঝতে পারিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "অন্ধকারে ওদের চোখ জ্বলে।"

অলি বলল, "তোমারও বুঝি ঘুম আসছিল না? তুমি কখন থেকে এখানে বসে আছ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোর একটু আগে থেকে। আমার ধারণা হয়েছিল, তুই ঠিক একবার এখানে উঠে আসবি চাঁদ দেখতে। তুই যাতে একা-একা ভয়টয় না পাস, তাই আমি ভাবলুম, একটু দেখে আসি।"

অলি হেসে বলল, "আমি ভয় পাব কেন? আমি তো জানিই, তুমি ঠিক একবার না-একবার আসবে!"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যি, আজকের রাতটা কী সুন্দর! আকাশে আর একটুও মেঘ নেই, কত তারা ফুটেছে। আমি একটু আগে দেখলাম, একটা উল্কা এক দিক থেকে অন্য দিকে ছুটে গেল।"

অলি বলল, "আমার এপাশটায় কী দারুণ রজনীগন্ধা ফুলের গন্ধ!"

অলির কথা শেষ হতে না-হতেই আচমকা শুরু হল সেই শব্দ। সেটা এতই জোরে আর এতই বিকট যে, কাকাবাবু পর্যন্ত কেঁপে উঠলেন প্রথমটায়। অলিও ভয় পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল কাকাবাবুকে।

সে আওয়াজটাকে মনে হয়, বিশাল কোনও জানোয়ার খিদের জ্বালায় চিৎকার করছে। সে চিৎকার এত জোরে যে, মনে হয় ফেটে যাবে আকাশ। একবার সেটা সরে যাচ্ছে একটু দূরে, আবার যেন এগিয়ে আসছে এদিকে। জন্তুটা কোথা থেকে ডাকছে? মনে হয়, যেন নরক থেকে উঠে এসে একটা অতিকায় প্রাণী সব কিছু খেয়ে ফেলতে চাইছে।

জোজো আর সন্তুরাও জেগে উঠে প্রথমেই কাকাবাবুর ঘর দেখতে গিয়েছে। সে ঘর ফাঁকা দেখে দৌড়ে এসেছে বাইরে, দেবলীনাও তাদের সঙ্গে। গেস্ট-হাউসের সব কর্মচারী, বিব দত্ত, পাহারাদাররাও জড়ো হয়েছে এক জায়গায়।

কেউ-কেউ ভয়ের চোটে কাঁপছে। একটাও কথা বলছে না কেউ।

প্রায় দশ মিনিট পর যেমন হঠাৎ শব্দটা শুরু হয়েছিল, সেরকম হঠাৎ থেমে গেল।

তারপরও কয়েক মিনিট সবাই চুপ।

প্রথম কথা বলল জোজো। সে বলল, "টেরোড্যাকটিল!"

দেবলীনা বলল, "তার মানে?"

জোজো বলল, "টেরোড্যাকটিল একরকম ডাইনোসর। এ তো পরিষ্কার ডাইনোসরের ডাক বোঝাই যাচ্ছে।"

দেবলীনা বলল, "তুই ডাইনোসরের ডাক শুনেছিস? তুই বুঝি জন্মেছিলি সেই যুগে?"

জোজো বলল, "তোরা জুরাসিক পার্ক সিনেমাটা দেখিসনি? তাতে ডাইনোসর কত বার হুংকার দিয়েছে! আমি ডেফিনিট, এখানে জঙ্গলে একটা ডাইনোসর রয়ে গিয়েছে। সেটার একটা ফোটো তুলতে পারলে ওয়ার্ল্ড ফেমাস হয়ে যাব।"

দেবলীনা অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "কম্পিউটারে ওরকম কত ডাইনোসর বানানো যায়। তোকে আর ডাইনোসর আবিষ্কার করতে হবে না। আমার তো মনে হল, এটা একটা কোনও জলজন্তু।"

অন্যরা অনেক রকম কথা বলছে এখন। শুধু চুপ করে আছে অলি।

কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "অলি, তুমি জানো, ওটা কিসের চিৎকার?"

অলি দু' দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না, আমি জানি না। খুব ভয় করছিল!"

কাকাবাবু এবার সবাইকে বললেন, "চলো, এখন শুয়ে পড়া যাক। অনেক রাত হল। চলো, চলো, চলো..."

বিছানায় ফিরে এসে জোজো অবশ্য অনেক রকম থিয়োরি দিতে লাগল। ওটা যদি ডাইনোসর না হয়, তা হলে নিশ্চয়ই কোনও পাখি। কিছু-কিছু ডাইনোসরই তো বিরাট-বিরাট পাখি হয়ে আকাশে উড়েছিল। জন্তুর ডাক আর পাখির ডাক যদি একসঙ্গে মিশে যায়, তা হলে কী ভয়ংকর হতে পারে!"

এবারে জোজোর কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল সন্তু।

ভোরবেলা তার ঘুম ভেঙে গেল ফোনের আওয়াজে। দু'টো খাটের মাঝখানে ফোন, জোজো অঘোরে ঘুমোচ্ছে, সে শুনতে পায়নি। সন্তুর ঘুম খুব পাতলা, সে ফোনটা তুলে শুনতে পেল কাকাবাবুর গলা।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, আমি একটু মর্নিং ওয়াকে যাব, তুই কি আমার সঙ্গে যেতে চাস? না চাইলে আরও ঘুমোতে পারিস। আর যদি যেতে চাস, তা হলে খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে আয়। জোজোকে ডাকার দরকার নেই।"

সন্তু বলল, "আমি ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

পাঁচ নয়, সাত-আট মিনিটের মধ্যে সন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, কাকাবাবু তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

হাঁটতে শুরু করে কাকাবাবু বললেন, "ইটের রাস্তা তো, যদি হোঁচট খাই, তাই সঙ্গে একজন থাকলে ভাল হয়। তোর ভাল করে ঘুম হল না।"

সন্তু বলল, "তুমিই বা কতক্ষণ ঘুমোলে?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমি আর শুতেই যাইনি। একটা রাত না ঘুমোলে কী হয়? মাথার মধ্যে একটা চিন্তা ঢুকলে আর আমি ঘুমোতেই পারি না। কাল রাতটা কত সুন্দর ছিল। হঠাৎ কী একটা বীভৎস আওয়াজ সব নষ্ট করে দিল।"

সন্তু বলল, "আমরা জেটিঘাটের দিকে যাচ্ছি। ওদিকে তো আর বেড়াবার রাস্তা নেই। বরং বাংলোর পিছন দিকটায় গেলে নাকি সমুদ্র দেখা যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "চলই না।"

সকালটাও ভারী চমৎকার। কাল রাত্তিরের ওই বিকট চিৎকারের স্মৃতিটা মুছে ফেলতে পারলে এই জায়গাটার সব কিছুই তো ভাল। কিন্তু সেটা কিছুতেই মুছে ফেলা যাচ্ছে না।

জেটিঘাটে কালকের লঞ্চটা নোঙর করা আছে। চারপাশে গোটাতিনেক ভটভটি নৌকো, আর একটা ছোট্ট মোটরবোট। সাদা রঙের, মনে হয় যেন একটা রাজহাঁস।

সেটার কাছে গিয়ে দেখা গেল, নীল গেঞ্জি পরা একজন লোক সানগ্লাস পরে, স্টিয়ারিং-এ বসে আছে। কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বরুণ, তুমি রেডি?"

সেই লোকটি বলল, "অ্যাবসোলিউটলি! দশ মিনিট আগে থেকেই বসে আছি।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই আমার ক্রাচ দু'টো ধর। আমি আগে উঠি।"

দু'জনেই ওঠার পর কাকাবাবু বললেন, "দেখছিস তো সন্তু, এটায় তিন-চারজনের বেশি বসার জায়গা হয় না। জানাজানি হয়ে গেলে, সবাই মিলে আসতে চাইত। তাই ওরা জেগে ওঠার আগেই আমরা

একটু ঘুরে আসি। আমাদের পাইলটের নাম বরুণ হালুই। কাল রাত্তিরেই আমি ওর সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করে রেখেছি। বরুণ, এই আমার ভাইপো সন্তু।"

বরুণ বলল, "আগে কোন দিকে যেতে চান?"

কাকাবাবু বললেন, "আগে সমুদ্রের দিকেই চলো, খানিকটা ঘুরপাক দিয়ে আসি। তবে বেশি জোরে চালিয়ো না ভাই।"

বরুণ বলল, "তা চালাব না। তবে বড় ঢেউ এলে বোটটাও লাফিয়ে ওঠে। সন্তুবাবু, শক্ত করে ধরে থেকো।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বোটটা কি কখনও উলটে গিয়েছে?"

বরুণ বলল, "হালকা জিনিস, মাঝে-মাঝে তো উলটে যেতেই পারে। তাতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না। আপনার জন্য সেজন্যই আমি ভাবছিলাম, বাই চান্স উলটে গেলে আপনি খোঁড়া পায়ে সাঁতার কাটতে পারবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "খোঁড়া পায়ে আমার সাঁতার কাটতে কোনও অসুবিধে নেই, এর আগে স্পিডবোট চাপার অভিজ্ঞতাও আছে। আর এই সন্তু সাঁতারে তিনটে মেডেল পেয়েছে। সুতরাং এ নিয়ে তোমায় কোনও চিন্তা করতে হবে না।"

বোটটা চলতে শুরু করার একটু পরেই সন্তু একটা শুশুক দেখতে পেল। সে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ডলফিন, ওই যে ডলফিন!"

বরুণ বলল, "কয়েক বছর আগেও আমরা অনেক ডলফিন দেখেছি। এখন খুব কম দেখা যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে, ততই এইসব জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যা কমে যাবে।"

বরুণ বলল, "এক সময় তো পৃথিবীতে মানুষই ছিল না। তখন বড়-বড় জন্তু-জানোয়াররাই দাপিয়ে বেড়াত। তারপর মানুষ এসে সবাইকে হারিয়ে দিল।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কাল রাত্তিরে যে বিকট আওয়াজটা হল, ওটা তো তুমি আগেও শুনেছ?"

বরুণ বলল, "হ্যাঁ, এই নিয়ে তিন বার।"

কাকাবাবু বললেন, "আওয়াজটা কেন হয়, কোথা থেকে আসে, তা জানার কৌতূহল হয়নি তোমার?"

বরুণ বলল, "প্রথম বার শোনার পরই আমি পরদিন সকালে এই দিকটায় অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেছি। কোনও কিছুই দেখতে পাইনি। দিনেরবেলা কোনও চিহ্নই থাকে না। আসল কথা কী জানেন, রাত্তিরবেলা যখন ওই আওয়াজটা হয়, তখনই অনেকে মিলে যদি খোঁজাখুঁজি করা যায়, তা হলে হয়তো কিছু সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে সময় কেউ ভয়ে বেরোতে চায় না। আমি দু'-একজনকে বলেছি, এই টুরিস্ট লজের মালিক মিঃ বিব দত্তকেও বলেছি, চলুন, আমরা একটা সার্চ পার্টি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি, উনিও তা-না-না-না করে এড়িয়ে গিয়েছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "আজ যদি আবার সেই আওয়াজটা হয়, ঠিক সেই সময় আমি যদি তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে চাই?"

বরুণ বলল, "শুধু আপনি আর আমি? একটু রিস্কি হয়ে যাবে না?"

সন্তু বলল, "আমিও যাব।"

বরুণ বলল, "তুমি সঙ্গে থাকলেও কি বিশেষ কিছু সুবিধে হবে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি যত দূর বুঝেছি, ওই আওয়াজটা কোনও জন্তু বা মানুষ যে-ই করুক, সে তেড়ে এসে আক্রমণ করে না, কারও কোনও ক্ষতিও করে না, শুধু ভয় দেখায়।"

বরুণ বলল, "টুরিস্টরা সব ভয় পেয়ে পালাতে শুরু করেছে। মিস্টার দত্ত'র ব্যবসাই উঠে যেতে বসেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কোনও জন্তু নিশ্চয়ই শুধু-শুধু ভয় দেখাতে আসবে না। তা হলে এটা কোনও মানুষেরই কাজ।"

বরুণ বলল, "কিন্তু মানুষ ওরকম আওয়াজ করবে কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষ সব পারে। জোজো ঠিকই বলেছে, সিনেমায় ডাইনোসরের ডাক শোনায়, কিং কং-এর হুংকার... আচ্ছা বরুণ, এদিকে কোনও দ্বীপে মানুষ থাকে?"

বরুণ বলল, "নাঃ! কয়েকটা ছোট-ছোট দ্বীপ আছে, কিন্তু মনুষ্যবাসের অযোগ্য।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কেন, অযোগ্য কেন?"

বরুণ বলল, "খাবার জল নেই যে। জল ছাড়া কি মানুষ বাঁচে? এই নোনাজল তো এক ফোঁটাও খাওয়া যায় না।"

এর মধ্যে স্পিডবোটটা চলে এসেছে সমুদ্রের একেবারে কাছাকাছি। নদীর মোহনা এখানে খুব চওড়া। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে গোটা দু'-এক জাহাজ। হাওয়া এখানে বেশ ফিনফিনে।

বরুণ জিজ্ঞেস করল, "আর কতটা যাব? সমুদ্রে গিয়ে পড়ব?"

সন্তু খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন, সমুদ্রে চলুন।"

তারপরই থেমে গিয়ে বলল, "ও, আই অ্যাম সরি। কাকাবাবু যা বলবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সমুদ্রের বুকে খানিকটা ঘুরে আসা যাক। এত দূরই এলাম যখন..."

সন্তু বলল, "এই দিক দিয়ে সোজা গেলে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে যাব, তাই না?"

বরুণ বলল, "একেবারে সোজা যাওয়া যায় না। তবে এদিকেই অস্ট্রেলিয়া।"

কাকাবাবু বললেন, "একটু দূরেই আন্দামান। সন্তু, আমরা একবার আন্দামান থেকে জাহাজে ফিরেছিলাম, তোর মনে নেই?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন? আবার যেতে ইচ্ছে করে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বরুণ, ওই যে ডান দিকে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে, ওর নাম কী?"

বরুণ বলল, "এখনও নাম দেওয়া হয়নি। পাঁচ-সাত বছর হল, ওই দ্বীপটা জেগেছে। আরও কিছু বছর যাক, দেখতে হবে, এর মধ্যে আবার ডুবে যায় না পাকাপাকি থাকে, তখন নাম হবে।"

সন্তু বলল, "মাত্র পাঁচ-সাত বছর! তার মধ্যেই অত গাছ হয়ে গিয়েছে?"

বরুণ বলল, "সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার। সব দ্বীপে এত গাছপালা কোথা থেকে যে আসে।"

কাকাবাবু বললেন, "পাখিরা নিয়ে আসে, জোয়ারের সময় ভেসে আসে। ওই দ্বীপটা কেমন সুন্দর, পারফেক্টলি গোল, ওটার কাছে যাওয়া যায় না? ভিতরটা একটু ঘুরে দেখে আসতাম।"

বরুণ বলল, "কাছে যেতে পারি। কিন্তু ভিতরে যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন ঠিক হবে না?"

বরুণ বলল, "এখানকার লোকেরা কোনও দ্বীপে প্রথমবার পা দেবার আগে কীসব পুজো-টুজো করে। এখানে সেই পুজো হয়েছে কিনা আমি জানি না। তা ছাড়া ভিতরে কী আছে না আছে..."

কাকাবাবু বললেন, "কী থাকতে পারে কিংবা পারে না, তা তো আমরা জেনে গিয়েছি। ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানব তো থাকবে না। বড়জোর কুমিররা রোদ পোহাতে পারে। চলো, কাছাকাছি তো অন্তত যাওয়া যাক।"

বরুণ বেশ জোরে চালিয়ে নিয়ে এল এবার। সমুদ্র এখানে শান্ত, বড় ঢেউ নেই। দ্বীপটা যেন একটা মস্ত বড় সবুজ কৌটোর মতন গভীর সমুদ্রে ভাসছে। বেলাভূমির কাছে এসে দেখা গেল, সেখানে বালির উপর একটা লাল রঙের কারপেট পাতা। লঞ্চটা একবার জোরে দুলতেই চোখের নিমেষে সেই কারপেটটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আসলে অসংখ্য ছোট-ছোট কাঁকড়া, সেগুলোকেই লাল কারপেটের মতন দেখায়। কিছু একটা আওয়াজ পেলেই সেগুলো গর্তে ঢুকে পড়ে। অবশ্য অত ছোট-ছোট কাঁকড়া মানুষের খাওয়ার অযোগ্য।

কাকাবাবু বললেন, "আমি একবার নামব, দ্বীপটায় গাছপালা ছাড়া

আর কিছু আছে কিনা...”

কাকাবাবুর কথা শেষ হল না। তখনই ডান পাশের জলের মধ্যে প্রবল আলোড়ন হল, তারপরই উঠে এল একটা অতিকায়, বীভৎস প্রাণী। তার চোখ দু'টো ফুটবলের মতন, হিংস্র মুখখানা ভর্তি বড়-বড় ধারালো দাঁত, নাকের ফুটো দিয়ে কী যেন বেরোচ্ছে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, কাকাবাবু জন্তুটাকে ভাল করে দেখারও সময় পেলেন না। সেই জন্তুটার নাক থেকে পিচকিরির মতন লাল রং বেরিয়ে এসে কাকাবাবুর সারা মুখে লাগল। কাকাবাবু মুখটা ঢাকার জন্য হাত তুলতে গিয়েও পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

॥ ৭ ॥

জ্ঞান ফেরার পর কাকাবাবু প্রথমে বুঝতেই পারলেন না, তিনি কোথায় শুয়ে আছেন। কয়েকবার হাত দিয়ে ঘষলেন চোখ। তবু ঘুম-ঘুম ভাবটা যাচ্ছে না।

খানিক পরে অনেকটা ঠিক হওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন, একটা ছোট্ট ঘরে একটা সরু খাটের উপর শুয়ে আছেন তিনি। ঘরে একটা নীল আলো জ্বলছে।

আস্তে-আস্তে তিনি উঠে বসলেন। কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, মানিব্যাগটা ঠিকই আছে, কিন্তু তাঁর রিভলভারটা নেই।

তিনি সব কিছু মনে করার চেষ্টা করলেন।

ভোরবেলা একটা স্পিডবোটে তিনি ঘুরছিলেন সন্তু আর বরুণ নামে একজন পাইলটের সঙ্গে। নদী ছাড়িয়ে এসে পড়লেন সমুদ্রে। সেখানে গাছপালায় ভরা একটা ছোট্ট দ্বীপ। সেই দ্বীপে নামা হয়নি, তার আগেই সমুদ্র থেকে মাথা তুলল একটা বিশাল, বিকট চেহারার জন্তু। তারপর?

তারপর ওই জন্তুটার নাক দিয়ে ফোয়ারার মতন লাল রঙের কী যেন বেরোচ্ছিল, সেটা এসে মুখে লাগল।

তারপর? আর মনে নেই!

এই ঘরটা কোথায়? এখানে তিনি এলেন কী করে?

সন্তু আর বরুণই বা কোথায় গেল? এই ছোট্ট ঘরটায় আর কারও থাকার জায়গাই হবে না।

দেওয়ালে একটা গোল আয়না রয়েছে। কাকাবাবু উঠে গিয়ে সেখানে মুখ দেখলেন। না, তাঁর মুখে লাল রং-টং কিছু নেই।

পাশেই একটা এক পাল্লার ছোট দরজা। কাকাবাবু সেটা ঠেলতে গিয়ে বুঝলেন, দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ।

তা হলে কেউ তাঁকে এখানে আটকে রেখেছে?

এখন তো অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কেউ না-কেউ আসবে নিশ্চয়ই। একটা বোতলে জল রাখা আছে। বোতলটা সরু আর মাঝারি সাইজের। একবার খেলেই সব জল শেষ হয়ে যাবে।

কাকাবাবু একবারেই জলটা শেষ করে দিলেন।

প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে দরজাটা খুলে গেল। বাইরে থেকে একজন কেউ বাংলায় বলল, "বেরিয়ে এসো!"

দরজার কাছে এসে লোকটির মুখ দেখে কাকাবাবু চমকে উঠলেন। এই তো সেই সুবল দাস ওরফে রুস্তম, কাল রাতে যে জোর করে একটা দ্বীপের কাছে নেমে গেল।

কাকাবাবু প্রথমেই তাকে কিছু বললেন না, তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন বেশ কয়েক মুহূর্ত। সে এখন পরে আছে নীল রঙের খুব টাইট প্যান্ট-শার্ট।

সে কাকাবাবুকে চেনার কোনও লক্ষণই দেখাল না। আবার বলল, "চলো আমার সঙ্গে।"

সামনেই কয়েক ধাপ সিঁড়ি দেখে কাকাবাবু বললেন, "আমার ক্রাচ দু'টো কোথায়? ক্রাচ ছাড়া আমি হাঁটতে পারি না।"

রুস্তম এবার রুক্ষ ভাবে বলল, "ওসব হবে-টবে না। চলো বলছি!"

কাকাবাবু ঠান্ডা গলায় বললেন, "ক্রাচ না পেলে আমি কোথাও যাব না!"

রুস্তম বলল, "তুমি যাবে না, তোমার ঘাড় যাবে।"

সে মুখের মধ্যে দু'টো আঙুল পুরে জোরে শিস দিল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে দুদ্দাড় করে নেমে এল আরও দু'জন লোক, তাদেরও একইরকম পোশাক।

রুস্তম তাদের বলল, "মাস্টার একে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন। এ যেতে চাইছে না। জোর করে তুলে নিয়ে যেতে হবে। হাত লাগাও!"

ওরা এসে কাকাবাবুকে চেপে ধরল।

কাকাবাবু ভাবলেন, এদের তিনজনের সঙ্গে লড়াই করে কোনও লাভ হবে না। বরং দেখাই যাক না, ওরা কার কাছে নিয়ে যেতে চাইছে।

তিনি আর বাধা দিলেন না।

ওরা তাঁকে প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে, চার-পাঁচ ধাপ সিঁড়ির উপরে উঠে নিয়ে গেল একটা ঘরের মধ্যে। সেখানে ধপ করে নামিয়ে দেওয়ার পর রুস্তম ফিসফিস করে বলল, "সাবধান! মাস্টার নিজে থেকে কিছু না বললে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না। তাতে উনি খুব রেগে যান। এখন চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকো!"

ওরা তিনজনই চলে গেল ঘরের বাইরে।

এ ঘরটাও তেমন কিছু বড় নয়। কোনও জানলা নেই। একটা ছোট গোল টেবিলের এক পাশে একটিমাত্র চেয়ার, তাতে বসে আছে একজন মাঝবয়সি লোক। তার পোশাক অতি বিচিত্র। মাথায় একটা হেলমেট, গায়ে একটা কালো কোট, তার সোনালি বোতাম আসল সোনারও হতে পারে। দু' কানে দুলছে দু'টো বেশ বড় দুল, দাড়ি নেই, বেশ পুরুষ্টু গোঁফ আছে। লম্বা জুলপি।

লোকটি মন দিয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে কী যেন লিখে চলেছে। কয়েক মিনিট সে কাকাবাবুকে গ্রাহ্যই করল না।

কাকাবাবুর মনে হল, তিনি যেন লোকটিকে আগে কোথাও দেখেছেন। মুখটা বেশ চেনা-চেনা। কিন্তু কোথায় দেখেছেন, তা মনে করতে পারলেন না। লোকটির ডান হাতের চারটে আঙুলে চারটে আংটি।

খানিকক্ষণ পরে সে লেখা শেষ করে কলমে ক্যাপ পরাল। তারপর মুখ তুলে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, "হুঃ, তুমি এসে গিয়েছ? কী যেন নাম তোমার, দাঁড়াও দেখছি, দেখছি..."

সে একটা আইপড বা ওই ধরনের কোনও যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে বলল, "রায় চৌড্রুয়ারি... খুব শক্ত নাম!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার একটা সহজ নামও আছে। রাজা। উচ্চারণ করা সোজা।"

লোকটি তিনবার বলল, "রাওজা, রায়জা, রাজা... দ্যাটস গুড। আমার নাম ক্যাপ্টেন নিমো। তুমি আমার নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বলল, "ক্যাপ্টেন নিমো?"

লোকটি বলল, "ইয়েস। ভাবছ, আমার কত বয়স? ক্যাপ্টেন নিমোদের বয়স বাড়ে না। হিসেব অনুযায়ী আমার বয়স এখন একশো এগারো বছর হওয়া উচিত, কিন্তু আমার বয়স এখন ফর্টি এইট। প্রায় তোমারই বয়সি, তাই না? আমি ক্যাপ্টেন নিমোর বংশধর, তবে আমাদের ফ্যামিলির বড় ছেলের নাম সব সময় নিমোই রাখা হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "নিমো বলে সত্যি-সত্যি কেউ ছিল নাকি? সে তো একটা গল্পের বইয়ের কাল্পনিক চরিত্র। ছেলেবেলায় পড়েছি, জুল ভার্নের লেখা বই, 'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগ্স আন্ডার দ্য সি', খুব ভাল লেগেছিল। ওই গল্প নিয়ে সিনেমাও হয়েছে।"

সেই লোকটি বলল, "কল্পনা অনেক সময় সত্যি হয়ে যায়। গল্পের চরিত্র হয়ে ওঠে জীবন্ত। জুল ভার্ন 'নটিলাস' বলে যে জাহাজের কল্পনা করেছিলেন, পরে নানা দেশে সেইরকম তো তৈরি হল। আমার এই জাহাজের নামও 'নটিলাস'।"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "জাহাজ? নটিলাস? তার মানে, তার মানে, এটা কি একটা সাবমেরিন? ডুবোজাহাজ?"

লোকটি বলল, "অফকোর্স! তুমি তো চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছ। তার মধ্যে আমরা এসে পড়েছি ইন্দোনেশিয়ার কাছাকাছি।"

কাকাবাবু বললেন, "চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি? তা কী করে সম্ভব?"

লোকটি বলল, "সম্ভব তো বটেই। এই লিকুইড ক্লোরোফর্ম আমার আবিষ্কার। এর প্রভাবে অনেকের ছত্রিশ ঘণ্টাতেও হুঁশ ফেরে না।"

কাকাবাবু অনেকটা আপনমনে বললেন, "ডুবোজাহাজ! তাই এখানে সব কিছুই ছোট-ছোট। কোনও ঘরে জানলা নেই। এটারই সামনের দিকটায় রং-টং করে, মুখ বানিয়ে একটা জন্তুর মতন করা হয়েছে।"

সেই লোকটি বলল, "হ্যাঁ, যখন আমরা জলের উপর মাথা তুলি, তখন কেউ দেখে ফেললে যাতে ভয় পায়। তোমাকে অবশ্য ভয় দেখিয়ে কোনও কাজ হবে না জানতাম। তাই তোমাকে অজ্ঞান করে ধরে আনা হয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে এত সম্মান দেখিয়ে ধরে আনার কারণটা কী জানতে পারি?"

লোকটি বলল, "নিশ্চয়ই জানতে পারবে। তবে এক্ষুনি নয়। এখনই জানলে তোমার মনখারাপ হয়ে যাবে! তোমার হাতে এখনও দেড় দিন সময় আছে।"

কাকাবাবু আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় রুস্তম ও আর একজন লোক দু'টো খাবারের ট্রে নিয়ে ঢুকে এল।

তা দেখে সেই ক্যাপ্টেন নিমো সাজা লোকটি খুব রেগে গিয়ে বলল, "এই সময় আমার এ ঘরে খাবার আনতে কে বলেছে? সব ক'টা ইডিয়েট। এই আলি, তুই জানিস না যে আমি অন্য কারও সামনে বসে খাই না?"

রুস্তম কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "মাস্টার, এখন ঠিক বারোটা বাজে। এটাই তো আপনার খাওয়ার সময়।"

নকল ক্যাপ্টেন নিমো টেবিলে এক চাপড় মেরে বলল, "তা হলে আমি একজন প্রিজনারের সামনে বসে গপাগপ করে খাব? ভদ্রতা, সভ্যতার ব্যাপার নেই? ছি ছি ছি! প্রিজনারকে এখান থেকে নিয়ে যা। আর আলি, তুই কাছে আয়..."

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, রুস্তম কিংবা সুবল দাসের নাম এখানে আলি।

ক্যাপ্টেন নিমো উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল, তার কোমরে একটা চওড়া বেল্ট, তাতে গোঁজা রয়েছে দু'দিকে দু'টো রিভলভার। আর তার প্যান্টটা সোনালি রঙের। ওরকম প্যান্ট কাকাবাবু আগে কখনও দেখেননি।

রুস্তম টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ক্যাপ্টেন নিমো তার একটা কান ধরে জোরে মলে দিল। তারপর বলল, "ভবিষ্যতে এরকম ভুল যেন আর না হয়!"

তারপরই কাকাবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে তোমার অসুবিধে হয় না?"

কাকাবাবু বললেন, "অসুবিধে হয় তো বটেই। এক পায়ে বিচ্ছিরি ভাবে লাফিয়ে-লাফিয়ে হাঁটতে হয়। তাও বেশিক্ষণ পারি না।"

ক্যাপ্টেন নিমো রুস্তমকে বলল, "এই, রাজাকে এখন ঘরে নিয়ে যা। খাবার দে। ঠিক দেড় ঘণ্টা বাদে আবার আমার কাছে নিয়ে আসবি। তখন ক্রাচ দিবি।"

রুস্তম কাকাবাবুর পিঠে হাত দিয়ে বলল, "চলো।"

কাকাবাবুকে ফিরিয়ে আনা হল আবার ছোট ঘরটায়। তারপর রুস্তমরা বেরিয়ে গেল, দরজা বন্ধ করল না।

কাকাবাবু খাটটার উপর বসে ভাবলেন, তাঁকে এখানে বন্দি করে রাখা হলেও তাঁর হাত-পা বাঁধা হয়নি, দরজাটাও এখন খোলা। তবে এটা সাবমেরিন, জলের কত তলায় রয়েছে কে জানে, এখান থেকে পালাবার কোনও উপায়ও তো নেই!

যে লোকটি নিজেকে ক্যাপ্টেন নিমো বলছে, সে কি পাগল নাকি? সোনালি রঙের প্যান্ট পরে! সাবমেরিনটাকে বাইরের দিকে সাজিয়েছে একটা বিকট জন্তুর মতন। এটার ভিতর থেকেই নিশ্চয়ই সে ওই বিচ্ছিরি শব্দটা করে। তাঁকে এখানে ধরে এনেছেই বা কেন?

লোকটিকে আগে কোথায় দেখেছেন, তা কাকাবাবু এখনও মনে করতে পারলেন না। কিন্তু মুখখানা বেশ চেনা-চেনা লাগছে ঠিকই।

একটু পরেই রুস্তম এ ঘরে একটা খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে ঢুকল। এ ঘরে টেবিল বা টুল জাতীয় কিছু নেই, খাবারের প্লেটটা হাতেই নিলেন কাকাবাবু।

রুস্তম জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি মিষ্টি খান? আইসক্রিম এনে দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "আর কিছু লাগবে না। তুমি যেতে পার।"

লোকটির সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না তাঁর। ওকে নদী থেকে তুলে বাঁচানো হয়েছিল, তারপরে ও দেবলীনার গলায় একটা ছুরি ঠেকিয়ে কী কাণ্ডই করল। এরকম অকৃতজ্ঞ মানুষকে দেখলেই রাগ হয়।

সমর ঘোষ বলছিল, এই রুস্তম নাকি ডাকাত। কিন্তু এখানে তো দেখা যাচ্ছে সে চাকরের কাজ করছে। ক্যাপ্টেন নিমো ওর কান মলে দিল! এরকম তিনি আগে কখনও দেখেননি।

প্লেটটায় রয়েছে খানিকটা ভাত আর দু'খানা রুটি, খানিকটা ট্যাঁড়সের তরকারি আর কয়েক টুকরো মুর্গির মাংস আর ঝোল। এই খাবার কাকাবাবুর পক্ষে যথেষ্ট। তবে ট্যাঁড়সের তরকারি তিনি খান না।

সন্তু আর বরুণ কোথায় গেল? তাদেরও তো অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা। তারা এখানে অন্য কোনও ঘরে আছে? নাকি কাকাবাবুকে একাই তুলে আনা হয়েছে! তিনি চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন? তেমন তো খিদে পায়নি।

কাঁটা-চামচ দেয়নি, তাই হাত দিয়েই খেতে হল কাকাবাবুকে। এখন হাতটা ধুতে হবে। ঘরে কোনও জলের ব্যবস্থা নেই। কাকাবাবু খালি প্লেটটা হাতে নিয়ে দরজার কাছে আসতেই দেখতে পেলেন, সামনের সিঁড়ির উপর একজন লোক বসে আছে। এরও পোশাকের রং নীল।

কাকাবাবু বললেন, "হাত ধোয়ার জল চাই। খাবার জলও চাই।"

লোকটি পাশের একটা দরজার দিকে আঙুল দেখাল। সেটা একটা বাথরুম, খুবই ছোট। জাপানিদের বাথরুমও এত ছোট হয় না। কাকাবাবু বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে নিলেন। কিন্তু এই জল খাওয়া যায় না, খুবই নোনতা।

তিনি বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখলেন, সেই লোকটার হাতে একটা ছোট্ট জলের বোতল। সেটা সে কাকাবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করতে লাগল, তাঁকে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য। এ কোনও কথা বলে না, বোবা নাকি?

কাকাবাবু ফিরে এলেন নিজের ঘরে। এর মধ্যেই এই ঘরটাকে তিনি নিজের ঘর হিসেবে ভাবতে শুরু করেছেন।

এবার তিনি ঘরটার দেওয়ালের সব জায়গায় হাত বুলোতে লাগলেন। এক জায়গায় দেখতে পেলেন একটা গোল কাটা দাগ। সেখানে খানিকটা টেপাটেপি করতেই খুলে গেল একটা ছোট্ট গোল জানলা।

কাকাবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি এর আগে কখনও ডুবোজাহাজে চাপেননি, তবু আন্দাজ করেছিলেন, বড় জাহাজের যেমন পোর্টহোল থাকে, সেরকম একটা কিছু জানলার মতন থাকা উচিত। যা দিয়ে বাইরে দেখা যায়।

এইবার বোঝা গেল, এটা সত্যিই একটা সাবমেরিন। বাইরে দেখা যাচ্ছে গাঢ় নীল জল, তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ঝাঁকে-ঝাঁকে ছোট মাছ। অপূর্ব দৃশ্য! একবার দেখতে পেলেন দু'টো অক্টোপাস।

কাকাবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। 'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগ্স আন্ডার দ্য সি' বইটাতেও একটা অক্টোপাসের কথা আছে। সেটা অবশ্য বিশাল, 'নটিলাস' জাহাজটাকেই চেপে ধরেছিল। অত বড় অক্টোপাস অবশ্য হয় না। ওটা লেখকের কল্পনা। আজ এতকাল পরে,

প্রায় দেড়শো বছর, কাকাবাবু বসে আছেন সেই নটিলাস নামে ডুবোজাহাজে। এ জাহাজের ক্যাপ্টেনের নামও ক্যাপ্টেন নিমো, কাকাবাবু দেখতে পাচ্ছেন অক্টোপাস।

হঠাৎ কাকাবাবুর মনে হল, তিনি কি সত্যিই একটা ডুবোজাহাজে বন্দি হয়ে আছেন, নাকি স্বপ্ন দেখছেন? পুরোটাই স্বপ্ন? তিনি নিজের গালে একটা চিমটি কাটলেন। না, ব্যথা লাগছে তো বেশ। তার মানে, তিনি জেগেই আছেন। এটা সত্যিই একটা ডুবোজাহাজ আর বাইরে দু'টো অক্টোপাস সত্যিই দেখা গেল!

কাকাবাবু বিছানাটায় শুয়ে পড়ে তাকিয়ে রইলেন জানলাটার দিকে।

ওই লোকটা তাঁকে নিয়ে কী করতে চায়। কতদিন আটকে রাখবে? জলের তলায় বলেই এখান থেকে বেরোবার কোনও উপায়ই নেই। ওদিকে দেবলীনা-জোজোরা কিছুই জানে না, ওরা খুব চিন্তা করছে। কিন্তু এখন তো অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই নেই মনে হচ্ছে।

ঠিক দেড় ঘণ্টা পর রুস্তম আবার এ ঘরে ঢুকে বলল, "চলো, মাস্টার তোমাকে ডাকছেন।"

কাকাবাবু হুকুমের সুরে বললেন, "আমার ক্রাচ এনে দাও। তখন তোমার মাস্টার তোমাকে অর্ডার করলেন, মনে নেই?"

রুস্তম বলল, "আচ্ছা আমি আনছি।"

ক্রাচ দু'টো ফিরে পেয়ে কাকাবাবুর মনটা ভাল হয়ে গেল। এক পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে হাঁটতে গেলে কেমন যেন ব্যক্তিত্ব চলে যায়।

কাকাবাবুকে উপরের ঘরটায় পৌঁছে দিয়েই রুস্তম চলে গেল। ক্যাপ্টেন নিমো সেই একই চেয়ারে বসে আছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ভাইপো সন্তু আর বরুণ কোথায়?"

ক্যাপ্টেন নিমো ঠোঁটে একটা আঙুল দিয়ে শ-শ-শ শব্দ করল। যেন সে কাকাবাবুকে চুপ করতে বলে অন্য কোনও শব্দ শোনার চেষ্টা করছে।

কাকাবাবু কোনও শব্দ শুনতে পেলেন না।

ঠোঁট থেকে আঙুল নামিয়ে নিমো বলল, "মিঃ রাজা, আপনাকে কেউ বলে দেয়নি যে, আমাকে কেউ কোনও প্রশ্ন করবে না। আগে কথা বলবে না। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে তবেই উত্তর দেবে।"

কাকাবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্যাপ্টেন নিমো তার গোঁফের দু' দিকের ডগা পাকাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, "অল রাইট, নাউ শুট! কী প্রশ্ন ছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু আর বরুণ আমার সঙ্গে ছিল।"

কথাটা শেষ না-হতেই নিমো বলল, "নো কমেন্ট। নেক্সট!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার সঙ্গে কি আমার আগে কোথাও দেখা হয়েছে?"

নিমো বললেন, "নাঃ! সে সৌভাগ্য আমার হয়নি।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার মুখটা খুব চেনা-চেনা লাগছে।"

নিমো এবার বিরাট জোরে অট্টহাস্য করতে লাগল। থামতেই চায় না। কাকাবাবু বুঝতেই পারছেন না। তিনি এমন কী হাসির কথা বললেন।

কোনওরকমে হাসি থামিয়ে নিমো বলল, "মিঃ রাজা, চেনা-চেনা তো লাগবেই। তুমি তো নিজেকে দেখছ।"

কাকাবাবু এ কথার মানেই বুঝতে পারলেন না।

নিমো বলল, "কাছে এসো, কাছে এসো।"

কাকাবাবু চলে এলেন টেবিলের কাছে।

নিমো তার মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে ফেলল, তারপর বলল, "তোমার গোঁফ চওড়া মতন, আমার গোঁফ শেষের দিকে সরু করে পাকানো। সোজা করে দিচ্ছি। আমার জুলফি দু'টো তোমার চেয়ে অনেক বড়, এই দ্যাখো, আমারটা অর্ধেক ঢেকে দিচ্ছি, এবার দ্যাখো তো ভাল করে।"

কাকাবাবু এতই অবাক হলেন যে, কোনও কথাই বলতে পারলেন না।

নিমো আবার বলল, "মানুষ তো নিজের মুখ বেশি দ্যাখে না, অন্যদেরই দ্যাখে। তাই অন্য কারও সঙ্গে নিজের মুখের মিল থাকলেও চিনতে দেরি হয়। তোমার সঙ্গে আমার এমনই মিল যে, লোকে বলতে পারে তুমি-আমি যমজ ভাই! শুধু মুখের মিলই নয়, তোমার মতন আমাকেও ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে হয়। আমি আগেই শুনেছিলাম, কলকাতায় আমার মতন চেহারার একজন মানুষ আছে। কাল রাত্তিরে আলি এসে বলল, তোমাকে এদিকে দেখা গিয়েছে। তাই ধরে নিয়ে এলাম। এখন তোমাকে নিয়ে কী করা যায় বলো তো?"

কাকাবাবু বললেন, "একজন ভাল ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে ফোটো তোলাতে হবে। তুমি আর আমি পাশাপাশি।"

নিমো বলল, "ঠিক তার উলটো। পৃথিবীতে ক্যাপ্টেন নিমো একজনই থাকবে। অন্য কারও সঙ্গে চেহারায় মিল থাকলে তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? আমার তো এক্ষুনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কোনও ইচ্ছে নেই। তুমি কি আমাকে ধরার জন্যই সুন্দরবনের কাছে এসে অপেক্ষা করছিলে?"

নিমো বলল, "না, না, তোমাকে তো বাই চান্স পেয়ে গেলাম। আমি প্রত্যেক বছর দু' বার করে সুন্দরবনে বাঘ মারতে আসি।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঘ মারতে মানে, বাঘ শিকার করতে?"

নিমো বলল, "ইয়েস!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঘ শিকার করা নিষিদ্ধ, বে-আইনি, তা তুমি জানো না?"

নিমো বলল, "আমি ওসব আইন-টাইন গ্রাহ্য করি না। কেউ আমাকে ধরতেও পারবে না। আমি প্রতিবার এখানে এসে তিন-চারটে বাঘ মারি। কালই তো একটাকে মেরেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "কাল বাঘ মেরেছ? কোথায়?"

নিমো বলল, "আমি কোথাও যাই না। আমি এই নটিলাসেই বসে থাকি। আমার লোক বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে আসে। কোনও একটা গ্রামের গোয়ালঘরে একটা বাঘ বসেছিল, আমার লোক সেটাকে নিয়ে এল। রাত্তিরবেলা আমি নিজে সেটাকে গুলি করে মারলাম। তারপর তার ছাল ছাড়ানো হল। বাঘের ছাল বেশ ভাল দামে বিক্রি হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি বাঘের ছাল বিক্রি করার জন্য বাঘ মারো?"

নিমো জোর দিয়ে বলল, "মোটেই না! তোমার একটা পা যে খোঁড়া, সেটা কী করে হল?"

কাকাবাবু বললেন, "একবার পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।"

নিমো বলল, "আমার কী হয়েছিল জানো? আমি একসময় নেপালে ছিলাম, সেখানে জঙ্গল দেখতে গিয়ে পড়েছিলাম বাঘের খপ্পরে। একটা বাঘ আমার ডান পায়ের পাতাটা চিবিয়ে গুঁড়ো করে দিয়েছিল। সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি বেঁচে উঠি, পৃথিবী থেকে সব বাঘ শেষ করে ফেলব। সব ক'টাকে!"

কাকাবাবু বললেন, "একটা বাঘ তোমাকে কামড়েছিল বলে তুমি অন্য বাঘদের মারবে কেন? তারা তো কোনও দোষ করেনি!"

নিমো বলল, "ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। পৃথিবীতে বাঘ থাকার কোনও দরকার নেই। বাঘ তো মানুষের কোনও উপকার করে না! তুমি ভাবছ, আমি জলের নীচে থাকি, আমি কী করে সব বাঘ মারব? কুড়ি বছর আগে তোমাদের ইন্ডিয়ায় বাঘ ছিল প্রায় সাড়ে তিন হাজার, এ বছরের সেন্সাস রিপোর্টে সেই সংখ্যাটা নেমে দাঁড়িয়েছে ১,৭০৬ টা, না, কালই আর একটা মরেছে, এখন ১,৭০৫টা। এত কমল কী করে? না, আমি সব মারিনি। আমি চোরাকারবারিদের মধ্যে রটিয়ে দিয়েছি যে, আমি ভাল দামে বাঘের চামড়া কিনব। তাতেই পোচাররা উৎসাহিত হয়ে বাঘ মারে। আর পাঁচ বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে সব বাঘ শেষ হয়ে যাবে। ফিনিশ!"

কাকাবাবু বললেন, "তার আগেই তুমি ধরা পড়ে যাবে।"

নিমো নিজের বুকে চাপড় মেরে বললেন, "ক্যাপ্টেন নিমোকে

ধরতে পারে এমন সাধ্য পৃথিবীতে কারও নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "একটা সাবমেরিন চালাবার তো অনেক খরচ। শুধু বাঘের চামড়া বিক্রি করেই তোমার চলে?"

নিমো বলল, "কী করে আমার চলে, তা তোমায় বলব কেন? অবশ্য বলতেও পারি। কারণ, তুমি তো প্রাণ নিয়ে এ জাহাজের বাইরে যেতে পারবে না, কাউকে কিছু জানাতেও পারবে না। গত মার্চ মাসে গ্রিসের কাছে একটা জাহাজডুবি হয়েছিল মনে আছে? জাহাজটা ডুবে যাওয়ার কারণ বোঝা যায়নি বলে সারা পৃথিবীতেই অনেক লেখালিখি হয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, মনে আছে। সেটা তোমারই কীর্তি!"

নিমো বলল, "ইয়েস। আমি তলা থেকে জাহাজটা ফুটো করে দিয়েছিলাম। টরপেডো চার্জ করেছি, কেউ বুঝতেই পারেনি। তারপর জাহাজের সবাই যখন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত, তখন আমার লোক সব দামি জিনিস তুলে নিয়ে আসে।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি তা হলে একজন জলদস্যু। ছি ছি ছি ছি। তুমি ক্যাপ্টেন নিমো নাম নিয়েছ, কিন্তু গল্পের ক্যাপ্টেন নিমো মোটেই ডাকাত ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানী।"

নিমো বলল, "আমিও সায়েন্টিস্ট! অনেক কিছু আবিষ্কার করেছি। আমার লিকুইড ক্লোরোফর্ম দিয়ে বাঘকে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে অজ্ঞান করে ফেলা যায়, গুলি করতে হয় না। ইচ্ছে করলে আমি একসঙ্গে শত-শত মানুষকেও অজ্ঞান করে বন্দি করে ফেলতে পারি, একটা রাজ্য জয় করতে পারি। কিন্তু আমি জলের তলায়ই ভাল থাকি। উপরে উঠলেই আমার গা জ্বালা করে। পৃথিবীর হাওয়াই বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু জলের নিচ থেকে ডাকাতি করে তুমি কতদিন টিকতে পারবে? ধরা তো পড়বেই।"

নিমো বলল, "তোমাকে তো বলেছি, আমাকে ধরার সাধ্য পৃথিবীতে কারও নেই। এই নটিলাসের মতন শক্তিশালী সাবমেরিনও কোনও দেশের নেই।"

হঠাৎ গলার আওয়াজ পালটিয়ে রাগের সঙ্গে সে বলল, "তুমি যে এত সব কথা বলছ, তোমার নিজেরই তো আয়ু শেষ। কালকের মধ্যে তুমি খতম!"

কাকাবাবু হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন।

নিমো চেয়ার ছেড়ে উঠে এল। তার ক্রাচ দু'টো খুবই দামি মনে হল, খুব সম্ভবত হাতির দাঁত কেটে-কেটে তৈরি।

সে একেবারে কাকাবাবুর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, "সত্যি, মুখের মিল হুবহু এক রকম। অথচ তুমি এক দেশের মানুষ, আমি অন্য দেশের।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কিন্তু অতটা মিল পাচ্ছি না। তোমার মুখে যে একটা হিংস্র ভাব ফুটে আছে, আমি শত চেষ্টা করলেও সেরকম ভাব ফোটাতে পারব না।"

এই কথাটা গ্রাহ্য না করে নিমো বলল, "আমি তোমাকে একটা থাপ্পড় মারব। তুমিও মারবে। দেখা যাবে, কার হাতে কত জোর?"

সে হাত তুলে কাকাবাবুকে মারতে যেতেই কাকাবাবু আগেই তার উদ্যত হাতটা চেপে ধরলেন। তারপর ওকে বকুনি দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "থাপ্পড় মারামারি তো ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যাপার, আমি ওতে রাজি নই। যদি পাঞ্জা লড়তে চাও, সেটা দেখা যেতে পারে।"

নিমো বলল, "নাঃ! পাঞ্জা লড়ে তো গুন্ডারা। আজ রাত্তিরে আমার এই জাহাজ একবার উপরে উঠবে। কিছু বাজার-টাজার করতে হবে। সেখানে একটা ফাঁকা মাঠ আছে। সেখানে আমাদের দু'জনের রেস হবে। দেখা যাবে, ক্রাচ নিয়ে কে আগে দৌড়ে গোলে পৌঁছতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তাতেও রাজি নই।"

নিমো বলল, "কেন রাজি নও?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামি না।"

নিমো ফস করে কোমর থেকে একটা রিভলভার বের করে বলল, "এটা তোমার কপালে ঠেকালে নিশ্চয়ই রাজি হবে।"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না। তাও রাজি হব না। তুমি তো বললে, আমার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে, কালই আমাকে মরতে হবে। তা হলে আর শুধু-শুধু রিভলভারকে ভয় পেতে যাব কেন?"

নিমো বলল, "দৌড়ে যদি তুমি জিততে পার, তা হলে আমি তোমার আয়ু একদিন বাড়িয়ে দিতে পারি। কালকের বদলে পরশু!"

কাকাবাবু বললেন, "মরতে সবাইকেই হয় একদিন না-একদিন। তবে মৃত্যুকে ভয় না পাওয়াটাই বেঁচে থাকার সার্থকতা। একটা দিন এক্সট্রা আয়ু পাওয়ার জন্য আমি তোমার কাছে মাথা নিচু করব কেন?"

নিমো বলল, "ওসব বড়-বড় কথা অনেক শুনেছি। সত্যিকারের মৃত্যুর মুখোমুখি এলে সবাই কেঁদে ফেলে কিংবা 'দয়া করো', 'বাঁচাও' বলে পায়ে পড়তে চায়। দেখা যাক, তুমি কী করো! আজ রাত্তিরেই..."

কাকাবাবু বললেন, "মানুষকে মেরে তুমি বুঝি আনন্দ পাও? তুমি বাঘও মারছ, আর মানুষ মেরেছ কতজন?"

নিমো বলল, "শাট আপ!"

তারপর সে জোরে হাততালি দিল তিনবার।

তখনই দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল রুস্তম আর একজন।

নিমো বলল, "এই লোকটিকে নিয়ে যাও, ব্লু রুমে রাখবে! দরজা বন্ধ করার দরকার নেই। ওকে বুঝিয়ে দিয়ো যে, সাবমেরিন থেকে পালানো অসম্ভব। জলের প্রেশারে দরজাই খুলবে না। তবে, ওকে না খাইয়ে রেখো না। খাবার-টাবার দিয়ো! আজ সন্ধেবেলা আমাদের একবার সারফেসে উঠতে হবে, তখন ও যদি হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু করে, তা হলে ওকে অজ্ঞান করে দিয়ো। আমি গোলমাল একেবারে সহ্য করতে পারি না। রাত ঠিক সাড়ে আট'টার সময় ওকে নিয়ে আসবে আমার ঘরে।

॥ ৮ ॥

ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছটায় এসে কাকাবাবু একটু দাঁড়ালেন।

রুস্তম তাঁর পিঠে একটা ঠেলা মেরে বলল, "চলো, চলো, থামবার নিয়ম নেই।"

কাকাবাবুর মনে হল, লোকে যেমন গোরু-ছাগলকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, এই লোকটাও তাঁর সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করছে।

ক্রাচ বগলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় খুব সাবধানে থাকতে হয়, না হলে ক্রাচ হড়কে যেতে পারে। তা এ লোকটা বুঝবে না।

নেমে আসার পর কাকাবাবু আগের ঘরটায় ঢুকতে গেলেন। রুস্তম তাঁর জামার কলার চেপে ধরে বলল, "ওখানে নয়। শুনলে না যে, তোমাকে ব্লু রুমে রাখতে বলেছে? তুমি কালা নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা কোন দিকে, তা তো জানি না। আমার কলার ছেড়ে দাও, কোনদিকে যেতে হবে বলো, যাচ্ছি!"

সে অনাবশ্যক জোরে চেঁচিয়ে বলল, "পালাবার চেষ্টা কোরো না। তা হলে তক্ষুনি মরবে। আর যদি চুপচাপ সব কথা শুনে চলো, তা হলে আরও কিছুক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার খুব তাড়াতাড়ি মরে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই।"

রুস্তম তাঁকে নিয়ে চলল ইঞ্জিনঘরের পাশ দিয়ে। সেখানে রয়েছে দু'জন চালক। তারা কাকাবাবুর দিকে ফিরেও তাকাল না। রুস্তমের সঙ্গে যে অন্য লোকটি আছে, সে কথা বলছে না একটিও।

একটুখানি এগিয়ে রুস্তম একটা ঘরের দরজা ঠেলে খুলে ফেলল।

এ ঘরটাও ছোট, তবে দেওয়াল গাঢ় নীল রঙের। একটা সরু বিছানা ছাড়া দু'টো চেয়ারও রয়েছে। কাকাবাবু একটা চেয়ারে বসলেন।

রুস্তম জিজ্ঞেস করল, "এখন কিছু খাবার খেতে চাও? কিংবা যখন ডিনারের সময় হবে, তখনই কি খাবার এনে দেব?"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না, এখন কিছু চাই না।"

রুস্তম বলল, "সেই ভাল। এখন আবার তোমার জন্য কে খাবার বানাবে? এখন লক্ষ্মী ছেলের মতন চুপটি করে বসে থাকো।"

রুস্তমের হাবভাব দেখে কাকাবাবুর গা জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে শাস্তি দেওয়ারও তো কোনও উপায় নেই। সহ্য করে যেতেই হবে।

রুস্তম তার সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজাটা টেনে দিল।

এ ঘরেও একটা গোল কাচের জানলা আছে। কিন্তু এখন আর বাইরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার মানে সন্ধে হয়ে গিয়েছে।

কাকাবাবু ভাবলেন, এখন কিছু দেখার নেই, কিছু শোনার নেই। এমনি-এমনি চুপ করে বসে থাকতে হবে? এরা ঘরে কয়েকখানা বই রাখে না কেন, তা হলে বই পড়ে সময় কাটানো যেত। এই নিমো কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলছে ইংরেজিতে আর রুস্তমদের সঙ্গে ভাঙা-ভাঙা বাংলায়। কোন দেশের লোক, তা বোঝা যাচ্ছে না।

ক্যাপ্টেন নিমো বলে যে-লোকটি নিজের পরিচয় দিচ্ছে, সে নিশ্চয়ই পাগল। কাকাবাবুর সঙ্গে তার মুখের কিছুটা মিল আছে বলেই তাঁকে সে মেরে ফেলতে চায়। পৃথিবী থেকে সব বাঘ ও শেষ করে দেবে, এটাও তো পাগলের মতন চিন্তা! কাল সন্তুরা বাঘ ধরা দেখতে গিয়েও দেখতে পায়নি। সবাই ভেবেছে, সেই বাঘটাকে বাংলাদেশের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকরা ধরে নিয়ে গিয়েছে, তা তো ঠিক নয়। এই লোকটাই কিছু লোককে ট্রেনিং দিয়ে বাঘ চুরি করে আনায়। তারপর ঘুমন্ত বাঘকে গুলি করে মারে। আহা কী বীরপুরুষ!

নিশ্চয়ই সে ওইসব লোককে অনেক টাকা দেয়। সেই টাকা ও পায় জাহাজে ডাকাতি করে। জলের তলায় থেকে একজন এরকম ডাকাতি করে যাচ্ছে, তা সম্ভবত এখনও কোনও দেশ জানে না। খবরের কাগজে এ বিষয়ে তো কোনও লেখালিখি হয়নি। জানতে পারবে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন, তখন ও ধরা পড়ে যাবে। তার আগে ও এরকম খুনের কারবার চালিয়ে যাবে!

কাকাবাবু ভাবলেন, ও কি সত্যিই আজ রাত্তিরের মধ্যে তাঁকে খুন করে ফেলবে নাকি? তিনি অনেকবার, অনেক রকম বিপদে পড়েছেন। কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর আগে কখনও হয়নি। পালাবার কোনও উপায় নেই। জলের তলায় যে দরজা খোলা যায় না, তা তিনি ভালই জানেন। তিনি সাইকেল, গাড়ি, এমনকী প্লেনও চালাতে পারেন, কিন্তু সাবমেরিন তো চালাতে জানেন না। এই প্রথম তিনি সাবমেরিনে চেপেছেন, আর কি দ্বিতীয়বার চাপা হবে?

খুট করে একটা শব্দ হয়ে দরজাটা খুলে গেল।

প্রথমে মনে হল, একটা ছায়ামূর্তি। তারপর বোঝা গেল, রুস্তম এসেছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে সে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

কাকাবাবু ভাবলেন, সাড়ে আটটার সময় তাঁকে আবার ক্যাপ্টেন নিমোর কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো সাড়ে আটটা বাজতে পারে না। ও এখন কী মতলবে এসেছে কে জানে। তবে এখনও যদি ও বদ লোকের মতন ব্যবহার করে, তা হলে তিনি ওকে কঠিন শাস্তি দেবেনই। তারপর যা হয় হোক।

রুস্তম কাছে এসে মেঝেয় বসে পড়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "স্যার, আপনার কাছে ক্ষমা চাইতেও লজ্জা পাচ্ছি। আপনি আমাকে যা শাস্তি দিতে চান দিন।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে ভাবলেন, এ আবার কীরকম কায়দা? ও কেন হঠাৎ ক্ষমা চাইছে? নতুন কোনও বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে? তিনি কিছু বললেন না।

পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করল সে। সেটা কাকাবাবুরই

রিভলভার। সেটা কাকাবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, "এটা মাস্টারের কাছে রাখা ছিল, আমি সরিয়ে এনেছি। আপনার কাছে রাখুন।"

কাকাবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, "এটা আমার কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন? তোমায় মাস্টার বলেছে?"

রুস্তম জিভ কেটে বলল, "না, না! বরং আমি এটা সরিয়ে এনেছি, তিনি তা জানতে পারলে বোধ হয় আমার ডান হাতটাই কেটে ফেলবেন। উনি খুব নিষ্ঠুর। মানুষ মারতে একটুও হাত কাঁপে না। আপনাকে যে এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছে, সেটাই খুব আশ্চর্যের।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বিপদ হতে পারে জেনেও তুমি এটা আমাকে দিতে এসেছ?"

রুস্তম বলল, "স্যার, আপনি বলেছিলেন, আমি একটা নরাধম। আমি সত্যিই নরাধম। নরকে গিয়ে চাবুক খেতে হবে আমাকে। আপনার সঙ্গের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে কত সেবা-যত্ন করে বাঁচাল, আর আমি তাদের সঙ্গে কীরকম খারাপ ব্যবহার করলাম! এমনকী, আপনার সঙ্গেও..."

কাকাবাবু শুকনো গলায় বললেন, "তোমার ঊরুর অবস্থা কেমন? যেখানে গুলি লেগেছিল?"

রুস্তম বলল, "খুব বেশি কিছু হয়নি। তবে দু'-একদিন বিশ্রাম নিতে পারলে ভাল হত।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাকে কাল রাত্তিরে একটা দ্বীপের কাছে নামিয়ে দেওয়া হল, সেখানে বাড়িঘর কিছু নেই। আজ সকালেই তুমি সেই দ্বীপ থেকে এই ডুবোজাহাজে চলে এলে কী করে? এত তাড়াতাড়ি!"

রুস্তম বলল, "কাল তো নয়, গত পরশু, পরশু! আপনি টানা চব্বিশ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। শুনুন স্যার, কাজের কথা বলি। এই ক্যাপ্টেন অতি নিষ্ঠুর। যখন গুলি করে বাঘ মারে, তখন খলখলিয়ে হাসে! মানুষ মেরেও সেরকম আনন্দ পায়! আপনাকে যখন মারবে বলেছে, তখন নিশ্চয়ই মারবে। বাধা দেওয়ার কোনও উপায় তো নেই। যতক্ষণ এই জাহাজটা জলের তলায় থাকবে, ততক্ষণ বাইরে যাওয়া যাবে না। আর খোদ ক্যাপ্টেনের হুকুম ছাড়া পাইলটরাও উপরে উঠবে না। আপনি এই ডুবোজাহাজ চালাতে জানেন?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ।"

রুস্তম বলল, "তা হলে স্যার, আপনি এ ঘরে থাকবেন না। কোথাও লুকিয়ে থাকুন। দেখুন, যদি ধরা না দিয়ে থাকতে পারেন। আমিও তক্কে-তক্কে থাকব, তারপর আপনি আর আমি দু'জনে মিলে যদি ক্যাপ্টেনকে ধরে ফেলতে পারি... ঠিক আছে, আমি এখন যাচ্ছি!"

সে উঠে দাঁড়াতেই দরজার কাছে একটা হাসির আওয়াজ শোনা গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন নিমো।

সে বলল, "কী, এর মধ্যেই কথাবার্তা শেষ হয়ে গেল? ওরে আলি, তুই এত মূর্খ, তুই জানিস না, কেন এই রাজাকে ব্লু-রুমে রাখতে বলেছি? এখানে লুকনো মাইক্রোফোন ফিট করা আছে, এখানকার সব কথা আমার ঘরে বসে শোনা যায়। তুই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস, তার শাস্তি তুই পাবি। আগে ওর ব্যবস্থা করি।"

কাকাবাবু রিভলভারটা তুলে বললেন, "ওহে ক্যাপ্টেন নিমো, তোমার জারিজুরি সব শেষ। এখন থেকে আমি যা বলব, তোমাকে তা মেনে চলতে হবে। মাথার উপর হাত তোলো।"

নিমো আবার হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসতে-হাসতেই বলল, "তাই নাকি? তোমার কথা না মানলে কী হবে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার হাতের টিপ খুব ভাল। একটা গুলিতে তুমি খতম হয়ে যাবে।"

নিমো বলল, "আজ পর্যন্ত আমি কারও হুকুম মেনে চলিনি। আমাকে যদি কেউ হুকুম করে, তার নিজেরই আয়ু শেষ। মিস্টার রাজা, তোমার হাতের ওই জিনিসটা ফেলে দাও। ওতে একটাও গুলি নেই। সে ব্যবস্থা আমি আগেই করে রেখেছি। এখন তো ওটা একটা খেলনা!"

কাকাবাবু রিভলভারটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখারও সময় পাননি। এবার দেখলেন, সত্যিই চেম্বার ফাঁকা।

নিমো এবার নিজের রিভলভারটা বের করল।

রুস্তম কেঁদে ফেলে বলল, "হুজুর, ইনি এক সময় আমার খুব উপকার করেছিলেন, তাই আমি ওঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম।"

নিমো চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "তোর উপকার করেছিল, তাতে আমার কী? আমি ওকে ধরে এনেছি, আমার ইচ্ছে মতন ওকে শাস্তি দেব।"

রুস্তম বলল, "উনি ভাল লোক। আপনি ওকে ছেড়ে দিন, ওর বদলে আমাকে যা ইচ্ছে শাস্তি দিন।"

নিমো বলল, "একজনের বদলে আর-একজনের শাস্তি? আরে এখানে বদলাবদলির কোনও প্রশ্নই নেই! দু'জনেই শাস্তি পাবি। দু'জনের শাস্তি দু'রকম। তুই একটা বিশ্বাসঘাতক, তোর তো আর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। এই ভদ্রলোক বরং কোন দোষই করেননি। শুধু ওঁর মুখখানা আমার মতন। সেটা ওঁর দোষ নয়, ভগবান ভুল করে দু'জনকে এক রকম গড়েছেন। ভগবানের সেই ভুলটা আমাকেই ঠিক করে দিতে হবে। পৃথিবীতে দু'জন ক্যাপ্টেন নিমো থাকতে পারে না।"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীতে একই রকম চেহারার দু'জন রাজা রায়চৌধুরী থাকলে আমি খুশিই হতাম।"

নিমো বলল, "শাট আপ। তুমি একটা এলেবেলে লোক, আমি মোটেই তোমার মতন দেখতে নই, তুমি বাই-চান্স ক্যাপ্টেন নিমোর মতন চেহারা পেয়েছ। আমি ভাবছি, তোমাকে একেবারে প্রাণে না মেরে চেহারাটা বদলে দেওয়া যায় কিনা। যদি তোমার কান দু'টো কেটে ফেলা যায়! কান কাটলে মানুষের চেহারা অন্যরকম হয়ে যায় না? কান কাটার একটা কী সুবিধে বলো তো? কেউ তোমার কান মলে দিতে পারবে না। সেটাই ভাল! আমি তা হলে তোমার কানটা মলে দিই শেষবারের মতন?"

সে ফস করে কাকাবাবুর একটা কান ধরে ফেলল।

কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে খুব জোরে একটা ধাক্কা দিলেন তাকে। নিমো সেই ধাক্কার চোটে পড়ে গেল মাটিতে। কাকাবাবু ঝুঁকে তার হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু নিমো তার মধ্যেই খানিকটা গড়িয়ে সরে গেল দূরে। রিভলভারটা ছুঁতে দিল না কাকাবাবুকে। কর্কশ গলায় বলল, "খবরদার, আমার গায়ে হাত ছোঁয়াবে না। তা হলে আমি সঙ্গে-সঙ্গে তোমাকে নরকে পাঠাব।"

সে চেঁচিয়ে ডাকল, "ফার্নান্ডেজ, ফার্নান্ডেজ!"

দরজার কাছ থেকে একজন বলল, "ইয়েস মাস্টার।"

নিমো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "অন্যদের ডাকো। আলিকে ধরে রাখো। আর এই রাজাকে বাঁধো, ওকে দিয়ে এসো আমার ঘরে।"

নিমোর নিজের ঘরটা জমকালো ভাবে সাজানো। দু' দিকের দেওয়ালে ঝুলছে দু'টি বাঘের ছাল, মুন্ডু সমেত। অন্য দেওয়ালটায় আড়াআড়ি করে রাখা দু'টো তলোয়ার আর মাঝখানে একটা ঢাল। অনেক রঙিন পাথরের মালা, তার মধ্যে চুনি-পান্নাও থাকতে পারে। আর একটা ওয়্যারলেস সেট।

ফার্নান্ডেজ নামের লোকটি কাকাবাবুর হাত দু'টো বেঁধে ফেলল। তারপর আরও দু'জন মিলে তাঁকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে এল ক্যাপ্টেনের ঘরে।

নিমো সবাইকে বাইরে যাওয়ার জন্য চোখের ইঙ্গিত করল।

তারপর নিজে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল কাকাবাবুর। ভুরু তুলে বলল, "এবার? এবার যদি তোমার কান মলে দিই, তুমি কী করে বাধা দেবে?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে মেরে ফেলতে পার, কিন্তু আমাকে অপমান করা তোমার উচিত নয়।"

নিমো বলল, "উচিত আর অনুচিত নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমার যখন যা ইচ্ছে হয়, তাই করি। দেখবে, দেখবে?"

সে কাকাবাবুর একটা কান ধরে জোরে মলে দিল।

কাকাবাবুর হাত বাঁধা, কিছুই করার উপায় নেই। তিনি জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন নিমোর দিকে। আস্তে-আস্তে বললেন, "আমার গায়ে যদি কেউ হাত দেয়, তাকে আমি ছাড়ি না। তাকে আমি শাস্তি দেবই। তুমি আমার কানে হাত দিলে, সেজন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।"

নিমো হা-হা করে হেসে বলল, "একে কী বলে জানো? দুর্বলের আস্ফালন। তুমি তো মরবে একটু পরেই, তা হলে আর প্রতিশোধ নেবে কখন? তোমাকে কেন এক্ষুনি গুলি করছি না জানো? হঠাৎ আমার ইচ্ছে হল, তোমাকে একেবারে প্রাণে না মেরে, আধমরা করে কোথাও সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব। হাঙররা তোমার মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাবে। কোথায় এখন হাঙরের দল এসে গিয়েছে, সেটা দেখে নিতে হবে।"

তারপর আবার সে বলল, "ততক্ষণ আমি তোমার নাক মলব, কান মলব, যা খুশি করব।"

সে খুব জোরে একটা থাপ্পড় কষাল কাকাবাবুর গালে।

॥ ৯ ॥

ঠিক আটটার সময় নিমো দরজা খুলে হাততালি দিল তিনবার।

সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এল ফার্নান্ডেজ, তার এক পায়ে জুতো। সে বলল, "ইয়েস মাস্টার।"

নিমো বলল, "ওই বিশ্বাসঘাতক আলিটাকে কোথায় রেখেছ?"

ফার্নান্ডেজ বলল, "আমার নীচের ঘরে। ওর হাত আর পা বাঁধা।"

নিমো বলল, "ওই অবস্থাতেই দিন দুয়েক থাক। কোনও খাবার দেবে না। পানীয় জলও দেবে না। তারপর আমি ওর ব্যবস্থা করব। তোমার এক পায়ে জুতো কেন?"

ফার্নান্ডেজ বলল, "মাস্টার, আপনি ডাকলেন, তখন জুতো পরতে গেলে যদি দেরি হয়ে যায়, তাই একপাটি জুতো পায়েই চলে এসেছি।"

নিমো বলল, "বেশ! জুতো পরার জন্য অযথা দেরি করোনি বলে তোমায় একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। আর ওই রকম বিচ্ছিরি ভাবে তুমি আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছ, এজন্যে একটা শাস্তিও হতে পারে। এখন ক'টা বাজে?"

ফার্নান্ডেজ বলল, "আটটা!"

নিমো এক ধমক দিয়ে বলল, "আটটা? ঘড়ি দেখতে ভুলে গিয়েছ? ঠিক করে বলো!"

ফার্নান্ডেজ বলল, "আটটা বেজে দু' মিনিট হয়েছে, মাস্টার!"

নিমো বলল, "এখনও আমার খাবার দিল না? কুককে ডাকো। ডাকো এখানে!"

ফার্নান্ডেজ ডাকার আগেই ছুটে এল কুক। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। সে বলল, "আপনার ডিনার রেডি, মাস্টার! কোথায় দেব, এই ঘরে না কমন রুমে?"

নিমো বলল, "এখানেই আনো। আমি অন্য কারও সামনে খানা খাওয়া পছন্দ করি না। কিন্তু আজ ওই রাজা নামের লোকটাকে অজ্ঞান করে বেঁধে রেখেছি। এর মধ্যে যদি ওর জ্ঞান ফিরে আসে, তা হলে ওকে দেখিয়ে-দেখিয়ে খেতে চাই। যাও, নিয়ে এসো।"

এ ঘরেও একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার রয়েছে। টেবিলের তলায় হাত-পা বাঁধা রাজা রায়চৌধুরী, তার মুখেও সেলো টেপ আটকানো।

কুক ছুটে গিয়ে খাবারের ট্রে নিয়ে এল।

সেদিকে তাকিয়েই নিমো বলল, "ডিমের হালুয়া কোথায়? জানো না, আমি ডিমের হালুয়া কত ভালবাসি?"

কুক বলল, "মাপ করবেন স্যার, মাপ করবেন। ডিমের হালুয়া তৈরি আছে, আলাদা বাটিতে রেখেছি। এক্ষুনি নিয়ে আসছি।"

নিমো বলল, "যাও।"

কুক ডিমের হালুয়া ভর্তি বাটিটা টেবিলে এনে রাখতেই নিমো নিজের ঘড়ি দেখে বলল, "আটটা বেজে ছ' মিনিট দশ সেকেন্ড। ঠিক আছে, দশ সেকেন্ড ছেড়ে দিচ্ছি। ছ' মিনিট লেট। কাছে এসো, কাছে এসো।"

কুক কাছে আসতেই নিমো তার একটা কান খুব জোরে মলে দিল। তারপর বলল, "ফার্নান্ডেজ, তোমরা ওকে বাকি পাঁচবার কান মলে দাও। সবাই এখান থেকে যাও, এখান থেকে যাও।"

অন্যরা সরে যাওয়ার পর সে রাজা রায়চৌধুরীর গায়ে একটা ঠোক্কর দিল জুতো পায়ে। বোঝা গেল, তিনি এখনও অজ্ঞান।

তারপর নিমো চেয়ারে বসে খাওয়া শেষ করল। তারপর টেবিলটার ড্রয়ার খুলে কিছু দরকারি কাগজপত্র পড়তে-পড়তে দাগ দিল কয়েক জায়গায়।

মিনিট দশেক পর, ঘর থেকে বেরিয়ে ছিটকিনি টেনে দিল দরজায়। হাতির দাঁতের ক্রাচ দু'টো খটখটিয়ে নেমে এল নীচে। মেশিন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি মেরে বলল, "ম্যাকেঞ্জি, ক্রুডি, তোমাদের ডিনার হয়ে গিয়েছে?"

ম্যাকেঞ্জি বেশ লম্বা-চওড়া, আর ক্রুডি খানিকটা বেঁটে আর গাট্টাগোট্টা।

ক্রুডি বলল, "নো স্যার, আমরা একটু দেরি করেই খাই।"

নিমো বলল, "আজ একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আজ তোমাদের সারা রাত জাগতে হতে পারে।"

ম্যাকেঞ্জি বলল, "নো প্রবলেম। রাত জাগা আমাদের অভ্যেস আছে।"

নিমো ইঞ্জিন ঘরের ভেতরে ঢুকে এসে বলল, "দেখি, ম্যাপটা দাও।"

ম্যাপটা টেবিলের উপর ছড়িয়ে দেখতে-দেখতে বলল, "এই হচ্ছে ক্যানিং, আর এইখানে ধামাখালি। তোমরা আজ রাত্তিরের মধ্যে ফুল স্পিডে চালিয়ে ওখানে পৌঁছতে পারবে?"

ক্রুডি বলল, "হ্যাঁ, পেরে যাব। মানে, ওদিকেই ফিরে যাব?"

নিমো বলল, "আমার কাছে একটা মেসেজ এসেছে যে, ওখানে আবার একটা বাঘ গ্রামে ঢুকে পড়েছে। পুলিশ কিংবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন ওখানে পৌঁছবার আগেই আমাদের কাজ সেরে ফেলতে হবে। এর পর আর অনেকদিন ওদিকে যাব না। এবার এই বাঘটাকে যদি ঠিকঠাক ধরে আনতে পারি, তা হলে তোমাদের আমি পাঁচশো ডলার একস্ট্রা দেব।"

সেখান থেকে বেরিয়ে নিমো চলে এল রান্নাঘরে। এমনি লঞ্চের তুলনায় ডুবোজাহাজের রান্নাঘরটা বেশ বড়। তিন-চারজন কর্মী নিজেদের খাবারের প্লেট নিয়ে বসেছে। নিমোকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল।

নিমো বলল, "না, না, তোমরা খাও, খেতে শুরু করো। একটা ভাল খবর শুনেছ? কাল সকালেই আমরা আর-একটা বাঘ ধরতে চলেছি। ওই যে বিশ্বাসঘাতক আলি, যাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে, সে কি তোমাদের কারও বন্ধু? তোমরা কি কেউ চাও যে, ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক?"

সবাই চুপ।

নিমো আবার বলল, "লোকটা কিন্তু গ্রামের লোকদের ভাল বোঝাতে পারে। তাই ভাবছি, ওকে এবারের মতন ক্ষমা করে দেব কি না...!"

ফার্নান্ডেজ বলল, "বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করা উচিত নয়। ও আবার এ কাজ করতে পারে। টাকার লোভেই নিশ্চয়ই ও রাজা নামে, লোকটাকে সাহায্য করতে চাইছিল।"

নিমো জিজ্ঞেস করল, "আমি কি তোমাদের কম টাকা দিই?"

এবার সবাই এক সঙ্গে বলল, "নো মাস্টার!"

নিমো খুশি হয়ে বলল, "এবার যদি বাঘটাকে ঠিক মতন ধরে আনতে পার, তা হলে আমি তোমাদের প্রত্যেককে পাঁচশো ডলার

পুরস্কার দেব। তবে, আমার একটা শর্ত আছে। বাঘটাকে ঘুম পাড়িয়ে বোটে তোলার সময় গ্রামের লোকেরা ইট-পাটকেল ছোড়ে, লাঠি দিয়ে মারতে যায়, তাতে বাঘটা আহত হয়ে পড়তে পারে। তোমাদের সেটা আটকাতে হবে। আমি আহত বাঘ চাই না। আমি চাই পুরোপুরি স্বাস্থ্যবান রয়াল বেঙ্গল টাইগার।"

ফার্নান্ডেজ বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না। আমি গ্রামের লোকদের ঠিক ম্যানেজ করে দূরে সরিয়ে রাখব। একবার আমার মাথায় একটা আস্ত ইট লেগেছিল, মনে নেই আপনার?"

নিমো বলল, "হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন? তোমার মাথা ইটের চেয়েও শক্ত, তাই তোমার কোনও ক্ষতি হয়নি। হ্যাঁ, ভাল কথা। ভয়-দেখানো আওয়াজ করা যন্ত্রটা ঠিকঠাক আছে তো? খারাপ-টারাপ হয়নি?"

ফার্নান্ডেজ বলল, "একদম ঠিক আছে।"

নিমো বলল, "বোটটা যখন সারফেসে উঠবে, তখন একবার বাজিয়ে দিয়ো। আমাদের রোজ আইল্যান্ডে পৌঁছতে কতটা সময় লাগতে পারে?"

ফার্নান্ডেজ বলল, "সেটা স্যার, ক্রুডি আর ম্যাকেঞ্জি ঠিক বলতে পারবে। তবে ঘণ্টা ছয়েকের কম নয়।"

নিমো বলল, "গুড! ততক্ষণে আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। মনে রেখো, এই বোটে এখন দু'জন বন্দি রয়েছে। একজন ওই রাজা নামের লোকটি, আর অন্যজন আলি। এরা যেন কোনও রকম চালাকি করতে না পারে। নজর রাখবে। এই বলে সে তার গোঁফের ডগা মোচড়াতে লাগল।

ফার্নান্ডেজ বলল, "স্যার, আলিকে আমি টয়লেটে আটকে রেখেছি। বাইরে ছিটকিনি, ওখান থেকে ওর বেরোবার কোনও উপায় নেই। আর অন্য লোকটা, সে রয়েছে আপনার ঘরে। আপনি এখন ঘুমোবেন, এর মধ্যে যদি ওর জ্ঞান ফিরে আসে? ওকেও কি আমাদের..."

তাকে থামিয়ে দিয়ে নিমো বলল, "তুমি জানো না, ঘুমের মধ্যেও ক্যাপ্টেন নিমোর চোখ খোলা থাকে! ঘুমের মধ্যেও ক্যাপ্টেন নিমো একটা পিঁপড়েরও চলাফেরার আওয়াজ শুনতে পায়! ও আমার কাছেই থাকবে।"

সে ফিরে এল নিজের ঘরে।

রাজা রায়চৌধুরী আগের মতোই মেঝেতে অজ্ঞান অবস্থায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে।

নিমো তার নাকের কাছে আঙুল নিয়ে এসে দেখল। নিশ্বাস পড়ছে সমান ভাবে। নিমো তার কান মলে দিল বেশ জোরে। তাতেও রাজা একটুও ছটফট করল না। তার মানে, তার জ্ঞান ফিরে আসতে এখনও ঢের দেরি আছে।

এবার নিমো জুতো না খুলেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। কোমরের বেল্টও খুলল না।

যদিও সে একটু আগেই সগর্বে বলছিল যে, ঘুমের মধ্যেও তার চোখ খোলা থাকে, আর সব রকম আওয়াজ শুনতে পায়, আসলে কিন্তু তা নয়। একটু পরেই তার পিঁচ-পিঁচ করে নাক ডাকতে লাগল। পাশ ফিরল কয়েকবার।

এক সময় সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "আলি! আলি!"

তা শুনে ছুটে এল ফার্নান্ডেজ।

সে বলল, "স্যার, আলিকে তো বন্দি করে রাখা হয়েছে। তাকে এখানে নিয়ে আসব?"

নিমো বলল, "আলিকে বন্দি করা হয়েছে? কেন বলো তো? সে তো খুব কাজের লোক!"

ফার্নান্ডেজ বলল, "সে আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সেই রাজা নামের লোকটাকে ওর রিভলভার ফেরত দিতে গিয়েছিল!"

নিমো চেঁচিয়ে বলল, "বিশ্বাসঘাতক? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঠিক সময়ে ওকে ধরে ফেলেছি। ক্যাপ্টেন নিমোর চোখকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। ও এখন বন্দি থাক। আগে বাঘটা ধরি, তারপর ওর ব্যবস্থা করব।"

এই সময় বুঁ বুঁ শব্দ শোনা গেল।

এর মধ্যে রাজা রায়চৌধুরীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিছু বলার চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু তাঁর মুখের মধ্যে আস্ত একটা রুমাল ভরা আছে, তাই শুধু বুঁ বুঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

নিমো বলল, "ও কী বলতে চাইছে বলো তো ফান্ডু?"

ফার্নান্ডেজ বলল, "তা তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

নিমো বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি! আমি তো বোবা লোকেরও ভাষা বুঝি। ও বলছে, 'জল খাব! জল খাব!'"

ফার্নান্ডেজ বলল, "একটু জল এনে দেব?"

নিমো হিংস্র ভাবে চেঁচিয়ে বলল, "সার্টেনলি নট। ওকে ওইরকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জলে ভাসিয়ে দেব, তখন ও যত ইচ্ছে জল খাবে। জল খেয়ে খেয়ে ওর পেটটা ঢোল হয়ে যাবে। ওকে কেন মরতে হবে, বলো তো ফান্ডু?"

ফার্নান্ডেজ বলল, "নিশ্চয়ই ও আমাদের শত্রু।"

নিমো বলল, "শুধু ওর মুখখানাই আমাদের শত্রু। ওর মুন্ডুটা কেটে ফেলার পর যদি দেহটা বেঁচে থাকত, তাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তা তো আর হয় না। ওর মুখের সঙ্গে আমার মুখের যে অনেক মিল! একদিন যদি ও এসে বলে যে, ও-ই আসল ক্যাপ্টেন নিমো, তোমরা যদি তা বিশ্বাস করে ফ্যালো! সেই জন্যই ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।"

ফার্নান্ডেজ বলল, "তবে তো ওর বেঁচে থাকার কোনও অধিকারই নেই।"

নিমো বলল, "ওই তো ঠিক বুঝেছ। এবার তুমি ইঞ্জিন রুমে যাও, ম্যাকেঞ্জিকে বলো, বোটটাকে সারফেসে আস্তে-আস্তে তুলতে। যাও।"

ফার্নান্ডেজ বলল, "এই যাই স্যার!"

মিনিট পনেরো পর ফার্নান্ডেজ আবার এসে খবর দিল, "স্যার, আমরা জলের উপরে উঠে এসেছি। ডেকও পরিষ্কার করা হয়ে গিয়েছে।"

নিমো বলল, "এখনও তো ভোর হয়নি। গত দু'দিন টাটকা বাতাসে শ্বাস নেওয়া হয়নি। আমি কিছুক্ষণ উপরে গিয়ে বসব।"

এখনও সূর্য ওঠেনি বটে, কিন্তু অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। দু' ধারে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে গাছপালা, তাতে বোঝা যায়, বোটটা এখন সমুদ্র ছেড়ে কোনও নদীতে ঢুকেছে।

একটা চেয়ার টেনে তাতে বসে পড়ে নিমো বলল, "ফান্ডু, একটা পুলিশ লঞ্চের মেসেজ মাঝপথে ধরে ফেলে জেনেছি যে, এই বাঘটা এসেছে বি-হাইভ আইল্যান্ডে, কালী নদীতে। ক্রুডিকে বলো, ম্যাপ দেখে জায়গাটা বুঝে নিতে। পুলিশের লঞ্চ আছে ভোল্লাখালিতে। ওদের পৌঁছতে আরও অন্তত ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে। তার মধ্যেই কাজ সেরে ফেলতে হবে আমাদের। তোমরা জিনিসপত্র সব রেডি করো।"

তারপর অনেকটা আপন মনে বলল, "পরপর দু'টো বাঘ। আমরা খুব লাকি। তবে এই নিয়ে খুব হইচই পড়ে যাবে, খবরের কাগজে খুব লেখালিখি হবে। তাই এ তল্লাটে আর অন্তত এক বছর আসব না। এবার ঘাঁটি গাড়ব বালি দ্বীপে। সবাই খুব সাবধান, প্রত্যেককে পুরস্কার দেব। খুব সাবধানে থাকতে হবে। সামনের দিকে যে জন্তুর মুখটা আঁকা আছে, সেই জায়গাটা এখন ঢেকে দাও।"

অন্যরা নীচে নেমে গেল।

নিমো একবার তাকাল আকাশের দিকে। এখনও কয়েকটা তারা দেখা যাচ্ছে। সূর্য ওঠার ঠিক আগে পৃথিবীর রং মনে হয় যেন নীল। একটু পরেই পুব দিকে দেখা গেল লাল আভা।

এই সময় ফার্নান্ডেজ, আলি অর্থাৎ রুস্তম আর একজন খালাসি উঠে এল উপরে। ফার্নান্ডেজের হাতে একটা রাইফেল।

ফার্নান্ডেজ রুক্ষ গলায় বলল, "হ্যান্ডস আপ। ক্যাপ্টেন নিমো, তোমার লীলাখেলা শেষ। তুমি আমাদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতন ব্যবহার করো, যখন-তখন আমাদের কান মলে দাও, এবার আমরা

শোধ নেবা।"

রুস্তম বলল, "রাজা রায়চৌধুরীর সঙ্গে তোমার শুধু মুখের মিল আছে, তাই তুমি তাঁকে মেরে ফেলতে চাইছ! তিনি খুব ভাল লোক আর তুমি একটা শয়তান।"

নিমোর মুখে একটুও ভয়ের চিহ্ন ফুটল না। সে হাতও তুলল না। বরং হাসিমুখে বলল, "এটা কি বিদ্রোহ নাকি? মিউটিনি? ফাল্গু, তুমি আলিকে ছেড়ে দিলে? ও খুবই ধূর্ত!"

ফার্নান্ডেজ এক পা এগিয়ে এসে রাইফেলটা তাক করে বলল, "তোমায় বলছি না, হাত তুলতে, নইলে গুলি খাবে!"

নিমো বলল, "তাই নাকি?"'

সে বিদ্যুৎবেগে কোমর থেকে দু'টো রিভলভার তুলে গুলি চালাল একসঙ্গে। তাতে ফার্নান্ডেজের হাত থেকে রাইফেলটা খসে গিয়ে পড়ল খানিকটা দূরে। আর রুস্তমের মাথার চুল ছুঁয়ে গেল একটা গুলি।

দু'জনেই যেমন অবাক, তেমনি ভয় পেয়ে কাঁপতে লাগল।

নিমো বলল, "আমার পা খোঁড়া, কিন্তু হাত কীরকম চলে তা আজও বুঝলে না? ক্যাপ্টেন নিমোকে কেউ কোনওদিন ধরতে পারেনি। আমার বয়স কত জানো, একশো একত্রিশ বছর। এত বছরের মধ্যে কেউ একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি আমার গায়ে।"

নিমো আবার শুধু-শুধু শূন্যে দু'টো গুলি চালিয়ে বলল, "এখন তোমাদের নিয়ে কী করি বলো তো? এখানেই শেষ করে দেব? নাকি একটা জঙ্গলে ভরা দ্বীপে নামিয়ে দেব? সেখানে তোমাদের হয় বাঘে খাবে অথবা পুলিশের হাতে ধরা পড়বে।"

অন্য যে খালাসিটি এসেছে, সে এবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, "মাস্টার, আমি ক্ষমা চাইছি। আমার কোনও দোষ নেই। এই ফার্নান্ডেজ আমাকে ভুল বুঝিয়ে এনেছে। ওই দেখুন, একটা লঞ্চ আসছে। এটা যদি পুলিশের লঞ্চ হয়?"

নিমো বলল, "তোমার পিছন দিকে দ্যাখো, সেদিক দিয়েও একটা লঞ্চ আসছে। পুলিশ কিংবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লঞ্চ। এখন আমরা কি এই দু'টো লঞ্চের সঙ্গে গুলির লড়াই চালাব, না পালাবার চেষ্টা করব?"

ফার্নান্ডেজ বলল, "দু' দিকে দু'টো লঞ্চ, এদের সঙ্গে লড়াই করার কোনও মানেই হয় না। নির্ঘাত হারব। বরং জলের তলায় ডুব মেরে অনায়াসে পালানো যায়। ক্যাপ্টেন, এক্ষুনি নীচে চলুন।"

নিমো বলল, "ক্যাপ্টেন নিমো কখনও ধরাও দেয় না, পালায়ও না। আমার মনে হয়, রাজা রায়চৌধুরীকে ফেরত দিলেই ওরা আমাদের আর কিছু বলবে না। যাও, শিগগিরই তোমরা রাজা রায়চৌধুরীকে উপরে নিয়ে এসো!"

অন্য লঞ্চ থেকে লাউড স্পিকারে সমর ঘোষ জানাল, "আমি জেলার এস পি সমর ঘোষ বলছি, আমরা একবার নটিলাস বোটটা সার্চ করে দেখব। ভয় নেই, বেশিক্ষণ আটকাব না।"

নিমো চেঁচিয়ে বলল, "সার্চ করবে? তোমাদের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?"

সমর ঘোষ বলল, "সুন্দরবনে পুলিশের স্পেশ্যাল পাওয়ার আছে, সন্দেহ হলে যে-কোনও লঞ্চ বা নৌকো সার্চ করে দেখতে পারি।"

নিমো আবার জিজ্ঞেস করল, "সার্চ করে তোমরা কী দেখতে চাও?"

সমর ঘোষ বলল, "বাঘ শিকার করা এখানে সম্পূর্ণ বে-আইনি। আমরা দেখব বাঘের চামড়া আছে কি না!"

ফার্নান্ডেজ আর অন্য খালাসিটি এর মধ্যে বন্দি রাজা রায়চৌধুরীকে উপরে নিয়ে এসেছে।

নিমো বলল, "ওঁর বাঁধন খুলে দাও, মুখ থেকে রুমালটাও বার করে দাও। ইনি নদীতে ভাসছিলেন, আমরা বাই চান্স দেখতে পেয়ে এঁকে উদ্ধার করেছি। এর সঙ্গে একটা ব্যাগ ছিল, তার মধ্যে ছিল একটা বাঘছাল। কিন্তু সেটা আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। জলে ডুবে গিয়েছে।"

সব বাঁধন খুলে দেওয়ার পর দারুণ রাগে হাত-পা ছুড়তে-ছুড়তে রাজা রায়চৌধুরী বলতে লাগল, "নো, নো, আই অ্যাম নট রাজা, আমি ক্যাপ্টেন নিমো। এই লোকটা জোচ্চোর! আমি আসল ক্যাপ্টেন নিমো! আমি, আমি..."

ক্যাপ্টেন নিমো নিজের মাথার হেলমেটে তিনটে টোকা মেরে, চোখ টিপে বলল, "এর মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে। খুব ভয় পেয়েছে তো! যাই হোক, আস্তে-আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।"

দু'টো লঞ্চ একেবারে পাশাপাশি চলে এসেছে। রাজা রায়চৌধুরী এখনও পাগলের মতন চেঁচাচ্ছেন, "আমি ক্যাপ্টেন নিমো, আমি, আমি... ওই লোকটা জোচ্চোর..."

পুলিশের লঞ্চটার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে সন্তু।

তার দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল। মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলতে লাগল, "নাঃ, আর পারা যাচ্ছে না।"

সে মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে ফেলল। জুলপি দু'টোর তলা আঙুল দিয়ে ঘষতেই তা খানিকটা ছোট হয়ে গেল। গোঁফের ছুঁচলো দিকও একটু টানতেই উঠে আসতে লাগল। বোঝা গেল, গোঁফের খানিকটা অংশ নকল।

এইবার লোকটি অন্য রকম গলায় বলল, "এইবার দ্যাখ তো সন্তু, কে আসল রাজা রায়চৌধুরী?"

সন্তু রেলিং-এর উপর উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে এই লঞ্চে চলে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কাকাবাবু! উফ, এবারের মতন এত চিন্তা কখনও হয়নি। তিন দিন হয়ে গেল, তবু কোনও খোঁজই পাইনি।"

কাকাবাবু বললেন, "মাঝখান থেকে আমার একটা দিন যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল কে জানে! চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি।"

সমর ঘোষের দিকে রিভলবার দু'টো বাড়িয়ে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "তোমার কাছে রাখো। আর এবার বোটটা সার্চ করে দেখতে পার। প্রথমেই ইঞ্জিন ঘরে তালা লাগিয়ে দাও।"

॥ ১০ ॥

জোজো, দেবলীনা আর সবাই ডুবোজাহাজটা দেখার জন্য ব্যস্ত। কেউই আগে সাবমেরিন দেখেনি।

হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে জোজো পা পিছলে পড়ে গেল ভিতরের সিঁড়িতে। খুব ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল জোজো।

তিনটে মোটে সিঁড়ি, তবু বেকায়দায় পড়লে অনেক সময় হাড় ভেঙে যেতেও পারে।

দেবলীনা বলল, "এই জোজো, বসে রইলি কেন, ওঠ!"

জোজো বলল, "দারুণ ব্যথা করছে রে! উঠে দাঁড়াতে পারছি না।"

দেবলীনা বলল, "আহাহা, বাচ্চা ছেলে নাকি তুই? এইটুকু পড়ে গিয়েই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললি!"

সন্তু বলল, "ওর চোখে জল এসে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভ্যাঁ শব্দটা করেনি।"

দেবলীনা বলল, "উঠতে পারছিস না, তা হলে বসে থাক। আমরা ঘুরে দেখে আসি।"

অলি বলল, "তোমরা যাও। বোটটা তো পালাচ্ছে না, আমি পরে দেখব, আমি জোজোর পাশে বসছি।"

দেবলীনা বলল, "ঠিক আছে, আমরা চট করে ঘুরে আসছি।"

ইঞ্জিন ঘরটায় শুধু তালা নয়, একজন পুলিশকেও বসানো হয়েছে পাহারায়। সাবমেরিনের সব কর্মচারীকে আর একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। আর বিশেষ কিছু দেখার নেই। বীভৎস সেই আওয়াজের যন্ত্রটা সন্তু একবার চালিয়ে দিতেই সবাই ভয় পেয়ে গেল, সন্তু আবার সেটা বন্ধ করে দিল তাড়াতাড়ি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবলীনা ফিরে এসে বলল, "দেখি জোজো, তোর পা টা ফুলেছে কিনা। হ্যাঁ, ফুলেছে। এক্ষুনি গরম জলের সেঁক দিতে হবে।"

দেবলীনা জোজোর বাঁ পা'টা কোলে তুলে নিয়ে দেখছে ভাল

করে। জোজো লজ্জা পেয়ে বলল, "এই, এই, পায়ে হাত দিস না।"

দেবলীনা বলল, "কেন, পায়ে হাত দিলে কী হয়েছে, হাত আর পা কি আলাদা নাকি? যত্ত সব কুসংস্কার!"

খানিক পরে জোজোকে ধরাধরি করে পুলিশের লঞ্চের উপরের ডেকে এনে বসানো হল। একটা গামলায় গরম জল এনে তাতে তুলো ভিজিয়ে দেবলীনা যত্ন করে সেঁক দিতে লাগল জোজোর পায়ে। জোজো বারবার বলছে, "ব্যস, ব্যস, হয়েছে, আর লাগছে না।"

কাকাবাবু মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন। অন্য সময় এরা দু'জনেই বেশি ঝগড়া করে। এখন লজ্জা পাচ্ছে বাক্যবাগীশ জোজো আর যত্নের সঙ্গে সেবা করছে দেবলীনা।

সবাই মিলে মুড়ি আর বেগুনি খাওয়া হচ্ছে। সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, ওই যে লোকটি 'আমি ক্যাপ্টেন নিমো' 'আমি ক্যাপ্টেন নিমো' বলে চেঁচাচ্ছে, ও কি সত্যিই পাগল?"

কাকাবাবু বললেন, "এক ধরনের পাগল তো বটেই। ও নিজেকে মনে করে ক্যাপ্টেন নিমোর বংশধর। অথচ ক্যাপ্টেন নিমো বলে তো কেউ ছিল না কখনও। নিমো একটা গল্পের বইয়ের চরিত্র, সায়েন্স ফিকশন, কল্পবিজ্ঞান যাকে বলে। তখন তো সাবমেরিন এত উন্নত ধরনের তৈরি হয়নি। কিন্তু এর লেখক এমন নিখুঁত ভাবে সাবমেরিনের বর্ণনা দিয়েছিলেন যে, তা পড়ে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই সিস্টেমে পরে সাবমেরিন তৈরি হয়।"

অলি বলল, "লেখকরা কল্পনায় এমন সব জিনিস দেখতে পান, পরে বিজ্ঞানীরা সেসব তৈরি করতে লেগে যান।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, তুমি কখন থেকে ক্যাপ্টেন নিমো সেজেছিলে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা তিনজন ভোরবেলা স্পিডবোটে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ সাবমেরিনটা এসে আমাদের অ্যাটাক করল। তারপর নাকি একদিনের বেশি আমি ওই সাবমেরিনে ঘুমিয়েছি। তোদের কী হল?"

সন্তু বলল, "আমরা স্পিডবোটেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। তবে অতক্ষণ নয়, দুপুরের দিকে একটা লঞ্চ এসে আমাদের উদ্ধার করে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে বোধ হয় আবার কোনও ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছিল। জেগে ওঠার পর ওই লোকটার লম্বা-চওড়া কথা শুনে বুঝেছি, ও একরকম পাগল ঠিকই। তবে সেয়ানা পাগল। একটা বাঘ ওর পায়ে কামড়ে দিয়েছিল বলে ও পৃথিবীর সব বাঘ মেরে ফেলতে চায়। আবার মাঝে-মাঝে সমুদ্রে ডাকাতিও করে। যাই হোক, আমি ভাবলাম, ওকে আমি চেষ্টা করে কখনও বেঁধে ফেলতেও পারি, কিন্তু তারপর পালাব কী করে? জলের তলায় থাকলে তো সাবমেরিন থেকে বেরনোই যায় না। আমি সাবমেরিন চালাতে জানি না, আর যারা চালায়, তারা ক্যাপ্টেন নিমোর হুকুম ছাড়া আর কিছুই শুনবে না। সেই জন্যই আমাকে ক্যাপ্টেন নিমো সাজতে হল।"

দেবলীনা বলল, "কী করে সাজলে? কী করে ওকে কাবু করলে?"

কাকাবাবু বললেন, "ওই লোকটার ধারণা, ও নিজেই শুধু বুদ্ধিমান, আর কেউ কিছু পারে না। ওর ঘরে দু'টো তলোয়ার ছিল। আমার শুধু হাত বেঁধে ফেলে রেখেছিল, পা বাঁধেনি। হাতের বাঁধন কেটে ফেলতে আর কতক্ষণ লাগে। তখন ওকেই বেঁধে ফেলে রাজা রায়চৌধুরী সাজালাম। আর আমি হয়ে গেলাম ক্যাপ্টেন নিমো। কেউ বুঝতে পারেনি। ওর গলার আওয়াজটা খ্যানখেনে ধরনের। সেটাও নকল করতে অসুবিধে হয়নি।"

দেবলীনা বলল, "দারুণ অভিনয় করেছ, বুঝতেই পারিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "লোকটা কী খেতে ভালবাসে, কীরকম ভাবে কথা বলে, সব লক্ষ করেছিলাম। তাই সুবিধে হয়েছিল।"

দেবলীনা বলল, "তুমি তো সিনেমায় অভিনয় করলেই পার।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো আগে থিয়েটার করেছি, সন্তু জানে। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' আমার মুখস্থ। তবে এখন কি আর খোঁড়া লোককে কেউ সিনেমায় পার্ট দেবে? তবে টিভি সিরিয়ালে হয়তো দিলেও দিতে পারে।"

দেবলীনা বলল, "আর কেউ কিছু না দিলেও আমি তোমাকে একটা মেডেল দেব।"

সন্তু বলল, "এবার সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানো? সাবমেরিনের ব্যাপারটা যখন আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি, তখন অলি কিন্তু বলেছিল নদীতে সাবমেরিন ঢুকতে পারে কি না। কী রে, জোজো, তোর মনে নেই!"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন? তখন খেয়াল করিনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি....অলি, তুমি কী করে এরকম বলতে পার?"

অলি বলল, "বলেছিলাম বুঝি? কই, আমার তো কিছু মনে নেই। এমনিই বলেছিলাম বোধ হয়..."

দেবলীনা বলল, "অলির যে আরও কত কীর্তি আছে!"

অলি লজ্জা পেয়ে সেখান থেকে উঠে গেল।
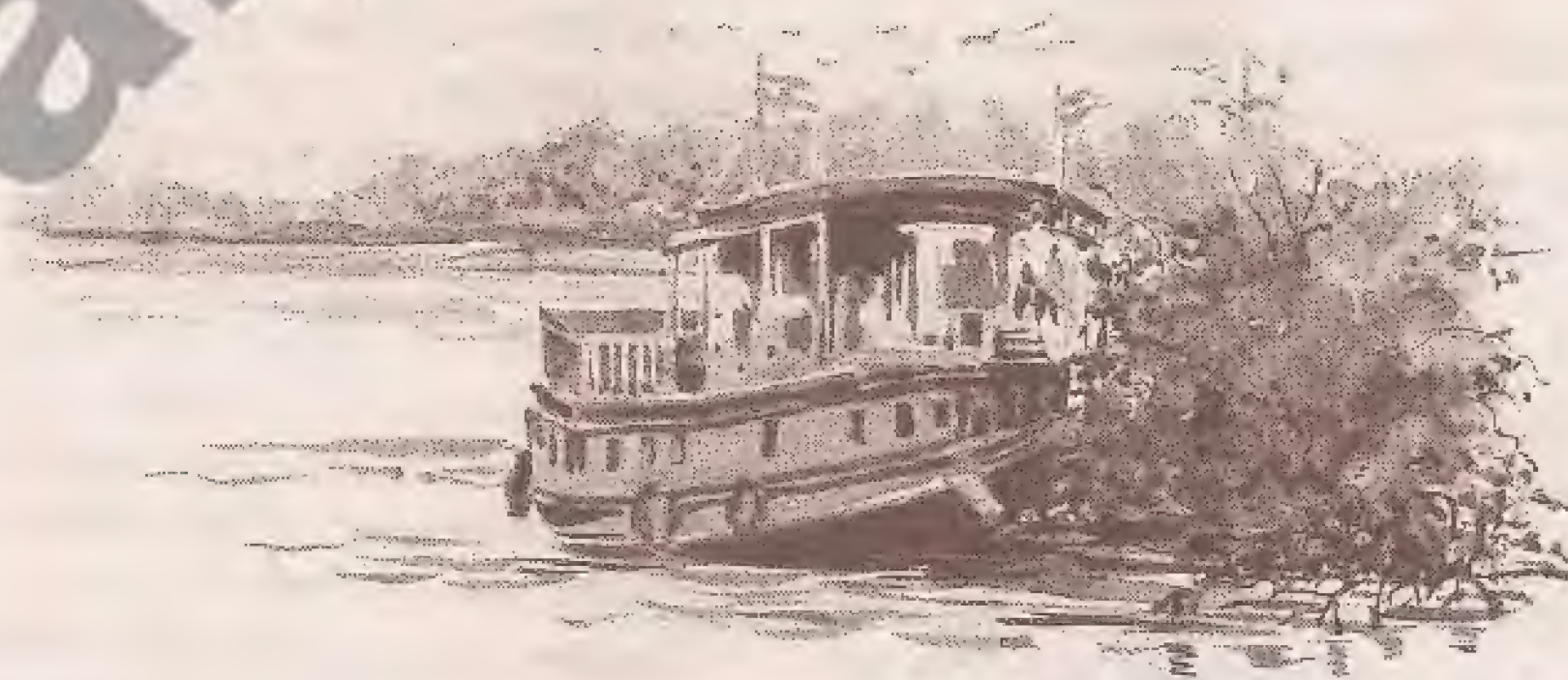
ভয়ংকর সুন্দর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভয়ংকর সুন্দর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
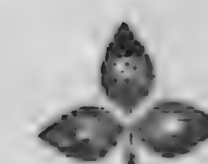
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

লীদার নদীর তীরে

আর সবাই পাহাড়ে গিয়ে কত আনন্দ করে, আমাকে সারাদিন বসে থাকতে হয় গজ ফিতে নিয়ে। পাথর মাপতে হয়। ফিতের একটা দিক ধরে থাকেন কাকাবাবু, আর একটা দিক ধরে টানতে টানতে আমি নিয়ে যাই, যতক্ষণ না ফুরোয়।

আজ সকাল থেকে একটুও কুয়াশা নেই। ঝকঝক করছে আকাশ। পাহাড়গুলোর মাথায় বরফ, রোদ্দুর লেগে চোখ ঝলসে যায়। ঠিক মনে হয় যেন সোনার মুকুট পরে আছে। যখন রোদ্দুর থাকে না, তখন মনে হয়, পাহাড় চূড়ায় কত কত আইসক্রিম, যত ইচ্ছে খাও, কোনোদিন ফুরোবে না।

আমার ডাক নাম সন্তু। ভালো সুনন্দ রায়চৌধুরী। আমি বালিগঞ্জের তীর্থপতি ইনসটিটিউশানে ক্লাস এইট-এ পড়ি। আমার একটা কুকুর আছে তার ডাক নাম রকু। ওর ভালো নামও অবশ্য আছে একটা। ওর ভালো নাম রকুকু। আমার ছোটমাসীর বাড়িতে একটা পোষা বিড়াল আছে। আমি সেটার নাম রেখেছি লড়াবি। আমি ওকে তেমন ভালবাসি না, তাই ওর ডাক নাম নেই। আমার কুকুরটাকে সঙ্গে আনতে পারিনি বলে মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ হয়। আমি গত বছর ফাইনাল পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়েছি, কিন্তু স্পোর্টসে চারটে আইটেমে ফার্স্ট হয়েছিলুম। কাকাবাবু এই জন্য আমাকে খুব ভালবাসেন।

আজ চমৎকার বেড়াবার দিন। কিন্তু আজও সকালবেলা কাকাবাবু বললেন, চলো সন্তু, আজ সোনমার্গের দিকে যাওয়া যাক। ব্যাগ দুটোতে সব জিনিসপত্তর ভরে নাও।

আমি জিগ্যেস করলাম, কাকাবাবু, সোনমার্গে তো আগেও গিয়েছিলাম। আবার ওখানেই যাবো?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, ঐ জায়গাটাই বেশী ভালো। ঐখানেই কাজ করতে হবে।

আমি একটু মন খারাপ করে বললাম, কাকাবাবু, আমরা শ্রীনগর যাবো না?

কাকাবাবু চশমা মুছতে মুছতে উত্তর দিলেন, না, না, শ্রীনগরে গিয়ে কী হবে? বাজে জায়গা। খালি জল আর জল! লোকজনের ভিড়!

আজ চোদ্দ দিন হলো আমরা কাশ্মীরে এসেছি। কিন্তু এখনও শ্রীনগর দেখিনি। একথা কেউ বিশ্বাস করবে? আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয় দীপঙ্কর ওর বাড়ির সবার সঙ্গে গত বছর বেড়াতে এসেছিল কাশ্মীরে। দীপঙ্করের বাবা বলে রেখেছেন, ও পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে, ওকে প্রত্যেকবার ভালো ভালো জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন। সেইজন্যই তো দু' নম্বরের জন্য সেকেন্ড হয়েও আমার দুঃখ হয়নি। কাশ্মীর থেকে ফিরে গিয়ে দীপঙ্কর কত গল্প বলেছিল। ডাল হ্রদের ওপর কতরকমের সুন্দর ভাবে সাজানো বড় বড় নৌকো থাকে। ওখানে সেই নৌকোগুলোর নাম হাউস বোট। সেই হাউস বোটে থাকতে কী আরাম। রাত্তিরবেলা যখন সব হাউস বোটে আলো জ্বলে ওঠে তখন মনে হয় জলের ওপর মায়াপুরী বসেছে। শিকারা নামে ছোট ছোট নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়, তাইতে চড়ে যাওয়া যায় যেখানে ইচ্ছে সেখানে। মোগল গার্ডেনস, চশমাসাহী, নেহেরু পার্ক— এইসব জায়গায় কী ভালো ভালো সব বাগান।

দীপঙ্করের কাছে গল্প শুনে আমি ভেবেছিলাম যে শ্রীনগরই বুঝি কাশ্মীর। এবারে কাকাবাবু যখন কাশ্মীরে আসবার কথা বললেন, তখন কী আনন্দই যে হয়েছিল আমার! কিন্তু এখনো আমার কাশ্মীরের কিছুই প্রায় দেখা হলো না। চোদ্দ দিন কেটে গেল। কাকাবাবুর কাছে শ্রীনগরের নাম বললেই উনি বলেন, ওখানে গিয়ে কি হবে? বাজে জায়গা! শুধু জল! জলের ওপর তো আর ফিতে দিয়ে মাপা যায় না। তাই বোধহয় কাকাবাবুর পছন্দ নয়। সত্যি কথা বলতে কি, কেন যে কাকাবাবু ফিতে দিয়ে পাহাড় মাপছেন তা আমি বুঝতে পারি না।

অবশ্য এই পহলগ্রাম জায়গাটাও বেশ সুন্দর। কিন্তু যে-জায়গাটা এখনও দেখিনি, সেই জায়গাটাই কল্পনায় বেশী সুন্দর লাগে। পহলগ্রামে বরফ মাখা পাহাড়গুলো এত কাছে যে মনে হয় এক দৌড়ে চলে যাই। একটা ছোট্ট নদী বয়ে গেছে পহলগ্রাম দিয়ে। ছোট হলেও নদীটার দারুণ স্রোত, আর জল কী ঠাণ্ডা!

পহলগ্রামে অনেক দোকানপাট, অনেক হোটেল আছে। এখান থেকেই তো তীর্থযাত্রীরা অমরনাথের দিকে যায়। অনেক সাহেব-

মেমেরও ভিড়। যারা আগে শ্রীনগর ঘুরে পহলগ্রামে এসেছে, তাদের মধ্যে অনেকে বলে যে শ্রীনগরের থেকে পহলগ্রাম জায়গাটা নাকি বেশী সুন্দর। কিন্তু আমি তো শ্রীনগর দেখিনি, তাই আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। শ্রীনগরের মতন এখানে তো হাউস বোট নেই। আমরা কিন্তু এখানেও হোটেলে থাকি না। আমরা থাকি নদীর এপারে, তাঁবুতে! এই তাঁবুতে থাকার ব্যাপারটা আমার খুব পছন্দ। দীপঙ্কররা শ্রীনগরে জলের ওপর হাউস বোটে ছিল, কিন্তু ওরা তো তাঁবুতে থাকেনি! দমদমের ভি-আই-পি রোড দিয়ে যেতে যেতে কতদিন দেখেছি, মাঠের মধ্যে সৈন্যরা তাঁবু খাটিয়ে আছে। আমারও খুব শখ হতো তাঁবুতে থাকার।

আমাদের তাঁবুটা ছোট হলেও বেশ ছিমছাম। পাশাপাশি দুটো খাট, কাকাবাবুর আর আমার। রাত্তিরবেলা দু' পাশের পর্দা ফেলে দিলে ঠিক ঘরের মতন হয়ে যায়। আর একটা ছোট ঘরের মতন আছে এক পাশে, সেটা জামাকাপড় ছাড়ার জন্য। অনেকে তাঁবুতে রান্না করেও খায়, আমাদের খাবার আসে হোটেল থেকে। তাঁবুতে শুলেও খুব বেশী শীত করে না আমাদের, তিনখানা করে কম্বল গায়ে দিই তো! ঘুমোবার সময়েও পায়ে গরম মোজা পরা থাকে। কোনো কোনো দিন খুব বেশী শীত পড়লে আমরা কয়েকটা হট ওয়াটার ব্যাগ বিছানায় নিয়ে রাখি। কত রাত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে নদীর স্রোতের শব্দ শুনতে পাই। আর কী একটা রাত-জাগা পাখি ডাকে চি-আও! চি-আও!

মাঝে মাঝে অনেক রাত্তিরে তাঁবুর মধ্যে মানুষজনের কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে যায়। আমার বালিশের পাশেই টর্চ থাকে। তাড়াতাড়ি টর্চ জেলে দেখি। কাশ্মীরে চোর-ডাকাতের ভয় প্রায় নেই বললেই চলে। এখানকার মানুষ খুব অতিথিপরায়ণ। টর্চের আলোয় দেখতে পাই, তাঁবুর মধ্যে আর কেউ নেই। কাকাবাবু ঘুমের মধ্যে কথা বলছেন। কাকাবাবুর এটা অনেক দিনের স্বভাব। কাকাবাবু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সঙ্গে যেন তর্ক করেন। তাই ওঁর দু'-রকম গলা হয়ে যায়। কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু আমার এই সময় একটু ভয় ভয় করে। তখন উঠে গিয়ে কাকাবাবুর গায়ে একটু ঠেলা মারলেই উনি চুপ করে যান।

আমার একটু দেরিতে ঘুম ভাঙে। পরীক্ষার আগে আমি অনেক রাত জেগে পড়তে পারি, কিন্তু ভোরে উঠতে খুব কষ্ট হয়। আর

এখানে এই শীতের মধ্যে তো বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছাই করে না। কাকাবাবু খুব ভোরে উঠতে পারেন। আমি জেগে উঠেই দেখি, কাকাবাবুর ততক্ষণে দাড়ি কামানো, স্নান করা সব শেষ। বিছানা থেকে নেমেই আমি তাঁবুর মধ্যে লাফালাফি দৌড়োদৌড়ি শুরু করি। তাতে খানিকটা শীত কাটে। আজ সকালবেলা মুখ হাত ধুয়ে, চা-টা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তাঁবুতে থাকার একটা সুবিধে এই দরজায় তালা লাগানো হয় না। তাঁবুতে তো দরজাই থাকে না। দরজার বদলে শক্ত পর্দা, সেটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেই হয়। আমাদের কোনো জিনিসপত্তর কোনোদিন চুরি হয়নি, কাশ্মীরে চোর নেই। অবশ্য ডাকাত আছে। সেটা আমরা পরে টের পেয়েছিলুম।

ছোট্ট ব্রীজটা পেরিয়ে চলে এলুম নদীর এদিকে। এই সকালেই রাস্তায় কত মানুষজনের ভিড়, কত রকম রং-বেরঙের পোষাক। যে-দেশে খুব বরফ থাকে, সে দেশের মানুষ খুব রঙীন জামা পড়তে ভালোবাসে। ঝাঁক ঝাঁক সাহেব মেম এসেছে আজ। ঘোড়াওয়ালা ছেলেরা ঘোড়া ভাড়া দেবার জন্য সবাই এক সঙ্গে চিল্লামিল্লি করছে। আমরা কিন্তু এখন ঘোড়া ভাড়া নেব না। আমরা বাসে করে যাবো সোনমার্গ। তারপর সেখান থেকে ঘোড়া ভাড়া নিয়ে পাহাড়ে উঠবো।

কাকাবাবুর ঘোড়ায় চড়তে খুব কষ্ট হয়। তাই আমরা ঘোড়ায় বেশী চড়ি না। প্রথম ক'দিন আমাদের একটা জিপ গাড়ি ছিল। এখানকার গভর্নমেণ্ট থেকে দিয়েছিল। গভর্নমেণ্টের লোকেরা কাকাবাবুকে খুব খাতির করেন। কিন্তু আমার কাকাবাবু ভারী অদ্ভুত। তিনি কোনো লোকের সাহায্য নিতে চান না। দু' তিন দিন বাদেই তিনি জিপ গাড়িটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাকে তখন বলেছিলেন, সব জায়গায় তো গাড়ি যায় না। যে-সব জায়গায় গাড়ি যাবার রাস্তা নেই—সেখানেই আমাদের বেশী কাজ। খোঁড়া পা নিয়েই তিনি কষ্ট করে চড়বেন ঘোড়ায়। এই যাঃ, বলে ফেললাম! আমার কাকাবাবুকে কিন্তু অন্য কেউ খোঁড়া বললে আমার ভীষণ রাগ হয়। আমি তো শুধু একবার মনে মনে বললাম। কাকাবাবু তো জন্ম থেকেই খোঁড়া নন্। মাত্র দু'বছর আগে কাকাবাবু যখন আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তখন কাবুলের থেকে খানিকটা দূরে ওঁর গাড়ি উল্টে যায়। তখনই একটা পা একেবারে চিপ্‌সে ভেঙে গিয়েছিল।

কাকাবাবুকে এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। এখন আর একলা একলা নিজে সব কাজ করতে পারেন না বলে কোথাও গেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমারও বেশ মজা, কত জায়গায় বেড়াই। গত বছর পুজোর সময় গিয়েছিলাম মথুরা, সেখান থেকে কালিকট। হ্যাঁ, সেই কালিকট বন্দর, যেখানে ভাস্কো-ডা-গামা প্রথম এসেছিলেন। ইতিহাসে-ভূগোলে যে-সব জায়গার নাম পড়েছি, সেখানে সত্যি সত্যি কোনোদিন বেড়াতে গেলে কী রকম যে অদ্ভুত ভালো লাগে, কী বলবো!
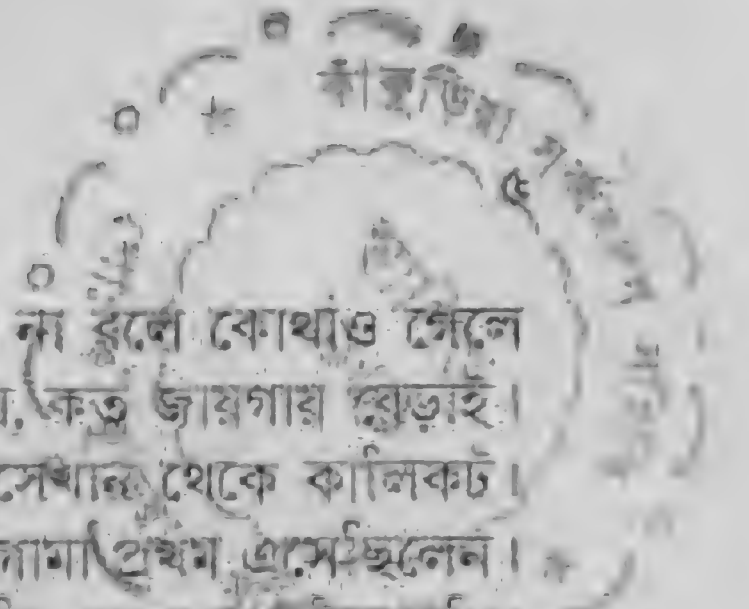
আগে চাকরি করার সময় কাকাবাবু যখন বাইরে বাইরেই ঘুরতেন, তখন আমরা ওঁকে বেশী দেখতে পেতাম না। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর উনি কলকাতায় আমাদের বাড়িতে থাকেন। বই পড়েন দিনরাত, আর বছরে একবার দু'বার নানান ঐতিহাসিক জায়গায় বেড়াতে যান—তখন আমাকে নিয়ে যান সঙ্গে। কাশ্মীরে এর আগেও কাকাবাবু দু' তিন বার এসেছেন—এখানে অনেকেই চেনেন কাকাবাবুকে।

ক্রাচে ভর দিয়েও কাকাবাবু কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন। দু' হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে আমি পাল্লা দিতে পারি না। এত তাড়াতাড়ি এসেও কিন্তু আমরা বাস ধরতে পারলুম না। সোনমার্গ যাবার প্রথম বাস একটু আগে ছেড়ে গেছে। পরের বাস আবার একঘণ্টা বাদে। অপেক্ষা করতে হবে।

কাকাবাবু কিন্তু বিরক্ত হলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, কী সন্তু, জিলিপি হবে নাকি?

আমি লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলুম। কাকাবাবু যে এক এক সময় মনের কথাটা ঠিক কী করে বুঝতে পারেন! পহলগ্রামে যারা বেড়াতে যায়নি, তারা বুঝতেই পারবে না, এখানকার জিলিপি'র কী অপূর্ব স্বাদ! খাঁটি ঘিয়ে ভাজা মস্ত বড় মৌচাক সাইজের জিলিপি। টুসটুসে রসে ভর্তি, ঠিক মধুর মতন। ভেজাল ঘি কাশ্মীরে যায় না, ডালডা তো বিক্রিই হয় না।

সোনার খোঁজে, না গন্ধকের খোঁজে?

বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই সোহনপালের বিরাট মিষ্টির দোকান। ভেতরে চেয়ার টেবিল পাতা, দেয়ালগুলো সব আয়না দিয়ে মোড়া। খাবারের দোকানের ভেতরে কেন যে আয়না দেওয়া বুঝি না। খাবার

তাকিয়ে দেখি আমাদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বিশাল চেহারার মানুষ। চিনি এঁকে, নাম সুচা সিং।

খাওয়ার সময় নিজের চেহারা দেখতে কারুর ভালো লাগে নাকি? জিলিপিতে কামড় বসাতেই হাত দিয়ে রস গড়িয়ে পড়লো।

কাকাবাবু নিজে খুব কম খান, কিন্তু আমার জন্য তিন চার রকমের খাবারের অর্ডার দিয়েছেন। এক ঘণ্টা সময় কাটাতে হবে তো! কাশ্মীরে এসে যতই পেট ভরে খাও, একটু বাদেই আবার খিদে পাবে। এখানকার জলে সব কিছু তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়।

—কী প্রোফেসার সাহেব, আজ কোনদিকে যাবেন?

তাকিয়ে দেখি আমাদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বিশাল চেহারার মানুষ। চিনি এঁকে, নাম সুচা সিং। প্রায় ছ' ফিট লম্বা, কব্জি দুটো আমার উরুর মতন চওড়া, মুখে সুবিন্যস্ত দাড়ি। সুচা সিং এখানে অনেকগুলো বাস আর ট্যাক্সির মালিক, খুব জবরদস্ত ধরনের মানুষ। কী কারণে যেন উনি আমার কাকাবাবুকে প্রোফেসার বলে ডাকেন, যদিও কাকাবাবু কোনোদিন কলেজে পড়াননি। কাকাবাবু আগে দিল্লিতে গভর্নমেণ্টের কাজ করতেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। কাশ্মীরে এসে প্রথম কয়েকদিনই অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলুম, এখানে অনেকেই ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। বাংলাদেশ থেকে এত দূরে, আশ্চর্য ব্যাপার, না? কাকাবাবুকে জিগ্যেস করেছিলুম এর কারণ। কাকাবাবু বলেছিলেন, ভ্রমণকারীদের দেখাশোনা করাই তো কাশ্মীরের লোকদের প্রধান পেশা। আর ভারতীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যাই বেশী—বাঙালীরা খুব বেড়াতে ভালোবাসে—তাই বাঙালীদের কথা শুনে শুনে এরা অনেকেই বাংলা শিখে নিয়েছে। যেমন, সাহেব মেম অনেক আসে বলে এরা ইংরাজিও জানে বেশ ভালোই। এখানেই একটা ঘোড়ার সহিসকে দেখেছি, বাইশ-তেইশ বছর বয়েস, সে কোনো দিন ইস্কুলে পড়েনি, নিজের নাম সই করতেও জানে না—অথচ ইংরেজী, বাংলা, উরদু বলে জলের মতন।

সুচা সিং ভাঙা ভাঙা উরদু আর বাংলা কথা মিলিয়ে বলেন। কিন্তু উরদু তো আমি জানি না, তন্দুরুস্ত, তাকাল্লুফ এই জাতীয় দু' চারটে কথার বেশী শিখতে পারিনি—তাই ওর কথাগুলো আমি বাংলাতেই লিখবো।

কাকাবাবু সুচা সিংকে পছন্দ করেন না। লোকটির বড্ড গায়ে পড়া ভাব আছে। কাকাবাবু একটু নির্লিপ্তভাবে বললেন, কোনদিকে যাবো ঠিক নেই। দেখি কোথায় যাওয়া যায়!

সুচা সিং চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেন, চলুন, কোনদিকে যাবেন বলুন, আমি আপনাকে পৌছে দিচ্ছি!

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না, তার দরকার নেই। আমরা একটু কাছাকাছি ঘুরে আসবো।

—আমার তো গাড়ি যাবেই, নামিয়ে দেব আপনাদের।

—না, আমরা বাসে যাবো।

—সোনমার্গের দিকে যাবেন তো বলুন। আমার একটা ভ্যান যাচ্ছে। ওটাতে যাবেন, আবার ফেরার সময় ওটাতেই ফিরে আসবেন।

প্রস্তাবটা এমন কিছু খারাপ নয়। সুচা সিং বেশ আন্তরিক ভাবেই বলছেন, কিন্তু পাত্তা দিলেন না কাকাবাবু। হাতের ভঙ্গি করে সুচা সিং-এর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, না, কোনো দরকার নেই।

কাকাবাবু যে সুচা সিংকে পছন্দ করছেন না এটা অন্য যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে। কিন্তু সুচা সিং-এর সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। চেয়ারটা কাকাবাবুর কাছে টেনে এনে খাতির জমাবার চেষ্টা করে বললেন, আপনার এখানে কোনো অসুবিধা কিংবা কষ্ট হচ্ছে না তো? কিছু দরকার হলে আমাকে বলবেন!

কাকাবাবু বললেন, না, না, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

—চা খাবেন তো? আমার সঙ্গে এক পেয়ালা চা খান্।

কাকাবাবু সংক্ষেপে বললেন, আমি চা খেয়েছি, আর খাবো না!

কাকাবাবু এবার পকেট থেকে চুরুট বার করলেন। আমি এর মানে জানি। আমি লক্ষ করেছি, সুচা সিং সিগারেট কিংবা চুরুটের ধোঁয়া একেবারে সহ্য করতে পারেন না। কাকাবাবু ওঁকে সরাবার জন্যই চুরুট ধরালেন। সুচা সিং কিন্তু তবু উঠলেন না—নাকটা একটু কুঁচকে সামনে বসেই রইলেন। তারপর হঠাৎ ফিসফিস করে জিগ্যেস করলেন, প্রোফেসার সাব, কিছু হদিস পেলেন?

কাকাবাবু বললেন, কী পাবো?

—যা খুঁজছেন এতদিন ধরে?

কাকাবাবু অপলকভাবে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুচা সিং-এর দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না, কিছুই পাইনি। বোধহয় কিছু পাওয়া যাবেও না!

—তাহলে আর খোঁড়া পা নিয়ে এত তকলিফ করছেন কেন?

—তবু খুঁজছি, কারণ খোঁজাটাই আমার নেশা।

—আপনারা বাঙালীরা বড় অদ্ভুত। আপনি যা খুঁজছেন, সেটা খুঁজে পেলে তা তো গভর্নমেণ্টেরই লাভ হবে। আপনার তো কিছু হবে না। তাহলে আপনি গভর্নমেণ্টের সাহায্য নিচ্ছেন না কেন? গভর্নমেণ্টকে বলুন, লোক দেবে, গাড়ি দেবে, সব ব্যবস্থা করবে— আপনি শুধু খবরদারি করবেন।

কাকাবাবু হেসে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন সুচা সিং-এর দিকে। তারপর বললেন, এটা আমার খেয়াল ছাড়া আর কিছু তো নয়! গভর্নমেণ্ট সব ব্যবস্থা করবে, তারপর যদি কিছুই না পাওয়া যায়, তখন সেটা একটা লজ্জার ব্যাপার হবে না?

—লজ্জা কি আছে, গভর্নমেণ্টের তো কত টাকারই শ্রাদ্ধ হচ্ছে; কম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ডাল্!

কাকাবাবু আবার হেসে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন সিংজী! বাঙালীরা অদ্ভুত জাত। তারা এসব পারে না।

সুচা সিং বললেন, বাঙালীদের আমাকে বলতে হবে না! আমি বহুৎ বাঙালী দেখেছি। ওদের মধ্যে বহুৎ ভালো ভালো মানুষ আছে, আবার খুব খারাপ, বদ্দি মানুষভি অনেক আছে। আপনাকে দেখেই বুঝেছি আপনি ভালো আদমি, কিন্তু একদম চালাক নন্!

একটা কথা আগে বলা হয়নি, কাকাবাবু কাশ্মীরে এসেছেন গন্ধকের খনি খুঁজতে। কাকাবাবুর ধারণা, কাশ্মীরের পাহাড়ের নিচে কোথাও প্রচুর গন্ধক জমা আছে। কাশ্মীর সরকারকে জানিয়েছেন সে কথা। সরকারকে না জানিয়ে তো কেউ আর পাহাড় পর্বত মাপামাপি করতে পারে না—বিশেষত কাশ্মীরের মতন সীমান্ত এলাকায়। আমি আর কাকাবাবু তাই গন্ধকের খনি আবিষ্কার করার কাজ করছি।

সুচা সিং বললেন, প্রোফেসারসাব, ওসব গন্ধক-টন্ধক ছাড়ুন। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এখানে পাহাড়ের নিচে সোনার খনি আছে। সেটা যদি খুঁজে বার করতে পারেন—

কাকাবাবু খানিকটা নকল আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, আপনি জানেন, এখানে সোনা পাওয়া যাবে?

—ডেফিনিটলি। আমি খুব ভালো ভাবে জানি।

—আপনি যখন জানেনই যে এখানে সোনা আছে, তাহলে আপনিই সেটা আবিষ্কার করে ফেলুন না!

—আমার যে আপনাদের মতন বিদ্যে নেই। ওসব খুঁজে বার করা

আপনাদের কাজ। আমি তো শুনেছি, টাটা কম্পানির যে এত বড় ইস্পাতের কারখানা, সেই ইস্পাতের খনি তো একজন বাঙালীই আবিষ্কার করেছিল!

কাকাবাবু চুরুটের ছাই ফেলতে ফেলতে বললেন, কিন্তু সিংজী, সোনার খনি খুঁজে পেলেও আপনার কী লাভ হবে! সোনার খনির মালিকানা গভর্নমেণ্টের হয়। গভর্নমেণ্ট নিয়ে নেবে।

সুচা সিং উৎসাহের চোটে টেবিলে ভর দিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, নিক না গভর্নমেণ্ট! তার আগে আমরাও যদি কিছু নিতে পারি! আমি আপনাকে সাহায্য করবো। এখানে মুস্তফা বশীর খান বলে একজন বুড়ো আছে, খুব ইমানদার লোক। সে আমাকে বলেছে, মার্তণ্ডের কাছে তার ঠাকুর্দা পাহাড় খুঁড়ে সোনা পেয়েছিল।

—আপনিও সেখানে পাহাড় খুঁড়তে লেগে যান।

—আরে শুনুন, শুনুন, প্রোফেসারসাব—

কাকাবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, ওঠ্ সন্তু। আমাদের বাসের সময় হয়ে এসেছে! তোর খাওয়া হয়েছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ। একটু জল খাবো।

—খেয়ে নে। ফ্লাস্কে জল ভরে নিয়েছিস তো?

তারপর কাকাবাবু সুচা সিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কি ধারণা, মাটির তলায় আস্ত আস্ত সোনার চাঁই পাওয়া যায়? পাথরের মধ্যে সোনা পাওয়া গেলেও তা গালিয়ে বার করা একটা বিরাট ব্যাপার। তাছাড়া সাধারণ লোক ভাবে সোনাই সবচেয়ে দামী জিনিস। কিন্তু তুমি ব্যবসা করো—তোমার তো বোঝা উচিত, অনেক জিনিসের দাম সোনার চেয়েও বেশী—যেমন ধরো কেউ যদি একটা পেট্রলের খনির সন্ধান পেয়ে যায়—সেটার দাম সোনার খনির চেয়েও কম হবে না। তেমনি, গন্ধক শুনে হেলাফেলা করছো, কিন্তু সত্যি সত্যি যদি প্রচুর পরিমাণে সালফার ডিপোজিটের খোঁজ পাওয়া যায়—

—সে তো হলো গিয়ে যদি-র কথা। যদি গন্ধক থাকে। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, কাশ্মীরে সোনা আছেই!

—তাহলে তুমি খুঁজতে লেগে যাও! আয় সন্তু—

সুচা সিং হঠাৎ খপ করে আমার হাত ধরে বললেন, কী খোকাবাবু, কোনদিকে যাবে আজ?

সুচা সিং-এর বিরাট হাতখানা যেন বাঘের থাবা, তার মধ্যে আমার

ছোট্ট হাতটা কোথায় মিলিয়ে গেছে। আমি উত্তরের দিয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকালাম। কাকাবাবু বললেন, আজ আমরা দূরে কোথাও যাবো না, কাছাকাছিই ঘুরবো।

সুচা সিং আমাকে আদর করার ভঙ্গি করে বললেন, খোকাবাবুকে নিয়ে একদিন আমি বেড়িয়ে আনবো। কী খোকাবাবু, কাশ্মীরের কোন কোন জায়গা দেখা হলো? আজ যাবে আমার সঙ্গে? একদম শ্রীনগর ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো!

শ্রীনগরের নাম শুনে আমার একটু একটু লোভ হচ্ছিল, তবু আমি বললাম, না।

সুচা সিং-এর হাত ছাড়িয়ে আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। সুচা সিং-ও এলেন পেছনে পেছনে। আমরা তখন বাস স্ট্যান্ডের দিকে না গিয়ে হাঁটতে লাগলাম অন্যদিকে।

কাকাবাবু সুচা সিংকে মিথ্যে কথা বলেছেন। আমরা যে আজ সোনমার্গে যাবো, তা তো সকাল থেকেই ঠিক আছে। কাকাবাবু সুচা সিংকে বললেন না সে কথা। গুরুজনরা যে কখনো মিথ্যে কথা বলেন না, তা মোটেই ঠিক নয়, মাঝে মাঝে বলেন। যেমন, আর একটা কথা, কাকাবাবু অনেককে বলেছেন বটে যে তিনি এখানে গন্ধকের খনি আবিষ্কার করতে এসেছেন—কিন্তু আমার সেটা বিশ্বাস হয় না। কাকাবাবু হয়তো ভেবেছেন, ছেলেমানুষ বলে আমি সব কিছু বিশ্বাস করবো কিন্তু আমি তো ততটা ছেলেমানুষ নই। আমি এখন ইংরিজি গল্পের বইও পড়তে পারি। কাকাবাবু অন্য কিছু খুঁজছেন। সেটা যে কী তা অবশ্য আমি জানি না। সুচা সিংও কাকাবাবুকে ঠিক বিশ্বাস করেননি। সুচা সিং-এর সরকারি মহলের অনেকের সঙ্গে জানাশোনা, সেখান থেকে কিছু শুনেই বোধহয় সুচা সিং সুযোগ পেলেই কাকাবাবুর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেন। সুচা সিং-এর কি ধারণা, কাকাবাবু গন্ধকের নাম করে আসলে সোনার খনিরই খোঁজ করছেন? আমরা কি সত্যিই সোনার সন্ধানে ঘুরছি?

সুচা সিং-এর দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা চলে এসেছি খানিকটা দূরে। রোদ উঠেছে বেশ, পথে এখন অনেক বেশী মানুষ। আজ শীতটা একটু বেশী পড়েছে। আজ সুন্দর বেড়াবার দিন।

বাসের এখনও বেশ খানিকটা দেরি আছে। সুচা সিং-এর জন্য আমরা বাস ডিপোতে যেতেও পারছি না। আস্তে আস্তে হাঁটতে

লাগলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে। কাকাবাবু আপনমনে চুরুট টেনে যাচ্ছেন। আমি একটা পাথরের টুকরোকে ফুটবল বানিয়ে সুট্ দিচ্ছিলাম—

হঠাৎ আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, আরেঃ, স্নিগ্ধাদি যাচ্ছে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো, স্নিগ্ধাদি, সিদ্ধার্থদা, রিণি—

কাকাবাবু জিগ্যেস করলেন, কে ওরা?

উত্তর না দিয়ে আমি চিৎকার করে ডাকলাম, এই স্নিগ্ধাদি!

এক ডাকেই শুনতে পেল। ওরাও আমাকে দেখে অবাক। এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের দিকে। আমি কাকাবাবুকে বললাম—কাকাবাবু, তুমি ছোড়দির বন্ধু স্নিগ্ধাদিকে দেখোনি?

উৎসাহে আমার মুখ জ্বলজ্বল করছে। এত দূরে হঠাৎ কোনো চেনা মানুষকে দেখলে কী আনন্দই যে লাগে। কলকাতায় থাকতেই অনেকদিন স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে দেখা হয়নি—আর আজ হঠাৎ এই কাশ্মীরে! বিশ্বাসই হয় না! কাকাবাবু কিন্তু খুব একটা উৎসাহিত হলেন না। আড়চোখে ঘড়িতে সময় দেখলেন।

স্নিগ্ধাদি আমার ছোড়দির ছেলেবেলা থেকে বন্ধু। কতদিন এসেছে আমাদের বাড়িতে। ছোড়দি-র বিয়ে হবার ঠিক এক মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল স্নিগ্ধাদির। স্নিগ্ধাদির বিয়েতে আমি ধুতি পরে গিয়েছিলাম। আমার জীবনে সেই প্রথম ধুতি পরা। সিদ্ধার্থদাকেও আমরা আগে থেকে চিনি, ছোড়দিদের কলেজের প্রফেসার ছিলেন, আমাদের পাড়ার ফাংশনে রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতাটা আবৃত্তি করেছিলেন। স্নিগ্ধাদির সঙ্গে সিদ্ধার্থদার বিয়ে হবার পর একটা মুশকিল হলো। স্নিগ্ধাদিকে স্নিগ্ধা বৌদি বলে ডাকতে হয়, কিংবা সিদ্ধার্থদাকে জামাইবাবু। আমি কিন্তু তা পারি না। এখনো সিদ্ধার্থদা-ই বলি! আর, রিণি হচ্ছে স্নিগ্ধাদির বোন, আমারই সমান, ক্লাস এইট-এ পড়ে। পড়াশুনোয় এমনিতে ভালোই, কিন্তু অঙ্কে খুব কাঁচা। কঠিন অ্যালজেব্রা তো পারেই না, জিওমেট্রি এত সোজা—তাও পারে না। তবে, রিণি বেশ ভালো ছবি আঁকে।

স্নিগ্ধাদি কাছে এসে এক মুখ হেসে বললেন, কীরে সন্তু, তোরা কবে এলি আর কে এসেছে? মাসীমা আসেননি? বনানীও আসেনি?

আমি বললাম, ওঁরা কেউ আসেনি। আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এসেছি।

কাকাবাবুর কথা শুনে ওরা তিনজনেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো কাকবাবুকে। চাকরি থেকে রিটায়ার করার আগে কাকাবাবু তো দিল্লিতেই থাকতেন বেশীর ভাগ—তাই স্নিগ্ধাদি দেখেননি আগে।

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুকে বললেন, আমি আপনার নাম অনেক শুনেছি। আপনি তো আরকিওলজিক্যাল সারভে-তে ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন? আমার এক মামার সঙ্গে আপনার—

কাকাবাবুর কথাবার্তা বলার যেন কোনো উৎসাহই নেই। শুকনো গলায় জিগ্যেস করলেন, তুমি কী করো?

সিদ্ধার্থদা বললেন, আমি কলকাতায় একটা কলেজে ইতিহাস পড়াই।

কাকাবাবু সিদ্ধার্থদার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, ইতিহাস পড়াও? তোমার সাবজেক্ট কি ছিল? ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি?

সিদ্ধার্থদা বিনীত ভাবে বললেন, হ্যাঁ। আমি বৌদ্ধ আমল নিয়ে কিছু রিসার্চ করেছি।

কাকাবাবু বললেন, ও, বেশ ভালো। আচ্ছা, তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই লাগলো। এবার আমাদের যেতে হবে। চল্ সন্তু—

সিদ্ধার্থদা বললেন, আপনারা কোনদিকে যাবেন? চলুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

আমি অধীর আগ্রহে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। কাকাবাবু যদি রাজী হয়ে যান, তাহলে কী ভালোই যে হয়! রোজই তো পাথর মাপামাপি করি, আজ একটা দিন যদি সবাই মিলে বেড়ানো যায়! তা ছাড়া, হঠাৎ স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কাকাবাবু একটু ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, নাঃ, তোমরাই ঘুরে-টুরে দ্যাখো। পহলগাম বেশ ভালো জায়গা। আমরা অন্য জায়গায় যাবো, আমাদের কাজ আছে।

সিদ্ধার্থদা বললেন, তা হলে সন্তু থাক আমাদের সঙ্গে!

স্নিগ্ধাদি বললেন, সন্তু, তুই তো এখানে কয়েকদিন ধরে আছিস। তুই তা হলে আমাদের গাইড হয়ে ঘুরে-টুরে দ্যাখা। আমরা তো উঠেছি শ্রীনগরে, এখানে একদিন থাকবো—

আমি উৎসাহের সঙ্গে জিগ্যেস করলাম, স্নিগ্ধাদি, শ্রীনগর কী রকম জায়গা?

স্নিগ্ধাদি বললেন, কী চমৎকার, তোকে কি বলবো! এত ফুল, আর আপেল কি শস্তা? তোরা এখনো যাসনি ওদিকে?

—না!

—এত সুন্দর যে মনে হয় ওখানেই সারা জীবন থেকে যাই।

আমি একটু অহংকারের সঙ্গে বললাম, পহলগামও শ্রীনগরের চেয়ে মোটেই খারাপ নয়। এখানে কাছাকাছি আরও কত ভালো জায়গা আছে!

রিণি বললো, এই সন্তু, তুই একটু রোগা হয়ে গেছিস কেন রে? অসুখ করেছিল?

আমি বললাম, না তো!

—তা হলে তোর মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

—ভ্যাট! মোটেই না!

নদীটার দিকে আঙুল দেখিয়ে রিণি জিগ্যেস করলো, এই নদীটার নাম কি রে?

আমি বললাম, এটার নাম হচ্ছে লীদার নদী। আগেকার দিনে এর সংস্কৃত নাম ছিল লম্বোদরী। লম্বোদরী থেকেই লোকের মুখে মুখে লীদার হয়ে গেছে। আবার অমরনাথের রাস্তায় এই নদী-টাকেই বলে নীল গঙ্গা।

স্নিগ্ধাদি হাসতে হাসতে বললেন, সন্তুটা কী রকম বিজ্ঞের মতন কথা বলছে! ঠিক পাকা গাইডদের মতন...

আমি বললাম, বাঃ, আমরা তো এখানে দু' সপ্তাহ ধরে আছি। সব চিনে গেছি। আমি একা একা তোমাদের সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারি।

কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, সন্তু, তুমি কি তাহলে এদের সঙ্গে থাকবে? তাই থাকো না হয়—

আমি চমকে কাকাবাবুর দিকে তাকালাম। কাকাবাবুর গলার আওয়াজটা যেন একটু অন্য রকম। হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে একটা কান্নাকান্না ভাব এসে গেল। কাকাবাবু নিশ্চয়ই আমার ওপরে অভি-মান করেছেন। তাই আমাকে থাকতে বললেন। আমি তো জানি, খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু একলা একলা কোনো কাজই করতে পার-বেন না। সাহায্যও নেবেন না অন্য কারুর।

আমি বললাম, কাকাবাবু, আমি তোমার সঙ্গেই যাবো।

কাকাবাবু তবু বললেন, না, তুমি থাকো না। আজ একটু বেড়াও ওদের সঙ্গে। আমি একলাই ঘুরে আসি।

আমি জোর দিয়ে বললাম, না, আমি তোমার সঙ্গেই যাবো!

কাকাবাবুর মুখখানা পরিষ্কার হয়ে গেল। বললেন, চলো তাহলে। আর দেরী করা যায় না।

আমি সিদ্ধার্থদাকে বললাম, আপনারা এখানে কয়েকদিন থাকুন না। আমরা তো আজ সন্ধেবেলাতেই ফিরে আসছি—

সিদ্ধার্থদা বললেন, আমরা কাল সকালবেলা অমরনাথের দিকে যাবো—

—সেই অমরনাথ মন্দির পর্যন্ত যাবেন? সে তো অনেকদিন লাগবে!

স্নিগ্ধাদি বললেন, ঐ রাস্তায় যাবো, যতটা যাওয়া যায়—খুব বেশী কষ্ট হলে যাবো না বেশীদূর। ফিরে এসে তোদের সঙ্গে দেখা হবে। তোরা কি এখানেই থাকছিস?

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুকে জিগ্যেস করলেন, আপনারা এখানে কতদিন থাকবেন?

কাকাবাবু বললেন, ঠিক নেই।

বাস এসে গেছে। আমি আর কাকাবাবু বাসে উঠে পড়লাম। চলন্ত বাসের জানলা দিয়ে দেখলাম, সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি আর রিণি হেঁটে যাচ্ছে লীদার নদীর দিকে। রিণি তরতরিয়ে নেমে গিয়ে নদীটার জলে পা ডোবালো।
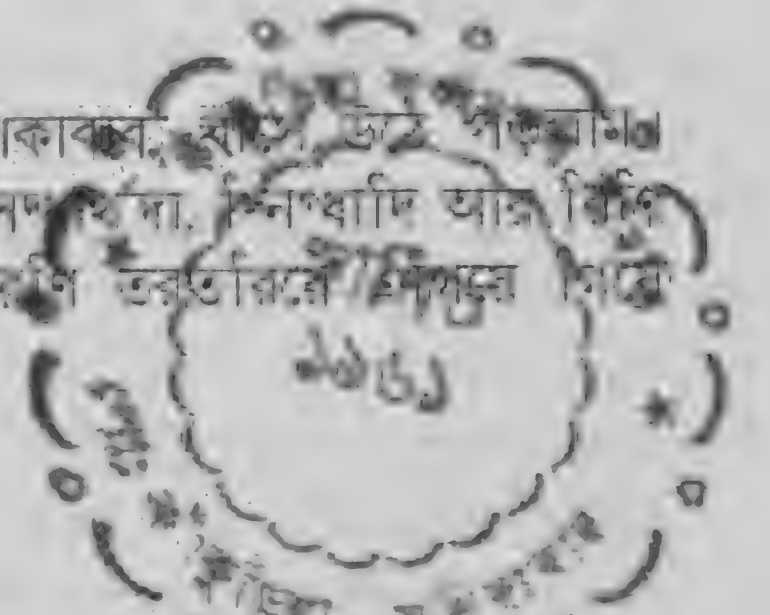
আকাশ পুরানো হয় না

সোনমার্গেও আজ বেশ ভিড়। প্রচুর লোক বেড়াতে এসেছে। বরফের ওপরে স্কেটিং করছে, লাফাচ্ছে, গড়াগড়ি দিচ্ছে অনেকে। বরফের ওপর লাফালাফি করার কী মজা, পড়ে গেলেও একটুও ব্যথা লাগে না, জামা কাপড় ভেজে না। এমনকি শীতও কম লাগে। এখানকার হাওয়াতেই বেশী শীত। একটা মেয়ে-স্কুল থেকে দল বেঁধে বেড়াতে এসেছে, এক রকম পোষাক পরা গোটা চল্লিশেক মেয়ে, কী হুড়োহুড়িই করছে সেখানে। আর দু'জন সাহেব মেম মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলছে অনবরত।

আমরা অবশ্য ওদিকে যাবো না। আমাদের খেলাধুলো করার

সময় নেই। কাকাবাবু কাশ্মীরের ম্যাপ খুলে অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। তারপর দুটো ঘোড়া ভাড়া করে আমাকে বললেন, চলো।

কাশ্মীরে এসে একটা লাভ হয়েছে, আমি বেশ ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারি এখন! প্রথম দু' একদিন অবশ্য ভয় ভয় করতো, গায়ে কী ব্যথা হয়েছিল! এখন সব সেরে গেছে, এখন ঘোড়া গ্যালপ করলেও আমার অসুবিধে হয় না। প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গেই একটা করে পাহারাদার ছেলে থাকে, আমি আমার সঙ্গের ছেলেটাকে ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে যাই।

সেই নির্জন পাহাড়ের ওপর দিয়ে একলা একলা ঘোড়া চালাতে চালাতে নিজেকে মনে হয় ইতিহাসের কোনো রাজপুত্রের মতন। অন্য কারুকে অবশ্য এ কথাটি বলা যায় না, নিজের মনে মনেই ভাবি। যেন আমি কোন এক নিরুদ্দেশের দিকে যাত্রা করেছি।

প্রায় এক ঘন্টা ঘোড়া চালিয়ে আমরা একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছুলাম। এখানে কিছু নেই, সব দিক ফাঁকা, এদিকে ওদিকে থোকা থোকা বরফ ছড়ানো, মানুষজনের চিহ্নমাত্র নেই। তিনদিক ঘিরে আছে বিশাল বিশাল পাহাড়—মেঘ ফুঁড়ে আরও উঁচুতে উঠে গেছে তাদের চূড়া। এক দিকে ঢালু হয়ে বিশাল খাদ, অনেক নিচে দেখা যায় কিছু গাছপালা আর একটা গ্রামের মতন।

এই পাহাড়টাতেও আমরা আগে একবার এসেছি, দিন আষ্টেক আগে। পাহাড়টা বেশী উঁচু নয়, অনেকটা ঢিপির মতন—আরও দুটো পাহাড় পেরিয়ে এটায় আসতে হয়। দু' চারটে বেঁটে বেঁটে পাইন গাছ আছে এ পাহাড়ে—পাইন গাছগুলোর ওপর বরফ পড়ে আছে, ঠিক যেন বরফের ফুল ফুটেছে। এখানে আবার নতুন করে মাপামাপি করার কি আছে কে জানে। সব দিকেই তো শুধু বরফ ছড়ানো। বরফ না খুঁড়লে কী করে বোঝা যাবে নিচে কী আছে? আর এই বরফের নিচে কি গন্ধক পাওয়া সম্ভব? কিংবা সোনা?

কাকাবাবু ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোকে ছুটি দিয়ে দিলেন। বললেন, বিকেলবেলা আসতে। ঘোড়া দুটো বাঁধা রইলো। আমাদের সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ আর ফ্লাস্কে কফি আছে—আমাদের আর খাবার-দাবারের জন্য নিচে নামতে হবে না।

ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে কাকাবাবু তার ওপর বসলেন। তারপর ওভারকোটের পকেট থেকে একটা হলদেটে, পোকায়-খাওয়া পুরোনো

বই বার করে দেখতে শুরু করলেন। আমাকে বললেন, সন্তু, তুমি ততক্ষণ চার পাশটা একটু দেখে নাও—একটু পরে কাজ শুরু করা যাবে।

আমার মন খারাপ ভাবটা তখনো যায়নি। একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে বললাম, কাকাবাবু, এই জায়গাটা তো আগে দেখেছি। আজ আর নতুন করে কী দেখবো?

কাকাবাবু বই থেকে মুখ তুলে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর খুব নরম গলায় বললেন, তোমার বুঝি খুব ইচ্ছে করছিল ঐ সিদ্ধার্থদের সঙ্গে বেড়াতে? তা তো হবেই, ছেলেমানুষ—

আমি থতমত খেয়ে বললাম, না, না, আমি কাজ করতেই চাই। এখন কাজ শুরু হবে না!

কাকাবাবু আমার গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, কোনো কাজ শুরু করার আগে সেই জায়গাটা খুব ভালো করে দেখে নিতে হয়। শোনো, দেখার জিনিসের কোনো শেষ নেই। কোনো জায়গাতে গিয়েই কখনো ভাববে না, দেখার কিছু নেই সেই জায়গায়। খোলা চোখ নিয়ে তাকালেই অনেক কিছু দেখতে পাবে। যেমন ধরো আকাশ। আকাশ কি কখনো পুরোনো হয়? কোনো মানুষ সারাজীবনে এক রকমের আকাশ দু'বার দেখে না। প্রত্যেকদিন আকাশের চেহারা অন্যরকম। এই পাহাড়ও তাই। কখনো রোদ্দুর, কখনো ছায়া—অমনি পাহাড়গুলোর চেহারা বদলে যায় না? একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকো—তাহলেই বুঝতে পারবে।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশটা আজ সত্যিই খুব সুন্দর। হালকা তুলোর মতন মেঘ বেশ জোরে উড়ে যাচ্ছে। সেই মেঘগুলোর চেয়ে আরও উঁচুতে আবার ঘন কালো রঙের মেঘ—অথচ রোদ্দুরও হয়েছে। রিণিদের সঙ্গে যদি দেখা না হতো, বেড়াবার ইচ্ছেটা নতুন করে না জাগতো—তাহলে এই আকাশের দিকে তাকালে ভালোই লাগতো।

কাকাবাবু বইটা পড়তে লাগলেন, আমি পাহাড়ের উল্টোদিকে একটুখানি নেমে গেলাম। এখানে একটা ছোট্ট গুহা আছে। গুহার মুখটা বেশ বড়, কিন্তু বেশী গভীর নয়। আগে বইতে পাহাড়ের গুহার কথা পড়লেই মনে হতো, সেটা হবে অন্ধকার-অন্ধকার, বাদুড়ের গন্ধ আর হিংস্র পশুর বাসা। সেদিক থেকে এই গুহাটা

দেখলে নিরাশই হতে হয়। কাশ্মীরে হিংস্র জীবজন্তু বিশেষ নেই। গুহাটা বেশ ঝকঝকে তকতকে। এক জায়গায় একটা ভাঙা উনুন আর আগুনের পোড়া দাগ। মনে হয় এইখানে এক সময় কেউ ছিল। এতদূরে কেউ তো আর পিকনিক করতে আসবে না। বোধহয় কোনো সন্ন্যাসী এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিল কোনো সময়।

গুহাটার মধ্যে একটু বসেছি অমনি বাইরে ঝুরঝুর করে বরফ পড়তে লাগলো। আমিও ছুটে বাইরে এলাম। বরফ পড়ার সময় ভারী মজা লাগে। ছেঁড়া ছেঁড়া তুলোর মতন হালকা বরফ, গায়ে পড়লেও জামাকাপড় ভেজে না—হাতে জমিয়ে-জমিয়ে শক্ত বলের মতনও বানানো যায়। বরফের মধ্যে খানিকটা দৌড়োদৌড়ি করে আমি শীত কমিয়ে নিলাম। তারপরে হাঁটুগেড়ে বসে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ জমিয়ে মন্দির বানাতে লাগলাম একটা।

কাকাবাবুও নেমে এসেছেন। বললেন, এসো এবার কাজ শুরু করা যাক। খানিকটা কাজ করে তারপরে আমরা খেয়ে নেবো। তোমার খিদে পায়নি তো?

—না, এক্ষুনি কি খিদে পাবে!

—বেশ। ফিতেগুলো বার করো।

ব্যাগ দুটো আমি গুহার মধ্যে রেখেছিলাম। সেগুলো নিতে এলাম, কাকাবাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন। গুহার চার পাশটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে বললেন, এই গুহাটা আমার বেশ পছন্দ। এইটার জন্যই এখানে আসি।

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, কাকাবাবু, আমরা এই গুহাটায় থাকতে পারি না? তাহলে বেশ মজা হবে!

কাকাবাবু বললেন, এখানে কি থাকা যায়? শীতে মরে যাবো। সামনেটা তো খোলা—যখন বরফের ঝড় উঠবে—

—কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো এই রকম গুহাতেই থাকে!

—সন্ন্যাসীরা যা পারে, তা কি আমরা পারি? সন্ন্যাসীরা অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে।

কাকাবাবু ক্রাচ দিয়ে গুহার দেওয়াল ঠুকে ঠুকে দেখতে লাগলেন। চিন্তিতভাবে বললেন, এই গুহার কোনো জায়গা কি ফাঁপা হতে পারে? মনে তো হচ্ছে না।

আমি কিছু বললাম না। পাথর আবার কখনো ফাঁপা হয় নাকি?

কাকাবাবু আরও কিছুক্ষণ গুহাটা পরীক্ষা করলেন। মেঝেতে শুয়ে পড়ে ঠুকে ঠুকে দেখলেন। তারপর নিরাশ ভাবে বললেন, না, এখানে কিছু আশা নেই।

কাকাবাবু গুহাটার মধ্যে কি যে পাবার আশা করেছিলেন, তা-ও বুঝতে পারলাম না আমি।

আর সময় নষ্ট না করে আমরা মাপার কাজ শুরু করলাম। এই মাপার কাজটা ঠিক যে পর পর হয় তা নয়। কাকাবাবু ফিতের একটা দিক ধরে থাকেন, আর একটা দিক ধরে আমি নেমে যাই, যতক্ষণ না ফিতেটা শেষ হয়। সেখানে আমি পা দিয়ে একটা দাগ কাটি। কাকাবাবু সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, এবার ডান দিকে যাও! ডানদিকটা হয়ে গেলে কাকাবাবু হয়তো বলেন, এবার বাঁ দিকে যাও অর্থাৎ, কাকাবাবু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি চারদিকে ঘুরতে থাকি। তারপর কাকাবাবু আবার খানিকটা এগিয়ে যান, আমি আবার মাপতে শুরু করি!

সত্যি কথা বলতে কি, এরকমভাবে মাপায় যে কোনো রকম কাজ হতে পারে তা আমার বিশ্বাস হয় না। অবশ্য আমি কতটুকুই বা বুঝি! আমি ক্লান্ত হয়ে যাই, কাকাবাবু কিন্তু ক্লান্ত হন না। দিনের পর দিন এইভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতায় ফেরার পর স্কুলের বন্ধুরা নিশ্চয়ই জিগ্যেস করবে এতদিন কাশ্মীরে থেকে কি করলি? আমি যদি বলি, আমি শুধু কাকাবাবুর সঙ্গে পাথর মেপে এলাম—তা হলে কেউ কি সে কথা বিশ্বাস করবে? কিংবা হয়তো হাসবে!

ঘণ্টা দু-এক বাদে আমরা একটু বিশ্রাম নেবার জন্য থামলাম। পাহাড়টার চূড়া থেকে আমরা অনেকটা নিচে চলে এসেছি। পাহাড়ের নিচের গ্রামটা এখন অনেকটা স্পষ্ট দেখা যায়। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, রুপোর তারের মতন একটা নদী।

কাকাবাবু বললেন, ডানদিকে দ্যাখো। উপত্যকা দেখতে পাচ্ছো?

ডানদিকে আর একটা খাড়া পাহাড়, তার নিচে ছোট্ট উপত্যকা। সেই উপত্যকায় অনেকটা বেশ পরিষ্কার জমি। ঠিক যেন একটা ফুটবল খেলার মাঠ। সেখানে কয়েকটা কী যেন জন্তু নড়াচড়া করছে। এত দূরে যে ভালো করে দেখা যায় না।

কাকাবাবু বললেন, ওগুলো কী জন্তু বুঝতে পারছো?

না, ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কুকুর। নাকি হরিণ

ওগুলো? কাকাবাবুর কাছে সব সময় ছোট একটা দূরবীন থাকে। সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, ভালো করে দ্যাখো।

দূরবীন চোখে দিয়েই দেখতে পেলাম, কুকুর কিংবা হরিণ না, কতগুলো ঘোড়া সেই উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশেপাশে একটাও মানুষজন নেই।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, কাকাবাবু, ওগুলো কি বুনো ঘোড়া? ওদের কখনো কেউ ধরেনি?

কাকাবাবু বললেন, না। ঠিক তার উল্টো।

আমি অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকালুম। ঘোড়ার উল্টো মানে কি? মেয়ে-ঘোড়া? মেয়ে ঘোড়াকে কি ঘুড়ী বলে? ঠিক জানি না। ইংরেজিতে বলে মেয়ার?

—কাকাবাবু, ওগুলো কি তবে মেয়ার?

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, না, তা বলিনি। ওগুলো বুনো ঘোড়া নয়, ওগুলো বুড়ো ঘোড়া। চলতি বাংলায় যাকে বলে বেতো ঘোড়া।

—ওগুলো সব বুড়ো ঘোড়া? এক সঙ্গে এত বুড়ো ঘোড়া কোথা থেকে এলো? তুমি কী করে জানলে?

—আমি আগেও দেখেছি। এই ব্যাপারটা শুধু কাশ্মীরেই দেখা যায়। এইগুলো হচ্ছে ঘোড়াদের কবরখানা। এই সব পাহাড়ী জায়গাতে তো বুড়ো ঘোড়া কোনো কাজে লাগে না, তাই ঘোড়াগুলো খুব বুড়ো হয়ে গেলে এই রকম উপত্যকায় ছেড়ে দেয়। ওখান থেকে উঠে আসতে পারবে না। ওখানেই আস্তে আস্তে মরে যায় একদিন!

—ইস, কী নিষ্ঠুর! কেন, বাড়িতে রেখে দিতে পারে না?

—নিষ্ঠুর নয়! বাড়িতে রেখে দিলে তো খেতে দিতেও হয়। এরা গরিব মানুষ, কাজ না করিয়ে কি শুধু শুধু বসিয়ে কারুকে খাওয়াতে পারে? তাই চোখের আড়ালে যাতে মরে যায়, তাই ছেড়ে দিয়ে আসে। নিজের হাতে মারতে হলো না। বুড়ো ঘোড়ার কোনো দাম নেই, কেউ কিনবেও না। এদেশে তো কেউ ঘোড়ার মাংস খায় না—তাহলে বাজারে বিক্রি হতে পারতো। ফ্রান্সে ঘোড়ার মাংস খায়—

ঘোড়াগুলো ওখানে থেকে মরার জন্য প্রতীক্ষা করছে—একথা ভেবেই আমার খুব কষ্ট হতে লাগলো। যতদিন ওরা মনিবের হয়ে খেটেছে ততদিন ওদের যত্ন ছিল। মানুষ বড় স্বার্থপর! মানুষও

তো খুব বুড়ো হয়ে গেলে আর কাজ করতে পারে না। তখন কি তাদের কেউ ওরকম ভাবে ছেড়ে দিয়ে আসে?

আমি দূরবীনটা নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলাম। এবার দেখতে পেলাম, ঐ উপত্যকার এখানে-সেখানে অনেক হাড় ছড়িয়ে আছে। আগে যারা মরেছে। যে-ঘোড়াগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেগুলোও খুব রোগা রোগা। খাবার কিছুই নেই বোধহয়। ঘোড়ারা কি আসন্ন মৃত্যুর কথা বুঝতে পারে?

কাকাবাবু বললেন, নাও, আবার কাজ শুরু করা যাক্।

আমি ফিতের বাক্স নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালাম।

এর পরেই একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেল। কাকাবাবু তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠার চেষ্টা করতেই বরফে ক্রাচ পিছলে গেল। কাকাবাবু মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন।

কাকাবাবুকে ধরার জন্য আমি হাতের জিনিস ফেলে ছুটতে যাচ্ছিলাম; কাকাবাবু সেই অবস্থায় থেকেই আমাকে চেঁচিয়ে বললেন, এই সন্তু দৌড়োবি না! পাহাড়ের ঢালু দিকে দৌড়োতে নেই। আমি নিজেই উঠছি!

আমি থমকে দাঁড়ালাম। কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে। ক্রাচটা নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিতে যেতেই আবার পড়ে গেলেন। এবার পড়েই গড়াতে লাগলেন নিচের দিকে।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। এবার আমি দৌড়োতেও সাহস পেলাম না। নিচের দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। কাকাবাবু গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে যাচ্ছেন—সেই ঘোড়াদের কবরখানার দিকে। কাকাবাবু দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে কিছু একটা চেপে ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ধরার কিছু নেই, একটা গাছ বা লতাপাতাও নেই। আমার বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করতে লাগলো। কী হবে? এখন কী হবে? আমি একবার পাঁচ ছ'টা সিঁড়ি গড়িয়ে পড়েছিলাম মামার বাড়িতে...। কিন্তু এ তো হাজার হাজার সিঁড়ির চেয়েও নিচু...

খানিকটা দূরে গিয়ে কাকাবাবু থেমে গেলেন। সেখানেও গাছপালা কিছু নেই, কী ধরে কাকাবাবু থামলেন জানি না। থেমে গিয়ে কাকাবাবু নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলেন। এবার আর কিছু না ভেবে আমি দৌড় লাগালাম কাকাবাবুর দিকে। সব সময় তো আর সাবধান হওয়ার কথা মনে থাকে না! দৌড়েই বুঝতে পারলাম, কী

দারুণ ভুল করেছি! পাহাড়ের ঢালু দিকে দৌড়োতে গিয়ে আমি আর থামতে পারছি না। আমার গতি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে!

কাকাবাবুর কাছাকাছি গিয়ে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। ওঁর হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কাকাবাবু!

কাকাবাবু মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, বললাম না, পাহাড়ের নিচের দিকে দৌড়োতে নেই! আর কক্ষনো এ রকম করবে না!

সেকথা অগ্রাহ্য করে আমি বললাম, কাকাবাবু, তোমার লাগেনি তো?

—তোমার লেগেছে কি না বলো!

—না, আমার কিছু হয়নি। তুমি...তুমি এতটা গড়িয়ে পড়লে...

—ও কিছু না। ওতে কিছু হয় না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুকে টেনে তুলতে গেলাম। কাকাবাবু আমার হাত ছাড়িয়ে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। কাকাবাবুর একটা পা ভাঙা, কিন্তু মনের জোর অসাধারণ। এমন ভাব করলেন, যেন কিছুই হয়নি।

কিন্তু চোখে হাত দিয়েই কাকাবাবু বললেন, এই যা! আমার চশমা?

চশমা ছাড়া কাকাবাবু চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পান না। খুব কাছ থেকেও মানুষ চিনতে পারেন না। গড়িয়ে পড়ার সময় কাকাবাবুর চশমাটা কোথায় হারিয়ে গেছে। কাছাকাছি কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।

হারিয়ে গেলে যদি অসুবিধের পড়তে হয়, সেই জন্য কাকাবাবুর এক জোড়া চশমা থাকে। আর একটা আছে তাঁবুকে। আমি বললাম, যাক গে, কাকাবাবু, তোমার তো আর একটা চশমা আছে!

কাকাবাবু বললেন, কিন্তু এখন আমি এতটা রাস্তা ফিরবো কি করে? তা ছাড়া সেটাও যদি কোনোরকমে হারিয়ে যায়, তা হলে তো সব কাজই বন্ধ হয়ে যাবে! তুমি দাঁড়াও আমি চশমাটা খুঁজে দেখি!

সেই ঢালু পাহাড়ে এক পা উঠতে বা নামতেই ভয় করে—সেখানে চশমা খোঁজা যে কি শক্ত ব্যাপার, তা বলে বোঝানো যাবে না। কাকাবাবু আর আমি দু'জনে দু'জনকে ধরে রইলাম, তারপর খুঁজতে লাগলাম চশমা। প্রায় পনেরো মিনিট বাদে দেখা গেল, বরফের মধ্যে সেটা গেঁথে আছে, একটা ডাঁটি ভাঙা—আর কোনো ক্ষতি হয়নি।

হঠাৎ আমার কান্না পেয়ে গেল। কাকাবাবু যদি তখন সত্যি সত্যি পড়ে যেতেন, আমি একলা এখানে কী করতাম? কাকাবাবুকে ফেলে আমি ফিরেও যেতে পারতাম না, কিংবা একলা একলা...

আমি আবার বসে পড়ে বললাম, কাকাবাবু, আমার এই কাজ ভালো লাগে না!

কাকাবাবু বললেন, ভালো লাগে না? বাড়ির জন্য মন কেমন করছে?

আমি উত্তর না দিয়ে মুখ গোঁজ করে বসে রইলাম। সত্যি আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু কাকাবাবুকে আমি তা দেখতে দিইনি।

কাকাবাবু বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তুমি না হয় সিদ্ধার্থদের সঙ্গেই চলে যাও!

—আর তুমি কী করবে? তুমি এখানে একলা একলা থাকবে?

—হ্যাঁ। আমি থাকবো। আমি যে কাজটা আরম্ভ করেছি, সেটা শেষ না করে যাবো না।

সিদ্ধার্থদাদের সঙ্গে যাবার কথা শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু কাকাবাবুকে একলা ফেলে যেতেও ইচ্ছে করে না। কাকাবাবু একলা একলা পাহাড়ে ঘুরবেন—কাকাবাবু কি ভাবছেন, আমি নিজের কষ্টের কথা ভেবে চলে যেতে চাইছি? মোটেই তা নয়! কাকাবাবুর জন্যই তো আমার চিন্তা হচ্ছে।

আমি বললাম, কাকাবাবু, আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো, তোমার সঙ্গে ফিরবো। কিন্তু ফিতে মাপার কাজ আমার ভালো লাগে না।

—ঠিক আছে, কাল থেকে অন্য একটা কমবয়সী ছেলেকে ঠিক করবো—সে ফিতে ধরবে, আর তুমি আমার পাশে থাকবে।

—কিন্তু কাকাবাবু, আমরা কী খুঁজছি? কী হবে এই রকম ফিতে মেপে?

কাকাবাবু একটুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, সন্তু, তুমি তো এখনও ছেলেমানুষ, এখন সব বুঝবে না। বড় হলে বুঝবে, আমরা যা খুঁজছি, যদি পাই, সেটা কত বড় আবিষ্কার!

—তাহলে আরও লোকজন নিয়ে এসে ভালো করে খুঁজলে হয় না?

—আমি বিশেষ কারুকে বলতে চাই না। কারণ যা খুঁজছি, তা যদি শেষ পর্যন্ত না পাই, লোকে শুনে হাসাহাসি করবে। পাবোই

যে তারও কোনো মানে নেই। সুতরাং চুপচাপ খোঁজাই ভালো, যদি হঠাৎ পেয়ে যাই, তখন সবাই অবাক হবে। তখন তোমাকেই সবাই বলবে বাহাদুর ছেলে!

—কাকাবাবু, আমরা আসলে কী খুঁজছি? সোনা?

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, কী বললে, সোনা? না, না, সোনা-টোনা কিছু নয়। পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে কেউ সোনা পায় নাকি? যত সব বাজে কথা!

—তাহলে?

—আমরা খুঁজছি একটা চৌকো পাতকুয়ো। চৌবাচ্চাও বলতে পারো। কিন্তু সাধারণ চৌবাচ্চার থেকে অনেক গভীর। চলো, আজকের মতন ফেরা যাক।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাস্তায়

সেদিন সন্ধেবেলা পহলগ্রামে আমাদের তাঁবুতে ফিরে এসে টের পেলাম, আমার বাঁ পায়ে বেশ ব্যথা হয়েছে। কখন একটু মচকে গেছে টের পাইনি। আয়োডেক্স মালিশ করলাম বেশ করে। কাকাবাবু যদিও বললেন, তাঁর কিছু হয়নি, তবুও আমি ওঁর দু' পায়ে মলম মালিশ করে দিলাম।

বলতে ভুলে গেছি, এখানে সন্ধে হয় নটার সময়। সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিকেলের আলো থাকে। প্রথম প্রথম ভারী অদ্ভুত লাগতো। আমাদের রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেও বাইরে তখন বিকেল। সূর্য অস্ত যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো। আমাদের দেশেই কত জায়গায় কত যে আশ্চর্য সব ব্যাপার আছে। বই পড়ে এই পৃথিবীটাকে কিছুই চেনা যায় না।

সিদ্ধার্থদারা বলেছিলেন, ওঁরা আজকের রাতটা প্লাজা হোটেলে থাকবেন। ভেবেছিলাম ফিরে এসে ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আসবো। কিন্তু পায়ের ব্যথার জন্য যাওয়া হলো না। হোটেলটা বেশ খানিকটা দূরে। বিছানায় শুয়ে লীদার নদীর শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা উঠে কাকাবাবুকে কিছু না বলেই আমি বেরিয়ে পড়লাম একলা-একলা। আজ কাকাবাবুর থেকেও আমি আগে উঠেছি। লীদার নদী পহলগ্রামে যেখানটায় ঢুকেছে, সেখানে একটা

ছোট্ট কাঠের ব্রিজ। আমি ব্রিজটার ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সিদ্ধার্থদারা অমরনাথে যাবেন, এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে।

একটু পরেই দেখা গেল ওঁদের। সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক আছেন আর দুজন গাইড। সবাই ঘোড়ার পিঠে। স্নিগ্ধাদি আর রিণিকে তো চেনাই যায় না। ব্রীচেস, ওভারকোট, মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা, চোখে কালো চশমা। সিদ্ধার্থদাকেও বেশ মানিয়েছে, তবে সিদ্ধার্থদার ঘোড়াটা ওঁর তুলনায় বেশ ছোট।

স্নিগ্ধাদি আমাকে দেখেই বললেন, ওমা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? আমরা ভাবলুম বুঝি তোর সঙ্গে আর দেখাই হলো না। কাল সারাদিন কোথায় ছিলি?

—সোনমার্গে ছিলাম।

—ওখানে কী করলি? ওখানে তো দেখার কিছু নেই।

আমি চট্ করে একটু আকাশের দিকে তাকালাম। সত্যিই, আকাশটা রোজই নতুন হয়ে যায়।

সিদ্ধার্থদা বললেন, সন্তু, তুমিও আমাদের সঙ্গে গেলে পারতে!

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আমাদের এখানে অনেক কাজ আছে।

সিদ্ধার্থদা হাসতে হাসতে জিগ্যেস করলেন, ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে এসে আবার কাজ কী? এখানেও স্কুলের হোম-টাস্ক করছো নাকি?

উত্তর দিলাম না। ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলাম খানিকটা। রিণিকে বললাম, শোন, মুখে অনেকটা করে ক্রিম মেখে নে। না হলে কিন্তু ভীষণ চামড়া ফাটে!

রিণি খিলখিল করে হেসে বললো, দিদি, দেখছো, সন্তু কী রকম বড়দের মতন কথা বলতে শিখেছে!

—আহা, আমি তোদের থেকে বেশীদিন আছি না! আমি তো এসব জানবোই!

—তুই সত্যি আমাদের সঙ্গে গেলে পারতিস। তুই বেশ গাইড হতিস আমাদের! জানিস, আমি অনেকগুলো ছবি এঁকেছি। তোকে দেখানো হলো না।

আমার তো ইচ্ছে হচ্ছিল তক্ষুনি ওদের সঙ্গে চলে যাই। যে-পোশাক পরে আছি সেইভাবেই। কিন্তু তা হয় না। আমি একটু অবজ্ঞার সঙ্গে বললাম, অমরনাথে এমন কিছু দেখবার নেই। ওসব

মন্দির-টন্দির দেখতে আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া আমি তো চন্দনবাড়ি আর কোহলাই পর্যন্ত গিয়েছি একবার!

স্নিগ্ধাদি বললেন, হ্যাঁরে, আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত থাকবি তো? আমাদের তো যাওয়া-আসা নিয়ে বড়জোর সাতদিন! কিংবা রাস্তা খারাপ থাকলে তার আগেও ফিরে আসতে পারি!

আমি জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, থাকবো। থাকবো।

রিণি ঘোড়ার ওপর একটু ভীতু ভীতু ভাবে বসে ছিল। আমি ওকে বললাম, এই, ঠিক করে শক্ত হয়ে বোস্! প্রথম দিন একটু গায়ে ব্যথা হবে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে!

রিণি বললো, যা, যা, তোকে আর শেখাতে হবে না! এলি না তো আমাদের সঙ্গে।

আমি বললাম, তোরা অমরনাথ থেকে ফিরে আয়—তখন অন্য কোথাও আমরা সবাই মিলে এক সঙ্গে বেড়াতে যাবো।

তারপর ওরা এগিয়ে গেল, আমি দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দিকে হাত নাড়তে লাগলাম।

ক্যাম্পে ফিরেই আবার সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল। কাকাবাবু ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। আমি বাইরে বেরিয়েছিলুম বলে কিছু জিগ্যেস করলেন না। একমনে ম্যাপ দেখছিলেন। এক সময় মুখ তুলে বললেন, সন্তু, আমি ঠিক করলাম, পহলগামে আমাদের আর থাকা হবে না। এখান থেকে যাতায়াত করতে অনেক সময় যায়। সোনমার্গ থেকে কাল পাহাড়ের নিচে যে ছোট্ট গ্রামটা দেখলাম, ওখানে গিয়েই দিন দশেক থাকা যাক্!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। পহলগাম থেকেও চলে যেতে হবে? সিদ্ধার্থদা, রিণি, স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে আর দেখা হবে না?

আমি মুখ শুকনো করে জিগ্যেস করলাম, ঐ গ্রামে থাকবো? ওখানে থাকার জায়গা আছে?

কাকাবাবু আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই বললেন, সে ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কালকে ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোর সঙ্গে কথা বলেছি। ওরাও ঐ গ্রামে থাকে। এটাই বেশ ভালো হবে। চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা হবে না—নিরিবিলিতে কাজ করা যাবে।

চেনাশুনো লোকের সঙ্গে দেখা হলে সবাই খুশী হয়। কাকাবাবুর সব কিছুই অন্যরকম। ঐ ছোট্ট গ্রামে থাকতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না। তবু পহলগামে কত লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়।

এখন এ জায়গা ছেড়ে আবার কোন্ ধান্দাড়া গোবিন্দপুরে যেতে হবে! কিন্তু কাকাবাবু একবার যখন ঠিক করেছেন, তখন যাবেনই!

কাকাবাবু বললেন, জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নাও। বেশী দেরি করে আর লাভ কী?

বাস-স্টপের কাছে আজও সুচা সিং-এর সঙ্গে দেখা হলো। বিশাল একখানা হাত আমার কাঁধের ওপর রেখে বললেন, কী খোকাবাবু, কাল সোনমার্গ কী রকম বেড়ানো হলো?

তারপর হা-হা করে হেসে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কী প্রোফেসারসাব, কাল যে বললেন সোনমার্গ যাবেন না? আমি তো কাল দেখলাম, আপনারা সোনমার্গ থেকে ফিরছেন বিকেলে!

কাকাবাবু নীরসভাবে বললেন, আমরা কবে কোথায় যাই কোনো ঠিক তো নেই।

—তা এই গরিব মানুষের গাড়িতে যেতে আপনার এত আপত্তি কেন? আমি তো ঐদিকেই যাই!

—তোমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে চাই না।

—এতে তকলিফ কী আছে? আপনি এত বড় পড়ালিখা জানা আদমি, আপনার যদি একটু সেবা করতে পারি—আপনি আজ কোন-দিকে যাবেন?

—আজও সোনমার্গই যাবো!

সুচা সিং একটু অবাক হয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, আবার সোনমার্গ? ওখানে কিছু পেলেন? জায়গাটা তো একদম ন্যাড়া। কিছু নেই!

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, সিংজী, তুমি মিথ্যেই ভাবনা করছো! আমি সোনা খুঁজছি না। সে সাধ্যও আমার নেই!

সুচা সিং গলার আওয়াজ নিচু করে বললেন, আপনি মার্টন-এর পুরোনো মন্দিরে গেছেন? সবাই যে সূর্য দেবতার মন্দিরে যায় সেখানে নয়—পাহাড়ের ওপরে যে পুরোনো মন্দির? লোকে বলে ঐ মন্দির ললিতাদিত্যের আমলের চেয়েও পুরোনো। সিকন্দর বুত শিকন ঐ মন্দির ভেঙে দেয়। কেন অত কষ্ট করে ঐ বিরাট মন্দির ভেঙে দিল জানেন? ঐ মন্দিরের কোনো যায়গায় মণ মণ সোনা পোঁতা আছে। সিকন্দর বুত শিকন তা খুঁজে পায়নি। সেই সোনা এখনও আছে।

কাকাবাবু বললেন, তাহলে সে কথা আমাকে বলে দিচ্ছো কেন?

সোনার কথা কি সবাইকে বলতে আছে ? নিজেই খুঁজে দেখো না !

সুচা সিং কাকাবাবুকে একটু তোষামোদ করার সুর করে বললেন, আপনারা পন্ডিত লোক, আপনারা জানেন রাজারা কোথায় কোন্ জায়গায় গুপ্ত সম্পদ লুকিয়ে রাখতেন। সাধারণ লোকেরা কি ওসব জানতে পারে ?

—তাই যদি হতো সিংজী, তাহলে পন্ডিতরা এত গরিব হয় কেন ? পন্ডিতরা সোনার খবর কিছুই বোঝে না ! আচ্ছা চলি !

সুচা সিং বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ! কমসে কম এক পেয়ালা চা তো খান আমার সঙ্গে ?

কাকাবাবু বললেন, আমি সকালে দু'কাপের বেশী চা খাই না। সেই দু' কাপ আজ খাওয়া হয়ে গেছে।

—তা হলে খোকাবাবুকে কিছু খাইয়ে দিই ! খোকাবাবু জিলাবি খেতে খুব ভালোবাসে !

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি কিছু খাবো না। আমার পেট ভর্তি !

তবু সুচা সিং আজ আর কিছুতেই ছাড়লেন না। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে এড়ানো গেল না। আজ জোর করে আমাদের তুললেন নিজের গাড়িতে। একটা বেশ মজবুত জিপ গাড়ি, সুচা সিং সেই গাড়িতেই ওদিকেই কোথায় যেন যাচ্ছেন কোনো একজন সরকারী হোমরা-চোমরার সঙ্গে দেখা করতে।

যাওয়ার পথে সুচা সিং অনেক গল্প করতে লাগলেন। আমি অবশ্য সব বুঝতে পারলাম না। আমি তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে। কী সুন্দর ছবির মতন রাস্তা। পাহাড় চিরে এঁকেবেঁকে উঠেছে। দু' পাশে পাইন আর পপলারের বন। মাঝে মাঝে চেনার গাছও দেখা যায়। চেনার গাছগুলো কী বড় বড় হয়, অনেকটা আমাদের দেবদারু গাছের মতন—যদিও পাতাগুলো অন্যরকম। হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে যায় আখরোট, খোবানি আর নাশপাতির গাছ। এগুলো অবশ্য আমার চোখে এখন নতুন লাগে না। আমি গাছ থেকে বুনো আপেল আর আঙুরও ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছি। কলকাতায় বসে এ কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় ? কত যে গোলাপফুল রাস্তায় ঘাটে ফুটে আছে !

কাকাবাবু জিগ্যেস করলেন, সিংজী, তুমি এই কাশ্মীরে কতদিন আছো ?

সুচা সিং বললেন যে কাশ্মীরে যখন যুদ্ধ হয় সাতচল্লিশ সালে, তখন তিনি এখানে এসেছিলেন লড়াই করতে। তখন সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধে তাঁর একটা আঙুল কাটা যায়।

সুচা সিং তাঁর বাঁ হাতটা দেখালেন, সত্যিই তাঁর কড়ে আঙুলটা নেই।

সুচা সিং হাসতে হাসতে বললেন, আমি সবাইকে কী বলি জানেন ? এই কড়ে আঙুলের ধাক্কা দিয়েই আমি হানাদারদের তাড়িয়ে দিয়েছি।

—তারপর, তুমি এখানেই থেকে গেলে ?

—না। যুদ্ধ থামলে ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাশ্মীর আমার এমন পসন্দ হয়ে গেল, সেনাবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি এখানেই চলে এলাম ব্যবসা করতে। এখন আমি এখানকারই লোক। কাশ্মীরী মেয়েকেই শাদী করেছি। দু শো টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম, এখন দেখুন না, আমার নয়খানা গাড়ি খাটছে ! কাশ্মীরের মাটিতে সোনা আছে, বুঝলেন ! নইলে ইতিহাসে দেখুন না, সবারই লোভ ছিল কাশ্মীরের দিকে !

কাকাবাবু তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, তুমি লেগে থাকো। তুমি হয়তো একদিন এই সোনার খোঁজ পেয়েও যেতে পারো সিংজী।

সোনমার্গ পৌঁছে সুচা সিং তাঁর চেনা একজন লোককে ডেকে বললেন, এই প্রোফেসার খুব বড়া আদমি। সব সময় এর দেখাশোনা করবে !

তারপর সুচা সিং চলে গেলেন। কাকাবাবু অবশ্য সুচা সিং-এর চেনা লোকটিকে পাত্তাই দিলেন না। তার হাত এড়িয়ে সোজা চলে এলেন ঘোড়াওয়ালাদের জটলার দিকে। গত কালের সেই দুটো ছেলে-কেই ঠিক করলেন আজ। কোনো রকম দরাদরি না করেই ঘোড়ায় চড়ে বসে বললেন, চলো !

একটু দূরে গিয়েই কাকাবাবু থামলেন। ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটিকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, এই তোমাদের নাম কী ?

নাম জিগ্যেস করতেই ওদের কী লজ্জা। মেয়েদের মতন ওদের ফর্সা গাল লাল হয়ে গেল। কিছুতেই বলতে চায় না। কেউ বুঝি কখনো ওদের নাম জিগ্যেস করেনি। একজনে আর একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছে। তাই দেখে আমি আর কাকাবাবুও হাসতে লাগলাম। অনেক কষ্টে জানা গেল, একজনের নাম আবুতালেব। আর একজনের নাম তো বোঝাই যায় না। শুনে

ঘোড়াওয়ালা ছেলেদুটিকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, এই তোমাদের নাম কী?

মনে হলো, ওর নাম হুন্দা। কী? আর কিছু নেই? শুধু হুন্দা? তা সে জানে না। নামটা যেন খুবই একটা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার।

কাকাবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, এরা হচ্ছে খশ্ জাতি। এদিককার পাহাড়ে এদের দেখা যায়।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এখানে না এলে কি জানতে পারতাম, খশ্ জাতি নামেও একটা জাতি আছে আমাদের দেশে! যে-জাতের একটা ছেলে নিজের নামটাও ভালো করে জানে না। হুন্দার মতন একটা বিদঘুটে নাম কে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, তাই নিয়েই ও খুব খুশী। অথচ কী সুন্দর দেখতে ছেলেটাকে। আর বেশ চটপটে, বুদ্ধিমান।

কাকাবাবু জিগ্যেস করলেন, তোমাদের গ্রামে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে? আমাদের থাকতে দেবে?

ছেলে দুটি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এ রকম প্রশ্ন ওরা কখনো শোনেনি। ওদের গ্রামে বোধহয় কোনো বাইরের লোক থাকেনি কখনো।

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে বললেন, যদি থাকতে দাও তাহলে রোজ দশ টাকা করে ভাড়া দেবো। তাছাড়া খাবার খরচ আলাদ। যে-কোনো রকমের একটা ঘর হলেই আমাদের চলবে।

টাকাটা দেখেই ওদের মুখে হাসি ফুটলো। পরস্পর কী যেন আলোচনা করে নিয়েই ওরা রাজী হয়ে গেল। তা বলে, ওদের কিন্তু লোভী মনে করা উচিত নয়। ওরা বড্ড গরিব তো, টাকার খুব দরকার ওদের।

গলাঙ্গীর নামে একটা জায়গা আছে, সেইদিকে ওদের গ্রাম। আমরা উঠতে লাগলাম পাহাড়ী পথে। পাশ দিয়ে রুপোর পাতের মতন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। কাকাবাবু বললেন, ওর নাম কঙ্গনা নদী। সন্তু ঐ যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছো, ঐ রাস্তাটা চলে গেছে লদ্দাকে। এমনিতে লোক যাকে বলে লাডাক। এই রাস্তাটা খুব ভয়ংকর। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই!

আস্তে আস্তে ঘোড়া চলছে, আমি চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। কী সুন্দর জায়গাটা! এখানে এলে মরার কথা মনেই হয় না। পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি। দূরে একটা পাহাড়ের মাথা সব

পাহাড়কে ছাড়িয়ে জেগে রয়েছে। সেটা দেখতে ঠিক মন্দিরের মতন।

—কাকাবাবু, মন্দিরের মতন ঐ পাহাড়টার নাম কী?

—ঠিকই বলেছিস, মন্দিরের মতন! সাহেবরাও ঐ পাহাড়ের নাম দিয়েছে ক্যাথিড্রাল পীক। সব পাহাড় ছাড়িয়ে উঠেছে ওর মাথা। দেখলেই মনে হয় না, এক সময় দেবতারা থাকতো এখানে? ঐ যে রাস্তাটার কথা বললাম, ওটাকে ওয়াংগাথ নালাও বলে। ঐ রাস্তা শুধু লাদাকে নয়, ওটা দিয়ে সমরখন্দ, পামীর, বোখারা, তাসখন্দ যাওয়া যায়। হাজার হাজার বছর আগে থেকেও মানুষ ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছে। ঐ রাস্তাটার জন্যই আমার এখানে আসা।

আমি জিগ্যেস করলাম, কাকাবাবু, এই রাস্তা দিয়েই কি আর্যরা ভারতে এসেছিল?

কাকাবাবু বললেন, তা ঠিক বলা যায় না। আর্যদের বোধহয় রাস্তা কিছু কিছু বানিয়ে নিতে হয়েছিল। ইন্দ্র কাশ্মীরে পাহাড় কাটিয়ে বন্ধ জলাশয়ের মুক্তি দিয়েছিলেন—এ রকম একটা কাহিনীও আছে।

যেতে যেতে একটা মিলিটারি ক্যাম্প পড়লো। বন্দুকধারী মিলিটারি এসে আমাদের আটকালো। কাকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে তার সঙ্গে কী যেন কথা বললেন। দেখালেন কাগজপত্র। যে কোনো জায়গায় ঘোরাফেরা করার অনুমতিপত্র কাকাবাবুর আছে। কাকাবাবুর কাছে একটা রিভলবার থাকে। সেটা আর তার লাইসেন্সও দেখালেন বার করে।

মিলিটারির লোকেরা আমাদের চা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। প্রায় জোর করে নিয়ে গেল ওদের তাঁবুতে। আমাদের দেখে ওরা হঠাৎ যেন খুব খুশী হয়ে উঠেছে। কাকাবাবু বললেন, ওরা তো কথা বলার লোক পায় না। মাসের পর মাস এখানে এমনি পড়ে আছে, আমাদের দেশকে পাহারা দিচ্ছে। তাই কথা বলার লোক পেলে ওদের ভালো লাগে।

সেখানে দুধে সেদ্ধ করা চা আর হালুয়া খেলাম। গল্প করলাম কিছুক্ষণ। আমাকে একজন মিলিটারি বললো, খোকাবাবু, হরিণের শিং নেবে? এই নাও!

বেশ একটা হরিণের শিং উপহার পেয়ে গেলাম। মিলিটারি দুজনেই পাঞ্জাবী শিখ। ভারী ভালো লোক। ঠিক আত্মীয়-স্বজনের মতন ব্যবহার করছিল আমাদের সঙ্গে। আমরা একটা পাহাড়ী গ্রামে

থাকবো শুনে ওরা তো অবাক। কত রকম অসুবিধের কথা বললো। কাকাবাবু সে সব হেসে উড়িয়ে দিলেন। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার উঠতে লাগলাম পাহাড়ী রাস্তায়। কাকাবাবু বললেন, আমরা সাড়ে সাত হাজার ফিটেরও বেশী উঁচুতে এসেছি।

আবু তালেব আর হুন্দাদের গ্রাম পাশাপাশি। কোন গ্রামে থাকবো, তাই নিয়ে ওরা দুজনে আমাদের টানাটানি করতে আরম্ভ করলো। কেউ ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত সব দেখেশুনে কাকাবাবু ঠিক করলেন, আবু তালেবদের গ্রামটাতেই থাকবেন। তবে হুন্দা আমাদের জন্য রান্নাটান্না ও অন্যান্য ব্যাপার দেখাশুনোর কাজ নেবে—এ জন্য সে-ও রোজ দশ টাকা করে পাবে।

ওদের গ্রামে পৌঁছুনো-মাত্র গ্রামের সব লোক ভিড় করে এসে আমাদের ঘিরে ধরলো। সবারই চোখে মুখে দারুণ কৌতূহল। ওদের গ্রামের বাচ্চারা কিংবা মেয়েরা আমাদের মতন জামাকাপড়-পরা মানুষই কখনো দেখেনি।

আবু তালেব নিজস্ব ভাষায় ওদের কী সব বোঝালো। ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করলো খানিকক্ষণ। তারপর আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেল। একখানা ছোট কাঠের ঘর, বোধহয় অন্য কেউ থাকতো, আমাদের জন্য এইমাত্র খালি করা হয়েছে। কাকাবাবু একবার দেখেই ঘরটা পছন্দ করে ফেলেছেন।

গ্রামখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলো যেন সাজিয়ে সাজিয়ে বসানো হয়েছে। পাহাড়ের নিচের দিকে খুব ঘন জঙ্গল। শুনলাম, এই গ্রামে একটাই শুধু অসুবিধে, খুব জলের কষ্ট। পাহাড়ের একেবারে নিচ থেকে জল আনতে হয়। হোক, এই শীতে বেশী জল তো লাগবে না আমাদের!

আমাদের ঘরখানার পেছনেই খানিকটা সমতল জায়গা। তার পর খাদ নেমে গেছে। খাদের ওপারে আর একটা পাহাড়, সেই পাহাড়টা ভর্তি জঙ্গল। জানলা দিয়ে তাকালে মনে হয়, ঠিক যেন বিরাট একটা পাহাড়ের ছবি আকাশের গায়ে ঝোলানো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু, ঘরটা ভালো করে গুছিয়ে ফ্যাল। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তুই এখানে থাকতে পারবি তো?

আমি ঘাড় কাৎ করে বললাম, হ্যাঁ। কতদিন থাকবো এখানে?

—দিন দশ-বারো। এর মধ্যে যদি কিছু না হয়, তাহলে এবারকার মতন ফিরে যেতে হবে। তোরও তো ইস্কুলের ছুটি ফুরিয়ে আসবে।

—আমার ইস্কুল খুলতে এখনও কুড়ি দিন বাকি।

—ঠিক আছে। এবার ভালো করে কাজ শুরু করতে হবে।

আমার শুধু একবার মনে হলো, সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি, রিণিরা জানতেও পারবে না, আমরা কোথায় আছি। ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

দু চোখে আগুন, এক অশ্বারোহী

এখানে আমাদের চার দিন কেটে গেল। সারাদিন কাকাবাবু আর আমি ঘুরে বেড়াই, ফিতে নিয়ে মাপামাপি হয়। জঙ্গলের ভেতরেও চলে যাই। কাজ অবশ্য কিছুই হচ্ছে না, তবে বেড়ানো তো হচ্ছে। কাশ্মীরে অনেকেই বেড়াতে যায়, কিন্তু কেউ তো গুজর আর খশ্ জাতির লোকদের সঙ্গে তাদের গ্রামে থাকেনি।

এই জায়গার লোকেরা যে কি ভালো তা কি বলবো! আমাদের সঙ্গে ওরা অসম্ভব ভালো ব্যবহার করে। ওরা অনেকেই আমাদের ভাষা বোঝে না, আমিও ওদের ভাষা বুঝি না, তবু কোনো অসুবিধে হয় না। হাত পা নেড়ে ঠিক বুঝিয়ে দেওয়া যায়। একদিন আমার কোটের একটা বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেটা শেলাই করার জন্য আমি ছুঁচ-সুতো চেয়েছিলাম। কিছুতেই আর সেটা ওরা বুঝতে পারে না। একবার নিয়ে এলো একটা গামলা, একবার নিয়ে এলো বঁটি। শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারলো, তখন কোটটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। একটু বাদেই ওদের বাড়ি থেকে বোতাম শেলাই করে আনলো।

সন্ধেবেলাই বাড়ি ফিরে দরজা-জানলা সব বন্ধ করে থাকতে হয়। শীত এখানে বড্ড বেশী। খুব হাওয়া, সেইজন্য। ঘরের মধ্যে আমরা আগুন জেলে রাখি। খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালোই হয়। গরম গরম মোটা মোটা চাপাটি আর মুরগী ঝোল। হুন্দা তো আছেই, তাছাড়া গ্রামের একটি মেয়েও দিনের বেলা আমাদের রান্না-টান্না করে দেয়। কাশ্মীরের লোকেরা ভালো রান্না করে, তবে নুন

দেয় বড্ড বেশী। বলে-বলেও কমানো যায় না। এরা সবাই এত বেশী নুন খায় যে আমাদের কম নুন খাওয়ার কথা বিশ্বাসই করতে পারে না। এরা ঝালও বেশী খায়, তবে সেটা এতদিনে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।

সারাদিনটা আমার বেশ ভালোই কাটে। সন্ধের সময়ও মন্দ লাগে না, তখন গ্রামের দু' চারজন বুড়ো লোক আসে, আগুনের ধারে বসে গল্প হয়।

কিন্তু রাত্তিরটা আমার কাটতেই চায় না। ঘুম আসে না, খুব ভয় করে। চারদিক নিঝুম। মনে হয়, নিজের বাড়ি থেকে কোথায় কতদূরে পড়ে আছি। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল বাবা-মার কাছ থেকে কোনো চিঠি পাইনি। আমারও লেখা হয়নি। পহলগাম থেকে লিখতাম কিন্তু এখানে ধারেকাছে পোস্টাফিস নেই। বাড়ির জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে। একটু একটু, বেশী না।

আমার কুকুরটার কথাও মনে পড়ে। এতদিন পর ফিরে গেলে ও কি আমায় চিনতে পারবে? মোটে তো দু' সপ্তাহ হলো এসেছি, অথচ মনে হয় যেন কতদিন কলকাতাকে দেখিনি। এইটাই বেশ মজার—বেড়াতে আসতেও খুব ভালো লাগে, আবার কয়েকদিন পরই কলকাতার জন্য মন ছটফট করে। রাত্তির বেলা ঘুম আসবার আগে যতক্ষণ একলা জেগে থাকি, তখনই কষ্ট হয় বেশী।

রাত্তিরে রোজ একটা শব্দ শুনতে পাই, সেটাই সবচেয়ে বেশী জ্বালায়। কী রকম অদ্ভুত শব্দ—অনেকটা ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দের মতন। কিন্তু শব্দটা মিলিয়ে যায় না। মনে হয় যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ঘোড়া অনবরত দৌড়োবার ভান করছে। কিন্তু আমি ঘোড়াদের স্বভাব যেটুকু বুঝেছি, তারা তো ওরকম কক্ষনো করে না।

জানলা খুলেও দেখার উপায় নেই। মাঝরাত্তিরের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া। তাছাড়া একলা একলা জানলা খুলতে আমার ভয় করে। এদিকে, ওর মধ্যে কাকাবাবু আবার ঘুমের ঘোরে কথা বলতে শুরু করেছেন। কার সঙ্গে যেন তর্ক করছেন কাকাবাবু। উঠে গিয়ে যে কাকাবাবুর গায়ে ধাক্কা দেবো, তা-ও ইচ্ছে করে না। বালিশে মুখ গুঁজে কান বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। আমার কান্না পাচ্ছিল।

প্রথম রাত্তিরে কাকাবাবুকে আমি ডাকিনি, দ্বিতীয় রাত্তিরে

আর না ডেকে পারলাম না। কাকাবাবু ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, কী? কী হয়েছে?

আমি বিবর্ণ মুখে বললাম, একটা কী রকম বিচ্ছিরি শব্দ।

কাকাবাবু কান খাড়া করে শুনলেন। তারপর বললেন, কেউ ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। এতে ভয় পাচ্ছো কেন?

—আপনি শুনুন। অনেকক্ষণ ধরে, ঠিক একই জায়গায় ঐ এক রকম শব্দ।

কাকাবাবু আর একটু শুনলেন। হাল্‌কা ভাবে বললেন, ঘোড়ারই তো শব্দ, আর তো কিছু না! ঘুমিয়ে পড়ো—

—আমাদের জানলার খুব কাছে।

কাকাবাবুর সাহস আছে খুব। উঠে গলায় কমফর্টার জড়ালেন। আর একটা কমফর্টার দিয়ে কান ঢাকলেন—ওভারকোটের পকেট থেকে রিভলবারটা বার করলেন। তারপর দেখলেন জানলা খুলে। টর্চ জ্বেলে তাকিয়ে রইলেন বাইরে। দু' এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। আবার জানলা বন্ধ করে এসে বললেন, ওটা কিছু নয়। নিশ্চিন্তে ঘুমো—

কাকাবাবু জানলা খুলে টর্চটা যখন জ্বেলেছিলেন, তক্ষুনি শব্দটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জানলা বন্ধ করতেই আবার শুরু হলো।

আমার গলা শুকিয়ে গেল। ফ্যাকাসে গলায় বললাম, কাকাবাবু, আবার শব্দ হচ্ছে!

—হোক না। শব্দ হলে ক্ষতি কী আছে? যা চোখে দেখা যায় না, তার থেকে ভয়ের কিছু নেই।

—কিন্তু—

—আরে, এরকম পাহাড়ী জায়গায় অনেক কিছু শোনা যায়। রাত্তিরে সব আওয়াজই বেশী মনে হয়—তাছাড়া পাহাড়ের নানান খাঁজে হাওয়া লেগে কতরকম শব্দ হয়, কত রকম প্রতিধ্বনি—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছুই শোনা যায় না।

আমি বললাম, কাকাবাবু, আমার যে কিছুতেই ঘুম আসছে না!

কাকাবাবু আমার খাটের কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, তুই চোখ বুজে শুয়ে থাক্—আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি—তাতেই ঘুম এসে যাবে।

কিন্তু একথা শুনে আমার লজ্জা করলো। আমি কি ছেলেমানুষ

নাকি যে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে হবে? তা ছাড়া কাকাবাবু আমার জন্য জেগে বসে থাকবেন! আমি বললাম, না, না, তার দরকার নেই। এবার আমি ঘুমোতে পারবো।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, সেই ভালো। ভয়কে প্রশ্রয় দিতে নেই। এ তো শুধু একটা শব্দ, এসে ভয় পাবার কি আছে?

আমি আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে জিগ্যেস করলাম, ঠিক মনে হচ্ছে না ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ? আমাদের জানলার খুব কাছে?

কাকাবাবু আবার রিভলবারটা হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, কৌন হ্যায়?

কোনো সাড়া নেই। তবে শব্দটা এবার আর থামলো না।

কাকাবাবু বললেন, এমনও হতে পারে—শব্দটা অনেক দূরে হচ্ছে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে মনে হচ্ছে খুব কাছে। এত শীতে বাইরে বেরুনো উচিত নয়, না হলে বাইরে বেরিয়ে দেখা যেত। আচ্ছা দেখা যাক্, কাল কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা!

পরদিন সন্ধেবেলা গ্রামের বৃদ্ধরা এলেন আমাদের সঙ্গে গল্প করতে। বড় বড় মগে চা ঢেলে খাওয়া হতে লাগলো। ঘরের এক কোনে আগুন জ্বলছে, মাঝে মাঝে আমি তার মধ্যে একটা দুটো কাঠ ছুঁড়ে দিচ্ছি। কাকাবাবু এ কথা সে কথার পর দুজন বৃদ্ধকে ঐ শব্দটার কথা জিগ্যেস করলেন।

একজন বৃদ্ধ শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বুঝেছি বাবুসাহেব, কাল তা হলে হাকো এসেছিল।

কাকাবাবু বললেন, হাকো কে?

—কোনো কোনোদিন মাঝরাত্তিরে ঘোড়া ছুটিয়ে যায়। তবে ও কারুর ক্ষতি করে না।

—অত রাত্তিরে ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় যায়?

বৃদ্ধ দুজন চুপ করে গেলেন। কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, তাছাড়া ঘোড়া ছুটিয়ে যায় না তো কোথাও! এক জায়গায় দাঁড়িয়েই তো ঘোড়া দাবড়ায়!

—ও ঐ রকমই।

কাকাবাবু আমার দিকে ফিরে ইংরাজিতে বললেন, নিশ্চয়ই এবার এরা একটা ভূতের গল্প শোনাবে। গ্রামের লোকেরা এইসব অনেক গল্প বানায়—তারপর শুনতে শুনতে ঠিক বিশ্বাস করে ফেলে।

কাকাবাবু বৃদ্ধদের আবার জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা, হাকোকে দেখতে কী রকম ? কমবয়েসী ছোকরা, না, বয়স্ক লোক ? দিনের বেলা তার দেখা পাওয়া যায় না ?

বৃদ্ধ দু'জন চুপ করে গিয়ে পরস্পরের চোখের দিকে তাকালেন। তারপর ফস্ করে লম্বা লম্বা বিড়ি ধরিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ধোঁয়া টানতে লাগলেন। যেন তাঁরা ও বিষয়ে আর কিছুই বলতে চান না।

কাকাবাবু তবু ছাড়লেন না। আবার জিগ্যেস করলেন, এই যে আপনারা হাকো না কার কথা বললেন, রাত্তির বেলা ঘোড়া ছুটিয়ে যায়—তাকে দেখতে কি রকম ?

একজন বৃদ্ধ বললেন, বাবু সাহেব, ও কথা থাক। হাকো আপনার ক্ষতি করবে না, শুধু শব্দই শুনবেন। আপনার ভয়ের কিছু নেই।

কাকাবাবু হেসে উঠে বললেন, শুধু শব্দ কেন, তার চেহারা দেখলেও আমি ভয় পাবো না। আমি তো তার কোনো ক্ষতি করি নি ! দিনের বেলা কেউ দেখেছে ?

—না, দিনের বেলা কেউ তাকে দেখেনি।

—আপনি তাকে কখনো দেখেছেন ? রাত্তিরে ?

বৃদ্ধটি চমকে উঠে বললেন, বাবুসাহেব, তাকে কেউ দেখতে চায় না। হাকো-কে দেখলে কেউ বাঁচে না। হাকো-র চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়—তার চোখের দিকে চোখ পড়লেই মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে দিনের বেলা সে আসে না, ইচ্ছে করে কারুর কোনো ক্ষতি করে না—

কাকাবাবু বললেন, হুঁ ! চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়। তাকে দেখতে কি মানুষের মতন না জন্তুর মতন ? কোনো গল্প-টল্প শোনেননি ? চোখের দিকে না তাকিয়ে পেছন দিক থেকে যদি কেউ দেখে ?

বৃদ্ধ বললেন, আমার ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি, একবার একটি মেয়ে তার সামনে পড়ে গিয়েছিল। হাকো তখন হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দেয়। মেয়েদের সে খুব সম্মান করে। সেই মেয়েটি দেখেছিল, হাকো খুব সুন্দর দেখতে একজন যুবাপুরুষ, তিরিশের বেশী বয়েস নয়—খুব লম্বা, মাথায় পাগড়ি, কোমরে তলোয়ার—

—তা সে বেচারা রোজ রাত্তিরে এখান দিয়ে ঘোড়া ছোটায় কেন ?

—এ তো শুধু আজকালের কথা নয় ! কত শো বছর ধরে যে হাকো এ রকম ভাবে যাচ্ছে, কেউ জানে না। হাকো ছিল একজন রাজার সৈন্য—লদ্দাকের রাস্তা দিয়ে সে রাজার খৎ নিয়ে যাচ্ছিল।

এক দুশমন তাকে একটা কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে। সেই থেকে প্রায় রাত্তিরে...

কাকাবাবু চুরুট টানতে টানতে হাসিমুখে গল্প শুনছিলেন। হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। ব্যস্তভাবে জিগ্যেস করলেন, কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে ? এখানে কুয়ো কোথায় ? আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন ?

বৃদ্ধ বললেন, না, সে আমরা কখনো দেখিনি। শুনেছি এসব ঠাকুর্দা-দিদিমার কাছে—

আর একজন বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ, আমিও শুনেছি ঐ সব জঙ্গল-টঙ্গলের দিকে বড় বড় কুয়ো আছে, একেবারে পাতাল পর্যন্ত চলে যায়—

কাকাবাবু বললেন, আমাকে নিয়ে যাবেন সেখানে ? অনেক বকশিস দোবো।

প্রথম বৃদ্ধ বললেন, না, বাবুসাহেব, আমি কোনোদিন কুয়ো-টুয়োর কথা শুনিনি। এদিকে জলই পাওয়া যায় না, তা কুয়ো থাকবে কী করে ? পাহাড়ের গর্ত-টর্ত হয়তো আছে, তাই লোকে বলে—

আমি হাকো সম্পর্কে আরও গল্প শুনতে চাইছিলাম। কিন্তু কাকাবাবুর আর কোনো উৎসাহ নেই ওর সম্পর্কে। কাকাবাবু উত্তেজিত হয়ে বারবার সেই কুয়োর কথা জিগ্যেস করতে লাগলেন। বৃদ্ধ দু'জনকে জেরা করতে লাগলেন, সারা গ্রামের কেউ কোনোদিন জঙ্গলের মধ্যে সেই কুয়ো দেখেছে কি না ! বৃদ্ধ দু'জন আর বিশেষ কিছুই বলতে পারলেন না। বকশিসের-লোভ দেখিয়েও জানা গেল না কিছুই। মনে হলো, হাকো-র সম্পর্কে ওঁদের খুবই ভয় আছে—হাকোর ধারেকাছে যাবার ইচ্ছেও নেই ওঁদের।

সেদিন রাত্তিরবেলা কাকাবাবু টর্চ আর রিভলবার হাতে নিয়ে জানলার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। সেদিন কিন্তু কোনো শব্দই শোনা গেল না। কাকাবাবু হেসে বললেন, আজ আমাদের ভূতমশাই বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছেন। রোজ কি আর সারারাত ঘোড়া চালানো যায় ! তাছাড়া রিভলবার থাকলে ভূতও ভয় পায়।

পরের দিনও প্রথম রাত্তিরে কিছু শোনা যায়নি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম সেই রহস্যময় ঘোড়-সওয়ারকে—যার দু চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়, যার নাম হাকো—কী করে যে লোক তার নাম জানলো ! আমি হঠাৎ হাকোর সামনে পড়ে

গেছি...। হাকো আগুন-জ্বলা চোখে তাকিয়েছে আমার দিকে। আমি দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে...। ভয় পেয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন শুনলাম বাইরে সেই শব্দ হচ্ছে। কাকাবাবুকে ডেকে তুললাম। কাকাবাবু টর্চ জেলে দেখার অনেক চেষ্টা করলেন। কিছুই দেখা গেল না। আওয়াজ অনবরত চললো। যতক্ষণ জেগে রইলাম, সেই খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দ। হাকো যদি ভূত হয়, তাহলে ঘোড়াটাও কি ভূত। ঘোড়ারা মরলে কি ভূত হয়? আমার ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। মনে হলো, আর একদিনও এখানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু কাকাবাবু কিছুতেই যাবেন না। হাকোর গল্প শোনবার পরই কাকাবাবুর এই জায়গাটা সম্পর্কে আকর্ষণ আরও বেড়ে গেছে।

সকালবেলা উঠলে কিন্তু ঐ সব কথা আর তেমন মনে পড়ে না। কতরকম পাখির ডাক শোনা যায়। নরম রোদ্দুরে ঝকমক করে জেগে ওঠে একটা সুন্দর দিন। আবু তালেব আর হুন্দা দুটো ঘোড়া নিয়ে এসে হাজির হয়। মুখে সরল হাসি। তখন সব কিছুই ভালো লাগে।

আজকাল আর আমি ঘোড়া চালাবার সময় ওদের কারুকে সঙ্গে নিই না। নিজেই খুব ভালো শিখে গেছি। এক এক সময় খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। খানিকটা নিচে নেমে গেলে বেশ ভালো রাস্তা—সেখানে আর কোনো রকম ভয় নেই।

কাকাবাবু বললেন, এদিকটা তো মোটামুটি দেখা হলো। চলো, আজ বনের ভেতরটা ঘুরে আসি।

আমি উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। বনের মধ্যে বেড়াতে আমার খুব পছন্দ হয়। এদিককার বনগুলো বেশ পরিষ্কার। ঝাউ আর চেনার গাছ—ভেতরটা অন্ধকার হলেও রাস্তা করে নেওয়া যায় সহজেই।

সেদিন বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতেই সেই সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডটা হলো। তারপর থেকেই আমাদের সব কিছু বদলে গেল। জঙ্গলের বেশ খানিকটা ভেতরে এসে আমরা পায়ে হেঁটে ঘুরছিলাম। কাকাবাবু এখানেও ফিতে বার করে মাপতে শুরু করেছেন। এতদিনে আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে এক একজন লোকের যেমন এক এক রকম বাতিক থাকে—তেমনি এই ফিতে মাপার ব্যাপারটাও কাকাবাবুর বাতিক। নইলে, এই জঙ্গলে ফিতে দিয়ে জায়গা মাপার কোনো মানে হয়?

জঙ্গলের মাটি বেশ স্যাঁতসেঁতে। কাল রাত্তিরেও বরফ পড়েছিল,

এখন বরফ বিশেষ নেই, কিন্তু গাছগুলো থেকে চুঁইয়ে পড়ছে জল। হাঁটতে গেলে পা পিছলে যায়। ফিতেটা ধরে দৌড়োচ্ছিলাম, হঠাৎ আমি একটা লতা-পাতার ঝোপের কাছে পা পিছলে পড়ে গেলাম। বেশী লাগেনি, কিন্তু উঠতে গিয়েও পারলাম না উঠতে। জায়গাটা কী রকম নরম নরম। দূর থেকে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি হলো, সন্তু, লেগেছে? আমি উত্তর দিলাম, না, না, লাগেনি। কিন্তু দাঁড়াতে পারছি না কিছুতেই। পায়ের তলায় শক্ত কিছু নেই। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, আমি নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি। জায়গাটা আসলে ফাঁপা—ওপরটা ঝোপে ঢাকা ছিল।

চেঁচিয়ে ওঠবার আগেই লতা-পাতা ছিঁড়ে আমি পড়ে যেতে লাগলাম নিচে। কত নিচে কে জানে।

ভয়ের চোটে নিশ্চয়ই আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। কখন নিচে গিয়ে পড়লাম টের পাইনি। চোখ খুলে প্রথমেই মনে হলো, আমি কি মরে গেছি না বেঁচে আছি? আর কি কোনোদিন মাকে, বাবাকে দেখতে পাবো? মরে যাবার পর কি রকম লাগে তা-ও তো জানি না। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা পচা পচা গন্ধ। হাতে চিমটি কেটে দেখলাম ব্যথা লাগলো। কিন্তু ওপর থেকে পড়ার সময় খুব বেশী লাগেনি—কারণ আমার পায়ের নিচেও বেশ ঝোপের মতন রয়েছে। আস্তে আস্তে অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ায় একটু একটু দেখতে পাচ্ছি। তাহলে নিশ্চয়ই মরিনি! আমি একটা বড় গর্ত বা লুকনো কোনো কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছি। ভয়ের চেয়েও, বেঁচে যে গেছি—এই জন্য একটু আনন্দই হলো সেই মুহূর্তে। আরও গভীর গর্ত যদি হতো, কিংবা তলায় যদি শুধু পাথর থাকতো—তাহলে এতক্ষণে...। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, কাকাবাবু, কাকাবাবু—

কাকাবাবু অনেকটা দূরে আছেন। হয়তো শুনতে পাবেন না। নিচ থেকে কি আমার গলার আওয়াজ পৌঁছুচ্ছে? ওপর দিকটায় তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় অন্ধকার। লতা-পাতা ছিঁড়ে যাওয়ায় সামান্য যা একটু ফাঁক হয়েছে, তাতেই সামান্য আলো।

তবে একটা খুব আশার কথা, ফিতের একটা দিক আমার হাতে তখনও ধরা আছে। অন্য দিকটা কাকাবাবুর হাতে। এইটা দেখে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন।

শক্ত করে ফিতেটা এক হাতে চেপে রেখে আমি আর এক হাতে

চার পাশটায় কী আছে দেখার চেষ্টা করলাম। গর্তটা বেশ বড়। একটা কুয়োর মতন, কিন্তু জল নেই। এই কুয়োতেই কি হাকো-কে মেরে ফেলা হয়েছিল? এটা কি হাকো-র বাড়ি?

ভয়ে আমার সারা গা শিরশিরিয়ে উঠলো। আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, কাকাবাবু! কাকাবাবু!

চেঁচাতে চেঁচাতেই মনে হলো, কাকাবাবু এসেও কি আমাকে তুলতে পারবেন এখান থেকে? খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু একলা কী করবেন? কেন যে আবু তালেব আর হুন্দাকে আজ সঙ্গে আনিনি। কাকাবাবু এখান থেকে ওদের গ্রামে ফিরে গিয়ে ওদের ডেকে আনতে আনতেই যদি আমি মরে যাই? মনে হচ্ছে যেন এর মধ্যেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। পচা পচা গন্ধটা বেশী করে নাকে লাগছে। আর বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারবো না! আমি মরে গেলে আমার মায়ের কী হবে? মা-ও যে তাহলে কাঁদতে-কাঁদতে মরে যাবে!

গলা ফাটিয়ে আরও কয়েকবার আমি কাকাবাবুর নাম ধরে চেঁচালাম। এখনো আসছেন না কেন? হয়তো এখানকার কোনো শব্দ ওপরে পৌঁছোয় না।

একটু বাদে আমার হাতের ফিতেয় টান পড়লো। কাকাবাবুর গলা শুনতে পেলাম, সন্তু? সন্তু?

—এই যে আমি, নিচে—

ওপরে খ্যাঁচ-খ্যাঁচ শব্দ হতে লাগলো, আমার গায়ে গাছ লতা-পাতার টুকরো পড়ছে। কাকাবাবু ছুরি দিয়ে ওপরের জঙ্গল সাফ করছেন। খানিকটা পরিষ্কার হবার পর কাকাবাবু মুখ বাড়ালেন। ব্যাকুলভাবে বললেন, সন্তু, তোমার লাগেনি তো? সন্তু, কথা শুনতে পাচ্ছো?

—হ্যাঁ, পাচ্ছি। না, আমার লাগেনি।

—উঠে দাঁড়াতে পারবে?

—হ্যাঁ। আমি তো দাঁড়িয়েই আছি।

—তোমার আশেপাশে জায়গাটা কী রকম?

—কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ভীষণ অন্ধকার এখানে।

—আমিও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও—

কাকাবাবু আবার ছুরি দিয়ে গাছপালা কেটে সাফ করতে লাগলেন। গর্তের মুখটা প্রায় সবই পরিষ্কার হয়ে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, সন্তু, ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াও। তোমার কোটের

সামনের দিকটা পেতে ধরো, আমি আমার লাইটারটা ফেলে দিচ্ছি।

কোট পাততে হলো না, এখন আমি গর্তের ওপর দিকটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। কাকাবাবু লাইটারটা ফেলে দিতেই আমি লুফে নিলাম।

—লাইটারটা জ্বালিয়ে দেখো, ওখানে কী আছে!

কাকাবাবু এই লাইটারে চুরুট ধরান। বেশ অনেকটা শিখা হয়। জ্বেলে চারপাশটা দেখলাম। গর্তটা বহু পুরোনো, দেয়ালের গায়ে বড় বড় গাছের শিকড়। দেখলে মনে হয় মানুষেরই কাটা গর্ত। একদিকে একটা সুড়ঙ্গের মতন। তার ভেতরটা এত অন্ধকার যে তাকাতেই আমার গা ছমছম করলো। বোঁটকা গন্ধটা সেদিক থেকেই আসছে মনে হলো।

সে-কথা কাকাবাবুকে বলতেই তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন, ঠিক আছে। কোনো ভয় নেই। আমি একটা দড়ি গাছের সঙ্গে বেঁধে আর এক দিক নিচে নামিয়ে দিচ্ছি, তুমি শক্ত করে ধরবে!

তখন আমার মনে পড়লো, আমাদের ব্যাগের মধ্যে তো নাইলনের দড়ি আছে। ভীষণ শক্ত, কিছুতেই ছেঁড়ে না। তাহলে আর ভয় নেই। দড়ি ধরেই আমি ওপরে উঠে যেতে পারবো।

দড়িটা নিচে এসে পড়তেই আমি হাতের সঙ্গে পাক দিয়ে শক্ত করে ধরলাম। তারপর লাইটারটা নিভিয়ে দিয়ে বললাম, কাকাবাবু, আমি উঠছি ওপরে—

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না, উঠো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি আসছি।

কাকাবাবুর তো খোঁড়া পা নিয়ে নিচে নামবার দরকার নেই। তাই আমি চেঁচিয়ে বললাম, না, না, তোমাকে আসতে হবে না। আমি নিজেই উঠতে পারবো।

কাকাবাবু হুকুম দিলেন, তুমি চুপ করে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি এক্ষুনি আসছি।

সেই দড়ি ধরে কাকাবাবু নেমে এলেন। মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই ফিসফিস করে বললেন, সন্তু, এই গর্তের মুখটা চৌকো—এই সেই চৌকো পাতকুয়ো! আমরা যা খুঁজছিলাম বোধহয় সেই জায়গা।

বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। এই গর্তটা আমরা খুঁজেছিলাম—এতদিন ধরে? কিন্তু কী আছে এখানে? এখানে কি

গুপ্তধন আছে ?

কাকাবাবু সুড়ঙ্গটার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বললেন, এর ভেতরে ঢুকতে হবে। সন্তু, তুমি ভিতরে ঢুকতে পারবে ?

কাকাবাবু এমন ভাবে কথা বলছেন যেন এই গর্তটা তাঁর বহু-দিনের চেনা। আমরা যে বিপদে পড়েছি, কাকাবাবুর ব্যবহার দেখে তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। বরং বেশ একটা খুশী খুশী ভাব। এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করার বদলে তিনি ঐ বিচ্ছিরি সুড়ঙ্গটার মধ্যে ঢুকতে চান !

আমি কাকাবাবুর গা ঘেঁষে ওভারকোটটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার ভীষণ ভয় করছে। আমি মরে গেলেও ঐ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকতে পারবো না। কাকাবাবু একলা ঢুকলেও ভয়, কাকাবাবুর যদি কোনো বিপদ-টিপদ হয়ে যায় ! কাকাবাবু নিচে নামবার সময় ক্রাচ দুটো আনেননি। ওঁর এমনি দাঁড়িয়ে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উনি কিছু গ্রাহ্য করছেন না এখন।

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও, আগে দেখেনি, সুড়ঙ্গটা কত বড়।

কাকাবাবু লাইটারটা জ্বাললেন। তাতে বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। শুধু জমাট অন্ধকার।

—সন্তু, দ্যাখ তো, শুকনো গাছটাছ আছে কিনা, যাতে আগুন জ্বালা যায় !

শুকনো গাছও নেই। বরং সব কিছুই ভিজে স্যাঁতসেঁতে। পাথরের দেয়ালে হাত দিলেও হাতে জল লাগে।

কাকাবাবু অধীর হয়ে বললেন, কী মুস্কিল, আগুন জ্বালাবার কিছু নেই ? টর্চটা আনলে হতো—বুঝবোই বা কী করে, দিনের বেলা—

আমি বললাম, কাকাবাবু, এখন আমরা ওপরে উঠে পড়ি বরং। পরে লোকজন ডেকে এনে দেখলে হয় না ?

কাকাবাবু প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, না ! এসব লোকজন ডেকে এনে দেখার জিনিস নয়।

আমি বললাম, কাকাবাবু ঐ সুড়ঙ্গটার মধ্যে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ !

কাকাবাবু নাকে বড় রকম নিঃশ্বাস টেনে বললেন, গন্ধ ? কই, আমি পাচ্ছি না তো ! অবশ্য, আমার একটু সর্দি হয়েছে। গন্ধ থাক না, তাতে কি হয়েছে ?

কাকাবাবু ঝট করে পকেট থেকে বড় একটা রুমাল বার করলেন।

তারপর সেটাতেই লাইটার থেকে একটু পেটরোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। রুমালটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সেই আলোতে দেখা গেল গুহাটা বেশী বড় নয়। কাকাবাবু মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, আমি দারুণ ভয় পেয়ে কাকাবাবুকে টেনে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কাকাবাবু, দ্যাখো, দ্যাখো—

গুহার একেবারে শেষ দিকে দুটো চোখ আগুনের মতন জ্বলজ্বল করছে। আমার তক্ষুনি মনে হলো, হাকো বসে আছে ওখানে। আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম, এটা হাকোর বাড়ি। ও বেরিয়ে এসেই আমাদের পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

কাকাবাবু একটু থমকে গেলেন। আমি ফিসফিস করে বললাম, হাকো ! নিশ্চয়ই হাকো ! ওরা বলেছিল কুয়োর মধ্যে...

কাকাবাবু বললেন, ধ্যাৎ ! হাকো আবার কী ? তোর মাথার মধ্যে বুঝি ঐ সব গল্প ঢুকেছে !

—তা হলে কী ? চোখ দুটোতে আগুন জ্বলছে—

—আগুন কোথায় ? আলো পড়ে চকচক করছে।

—তবে কি বাঘ ?

—এত ঠান্ডা জায়গায় বাঘ থাকে না। খুব সম্ভব পাহাড়ী সাপ। পাইথন-টাইথন হবে। ভয়ের কিছু নেই। পাইথন তেড়ে এসে কামড়ায় না !

রুমালটা ততক্ষণে সবটা পুড়ে এসেছে। বিশ্রী গন্ধ আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে সেটা থেকে। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে এসেছে, ধোঁয়ার জন্য আবার কাশি পেয়ে গেল।

কাকাবাবু হুকুম করলেন, সন্তু, তোমার পকেট থেকে রুমাল বার করো। আমি আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি, তুমি ধরে থাকো ওটা। এক পাশে সরে গিয়ে হাতটা শুধু বাড়িয়ে দাও গুহাটার দিকে।

কাকাবাবু রিভলবারটা বার করে বললেন, বেচারাকে মারা উচিত নয়, ও চুপ করে বসে ছিল, আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। কিন্তু সাপকে তো বিশ্বাস করা যায় না। আমাকে যে ভেতরে ঢুকতেই হবে।

—যদি সাপ না হয় ?

—সাপ ছাড়া আর কোনো জন্তু এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকে না।

কাকাবাবু সেই চোখ দুটো লক্ষ্য করে পর পর দুবার গুলি করলেন। হঠাৎ গুহাটার মধ্যে তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণ অন্ধকারে টুঁ শব্দটিও ছিল না। এখন গুহাটার ভেতরে কে যেন

প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে দাপাদাপি করছে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, সন্তু, সরে দাঁড়াও, গুহার মুখটা থেকে সরে দাঁড়াও। ও এখন বেরুবার চেষ্টা করবে!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাপটার বীভৎস মুখখানা গুহা থেকে বেরিয়ে এলো। অনেকটা থেঁতলে গেছে। কাকাবাবু আবার দুটো গুলি ছুঁড়লেন।

আস্তে আস্তে থেমে গেল সব ছটফটানি। আমি উল্টো দিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি। তাড়াতাড়ি পিছু হটতে গিয়ে মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। এত জোরে বুক ঢিপঢিপ করছে যে মনে হচ্ছে কানে তালা লেগে যাবে। পা দুটো কাঁপছে থরথর করে।

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে দেখলেন সাপটার তখনও প্রাণ আছে কিনা। সেটা আর নড়লো না। আমি বললাম, কাকাবাবু, যদি ভেতরে আরও কিছু থাকে? সাপ কিংবা অন্য জন্তু-জানোয়ার সব একসঙ্গে দুটো করে থাকে না?

—আর কিছু থাকলে এতক্ষণে বেরিয়ে আসতো।

তারপরেই কাকাবাবু গুহাটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমি বারণ করার সময় পেলাম না। তখন দিশেহারা হয়ে গিয়ে আমিও ঢুকে পড়লাম পেছন পেছন।

এই রুমালটাও প্রায় পুড়ে এসেছে। হাতে ছেঁকা লাগার ভয়ে আমি সেটাকে ফেলে দিলাম মাটিতে। সেই আলোতে দেখা গেল গুহার মধ্যে একটা মানুষের কঙ্কালের টুকরো পড়ে আছে। শুধু মুণ্ডু আর কয়েকখানা হাড়। একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি, একটা মস্ত বড় লম্বা বর্শা। আর একটা চৌকো তামার বাক্স।

কাকাবাবু সেই তামার বাক্সটা তুলে নিয়েই বললেন, সন্তু, শিগগির বাইরে চলে এসো। এই বন্ধ গুহার মধ্যে আগুন জ্বালা হয়েছে, এখানকার অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে। এক্ষুনি দম বন্ধ হয়ে আসবে। চলে এসো শিগগির।

ঝোলানো দড়ি ধরে দেয়ালের শিকড়-বাকড়ে পা দিয়ে একেবারে ওপরে উঠে এলাম। আগে আমি, তারপর কাকাবাবু। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়ে কত কষ্ট করে যে উঠলেন, তা অন্য কেউ বুঝবে না। কিন্তু কাকাবাবুর মুখে কষ্টের কোনো চিহ্ন নেই। আমিও তখন বিপদ কিংবা কষ্টের কথা ভুলে গেছি। বাক্সটার মধ্যে কী আছে তা দেখার জন্য আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না। কত অ্যাডভেঞ্চার

সন্তু, সরে দাঁড়াও, গুহার মুখটা থেকে সরে দাঁড়াও। ও এখন বেরুবার চেষ্টা করবে।

বইতে পড়েছি, এইরকম ভাবে গুপ্তধন খুঁজে পাবার কথা। আমরাও ঠিক সেই রকম...বাক্সটার মধ্যে মণিমুক্তো, জহরৎ যদি ভর্তি থাকে—

কাকাবাবু টানাটানি করে বাক্সটা খোলার চেষ্টা করলেন। কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না। তালা বন্ধও নয়, কিন্তু কীভাবে যে আটকানো তা-ও বোঝা যায় না। আমি একটা বড় পাথর নিয়ে এলাম। সেটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে একটা কোণ ভেঙে ফেলা হলো। বাক্সটা অবশ্য বহুকালের পুরোনো, জোরে আছাড় মারলেই ভেঙে যাবে। ভাঙা দিকটায় ছুরি ঢুকিয়ে চাড় দিতেই ডালাটা উঠে এলো।

বাক্সটার ভেতরে তাকিয়ে আমি একেবারে নিরাশ হয়ে গেলাম। মণি, মাণিক্য, জহরৎ কিছুই নেই। কেউ যেন আমাদের ঠকাবার জন্যই বাক্সটা ওখানে রেখে গেছে। বাক্সটার মধ্যে শুধু একটা বড় গোল পাথর, গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। কেউ বোধহয় আমাদের আগে ঐ গুহাটায় ঢুকে বাক্সটা খুলে মণিমুক্তো সব নিয়ে তারপর অন্যদের ঠকাবার জন্য ভরে রেখে গেছে।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই দেখলাম, কাকাবাবুর মুখে দারুণ আনন্দের চিহ্ন। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁটে অদ্ভুত ধরনের হাসি। কাকাবাবু চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেললেন। আমি ভাবলাম চশমার কাচ মুছবেন। কিন্তু তা তো নয়? মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বাক্সটা হাতে নিয়ে কাকাবাবু হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

মূর্তি রহস্য

চোখ মুছে কাকাবাবু বললেন, সন্তু, এতদিনের কষ্ট আজ সার্থক হলো। কতদিন ধরে আমি এর স্বপ্ন দেখেছি। নিজেরও বিশ্বাস ছিল না, সত্যিই কোনোদিন সফল হবো। তোর জন্যই এটা পাওয়া গেল, তোর নামও সবাই জানবে।

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে কাকাবাবুর পাশে বসে পড়লাম। কাকাবাবু খুব সাবধানে পাথরটা তুললেন। এবার আমি লক্ষ্য করলাম, ওটা ঠিক সাধারণ পাথর নয়, অনেকটা মানুষের মুখের মতন। যদিও কান দুটো আর নাক ভাঙা। সেই ভাঙা টুকরোগুলোও বাক্সের মধ্যে পড়ে আছে। বোধহয় অজগরটার লেজের ঝাপটায় বাক্সটা ওলটপালট হয়েছে, সেই সময় ভেঙে গেছে। কিংবা আগেও ভাঙতে পারে।

কাকাবাবু রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে শ্যাওলা পরিষ্কার করে ফেলার পর মুখচোখ ফুটে উঠলো। গলার কাছ থেকে ভাঙা। গোটা মূর্তি থেকে শুধু মুণ্ডুটা ভেঙে আনা হয়েছে। বহুকালের পুরোনো মূর্তি, এমন কিছু দেখতে সুন্দরও নয় যে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা যায়। এটার জন্য কাকাবাবু এত বাড়াবাড়ি করছেন কেন?

কাকাবাবু ছুরি দিয়ে মুণ্ডুটার গলার কাছে খোঁচাতে লাগলেন। ঝুরঝুর করে মাটি খসে পড়ছে। অর্থাৎ মুণ্ডুটা ফাঁপা, মাটি দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। এখনও ভাবছি, তাহলে বোধহয় এই মুণ্ডুটার ভেতরে খুব দামী কোনো জিনিস লুকানো আছে। হীরে মুক্তো যদি না-ও থাকে, তবুও কোনো গুপ্তধনের নক্সা অন্তত পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছুই বেরুলো না, শুধু মাটিই পড়তে লাগলো। একেবারে সাফ হয়ে যাবার পর, ভেতরটা ভালো করে দেখে নিয়ে কাকাবাবু আর একবার খুশী হয়ে উঠলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন, সব মিলে যাচ্ছে। ভেতরে কী সব লেখা আছে দেখতে পাচ্ছিস তো? আমি অবশ্য এই লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারবো না—কিন্তু পণ্ডিতরা দেখলে...। আমি সোনার খনি কিংবা গন্ধকের খনি আবিষ্কার করতে আসিনি, এটা খুঁজতেই এসেছিলাম। এটার কাছে সোনা, রুপো তুচ্ছ।

আমি জিগ্যেস করলাম, কাকাবাবু, এটা কার মুণ্ডু?

—সম্রাট কনিষ্কর নাম শুনেছিস? পড়েছিস ইতিহাস?

—হ্যাঁ, পড়েছি।

—সম্রাট কনিষ্ককে দেখতে কী রকম ছিল, কেউ জানে না। কয়েকটা প্রাচীন মুদ্রায় তাঁর মুখের খুব ঝাপসা ছবি দেখা গেছে—কিন্তু তাঁর কোনো পাথরের মূর্তিরই মুখ নেই। এই সেই মুখ। তুই আর আমি প্রথম তার মুখ আবিষ্কার করলাম। শুধু মুখ নয়—তার জীবনের সব কথা। ইতিহাসের দিক থেকে এর যে কী বিরাট মূল্য, তুই এখন হয়তো বুঝবি না, বড় হয়ে বুঝবি। সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে যাবে!

—কিন্তু এটা যে সত্যিই কনিষ্কর মাথা, তা কী করে বোঝা যাবে?

—ঐ যে মাথার ভেতরে সব লেখা আছে!

ব্যাপারটার গুরুত্ব আমি তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। কিছুই ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমি বললাম, যদি কেউ যে-কোনো একটা মুণ্ডু বানিয়ে তার মধ্যে কিছু লিখে দ্যায়, তাহলেই কি সবাই বিশ্বাস করবে?

কাকাবাবু বললেন, লেখার ধরন দেখে, ভাষা দেখে, মূর্তির গড়ন দেখে পণ্ডিতরা তার বয়েস বলে দিতে পারে। ওসব বোঝা খুব শক্ত নয়।

কিন্তু মূর্তির মাথার মধ্যে কিছু লেখা থাকে—আগে তো কখনও শুনিনি। তা ছাড়া, কনিষ্কর মাথা এই গুহার মধ্যে এলো কী করে?

—শোন, তা হলে তোকে গোটা ব্যাপারটা বলি, একটা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পৃথিবীতে এরকম চমকপ্রদ ঐতিহাসিক আবিষ্কার খুব কমই হয়েছে। পিরামিডের লিপি কিংবা হিট্টাইট সভ্যতা আবিষ্কারের সময় যে-রকম হয়েছিল, অনেকটা সেই রকম।

কাকাবাবু পাথরের মুণ্ডুটা সাবধানে রাখলেন সেই বাক্সের ভেতরে। আরাম করে একটা চুরুট ধরালেন। মুখে সার্থকতার হাসি। বললেন, তুই পাইথনটা দেখে খুব ভয় পেয়েছিলি, না?

আমি উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করলাম। ভাবতে গেলেই এখনো বুক কাঁপে।

—রিভলবার-বন্দুক থাকলে পাইথন দেখে ভয় পাবার বিশেষ কারণ নেই। বাঘ, হায়না হলেই বরং বিপদ বেশী। বেচারা ওখানে নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধেছিল, বসে বসে রাজার মুণ্ডু পাহারা দিচ্ছিল। মরণ ছিল আমার হাতে।

—কাকাবাবু, তুমি কী করে জানলে যে মুণ্ডুটা এই রকম একটা গুহার মধ্যে থাকবে?

—বছর চারেক আগে আমি একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে জাপানে গিয়েছিলাম, তোর মনে আছে তো?

—হ্যাঁ, মনে আছে।

—ফেরার পথে আমি হংকং-এ নেমেছিলাম। হংকং-এ আমি কিছু বইপত্তর আর পুরোনো জিনিস কিনেছিলাম—সেখানে একটা দোকানে ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি একটা বহু পুরোনো বই পেয়ে যাই। বইটা চতুর্থ শতাব্দীতে একজন চীনা ডাক্তারের লেখা। ডাক্তারটির সুনাম ছিল পাগলের চিকিৎসায়। ডাক্তারী বই হিসেবে বইটার এখন কোনো দাম নেই, কারণ যে-সব চিকিৎসার কথা তিনি লিখেছেন, তা শুনলে লোকে হাসবে। যেমন, এক জায়গায় লিখেছেন, যে-সব পাগল বেশী কথা বলে কিংবা চিৎকার করে তাদের পরপর কয়েকদিন পায়ে দড়ি বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখলে পাগলামি সেরে যায়! আর এক জায়গায় লিখেছেন, পাগলরা উল্টোপাল্টা কথা বললেই তাদের কানের

সামনে খুব জোরে জোরে ঢাক ঢোল পেটাতে হবে। সেই আওয়াজের চোটে তাদের কথা শোনা যাবে না। বেশীদিন কথা না বলতে পারলেই তাদের পাগলামি আপনি আপনি সেরে যাবে।

চুরুট নিভে গিয়েছিল বলে কাকাবাবু সেটা ধরাবার জন্য একটু থামলেন। আমি এখনো অগাধ জলে। চীনে ডাক্তারের লেখা বইয়ের সঙ্গে সম্রাট কনিষ্কের মুণ্ডু উদ্ধারের কী সম্পর্ক কিছুই বুঝতে পারছি না।

কাকাবাবু চুরুটে কয়েকবার টান দিয়ে আবার শুরু করলেন, যাই হোক, ডাক্তারী বই হিসেবে দাম না থাকলেও বইটাতে নানান দেশের পাগলদের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক গল্প আছে, সেগুলো পড়তে বেশ মজা লাগে। তারই মধ্যে একটা গল্প দেখে আমার মনে প্রথম খটকা লেগেছিল। ঐ ডাক্তারেরই পরিবারের একজন নাকি দু-এক শো বছর আগে চীনের সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি তাঁর নথিপত্রে একজন ভারতীয় পাগলের কথা লিখে গেছেন—কালিকট বন্দরের রাস্তায় পাগলটা হাতে শিকল বাঁধা অবস্থায় থাকতো, আর সর্বক্ষণ চেঁচাতো—সম্রাট কনিষ্কের মুণ্ডু নিয়ে আমার বন্ধু একটা চৌকো ইঁদারায় বসে আছে, আমাকে সেখানে যেতে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও! পাগলের কল্পনা কত উদ্ভট হতে পারে সেই হিসেবেই ডাক্তার-লেখকটি এই গল্পের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন—চার পাঁচ পাতা জুড়ে আছে সেই বর্ণনা। ঘটনাটি সত্যি অদ্ভুত। সম্রাট কনিষ্ক মারা গেছেন স্বাভাবিক ভাবে—তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পর যদি কেউ বলে তাঁর এক বন্ধু কনিষ্কের মুণ্ডু নিয়ে একটা চৌকো ইঁদারায় বন্দী হয়ে আছে—তাহলে তার কল্পনা শক্তি থেকে অবাক হবারই কথা। পাগলদের মধ্যে এ খুব উঁচু জাতের পাগল। চীনা ডাক্তার তাই ওর কথা সবিস্তারে লিখেছেন। ঘটনাটা যে ভাবে ঐ বইতে আছে সেটা বললে তুই বুঝবি না। চীনে ভাষায় নামটাম অনেক বদলে গেছে, জায়গার নাম ওলোট পালোট হয়ে গেছে। যাই হোক, ঐ লেখাটার সঙ্গে ইতিহাসের কিছু কিছু ঘটনা মিলিয়ে আমার কাছে যে ভাবে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো, সেটাই তোকে বলছি।

কনিষ্কর কথা তো ইতিহাসে একটু একটু পড়েছিস। কুষাণ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন এই প্রথম কনিষ্ক। খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে উনি রাজত্ব করেছিলেন। এশিয়ার অনেকগুলো দেশ ছিল ওঁর অধীনে, আমাদের ভারতবর্ষেরও প্রায়

দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল কনিষ্কর শাসন। অন্যান্য রাজারা ওঁকে এমন ভয় পেত যে বিভিন্ন দেশের রাজপুত্রদের সম্রাট কনিষ্ক নিজের রাজ্যে নজরবন্দী করে রাখতেন বলে শোনা যায়। শুধু যে বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল কনিষ্কর তাই-ই নয়, সম্রাটের নিজেরও অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলে তখনকার লোকে বিশ্বাস করতো। পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি কনিষ্ক সম্পর্কে এই রকম একটা উপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন। আল বেরুনি-ও প্রায় একই রকম একটা কাহিনী বলেছেন তাঁর তাহকিক-ই-হিন্দ বইতে। চীনে ডাক্তারের সেই পাগলের গল্পের সঙ্গেও এসবের মিল আছে। তাই আমি কৌতূহলী হয়েছিলাম।

গল্পটা হচ্ছে এই। গান্ধারের সম্রাট কনিষ্ক ভারত আক্রমণ করে একটার পর একটা রাজ্য জয় করে চলেছেন। প্রবল তাঁর প্রতাপ, প্রাচ্য দেশের প্রায় সব রাজাই তাঁর নামে ভয় পায়। এদিকে তিনি রাজ্য জয় করে চলেছেন—আবার ধর্মের উন্নতির জন্য তিনি বৌদ্ধদের একটা মহা সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন—এমন কথাও শোনা যায়। প্রজাদের কাছ থেকে তিনি ভয় ও ভক্তি এক সঙ্গে আদায় করে নিতে জানতেন। যাই হোক, এই সময় একদিন কেউ একজন তাঁকে খুব সুন্দর দুটি কাপড় উপহার দেয়। কাপড় দুটো দেখে সম্রাট কনিষ্ক মুগ্ধ হলেন, একটা নিজের জন্য রেখে আর একটা পাঠিয়ে দিলেন রানীকে।

তারপর একদিন রানী সেই কাপড়খানা পরে সম্রাটের সামনে এসেছেন, সম্রাট তাকে দেখেই চমকে উঠলেন। রানীর ঠিক বুকের মাঝখানে কাপড়টার ওপরে গেরুয়া রঙে মানুষের হাত আঁকা।

রাজা ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, রানী! এ কী রকম শাড়ি পরেছো তুমি? ঐ হাতটা আঁকার মানে কী?

রানী বললেন, মহারাজ, এই কাপড়টা আপনিই পাঠিয়েছেন, আপনাকে খুশী করার জন্যই আমি আজ এটা পরেছি। আগে থেকেই কাপড়টাতে এই রকম হাত আঁকা ছিল।

শুনেই সম্রাট খুব রেগে গেলেন। তবে কি কেউ সম্রাটকে পুরোনো কাপড় উপহার দিয়ে গেছে? কারুর এতখানি স্পর্ধা হবে, এ তো ভাবাই যায় না! রাজকোষের রক্ষককে ডেকে সম্রাট জিগ্যেস করলেন, এর মানে কী? কে এই হাতের ছাপ এঁকেছে?

রাজকোষের রক্ষক বললেন, মহারাজ, এই ধরনের সব কাপড়ের

ওপরেই এই রকম হাতের ছাপ আঁকা থাকে।

সম্রাট হুকুম দিলেন, এই কাপড় যে উপহার দিয়েছে, তাকে ডাকো!

ডাকা হলো তাকে। সে বেচারী এসে ভয়ে ভয়ে বললো, সে এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। একজন বিদেশী বণিকের কাছে এই কাপড় দেখে তার খুব পছন্দ হয়েছিল, তাই উপহার এনেছিল সম্রাটের জন্য।

সম্রাট কনিষ্ক ব্যাপারটা সম্পর্কে খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, যেমন করে পারো, ধরে আনো সেই বণিককে। অশ্বারোহী সৈনিকরা ছুটে গেল। দুদিনের মধ্যেই সেই বণিককে ধরে এনে হাজির করলে সম্রাটের সামনে। দেখা গেল, বণিকের কাছে অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড় আছে, কিন্তু সবগুলিতেই ঐ রকম গেরুয়া রঙের হাতের ছাপ আঁকা রয়েছে।

সম্রাট বললেন, বণিক, যদি সত্যিকথা বলো, তোমার ভয় নেই। কোথা থেকে এমন সুন্দর কাপড় পেয়েছো? কেনই বা এতে মানুষের হাতের ছাপ আঁকা।

বণিক ভয়ে ভয়ে হাতজোড় করে বললো, মহারাজ, এই কাপড় আমি এনেছি দক্ষিণ ভারত থেকে। সেখানে সাতবাহন নামে এক রাজা আছেন। প্রত্যেক বছর এই কাপড় তৈরী করার পর সেই রাজার কাছে আনা হয়। তিনি সমস্ত কাপড়ের ওপরে নিজের হাতের ছাপ এঁকে দেন। ছাপটা ঠিক এমনভাবে পড়ে যে কোনো পুরুষ এই কাপড় পরিধান করলে ছাপটা থাকবে ঠিক তার পিঠে, আর কোনো মেয়ে পরিধান করলে থাকবে তার বুকে।

সম্রাটের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো, রাগে থমথমে হলো মুখ। রাজসভার অমাত্যদের বললেন, কাপড়গুলো পরে দেখতে। বণিকের কথাই সত্যি, প্রত্যেকের পিঠেই হাতের ছাপ।

সম্রাট কনিষ্ক কোষ থেকে তলোয়ার খুলে মেঘ গর্জনের মত গম্ভীর গলায় বললেন, ঐ হাত কাটা অবস্থায় আমি দেখতে চাই। এখুনি দূত চলে যাক দাক্ষিণাত্যে, গিয়ে সেই উদ্ধত রাজা সাতবাহনকে বলুক, সে তার দুটো হাত ও দুটো পা কেটে যদি আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে আমি তার রাজ্য আক্রমণ করবো না। যদি না দেয়, তাহলে শীঘ্রই আমি আসছি।

দূত ছুটে গেল সাতবাহনের রাজ্যে। তখন সম্রাট কনিষ্কর

সেনাবাহিনীকে ভয় করে না এমন কোনো রাজা নেই। কনিষ্কের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার কোনোই আশা নেই সাতবাহনের। কিন্তু সাতবাহনের মন্ত্রীরা রাজাকে খুব ভালোবাসতেন। রাজাকে বাঁচাবার জন্য তাঁরা সবাই মিলে একটা বুদ্ধি বার করলেন! তাঁরা দূতকে বললেন, আমাদের রাজা সাতবাহন বড্ড ভালো মানুষ, তিনি রাজকার্য কিছুই দেখেন না। তিনি কখন কোথায় থাকেন, তাও জানা যায় না। আমরা মন্ত্রীরাই রাজ্য চালাই। সম্রাটকে জিগ্যেস করে এসো, আমরা কি আমাদের সবার হাত পা কেটে পাঠাবো?

সম্রাট কনিষ্ক দূতের মুখে সেই কথা শুনে বললেন, সৈন্য সাজাও। আমি নিজে ওদের শিক্ষা দিতে যাবো। হাতি, ঘোড়া, রথ নিয়ে কনিষ্কর বিরাট সৈন্যবাহিনী চললো দাক্ষিণাত্যে।

সাতবাহন রাজার মন্ত্রীরা সেই খবর শুনে রাজাকে লুকিয়ে রাখলেন মাটির তলায় একটা গোপন গুহায়। তারপর সোনা দিয়ে অবিকল সাতবাহনের মতন একটা মূর্তি বানিয়ে তাতেই রাজার পোশাক পরিয়ে নিয়ে গেলেন বাহিনীর সামনে। কনিষ্ক সেই মূর্তি-টাকে বন্দী করে ছলনা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বক্রহাস্যে সাতবাহন রাজার মন্ত্রীদের বললেন, তোমরা শুধু আমার সেনা-বাহিনীর ক্ষমতা দেখেছো, আমার নিজস্ব ক্ষমতা এখনো দেখোনি। এইবার সেটা দ্যাখো।

সম্রাট কনিষ্ক নিজের তলোয়ার দিয়ে সেই সোনার মূর্তির হাত ও পা দুটো কেটে ফেললেন। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই অলৌকিক উপায়ে মাটির নিচে গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাতবাহন রাজার হাত ও পা দুটোও কেটে পড়ে গেল।

আল বেরুনি যে কাহিনী বলেছেন, সেটা একটু অন্যরকম। কিন্তু তাতে সম্রাট কনিষ্কর আরও বেশী অলৌকিক শক্তির পরিচয় আছে। সেখানে কনিষ্ককে বলা হয়েছে পেশোয়ারের রাজা কনিষ্ক আর সাতবাহনের জায়গায় আছে কনৌজের রাজা। এবং কাপড়ের ওপরে হাতের ছাপের বদলে পায়ের ছাপ। যাই হোক, এটাও যে কনিষ্ক সম্পর্কে উপাখ্যান তা ঠিক বোঝা যায়। এতেও দেখা যায়, কনৌজের রাজার এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাজাকে বাঁচাবার জন্য লুকিয়ে রেখে, বিশ্বাসঘাতকের ভান করে কনিষ্কর সেনাবাহিনীকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় মরুভূমির মধ্যে। সেখানে জলের অভাবে সৈন্যরা হাহাকার করতে লাগলো, যুদ্ধে হেরে যাবার মতন অবস্থা। তখন মহাপরাক্রান্ত

সম্রাট কনিষ্ক সেই মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, তোমার ধারণা, আমি শুধু সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এতবড় সাম্রাজ্য গড়েছি? এইবার আমার নিজের ক্ষমতা দ্যাখো!

সম্রাট কনিষ্ক তখন প্রকাণ্ড এক বর্শা নিয়ে সাংঘাতিক জোরে সেই মরুভূমির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখান দিয়ে ঝর্ণার জলের ধারা বেরিয়ে এলো। কনিষ্ক সেই মন্ত্রীকে বললেন, যাও, এবার তোমার রাজার কাছে যাও। গিয়ে দেখে এসো, সেই রাজা এখন কেমন আছে। মন্ত্রী গিয়ে দেখলেন, লুকিয়ে থাকা অবস্থাতেই কনৌজের রাজার হাত পা কেটে টুকরো হয়ে পড়ে আছে। কনিষ্ক যে আগেও অনেকবার এরকম অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন, তারও উল্লেখ আছে। তখনকার দিনে লোকের ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কনিষ্ক শুধু সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধে জেতেন না। তাঁর মাথাটাই সব—আশ্চর্য তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা।

আবার চুরুট জ্বালিয়ে কাকাবাবু বললেন, এর পরের ঘটনা আমি পেয়েছি চীনে ডাক্তারের লেখা সেই পাগলের কাহিনী থেকে। অর্থাৎ কিছু কিছু ঘটনা পেয়েছি সেই পাগলের গল্প থেকে—তার সঙ্গে অন্য উপাদান মিলিয়ে আমি ব্যাপারটা জুড়ে নিয়েছি। সাতবাহন রাজার মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, বংশের লোকেরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। কিন্তু রাজপরিবার ও মন্ত্রীপরিবারের কয়েকজন পুরুষ ঐ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য দারুণ প্রতিজ্ঞা করে। তারা ঠিক করে, ছদ্মবেশ ধরে বা যে-কোনো উপায়েই হোক, তারা কনিষ্ককে গুপ্তহত্যা করবে—এজন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত। এই জন্য একদল লোক ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরেও তারা যায়। কনিষ্ক যখন যেখানে যাবেন, তারা তাঁকে সেখানেই খুন করার চেষ্টা করবে। কিন্তু কনিষ্কর মতন এতবড় একজন সম্রাটের রক্ষীবাহিনীকে অতিক্রম করে তাঁকে খুন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তারা শেষ পর্যন্ত কনিষ্ককে খুন করতে পারেনি। এদিকে অহংকারী সম্রাট কনিষ্ক তাঁর জীবিতকালেই নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, তাঁর মস্তিষ্কের অলৌকিক শক্তির জন্যই তাঁর এত প্রতিষ্ঠা। সেইজন্য তাঁর বিশেষ নির্দেশে তাঁর মূর্তির মাথার ভেতরে তাঁর কীর্তিকাহিনী সব খোদাই করে রাখা হয়। সাতবাহন বংশের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পুরুষেরা কনিষ্ককে হত্যা করতে না পেরে তাঁর মূর্তির মুণ্ডু ভেঙে নিয়ে যায়। কনিষ্কর যে দুটি

মূর্তি পাওয়া গেছে, দুটিরই মাথা এই জন্য ভাঙা।

চীনে ডাক্তার সেই পাগলের কাহিনীতে ভেবেছিলেন বুঝি পাগলটা সত্যিকারের কনিষ্কর কাটামুণ্ডুর কথা বলতো। কিন্তু কনিষ্ক যে সেভাবে মারা যায়নি, তা সেকালের সবারই জানা ছিল। পড়ে আমার মনে হলো, আসলে পাথরের মূর্তির মাথার কথাই বলেছিল সে।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম। সাতবাহন বংশের সেই পুরুষরা নিজেদের নাম দিয়েছিল সপ্তক বাহিনী। মহাভারতে যেমন সংসপ্তকদের কথা আছে—অর্থাৎ যারা নিজের জীবন দিয়েও প্রতিজ্ঞা পালন করতে চায়। সেই সপ্তক বাহিনীর দুজন লোক চলে যায় কান্দাহার পর্যন্ত। সেখান থেকে কনিষ্ক মূর্তির মাথাটা ভেঙে নেয়। তাদের ইচ্ছে ছিল সেই ভাঙা মুণ্ডু সাতবাহন রাজার বিধবা রানীর পায়ের কাছে রাখবে। তিনি সেটাতে পদাঘাত করে শোকের জ্বালা কিছুটা জুড়োবেন। কিন্তু কাশ্মীরের কাছে এসে তারা আটকে যায়। এটাই ছিল তখন যাতায়াতের রাস্তা। ফেরার পথে যখন তারা কাশ্মীরে এসে পৌঁছয়, তখন এখানে দারুণ গৃহযুদ্ধ বেধে গেছে। রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ আছে যে, কাশ্মীরেও একজন রাজার নাম ছিল কনিষ্ক। সেই কনিষ্ক আর আমাদের কনিষ্ক যদি এক হয় তা হলে কনিষ্কর মৃত্যুর পর এখানে হানাহানি শুরু হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। এখানে তখন বিদেশী দেখলেই বন্দী কিংবা হত্যা করা হচ্ছে। সপ্তক বাহিনীর লোক দুটি পড়লো মহাবিপদে। তারা দক্ষিণ ভারতের মানুষ, তাদের চেহারা দেখলেই চেনা যাবে। গণ্ডগোল কমার অপেক্ষায় তারা এখানে এক জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। মাটিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

কতদিন তাদের সেই গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল, তা বলা শক্ত। কাশ্মীরে তখন চরম অরাজকতা চলছিল, তার মধ্যে বিদেশী মানুষ হিসেবে তাদের বিপদ ছিল খুবই। কিন্তু দিনের পর দিন তো মানুষ আর গর্তের মধ্যে বসে থাকতে পারে না। তাদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই পালা করে বেরুতো রাত্তিরবেলা। খাবারদাবার সংগ্রহ করতো, খোঁজখবর আনতো। আমার কি মনে হয় জানিস, এখানকার গ্রামে যে হাকো সম্পর্কে গল্প প্রচলিত আছে—সেটা ঐ সপ্তক বাহিনীর একজন সম্পর্কে হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। রাত্তিরবেলা এই শীতে এখানে কেউ ঘোড়া চালায় না। সেকালে কেউ হয়তো মধ্য রাত্রে

একজন অশ্বারোহীকে দেখে ফেলেছিল, তার হাতে থাকতো মশাল—অমনি এক অলৌকিক গল্প। প্রাকৃতিক কারণে এখানকার পাহাড়-টাহারে কোথাও বোধহয় ঘোড়ার ক্ষুরের মতন শব্দ হয়—তার সঙ্গে ঐ কাহিনী মিশিয়ে ফেলেছে। সপ্তক থেকে হাকো হওয়া অসম্ভব নয়। মুখে মুখে উচ্চারণ এ রকম অনেক বদলে যায়। এখানে যে-জায়গাটার নাম এখন বানীহাল, আগে নাকি সেটার নাম ছিল বনশালা।

সেই দুজনের মধ্যে একজন এক রাত্তিরবেলা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে এক দস্যুদলের হাতে ধরা পড়ে যায়। একা সে লড়াই করেও নিজেকে ছাড়াতে পারেনি। দস্যুদল তাকে কালিকট বন্দরে নিয়ে গিয়ে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। তখন ক্রীতদাস প্রথা ছিল, জানিস তো? সেখানে লোকটি পাগল হয়ে যায়। আসলে তার সঙ্গী সেই গুহার মধ্যে সাহায্যের প্রতীক্ষায় বসে আছে—সে কোথায় চলে গেল জানতেও পারলো না—এই চিন্তাই তাকে পাগল করে দেয়। বিশেষত, সঙ্গী যদি ভাবে যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে এসেছে—এই চিন্তাই বেশী কষ্ট দিত তাকে। কারণ, তখনকার দিনে মানুষ প্রতিজ্ঞার খুব দাম দিত। সেইজন্যই সে সব সময় চিৎকার করে করে ঐ কথা বলে সাহায্য চাইতো পথের মানুষের কাছে। এমন কি অন্য কেউ যদি তার কথা শুনে সাহায্য করতে যায়—এইজন্য জায়গাটা এবং গুহার বর্ণনাও সে চেঁচিয়ে বলতো। কিন্তু সবটাই গাঁজাখুরি কিংবা পাগলের প্রলাপ বলে লোকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। একটা গুহার মধ্যে একজন লোক সম্রাট কনিষ্কর কাটা মুণ্ডু নিয়ে বসে আছে, একথা কে বিশ্বাস করবে!

চীনে ডাক্তারের সেই লেখা আর ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান মিলিয়ে আমি এই ব্যাপারটা মনে মনে খাড়া করেছিলাম। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করার সময়ও এই সব ব্যাপার নিয়ে আমি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। কিন্তু আর কারুকে বলিনি। ইতিহাসে এ-রকম অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার আছে। কিন্তু প্রমাণিত না হলে কেউ বিশ্বাস করে না। আমারও এক এক সময় মনে হতো পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যে। আবার কোন সময় মনে হতো—যদি সত্যি হয়, তাহলে ইতিহাসের একটা মহামূল্যবান জিনিস মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকবে? তাই আমি নিজে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।

চুরুটটা ফেলে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, এই সামান্য পাথরের টুকরোটার কত দাম এখন বুঝতে পারছিস? এর ভেতরে খোদাই

করা লিপির যখন পাঠোদ্ধার হবে—ইতিহাসের কত অজানা তথ্য যে জানা হয়ে যাবে তখন ! সাধারণ মানুষের কাছে এর কোনো মূল্য নেই। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে এর যা দাম, তা টাকা দিয়ে যাচাই করা যায় না। তবে, টাকার দামেও এর অনেক দাম আছে। বিদেশের অনেক মিউজিয়াম এটা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনতে চাইবে। আমরা অবশ্য কারুর কাছে এটা বিক্রি করবো না, কি বলিস ? আমরা ভারতের জাতীয় মিউজিয়ামকে এটা দান করবো। নানা দেশের মানুষ এটা দেখতে আসবে কলকাতায়। চল্, এবার আমাদের ফিরতে হবে।

আমি অভিভূতভাবে কাকাবাবুর গল্প শুনছিলাম। শুনতে শুনতে আমি চলে গিয়েছিলাম প্রাচীন ভারতের সেই সব জাঁকজমকের দিনে। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম সম্রাট কনিষ্ককে। পুরু দুটি ঠোঁট, চোখের দৃষ্টিতে প্রচণ্ড অহংকার, চৌকো ধরনের চোয়াল আর স্তক বাহিনীর সেই দুটি লোক। একজন মাটির তলার গুহায় পাথরের মূর্তিটি নিয়ে বসে আছি, আর একজন রাত্তিরবেলা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, হাতে মশাল...। কাকাবাবুর কথায় ঘোর ভেঙে গেল।

খুব সাবধানে বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, শোন সন্তু, এসম্পর্কে এখন কারুকে একটা কথাও বলবি না। কারুকে না। আমরা আজই পহলগ্রামে ফিরে যাবার চেষ্টা করবো। যদি প্লেনের টিকিট পাওয়া যায়, কাল পরশুর মধ্যেই ফিরে যাবো দিল্লি। সেখানে প্রেস কনফারেন্স করে সবাইকে জানাবো। তার আগে এটা সাবধানে জমা রাখতে হবে সরকারের কাছে। সন্তু, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। সারা জীবনে কখনো আমি এত আনন্দ পাইনি। মানুষ হয়ে জন্মালে অন্তত একটা কিছু মূল্যবান কাজ করে যাওয়া উচিত। এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ।

বিপদের পর বিপদ

গ্রামে ফিরে গিয়েই আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলাম সোনমার্গের দিকে। কাকাবাবু আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে রাজী নন। খাবারদাবার তৈরী হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো আমরা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। কাকাবাবু বললেন, পথে কোনো নদীর ধারে বসে খেয়ে নিলেই হবে।

গ্রামের বেশ কয়েকজন লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এলো। আমরা এ রকম হঠাৎ চলে যাবো শুনে তারা তো অবাক ! কেনই বা ওদের গ্রামে থাকতে এসেছিলাম, কেনই বা চলে যাচ্ছি এত তাড়াতাড়ি, তা ওরা কিছুই বুঝলো না। ওরা আমাদের সম্পর্কে কি ধারণা করছে কে জানে ! ওরা কেউ বাংলাদেশের নাম শোনেনি—কলকাতা শহরের নাম শুনেছে মাত্র দুজন। ঐসব লোকেরা ইতিমধ্যে ভালোবেসে ফেলেছিল আমাদের। একজন মুসলমান বৃদ্ধ আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে কেঁদেই ফেললেন। আবু তালেব আর হুন্দা তো এলোই সোনমার্গ পর্যন্ত।

সোনমার্গে এসে আমরা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। বাসের আর পাত্তা নেই। বিকেল হয়ে এসেছে, এর পর আর বেশিক্ষণ বাস বা গাড়ি চলবেও না এ পথে। কাকাবাবু চেষ্টা করলেন কোনো জিপ ভাড়া করার জন্য। তাও পাওয়া গেল না। একটু বাদে একটা স্টেশন ওয়াগন হুস করে থামলো আমাদের সামনে। সামনের সীট থেকে দাড়িওয়ালা একটা মুখ বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করলো, কী প্রোফেসারসাব, পহলগাম ফিরবেন নাকি ?

সুচা সিং। আশ্চর্যের ব্যাপার আমরা যখনই কোনো জায়গায় যাবার চেষ্টা করি, ঠিক সুচা সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ওঁকে দেখে কাকাবাবু এই প্রথম একটু খুশী হলেন। নিজেই অনুরোধ করে বললেন, কী সিংজী, আমাদের একটু পহলগাম পৌঁছে দেবে নাকি ? আমরা গাড়ি পাচ্ছি না।

সুচা সিং গাড়ি থেকে নেমে এসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! আপনি আমার গাড়িতে চড়বেন এ তো আমার ভাগ্য ! আসুন, আসুন ! কী খোকাবাবু, গাল দুটো খুব লাল হয়েছে দেখছি। খুব আপেল খেয়েছো বুঝি ?

কাকাবাবু বললেন, সিংজী, তোমার গাড়ির যা ভাড়া হয় তা আমি দেবো। তোমার ব্যবসা, আমরা এমনি এমনি চড়তে চাই না।

সুচা সিং একগাল হেসে বললেন, আপনার সঙ্গেও ব্যবসার সম্পর্ক ? আপনি একটা মানী গুণী লোক। তাছাড়া, আজ আমি শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরছি, আজ তো আমি ব্যবসা করতে আসিনি। আপনাকে বলেছিলাম না, আমি কাশ্মীরী মেয়ে বিয়ে করেছি ? এইদিকেই বাড়ি—

গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ির পেছনে নানান রকমের ফলের

ঝুড়িতে ভর্তি। সুচা সিং বোধহয় ওসব উপহার পেয়েছেন শ্বশুর-বাড়ি থেকে। আমরা আমাদের জিনিসপত্র পেছনেই রাখলাম, কিন্তু সেই আমার বাক্সটা কাকাবাবু একটা কাঠের বাক্সে ভরে নিয়েছিলেন, সেটা কাকাবাবু খুব সাবধানে নিজের কাছে রাখলেন।

গাড়ি ছাড়ার পর সুচা সিং বললেন, প্রোফেসারসাব, আপনার এদিককার কাজ কর্ম হয়ে গেল ? কিছু পেলেন ?

কাকাবাবু উদাসীনভাবে উত্তর দিলেন, না, কিছু পাইনি। আমি এবার ফিরে যাবো।

—ফিরে যাবেন ? এর মধ্যেই ফিরে যাবেন ? আর কিছু দিন দেখুন !

—নাঃ, আমার দ্বারা এসব কাজ হবে না বুঝতে পারছি। তাছাড়া গন্ধকের খনি এখানে বোধহয় পাবার সম্ভাবনা নেই।

—ওসব গন্ধক-টন্ধক ছাড়ুন ! আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি, এখানকার মাটির নিচে সোনা আছে। মাটন্-এর দিকে যদি খোঁজ করতে চান, বলুন, আমি আপনাকে সব রকম সাহায্য করবো।

—তুমি অন্য লোককে দিয়ে চেষ্টা করো সিংজী, আমাকে দিয়ে হবে না।

—কেন প্রোফেসারসাব, আপনি এত নিরাশ হচ্ছেন কেন ? আপনাকে আমি লোকজন, গাড়ি-টাড়ি সব দেব—আপনি শুধু বাংলাবেন !

—আমি বুড়ো হয়ে গেছি। পায়েও জোর নেই। আমি একটু খাটাখাটি করলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি, আমার দ্বারা কি ওসব হয় !

—আপনার ঐ বাক্সটার মধ্যে কী আছে ?

কাকাবাবু তাড়াতাড়ি বাক্সটার গায়ে ভালো করে হাত চাপা দিয়ে বললেন, ও কিছু না, দু' একটা টুকিটাকি জিনিসপত্তর।

—কী আছে, বলুন না ! আমি কি নিয়ে নিচ্ছি নাকি ? হাঃ হাঃ—

আমি সুচা সিংকে নিরস্ত করবার জন্য বলে ফেললাম, ওর মধ্যে একটা পাথর আছে। আর কিছু নেই !

বলেই বুঝলাম ভুল করেছি। কাকাবাবু আমার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন। সুচা সিং ভুরু কুঁচকে বললেন, পাথর ? একটা পাথর অত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছেন ? সোনাটোনার স্যাম্পেল নাকি ? সোনা তো পাথরের সঙ্গেই মিশে থাকে !

কাকাবাবু কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বললেন, আরে ধ্যাৎ, সেসব কিছু না। তুমি খালি সোনার স্বপ্ন দেখছো। এটা একটা কালো রঙের পাথর, দেখে ভালো লাগলো, তাই নিয়ে যাচ্ছি !

—আলাদা বাক্সে কালো পাথর ? এদিকে কালো পাথর পাওয়া যায় বলে তো কখনো শুনিনি। প্রোফেসার, আমাকে একটু দেখাবেন ?

—পরে দেখবে। এখন এটা খোলা যাবে না।

—কেন, খোলা যাবে না কেন ? সামান্য একটা বাক্স খোলা যাবে না ? দিন, আমি খুলে দিচ্ছি ?

এক হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে সুচা সিং একটা হাত বাড়ালেন বাক্সটা নেবার জন্য।

কাকাবাবু বাক্সটা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, না এখন না। বলছি তো, এখন খোলা যাবে না !

সুচা সিং তবু হাত বাড়িয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দিন না, একটু দেখি ! পাথর নিয়ে যাচ্ছেন, না লুকিয়ে লুকিয়ে সোনার স্যাম্পেল নিয়ে যাচ্ছেন, সেটা একটু দেখবো না ! ভয় নেই, ভাগ বসাবো না। শুধু দেখে একটু চক্ষু সার্থক করবো !

কাকাবাবু হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, না, এ বাক্সে হাত দেবে না। বারণ করছি, শুনছো না কেন ?

সুচা সিং কঠিন চোখে তাকালেন কাকাবাবুর দিকে। স্থির ভাবে। তাকিয়েই রইলেন দু' এক মিনিট। আমি বুঝতে পারলাম, ওঁর মনে আঘাত লেগেছে। কাকাবাবুর দিক থেকে মুখ ফেরালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, প্রোফেসারসাব, আমার নাম সুচা সিং। আমাকে এ তল্লাটের অনেকে চেনে। আমাকে কেউ ধমক দিয়ে কথা বলে না।

কাকাবাবু তখনও রাগের সঙ্গে বললেন, আমি বারণ করলেও কেউ আমার জিনিসে হাত দেবে, সেটাও আমি পছন্দ করি না। তুমি আমার সঙ্গে চোখ রাঙিয়ে কথা বলো না !

সুচা সিং বাক্সটার দিকে একবার, কাকাবাবুর মুখের দিকে একবার তাকালেন। আমার ভয় হলো, সুচা সিং যে-রকম রেগে গেছেন, যদি এখানেই গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলেন ! এখনও যে অনেকটা রাস্তা বাকী !

সুচা সিং কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, প্রোফেসারসাব, আপনি হঠাৎ এত রেগে গেলেন কেন ? একটা সামান্য পাথরও আপনি আমায় দেখাতে চান না ! ঠিক আছে, দেখাবেন

না। আমি কি আর জোর করে দেখবো ? আমি আপনাকে কত ভক্তি শ্রদ্ধা করি ! আপনার মতন মানী গুণী লোক তো বেশী দেখি না। সারাদিন ব্যবসার ধান্দায় থাকি, তবু আপনাদের মতন লোকের সঙ্গে দুটো কথা বললে ভালো লাগে। আপনি আমার ওপর রাগ করছেন !

কাকাবাবু তখনও রেগে আছেন, স্পষ্ট বোঝা যায়। তবু একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললেন, কেউ কোনো কিছু একবার না বললে, তারপর আর সে নিয়ে জোর করতে নেই। তাহলেই রাগের কোনো কারণ ঘটে না।

—ঠিক আছে, আমার গোস্তাকি হয়েছে। আমাকে মাপ করে দিন। তা প্রোফেসারসাব, সোনমার্গ ছেড়ে দিলেন, এবার কি অন্য কোনো দিকে কাজ শুরু করবেন !

—না, আর কাজ-টাজ করার মন নেই। এবার কলকাতায় ফিরবো !

—সে কি, এত খাটাখাটি করে শেষ পর্যন্ত একটা পাথরের টুকরো নিয়ে ঘর যাবেন ?

—ওটা একটা স্মৃতিচিহ্ন !

এরপর কিছুক্ষণ কেউ আর কোনো কথা বললো না। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, কাকাবাবুর রাগ এখনো কমেনি, কাকাবাবু এমনিতে শান্ত ধরনের মানুষ, কিন্তু একবার রেগে গেলে সহজে রাগ কমে না। ঐ বাক্সটা তিনি আর কারুকে ছুঁতে দিতেও চান না।

একটু বাদে সুচা সিং আবার বললেন, প্রোফেসারসাব, আপনার কোটের পকেট থেকে একটা রিভলবার উঁকি মারছে দেখলাম। সব সময় অস্ত্র নিয়ে ঘোরেন নাকি ?

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, জন্তু-জানোয়ার কিংবা দুষ্ট লোকের তো অভাব নেই। তাই সাবধানে থাকতে হয়।

সুচা সিং হেসে হেসে বললেন, সে কথা ঠিক, সে কথা ঠিক !

পহলগামে এসে পৌঁছুলাম সন্ধের পর। নটা বেজে গেছে। গাড়ি থেকে নামবার পর সুচা সিং কাকাবাবুর দেওয়া টাকা কিছুতেই নিলেন না। বরং কাকাবাবুর করমর্দন করে বললেন, প্রোফেসারসাব, আমি আপনার দোস্ত। গোসা করবেন না। যাবার আগে দেখা করে যাবেন ! খোকাবাবু, আবার দেখা হবে, কী বলো ?

আমার মনে হলো, সুচা সিং মানুষটা তেমন খারাপ নয়। কাকাবাবু ওর ওপর অমন রাগ না করলেই পারতেন।

পহলগামে লীদার নদীর ওপারে আমাদের তাঁবুটা রাখাই ছিল। যে রকম রেখে গিয়েছিলাম, জিনিসপত্তর ঠিক সেই রকমই আছে। সেখানে পৌঁছবার পর কাকাবাবু কাঠের বাক্সটা খুব সাবধানে তাঁর ট্রাঙ্কে ভরে রাখলেন। তারপর বললেন, সন্তু, তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটার কথা কারুকে বলবে না। আর এটাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করবে না। আমি যখন তাঁবুতে থাকবো না, তুমি তখন সব সময় এটার সামনে বসে থাকবে। আর তুমি না থাকলে আমি পাহারা দেবো। বুঝলে ?

আমি বললাম, কাকাবাবু, মুণ্ডুটা আমি তখন ভালো করে দেখিনি, আর একবার দেখবো এখন ?

কাকাবাবু উঠে গিয়ে আগে তাঁবুর সব পর্দাটর্দা ফেলে দিলেন। অন্য সব আলো নিভিয়ে শুধু একটা আলো জেবলে রেখে তারপর ট্রাঙ্ক থেকে বার করলেন কাঠের বাক্সটা। কাঠের বাক্সটার মধ্যে সেই পুরোনো তামার বাক্স, সেটার গায়েও এক সময় কী যেন লেখা ছিল— এখন আর পড়া যায় না।

পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে কাকাবাবু কনিষ্কর মুখ মুছতে লাগলেন। এখন তার কপাল, চোখ, ঠোঁটের রেখা অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ভাঙা নাক ও কান দুটো জোড়া দিলে সম্পূর্ণ মুখের আদল ফুটে উঠবে। কাকাবাবু কী স্নেহের সঙ্গে হাত বুলোচ্ছেন সেই পাথরের মূর্তিতে। আমার দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বললেন, সন্তু, এটার আবিষ্কার হিসেবে তোর নামও ইতিহাসে লেখা থাকবে !

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া করে আমরা খুব সকাল-সকাল শুয়ে পড়লাম। আজ রাত্তিরে আর কাকাবাবু ঘুমের ঘোরে কথা বলেননি একবারও। আজ তিনি সত্যিকারের শান্তিতে ঘুমিয়েছেন।

ভোরবেলা কাকাবাবুই আমাকে ডেকে তুললেন। এর মধ্যেই ওঁর দাড়ি কামানো হয়ে গেছে। কাকাবাবু বললেন, লীদার নদীর জলে রোদ্দুর পড়ে কী সুন্দর দেখাচ্ছে, দ্যাখো ! কাশ্মীর ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে তোমার মন কেমন করছে, না ?

—কাকাবাবু, আমরা কি আজই ফিরে যাবো ?

—প্লেনে কবে জায়গা পাই সেটা দেখতে হবে। আজ জায়গা পেলে আজই যেতে রাজী। তুমি সব জিনিসপত্তর বাঁধাছাঁদা করে ঠিক করে রাখো।

বেলা বাড়ার পর কাকাবাবু বললেন, সন্তু, তুমি তাঁবুতে থাকো,

আমি সব খোঁজখবর নিয়ে আসি। ব্যাসাম সাহেব আর ব্রতীন মুখার্জিকে দুটো টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে—ওঁরা কনিষ্ক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। আমি না আসা পর্যন্ত তুমি কিন্তু কোথাও যাবে না।

কাকাবাবু চলে গেলেন। আমি খাটে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়তে লাগলাম। একটা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। পড়তে পড়তে মনে হলো, আমরা নিজেরাও কম অ্যাডভেঞ্চার করিনি। গুহার মধ্যে হঠাৎ পড়ে যাওয়া, পাইথন সাপ—কলকাতায় আমার স্কুলের বন্ধুরা শুনলে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। কিন্তু এত বড় একটা আবিষ্কারের কথা কাগজে নিশ্চয়ই বেরুবে। তখন তো সবাইকে বিশ্বাস করতেই হবে।

কাকাবাবু জিগ্যেস করছিলেন, কাশ্মীর ছেড়ে যেতে আমার মন-কেমন করবে কি না! সত্যি কথা বলতে কি, আমার আর একটুও ভালো লাগছিল না থাকতে। যদিও শ্রীনগর দেখা হলো না, তাহলেও...। পৃথিবীর লোক কখন আমাদের আবিষ্কারের কথা জানবে, সেই উত্তেজনায় আমি ছটফট করছিলাম।

কতক্ষণ বই পড়েছিলাম জানি না। হোটেলের বেয়ারা যখন খাবার নিয়ে এলো তখন খেয়াল হলো। ওপারের হোটেল থেকে আমাদের তাঁবুতে খাবার নিয়ে আসে, কিন্তু কাকাবাবু তো এখনও এলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম কাকাবাবুর জন্য। তারপর খিদের যখন পেট চুঁই চুঁই করতে লাগলো, তখন খেয়ে নিলাম নিজের খাবারটা। কাকাবাবুর খাবারটা ঢাকা দিয়ে রাখলাম।

বিকেল গড়িয়ে গেল, তখনও কাকাবাবু এলেন না। দুশ্চিন্তা হতে লাগলো খুব। কাশ্মীরে এসে কাকাবাবু কক্ষনো একলা বেরোননি। সব সময় আমি সঙ্গে থেকেছি। কিন্তু এখন যে একজনকে তাঁবুতে পাহারা দিতে হবে! এত দেরী করার তো কোনো মানে হয় না। ছোট্ট জায়গা, পোস্ট আফিসে লাইন দিতেও হয় না কলকাতার মতন। কাকাবাবুর কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো? হঠাৎ জরুরী কাজে কারুর সঙ্গে দেখা করার জন্য কোথাও চলে যেতে হয়েছে? কিন্তু তাহলে কি আমায় খবর দিয়ে যেতেন না? কাকাবাবু তাঁবু থেকে বেরুতে বারণ করেছেন, আমি খোঁজ নিতে যেতেও পারছি না।

বিকেল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে রাত নেমে এলো। কাকাবাবুর দেখা নেই। এতক্ষণ একা-একা এই তাঁবুতে থেকে আমার কান্না পাচ্ছিল। কিছুই করার নেই, কারুর সঙ্গে কথা বলার নেই। কী যে

খারাপ লাগে! আমার বয়েসী কোনো ছেলে কি কখনো এতটা সময় একলা থাকে? সেই সকাল থেকে—এখন রাত সাড়ে ন'টা। মনে হচ্ছিল, তাঁবুর মধ্যে আমায় যেন কেউ বন্দী করে রেখেছে! কাকাবাবুর কাছে কথা দিয়েছি যে মুণ্ডুটাকে ফেলে রেখে আমি কোথাও যাবো না—তাই বেরুনোর উপায় নেই। যদিও, আমাদের কাছে যে এই মহা মূল্যবান জিনিসটা আছে সে কথা কেউ জানে না—তবু কাকাবাবুর হুকুম, সব সময় ওটা চোখে চোখে রাখা। এখন আমি কী করবো কে আমায় বলে দেবে?

রাত নিঝুম হবার পর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। এর আগে কোনোদিন আমি একলা কোথাও ঘুমোইনি। আমার ভয় করে। কিছুতেই ঘুম আসে না। খালি মনে হয়, কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। কাদের যেন পায়ের দুপদাপ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই দেখলাম, আমার মাথার কাছে একটা বিরাট লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে মনে হলো চোখের ভুল। একবার চোখ বন্ধ করে আর একবার তাকাতেই দেখলাম তখনো দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। প্রথমে মনে হলো, ইতিহাসের আমল থেকে বোধ হয় কোনো আত্মা এসেছে প্রতিশোধ নিতে। তারপরই বুঝলাম, তা নয়, আমি চিৎকার করে ওঠার আগেই মস্ত বড় একটা হাত আমার মুখ চেপে ধরলো। আমি সে হাতটা প্রাণপণ চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখলাম, তাঁবুর মধ্যে আরও দুজন লোক আছে। তাদের একজন আমার মুখের মধ্যে খানিকটা কাপড় ভরে দিয়ে মুখটা বেঁধে দিল। হাত আর পা দুটোও বাঁধলো। তারপর তারা তাঁবুর সব জিনিসপত্তর লণ্ডভণ্ড করতে লাগলো। একটু বাদেই তারা দুদ্দাড় করে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

ঘটনাটা ঘটতে দু' তিন মিনিটের বেশী সময় লাগলো না। আমার মুখ বন্ধ, হাত পা বাঁধা, কিন্তু দেখতে পেলাম সবই। কারণ ওরা মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালছিল। তাঁবুর সব জিনিস ওরা ওলোট পালোট করে গেল, কিন্তু ওরা একটা জিনিসই খুঁজতে এসেছিল।

এতদিন আমাদের তাঁবুটা এমনি পড়েছিল, কেউ কোনো জিনিস নেয়নি। আজ ডাকাতি হয়ে গেল। তবে, ওদের মধ্যে একজনকে আমি চিনতে পেরেছি। অন্ধকারে মুখ দেখা না গেলেও যে-হাতটা আমার মুখ চেপে ধরেছিল, সেই হাতটার একটা আঙুল কাটা ছিল।

সুচা সিং-এর একটা আঙুল নেই।

ওরা চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ আমি চুপ করে শুয়ে রইলাম। যতক্ষণ ওরা তাঁবুতে ছিল, ততক্ষণ খালি মনে হচ্ছিল ওরা যাবার সময় আমাকে মেরে ফেলবে।

বেশ খানিকটা পর আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। হাত বাঁধা, চ্যাঁচাবারও উপায় নেই। কিন্তু এই অবস্থায় তো সারারাত কাটানো যায় না।

আস্তে আস্তে নামলাম খাট থেকে। জোড়া পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোবার চেষ্টা করলাম। দুবার পড়ে গেলাম হুমড়ি খেয়ে, তবু এগুনো যায়। ইস্কুলের স্পোর্টসে স্যাক রেস-এ দৌড়েছিলাম আমি, অনেকটা সেই রকম, কিন্তু বুক এমন কাঁপছে যে ব্যালেন্স রাখতে পারছি না।

কোনো রকমে পৌঁছুলাম টেবিলের কাছে। ড্রয়ার খুলে বার করলাম ছুরিটা। কিন্তু ছুরিটা ঠিক মতন ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই। অতি কষ্টে ছুরিটা বেঁকিয়ে ঘষতে লাগলাম হাতের দড়ির বাঁধনে। প্রথমে মনে হলো, এটা একটা অসম্ভব কাজ। এ ভাবে সারা রাত ঘষেও দড়ি কাটা যাবে না—কারণ আঙুলে জোর পাচ্ছি না। শীতে আমি বাঁশ পাতার মতন কাঁপছি। কিন্তু বিপদের সময় মানুষের এমন মনের জোর এসে যায় যে অসম্ভবও সম্ভব হয় অনেক সময়। একবার ছুরিটা পড়ে গেল মাটিতে। সেটা তুলতে গিয়ে আমি নিজেও পড়ে গেলাম—একটুর জন্য আমার গালটা কাটেনি। সেই অবস্থায়, মাটিতে শুয়ে শুয়েই আমার মনে হলো, ঘাবড়ালে কোনো লাভ নেই, কান্নাকাটি করলেও কোনো ফল হবে না—আমাকে উঠে দাঁড়াতেই হবে, কাটতেই হবে হাতের বাঁধন। ছুরিটা নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগলো কাটতে, ততক্ষণে আমার হাত দুটো প্রায় অসাড় হয়ে এসেছে। মুখ ও পায়ের বাঁধন খুলে ফেললাম। এঃ, আমার মুখের মধ্যে এমন একটা ময়লা রুমাল ভরে দিয়েছিল যে দেখেই আমার বমি পেয়ে গেল, বমি করে ফেললাম মাটিতে। এই সময় বমি করার কোনো মানে হয়? কিন্তু রুমালটায় এমন বিশ্রী গন্ধ যে কিছুতেই সামলানো গেল না। ফ্লাস্কের গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেললাম। তাও, ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম শীতে।

তাঁবুর মধ্যে এক নজর তাকিয়েই বোঝা যায়, ওরা সেই কাঠের

বাক্সটা নিয়ে গেছে। পাথরের মুণ্ডুটার কোনো মূল্যই ওদের কাছে নেই—তবু কেন নিলে গেল? হয়তো ওরা নষ্ট করে ফেলবে। ওরা কি কাকাবাবুকে মেরে ফেলেছে? ওরা কি আমাকেও মারবে?

ডাকাতের বউ আর ছেলেমেয়ে

বিপদের রাত্রি অনেক দেরী করে শেষ হয়। সারা রাত কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটের ওপর বসেছিলাম। চোখ ঢুলে আসছিল, তবু ঘুমোইনি। আস্তে আস্তে যখন সকাল হলো, তখন মনের মধ্যে একটু জোর পেলাম। দিনের আলোয় অনেকটা সাহস আসে। মনে মনে ঠিক করলাম, ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, কাকাবাবুকে খুঁজে বার করতে হবে।

কিন্তু আমি একলা একলা কী করবো? কেউ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? বাচ্চা ছেলে বলে হয়তো আমার কথা উড়িয়ে দেবে। কাকাবাবুর মতন একজন বয়স্ক জলজ্যান্ত লোক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সুচা সিং-এর হাত আছে তাতে। কাকাবাবু থাকতে থাকতে মূর্তিটা নিতে সাহস করেনি। কাকাবাবুর সঙ্গে রিভলবার থাকে। তাই কাকাবাবুকে আগে সরিয়ে তারপর জিনিসটা নিয়ে যাওয়া হলো! সুচা সিং-এর অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি, ওঁর বিরুদ্ধে আমার কথা কে শুনবে?

আমাদের পাশের তাঁবুতে কয়েকজন জার্মান ছেলেমেয়ে থাকে। একটু একটু আলাপ হয়েছিল। ওদেরও বলে কোনো লাভ নেই, ওরা বিদেশী, কী আর সাহায্য করতে পারবে? চট করে মনে পড়ে গেল সিদ্ধার্থদার কথা। সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি, রিণি—ওরা কি অমরনাথ থেকে ফিরেছে? হয়তো এর মধ্যেই ফিরে শ্রীনগর চলে গেছে। এর মধ্যে ক'দিন কেটে গেল—অমরনাথ থেকে ফিরতে ক'দিন লাগে—সেটা আর কিছুতেই হিসেব করতে পারছি না। খালি মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, অমরনাথ থেকে ফিরলে নিশ্চয়ই প্লাজা হোটেলে উঠবে, সেখানে খবর পাওয়া যাবে।

কাকাবাবু বলেছিলেন, কোনোক্রমেই তাঁবু থেকে না বেরুতে। কিন্তু যে-জন্য বলেছিলেন, তার তো আর কোনো দরকার নেই। আসল জিনিসটাই চুরি হয়ে গেছে। আমাদের তাঁবুতে আর দামী জিনিস বিশেষ কিছু নেই। কাকাবাবু টাকা পয়সা কোথায় রাখতেন আমি

জানি না—সেগুলোও বোধহয় ডাকাতরা নিয়ে গেছে। হোটেলের বিল কী করে শোধ হবে কে জানে! সিদ্ধার্থদাদের না পেলে চলবেই না।

হেঁটে হেঁটে গেলাম প্লাজা হোটেলে। সেখানে কোনো খবরই পাওয়া গেল না। সিদ্ধার্থদারা হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন অমরনাথে—ফিরে এসেছেন কিনা ওঁরা জানেন না। ফেরার পর রিজার্ভেশানও করা নেই। এর মধ্যে ফিরে এসে অন্য হোটেলেও উঠতে পারেন বা শ্রীনগরে চলে যেতে পারেন। আবার এখনও ফিরতে নাও পারেন, অর্থাৎ আমি কিছুই জানতে পারলাম না। তবে, পোপোটলাল নামে একজন পান্ডা গিয়েছিলেন ওঁদের সঙ্গে—তার খোঁজ পেলে সব জানা যেতে পারে। পান্ডাজী যদি ফিরে থাকেন, তবে তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে সব খবরাখবর। পোপোটলালের ঠিকানা? ঠিকানা কিছু নেই—বাজারের কাছে গিয়ে খোঁজ করলে লোকে বলে দেবে।

নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম প্লাজা হোটেল থেকে। কোথায় এখন পোপোটলালকে পাবো? মানুষ হারিয়ে গেলে পুলিশকে খবর দিতে হয় শুনেছি। কাকাবাবুর কথা পুলিশকে জানাতে হবে।

পহলগামের রাস্তা দিয়ে এখন কত মানুষজন হাঁটছে, কত আনন্দ সবার মুখে চোখে। আমার বিপদের কথা কেউ জানে না। আমাকে কেউ ডেকে জিজ্ঞেস করলো না, খোকা, তোমার মুখটা এমন শুকনো দেখছি কেন? তোমার কি কিছু হয়েছে? আমারই বয়েসী কত ছেলে-মেয়ে হৈ চৈ করতে করতে যাচ্ছে বেড়াতে। আমার কেউ চেনা নেই। কলকাতায় বাবাকে টেলিগ্রাম করবো? বাবা আসতে আসতে যে সময় লাগবে ততদিন আমি একা...

হাঁটতে হাঁটতে বাস ডিপোর দিকে চলে এসেছিলাম। দু' একটা দোকানে জিজ্ঞেস করেছি পোপোটলালের খবর। কেউ কিছু বলতে পারেনি। এখন খুব টুরিস্ট আসার সময়—দোকানদাররা খদ্দের সামলাতেই ব্যস্ত—আমার কথা ভালো করে শোনার পর্যন্ত সময় নেই। হঠাৎ দেখলাম একটা বাসের জানলায় রিণির মুখ। এক্ষুনি বোধহয় বাসটা ছেড়ে দেবে। আমি প্রাণপণে দৌড়োতে লাগলাম, হাত পা ছুঁড়ে ডাকতে লাগলাম, রিণি, রিণি!

বাসটা ছাড়েনি। রিণি আর স্নিগ্ধাদি বসে আছে। হাঁপাতে হাঁপাতে জিগ্যেস করলাম, সিদ্ধার্থদা কোথায়?

স্নিগ্ধাদি বললেন, ও আসছে এক্ষুনি। তুই ওরকম করছিস কেন

রে, সন্তু?

রিণি বললো, কাল সারাদিন তোকে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না। ভাবলাম তোরা চলে গেছিস। আমরা পরশু ফিরেছি অমরনাথ থেকে। এবার পহলগ্রামে আমরাও তাঁবুতে ছিলাম।

কাল সারাদিন আমি তাঁবুতে বসে ছিলাম, আর ওদিকে ওরা আমাকে খুঁজছে। লীদার নদীর ধারে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা তাঁবু—হয়তো আমাদেরটার কাছাকাছিই ওরা ছিল, আমি টের পাইনি। এর কোনো মানে হয়?

একটু দম নিয়ে আমি বললাম, সিদ্ধার্থদাকে আমার ভীষণ দরকার। এক্ষুনি। স্নিগ্ধাদি, তোমাদের এই বাসে যাওয়া হবে না। নেমে পড়ো, শিগগির নেমে পড়ো।

স্নিগ্ধাদি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, কী হয়েছে কি? আমাদের তো বাসের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, মালপত্র তোলা হয়ে গেছে।

আমি বললাম, তোমরা আগে নেমে পড়ো, তারপর সব কথা বলছি! সাঙ্ঘাতিক কান্ড হয়ে গেছে। কাকাবাবু হারিয়ে গেছেন। আমাদের তাঁবুতে...

রিণি হি-হি করে হেসে উঠে বললো, কাকাবাবু হারিয়ে গেছেন? অতবড় একটা লোক আবার হারিয়ে যায় নাকি? বল, তুই-ই হারিয়ে গেছিস, তোর কাকাবাবুই তোকে খুঁজছেন।

আঃ, মেয়েদের নিয়ে আর পারা যায় না। রিণিটা একদম বাজে মার্কা। দরকারী কথার সময়েও হাসে। ভাগ্যিস এই সময় সিদ্ধার্থদা এসে গেলেন।

আমি সিদ্ধার্থদাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে যত সংক্ষেপে সম্ভব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। সিদ্ধার্থদা ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, এ তো সত্যি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। আমাদের সব মালপত্র উঠে গেছে, শ্রীনগরে লোক অপেক্ষা করবে। অথচ তোমাকে একা ফেলে রাখাও যায় না। কি করা যায় বলো তো? এক্ষুনি ঠিক করতে হবে, দেরি করার সময় নেই! আচ্ছা, এক কাজ করা যাক।

ততক্ষণে বাসটা স্টার্ট নিয়েছে, কন্ডাক্টর হুইসল বাজাচ্ছে ঘন ঘন। এ সব জায়গায় বাসে নিয়মকানুন খুব কড়া। সিদ্ধার্থদা জানলার কাছে গিয়ে স্নিগ্ধাদিকে বললেন, শোনো, তোমরা দুজনে চলে যাও শ্রীনগরে। এখানে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে—আমি সন্তুর

সঙ্গে থাকছি—একদিন পর যাবো।

স্নিগ্ধাদি তো কথাটা শুনেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, পাগল নাকি! আমরাও থাকবো তাহলে। কন্ডাকটরকে বলো—

সিদ্ধার্থদা বললেন, লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোনো। শ্রীনগরে তো সব ঠিক করাই আছে, তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। তোমরা এখানে থাকলেই বরং অসুবিধা হবে। আমি একদিন পরেই আসছি।

বাস ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে, সিদ্ধার্থদা সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা হেঁটে গেলেন বোঝাতে বোঝাতে। স্নিগ্ধাদি আমাকে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কি হয়েছে বল তো সন্তু? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! এই সন্তু, তুই চুপ করে আছিস কেন?

কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না ঐটুকু সময়ে—সিদ্ধার্থদা বললেন, যা হয়েছে পরে শুনতে পাবে। চিন্তা করো না, আমি কালকেই যাচ্ছি!

তারপর বাস জোরে ছুটলো, রিণি হাত নাড়তে লাগলো।

সিদ্ধার্থদা যে প্রথম থেকেই আমার কথায় গুরুত্ব দিলেন, বেশী কিছু জিগ্যেস না করেই থেকে যাওয়া ঠিক করলেন, সে জন্য সিদ্ধার্থদার কাছে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। সময় এত কম ছিল—ওর মধ্যে কি সব বুঝিয়ে বলা যায়?

বাসটা চলে যাবার পর সিদ্ধার্থদা বললেন, চলো, কাজ শুরু করা যাক! তোমার কাকাবাবু কাল সকাল বেলা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি? তোমাকে কোনো খবর না দিয়ে তিনি কোথাও চলে যাবেন, তা হতেই পারে না!

আমি জোর দিয়ে বললাম, তা হতেই পারে না!

—হুঁ! একটা জলজ্যান্ত লোক তা হলে যাবেই বা কোথায়!

—সুচা সিং...

—সুচা সিং? সে আবার কে?

—সুচা সিং নামের একজন লোকের সঙ্গে কাকাবাবুর ঝগড়া হয়েছিল। সেই লোকটাই তাঁবুর মধ্যে রাত্তিরবেলা আমাকে...

সিদ্ধার্থদা ভুরু কুঁচকে সব শুনলেন। চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। আমার মনের ভেতরের ভয়ের ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে। সিদ্ধার্থদাকে যখন পেয়েছি, তখন একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। যতক্ষণ একা ছিলাম, ততক্ষণ কি যে অসহ্য একটা অবস্থা...।

সিদ্ধার্থদা জিগ্যেস করলেন, থানায় খবর দিয়েছো? দাওনি? চলো, আগে সেখানেই যাই।

থানায় দুজন অফিসার ছিলেন, তাঁদের নাম মীর্জা আলি আর গুরুবচ্চন সিং। খাতির করে বসতে বললেন আমাদের, মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনলেন। তারপর মীর্জা আলি বললেন, বহুৎ তাজ্জবকী বাৎ! এখানে এরকম ঘটনা কখনো ঘটে না। দিনের বেলা একটা লোক উধাও হয়ে যাবে কী করে? তাছাড়া সুচা সিং-এর নামে তো কেউ কোনোদিন কোনো অভিযোগ করেনি।

গুরুবচ্চন সিং বললেন, আপনাদের তাঁবু থেকে কী কী চুরি গেছে? দামী জিনিস কী কী ছিল?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, কাকাবাবুর একটা রিভলবার ছিল, সেটা তিনি নিয়ে বেরিয়েছিলেন কিনা জানি না—সেটা পাচ্ছি না। আর কিছু টাকা পয়সা—

—কত?

—আমি তা জানি না।

—ক্যামেরা-ট্যামেরা?

—ছিল না। একটা দূরবীন ছিল, সেটা নেয়নি।

—আশ্চর্য, এর জন্যই দিনের বেলায় একটা লোককে...রাত্তির বেলা তাঁবুতে ঢুকে...এখানে এ রকম কান্ড...ঠিক আছে, চলুন এনকোয়ারি করে দেখা যাক—

পোস্ট অফিসে গিয়ে জানা গেল, কাকাবাবু সেখানে টেলিগ্রাম করতে যাননি। আগের দিন মাত্র তিনজন টেলিগ্রাম করতে এসেছিল, তার মধ্যে কাকাবাবুর মতন চেহারার কেউ ছিল না। দুজনই তাদের মধ্যে মহিলা, আর একজন স্থানীয় লোক। অর্থাৎ, যা হবার তা এখানে আসবার আগেই হয়েছে। আমাদের তাঁবুতে তদন্ত করে পুলিশ বুঝতে পারলেন, সেখানে ঢুকে লন্ডভন্ড করা হয়েছে, কিন্তু অপরাধীর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। সাধারণ চোর ডাকাত যে নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। বাইনোকুলার, অ্যালার্ম ঘড়ি, পেন—এসব কিছুই নেয়নি। যে-ট্রাঙ্কটা চোররা ভেঙেছে, সেটার মধ্যেই একটা মানি ব্যাগ ছিল কাকাবাবুর, সেটাও চোরদের চোখে পড়েনি। সুচা সিং-এর গ্যারেজে গিয়ে শোনা গেল, সুচা সিং বিশেষ কাজে মাটন্ গেছে, বিকেলেই ফিরবে। মীর্জা আলি হুকুম দিলেন সুচা সিং ফিরলেই যেন থানায় গিয়ে দেখা করে।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর গুরুবচন সিং বললেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের কাকাবাবুকে নিশ্চয়ই খুঁজে বার করবো। মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েছিল, খুব ভালো লোক—আমাদের সরকারের অনেকের সঙ্গে তাঁর চেনা জানা আছে, পহলগামে তাঁর কোনো বিপদ হবে, এতে পহলগামের বদনাম। সুচা সিং যদি দোষী হয়, তা হলে আমাদের হাত সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না। শাস্তি পাবেই। আপনারা বিকেলে আবার খবর নেবেন। আমরা সব জায়গায় পুলিশকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পুলিশদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর সিদ্ধার্থদা আমাকে জিগ্যেস করলেন, সন্তু, সকাল থেকে কিছু খেয়েছো? মুখ তো একেবারে শুকিয়ে গেছে। অত চিন্তা করো না!

এতক্ষণ খাওয়ার কথা মনেই পড়েনি। সিদ্ধার্থদার কথা শুনেই বুঝতে পারলাম, কী দারুণ খিদে পেয়েছে! সেই মিষ্টির দোকানটায় ঢুকলাম। কাকাবাবুর সঙ্গে বাইরে যাবার সময় আমরা প্রত্যেকবার এখানে জিলিপি খেতাম। কাকাবাবু আজ নেই! কাকাবাবু কোথায় আছেন, কে জানে! আমার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠলো।

আমি সিদ্ধার্থদার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কাকাবাবু বলেছিলেন, পাথরের মুণ্ডুটার কথা আমি যেন কোনো কারণেই কারুকে না বলি। সেইজন্য পুলিশকে বলিনি। কিন্তু সিদ্ধার্থদাকেও কি বলা যাবে না? সিদ্ধার্থদা তো আমাদের নিজেদের লোক। সিদ্ধার্থদার সাহায্য ছাড়া আমি একা কী করতে পারতাম? তাছাড়া সিদ্ধার্থদা ইতিহাসের অধ্যাপক, উনি ঠিক মূল্য বুঝবেন।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, সিদ্ধার্থদা, পুলিশকে সব কথা আমি বলিনি। আমাদের একটা দারুণ দামী জিনিস চুরি গেছে।—

—কী?

—আমরা সম্রাট কনিষ্ক-র মুণ্ডু আবিষ্কার করেছিলাম।

—কী বললে? কার মুণ্ডু?

আস্তে আস্তে সব ঘটনা খুলে বললাম সিদ্ধার্থদাকে। সিদ্ধার্থদা অবাক বিস্ময়ে শুনলেন সবটা। তারপর ছটফট করতে লাগলেন। বললেন, কী বলছো তুমি, সন্তু! এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ইতিহাসের দিক থেকে এর মূল্য যে কী দারুণ তা বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু সেটা এরকম ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? অসম্ভব! যে-কোনো উপায়েই হোক, ওটা বাঁচাতেই হবে।

দোকানের বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে সিদ্ধার্থদা আবার বললেন, তুমি ঠিক জানো, রাত্তিরবেলা সুচা সিং-ই ঢুকেছিল? সে-ই ওটা নিয়ে গেছে?

আমি জোর দিয়ে বললাম, আঙুল কাটা দেখেই আমি চিনেছি। তাছাড়া, ওটার কথা আর কেউ জানে না। সুচা সিংও জানতো না—ও কাঠের বাক্সটা খুলে দেখতে চেয়েছিল, ওর ধারণা ওর মধ্যে দামী কিছু জিনিস আছে।

—সুচা সিং ঐ একটা পাথরের মুখ নিয়ে কী করবে? ইতিহাস না জানলে, ওটার তো কোনো দামই নেই। সুচা সিং ওর মূল্য কী বুঝবে? সে নিতে চাইবেই বা কেন?

—সেটা আমিও জানি না। কিন্তু সিদ্ধার্থদা, ওর সব সময় ধারণা, কাকাবাবু এখানে সোনার খোঁজ করতে এসেছেন। ওর সেই সোনার জন্য লোভ।

কিন্তু যখন বাক্সটা নিয়ে দেখবে, ওতে দামী কিছু নেই, সোনা তো নেই-ই, তখন নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে ছেড়ে দেবে। শুধু শুধু তো কেউ কোনো মানুষকে মারে না বা আটকে রাখে না।

—কাকাবাবু বলছিলেন, বিদেশের মিউজিয়ামগুলো জানতে পারলে নাকি ওটার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দাম দিতে চাইবে।

—তার আগে তো জানতে হবে, মুণ্ডুটা কার! সেটা সুচা সিং জানবে কি করে? সুচা সিংকে সে কথা জানাও নি তো?

—না। সেইজন্যই বোধহয় কাকাবাবুকে আটকে রেখেছে।

—কাকাবাবু নিশ্চয়ই বলে দেবেন না!

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সিদ্ধার্থদা আপনমনেই বললেন, শুধু পুলিশের ওপর নির্ভর করলেই হবে না। আমাদেরও খোঁজ করতে হবে। ঐ পাথরের মুণ্ডুটার মূল্য পুলিশও বুঝবে না। ওটাকে রক্ষা করতে না পারলে...সন্তু, তুমি কিছুক্ষণ একলা থাকতে পারবে? আমি একটু দেখে আসি—

—না, সিদ্ধার্থদা, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। একলা থাকতে আমার ভয় করবে।

—দিনের বেলা আবার ভয় কি?

—না, আমি আপনার সঙ্গে যাবো। আচ্ছা, সিদ্ধার্থদা, এমন হতে পারে না যে সুচা সিং আসলে নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। পুলিশকে ওর লোকরা মিথ্যে কথা বলেছে?

—তা মনে হয় না। পুলিশ তো যে-কোনো মুহূর্তেই সার্চ করতে পারে। তবু একবার গিয়ে দেখা যাক।

দু-একটা দোকানদারকে জিগ্যেস করতেই সুচা সিং-এর বাড়িটা জানা গেল। বেশ বড় দোতলা বাড়ি, সামনে একটা ছোট্ট বাগান। বাগানে একজন মহিলা কাজ করছিলেন। কাশ্মীরী মেয়ে—কী সরল আর শান্ত তাঁর মুখখানা। দুটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে খেলা করছে। মহিলা বোধহয় সুচা সিং-এর স্ত্রী। সুচা সিং-এর কাশ্মীরী বউ সেকথা শুনেছিলেন। বাড়িটা দেখলে মনে হয় না—এটা কোনো বদমাইস লোকের বাড়ি।

সিদ্ধার্থ বাগানের গেটের সামনে গিয়ে খুব বিনীত ভাবে বললেন, বহিনজী, শুনিয়ে!

মহিলা একবার চোখ তুলে তাকালেন আমাদের দিকে। কোনো উত্তর দিলেন না!

সিদ্ধার্থদা আবার ডাকলেন, বহিনজী একটা বাত শুনিয়ে!

মহিলাটি এবারও কোনো উত্তর দিলেন না, আমাদের দিকে তাকালেন না। বুঝতে পারলুম, বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে ওঁকে। বাচ্চা ছেলে দুটি জুলজুল করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।

সিদ্ধার্থদা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। এবার গলার আওয়াজ খুব করুণ করে বললেন, বহিনজী, এক গেলাস পানি পিলায়েঙ্গে? বহুৎ পিয়াস লাগা! জল খেতে চাইলে কেউ কোনোদিন না বলতে পারে না। বিশেষত মেয়েরা। মহিলা এবার আমাদের দিকে তাকালেন। বাড়ির ভেতর গিয়ে এক গেলাস জল এনে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলেন সিদ্ধার্থদার দিকে।

সিদ্ধার্থদা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, হামকো নেই, এই লেড়কাকো দিজিয়ে!

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, নে খেয়ে নে! মাথা ঘোরা কমেছে!

আমি তো অবাক! তবু কোনো কথা বললাম না। সেই ঠাণ্ডার মধ্যেই বাধ্য হয়ে এক গেলাস জল খেয়ে নিতে হলো। সিদ্ধার্থদা সুচা সিং-এর বৌকে বললেন, এই ছেলেটার মাথা ঘুরছে। এর খুব শরীর খারাপ লাগছে হঠাৎ। কি করি বলুন তো? মাথায় জল ঢেলে দেবো?
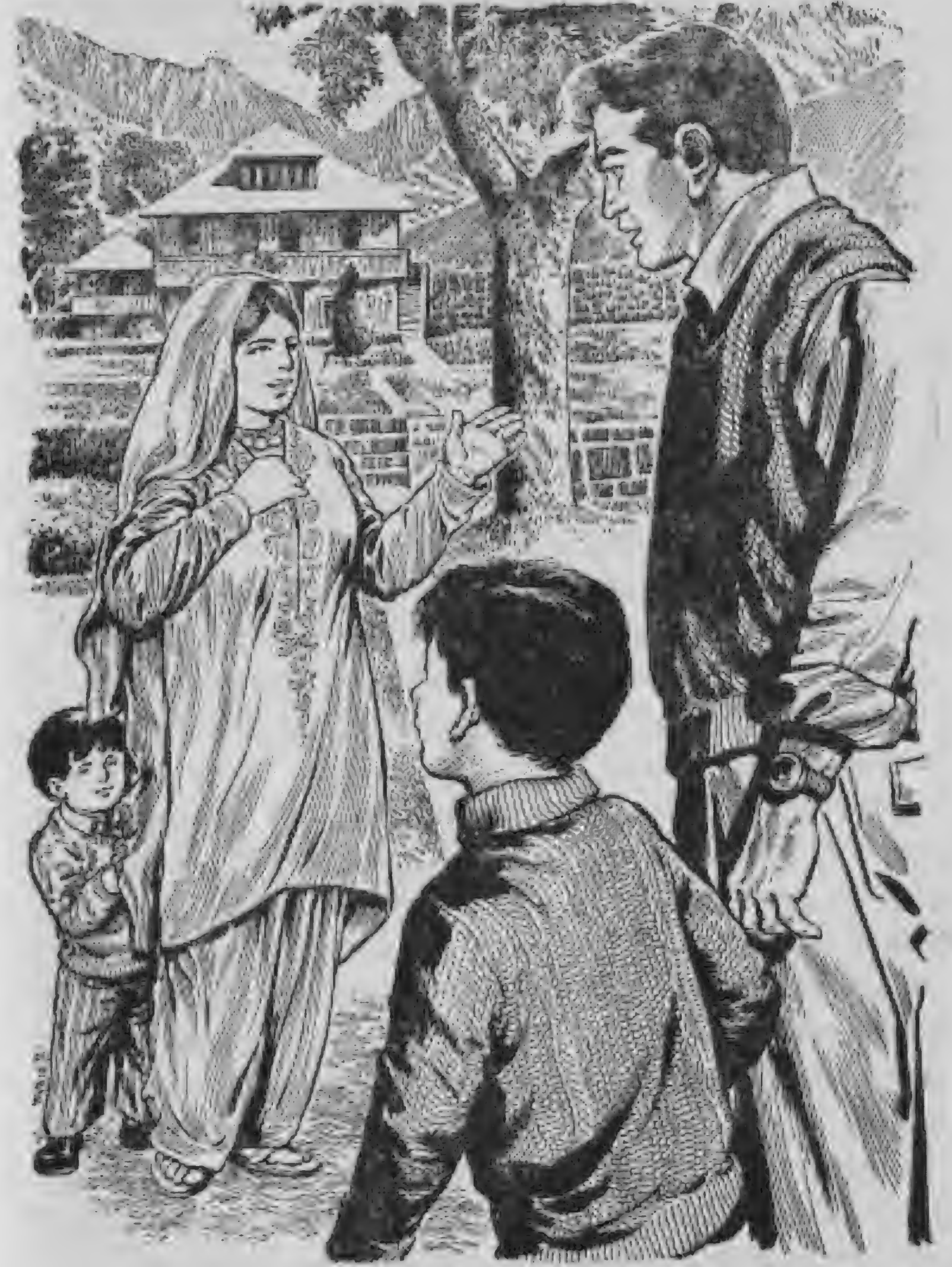
খুব দূরে নয়। দেওগির গাঁয়ে আমাদের একটা বাড়ি আছে, সেখানে গেলেন কাল। কবে ফিরবেন সে কথা তো কিছু বলেননি।

সুচা সিং-এর স্ত্রীর দয়া হলো। বাগানে একটা কাঠের বেঞ্চ ছিল, সেটা দেখিয়ে বললেন, ওর ওপর শুইয়ে দিন! সিদ্ধার্থদা আমাকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে রুমাল দিয়ে হাওয়া করতে করতে বললেন, আজই শ্রীনগরে গিয়ে একে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে। সুচা সিং যদি একটা গাড়ি দেন...

মহিলা বললেন, না, উনি বাড়ি নেই। গাড়ি ভাড়া নিতে হলে আপনারা গ্যারেজে গিয়ে দেখতে পারেন।

—গ্যারেজে খালি গাড়ি নেই। একটা মাত্র আছে—কিন্তু সিংজীর হুকুম ছাড়া সেটা পাওয়া যাবে না।

—কিন্তু উনি তো পহলগামে নেই এখন!

সিদ্ধার্থদা মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, আমাদের খুব দরকার ছিল। সিংজী কবে ফিরবেন? আজ ফেরার কোনো চান্স নেই? খুব দূরে কোথাও গেছেন কি?

—খুব দূরে নয়। দেওগির গাঁয়ে আমাদের একটা বাড়ি আছে, সেখানে গেলেন কাল। কবে ফিরবেন সে কথা তো কিছু বলেননি।

—দেওগির গ্রামটা কোথায় যেন? মাটন-এর কাছেই না?

—না, ওদিকে তো নয়। সোনমার্গের রাস্তায়। লীদার নদী ছাড়িয়ে বাঁ দিকে গেলেই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাম শুনেছি। দেওগির তো খুব সুন্দর জায়গা! সিদ্ধার্থদা রীতিমত গল্প জমিয়ে নিলেন। ছেলেমেয়ে দুটো আমাদের কাছে এসে বড় বড় টানা টানা চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো আমাদের দিকে।

আমার মনে হলো, মানুষের লোভ জিনিসটা কী বিচ্ছিরি! সুচা সিং-এর এই তো এত সুন্দর বাড়ি, আট-ন' খানা গাড়ি ব্যবসায় খাটাচ্ছে—তবু সোনার জন্য কী লোভ! সোনার লোভেই কাকাবাবুকে আটকে রেখেছে কোথাও। কাল রাত্তিরে আমাদের তাঁবুতে চুরি করতে গিয়েছিল। পুলিশ যখন ওকে ধরে ফাঁসি দেবে, তখন ছেলেমেয়ে-গুলো কাঁদবে কী রকম! শুনেছি আগেকার দিনে কাশ্মীরে কেউ চুরি করলে তার নাক বা কান বা হাত কেটে দিত।

একটু বাদে আমরা সুচা সিং-এর স্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। খানিকটা দূরে চলে আসার পর সিদ্ধার্থদা বললেন, সন্তু, একবার দেওগির গিয়ে দেখবে নাকি? সুচা সিং-এর বউকে বেশ সরল মনে হলো, বোধহয় মিথ্যে কথা বলেনি।

—পুলিশের কাছে জানাবেন না?

—হ্যাঁ, জানাবো। ওরা যদি গা না করে আমরা নিজেরাই গিয়ে দেখে আসবো একবার।

আবার আমরা থানায় গেলাম। পুলিশের লোকেরা সব শুনে বললেন, আপনারা এত ধৈর্য হারাচ্ছেন কেন? আজ সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখুন। মীর্জা আলি বললেন, সুচা সিংকে কালকেই আপনাদের সামনে হাজির করাবো, কোনো চিন্তা নেই। গুরুবচ্চন সিং বললেন, কী খোকাবাবু, আংকল-এর জন্য মন কেমন করছে?

থানা থেকে বেরিয়ে এসে সিদ্ধার্থদা বললেন, চল আমরা নিজেরাই যাই। একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে।

কিছুতেই আর গাড়ি পাওয়া যায় না। এখন পুরো সীজন্-এর সময়, গাড়ির খুব টানাটানি। শেষ পর্যন্ত একটা গাড়ি পাওয়া গেল, কিন্তু সেটা আমাদের নামিয়ে দিয়েই চলে আসবে। সিদ্ধার্থদা এত ব্যস্ত হয়ে গেছেন যে তাতেই রাজী হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, ফেরার সময় যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই! কী বলো, সন্তু?

দেওগির গ্রামের কাছাকাছি বড় রাস্তায় আমরা গাড়িটা ছেড়ে দিলাম। জায়গাটা ভীষণ নির্জন। রাস্তায় একটাও মানুষ নেই। রাস্তার দু পাশে ঘন গাছপালা। ফুল ফুটে আছে অজস্র। ময়না আর বুলবুলি পাখি উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক বেঁধে। কাছ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে একটা সরু ঝর্ণা, তার জলের কল্‌কল্ শব্দ শোনা যায় একটানা।

দুজনে মিলে হাঁটতে লাগলাম কিছুক্ষণ। সুচা সিং-এর বাড়িটা কী করে খুঁজে পাওয়া যাবে বুঝতে পারছি না। কারুকে জিগ্যেস করারও উপায় নেই। তবু আমার কেন যেন মনে হতে লাগলো, কাকাবাবু এখানেই কাছাকাছি কোথাও আছেন। এই রকম মনে হবার কোনো মানে নেই। তবু এক এক সময় মনে হয় না? সিদ্ধার্থদা আর আমি দুজনে রাস্তার দু দিক দেখতে দেখতে হাঁটছি। খানিকটা বাদে হঠাৎ আমি রাস্তার পাশে একটা জিনিস দেখে ছুটে গেলাম। কাকাবাবুর একটা ক্রাচ পড়ে আছে। আমার শরীরটা কী রকম দুর্বল হয়ে গেল, চোখ জ্বালা করে উঠলো। কাকাবাবু তো ক্রাচ ছাড়া কোথাও যান না। এটা এখানে পড়ে কেন? তাহলে কি কাকাবাবুকে ওরা...

সিদ্ধার্থদা সেটা দেখে বললেন, এটা তো অন্য কারুরও হতে পারে। ক্রাচ তো এক রকমই হয়। সন্তু, তুমি ঠিক চিনতে পারছো?

—হ্যাঁ, সিদ্ধার্থদা। কোনো ভুল নেই। এই যে মাঝখানটার

খানিকটা ঘষটানো দাগ ? সিদ্ধার্থদা, কী হবে ?

—আরে, তুমি আগেই ভয় পাচ্ছো কেন ? পুরুষ মানুষের অত দুর্বল হতে নেই। শেষ না-দেখা পর্যন্ত কোনো জিনিস মেনে নেবে না। একখানা ক্রাচ পড়ে আছে, আর একটা কোথায় গেল ?

আর একটা কাছাকাছি কোথাও পাওয়া গেল না। সিদ্ধার্থদা সেটাকে তুলে হাতে রাখলেন। তারপর বললেন, আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। কাকাবাবু হয়তো ইচ্ছে করেই এটা ফেলে দিয়েছেন—চিহ্ন রাখবার জন্য। ওঁর খোঁজে যদি কেউ আসে, তাহলে এটা দেখে বুঝতে পারবে। পাশ দিয়ে এই যে সরু রাস্তাটা গেছে, চলো এইটা দিয়ে গিয়ে দেখা যাক।

সেই রাস্তাটা দিয়ে একটু দূরে যেতেই একটা বাড়ি চোখে পড়লো। দোতলা কাঠের বাড়ি। কোনো মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। সাবধানে আমরা এগোলাম বাড়িটার দিকে। সিদ্ধার্থদা খুব সাবধানে তাকাচ্ছেন চারদিকে। হঠাৎ আমার কাঁধ চেপে ধরে সিদ্ধার্থদা বললেন, ঐ দ্যাখো বলেছিলুম, ঐ যে আর একটা ক্রাচ।

একটা গোলাপের ঝোপের পাশে দ্বিতীয় ক্রাচটা পড়ে আছে। সিদ্ধার্থদা সেটাও তুলে নিলেন। আর কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক জায়গাতেই এসে গেছি।

সিদ্ধার্থদা মুখখানা কঠিন করে বললেন, হুঁ, একটা লোককে লুকিয়ে রাখার পক্ষে বেশ ভালো জায়গা! কেউ টের পাবে না।

আমি ফিসফিস করে বললাম, সিদ্ধার্থদা, এখন ফিরে গিয়ে চট করে পুলিশ ডেকে আনলে হয় না ?

—এখন পুলিশ ডাকতে যাবো ? ততক্ষণে ওরা যদি পালায় ? এসেছি যখন, শেষ না দেখে যাবো না।

—কিন্তু ওরা যদি অনেক লোক থাকে ?

—তুমি ভয় পাচ্ছো নাকি সন্তু ?

—না, না, ভয় পাইনি—

—ক্রাচ দুটো দুজনের হাতে থাক। বেশ শক্ত আছে, দরকার হলে কাজে লাগবে।

কয়েকটা গাছের আড়ালে আমরা কিছুক্ষণ লুকিয়ে রইলাম। বাড়িটাতে একটাও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। সোজা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। পাশাপাশি তিনখানা ঘর, তার মধ্যে ডানদিকের কোণের ঘরটা তালাবন্ধ। আমি বললাম, হয়তো সবাই এখান থেকে

আবার অন্য কোথাও চলে গেছে।

সিদ্ধার্থদা গম্ভীরভাবে বললেন, তা হতেও পারে। কিন্তু না দেখে তো যাওয়া যায় না।

—সিদ্ধার্থদা, প্রায় সন্ধে হয়ে আসছে। এরপর আমরা ফিরবোই বা কী করে ?

—সে ভাবনা পরে হবে। ফিরতে না পারি ফিরবো না। কনিষ্কর মাথাটা আমি একবার অন্তত দেখবোই।

একটু সন্ধে হতেই আমরা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। এখনও কারুর দেখা নেই। পা টিপে টিপে উঠে গেলাম কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির পাশের ঘরটাই তালাবন্ধ, পাশের জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারলাম। অন্ধকার, ভালো দেখা যায় না। মনে হলো যেন একটা চৌপাই-তে একজন মানুষ শুয়ে আছে। চোখে অন্ধকার একটু সয়ে যেতেই চিনতে পারলাম—কাকাবাবু!

সিদ্ধার্থদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় বললেন, চুপ!

তারপর তালাটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। তালাটা পেল্লায় বড়। সিদ্ধার্থদা বললেন, তালাটা বড় হলেও বেশী মজবুত নয়। সস্তা কোম্পানীর তৈরী। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ওরা এরকম একটা বাজে তালা লাগিয়ে রেখেছে কেন! বাড়িতেও আর কেউ নেই মনে হচ্ছে।

সিদ্ধার্থদা ক্রাচের সরু দিকটা ঢুকিয়ে দিলেন তালাটার মধ্যে। তারপর খুব জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই তালাটা খুলে এলো।

সিদ্ধার্থদা বললেন, দেখে কি মনে হচ্ছে, আমার তালা ভাঙার প্র্যাকটিস আছে ? আমি কিন্তু জীবনে এই প্রথম তালা ভাঙলাম।

ততক্ষণে আমি দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলেছি। ফিসফিস করে ডাকলাম, কাকাবাবু, কাকাবাবু!

সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথায় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো। আমি ছিটকে পড়লাম ঘরের মধ্যে। সিদ্ধার্থদাও পড়লেন এসে আমার পাশে। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থদা প্রথম আঘাতটা সামলে নিয়েই চট করে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে গিয়ে টেনে দরজাটা খোলার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। দরজাটা ওপাশ থেকে কেউ টেনে ধরে আছে। একটু ফাঁকও হলো না। ধাক্কাধাক্কি করে নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন সিদ্ধার্থদা।

কাকাবাবু ততক্ষণে উঠে বসেছেন। শূন্য দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, কে ? ঘরের মধ্যে আলো বেশী নেই, কিন্তু মানুষ চেনা

যায়। কাকাবাবু আমাদের চিনতে পারছেন না! কাকাবাবুকে কি ওরা অন্ধ করে দিয়েছে! পর মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, কাকাবাবুর চোখে চশমা নেই। চশমা ছাড়া উনি অন্ধেরই মতন। আমি বললাম, কাকাবাবু, আমি সন্তু। আমার সঙ্গে সিদ্ধার্থদা—। কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, তোমরা আবার এরকম বিপদের ঝুঁকি নিলে কেন?

আমি দেখলাম কাকাবাবুর ডান হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ছুটে গিয়ে কাকাবাবুর পাশে দাঁড়ালাম। জিগ্যেস করলাম, তোমাকে মেরেছে ওরা?

কাকাবাবু বললেন, ও কিছু না। তোমরা নিজেরা না এসে পুলিশকে খবর দিলে পারতে। এরা বিপজ্জনক লোক।

সিদ্ধার্থদা বেশ জোরে চেঁচিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমরা পুলিশকে খবর দিয়েছি। পুলিশ আমাদের পেছন পেছনই আসছে।

জানলার বাইরে একটা হাসির আওয়াজ শোনা গেল। জানলায় দেখলাম সুচা সিং-এর বিরাট মুখ। সুচা সিং প্রথমেই বললেন...। না, বললেন না, বললো। ওকে আমি মোটেই আর আপনি বলবো না। একটা ডাকাত, গুণ্ডা! আমার কাকাবাবুকে মেরেছে!

সুচা সিং বললো, কী খোকাবাবু, তোমার বেশী লাগেনি তো? একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়েছি।

সিদ্ধার্থদা বললেন, আমার কিন্তু খুব জোরে লেগেছে। আমাকে কী দিয়ে মারলে? লাঠি দিয়ে? অতবড় চেহারাটা নিয়ে লুকিয়ে ছিলে কোথায়?

সুচা সিং বললো, এই ছোকরাটি কে খোকাবাবু? একে তো আগে দেখিনি।

আমি কিছু বলার আগেই সিদ্ধার্থদা বলে উঠলেন, আরো অনেককে দেখবে। পুলিশ আসছে একটু পরেই।

সুচা সিং আবার হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো, আসুক, আসুক! অনেক জায়গা আছে এ বাড়িতে। খানাপিনা করুন, আরামসে থাকুন, কুই বাত নেই! রাত্তিরে শীত লাগলে কম্বল নিয়ে নেবেন—ঐ খাটের নিচে অনেক কম্বল আছে।

কাকাবাবু খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পায় পায় হেঁটে গেলেন জানলার দিকে। গম্ভীর ভাবে বললেন, সুচা সিং, আমার চশমাটা দাও! চশমা নিয়ে তোমাদের কি লাভ!

সুচা সিং খানিকটা অবাক হবার ভাব দেখিয়ে বললো, চশমা?

আপনার চশমা কোথায় তা আমি কি করে জানবো! হয়তো আসবার সময় কোথাও পড়েটড়ে গিয়ে থাকবে!

—না, তোমার লোক জোর করে আমার চশমা খুলে নিয়েছে।

—তাই নাকি! খুব অন্যায়!

—চশমাটা এনে দিতে বলো!

—সে তো এখন এখানে নেই! এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনাকে তো এখন পড়ালিখা করতে হচ্ছে না!

কাকাবাবু হতাশ ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমার মনে হলো যেন কনিষ্কর মুণ্ডু কিংবা আর সবকিছুর থেকে চশমাটাই এখন ওর কাছে সবচেয়ে বড় কথা!

সিদ্ধার্থদা বললেন, পুলিশকে আমি এই জায়গাটার নাম বলে এসেছি। আজ হোক কাল হোক পুলিশ এখানে ঠিক এসে পড়বে।

সুচা সিং বললো, আসুক না! পুলিশকে আমি পরোয়া করি না!

কাকাবাবু বললেন, সুচা সিং, তুমি আমাদের শুধু শুধু আটকে রেখেছো। আমাদের ছেড়ে দাও।

—প্রোফেসারসাব, আপনাকে ছেড়ে দিতে কি আমার আপত্তি আছে? আপনাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিতে পারি। আপনি আমার কথাটা শুনুন।

—তোমার ধারণা ভুল। আমি সোনার খবর জানি না।

—ঠিক আছে। এখন আপনার নিজের লোক এসে গেছে, বাতচিত করুন। দেখুন, যদি আপনার মত পাল্টায়—

—সুচা সিং, পাথরের মুণ্ডুটা আমার কাছে দিয়ে যাও। ওটা যেন কোনোরকমে নষ্ট না হয়। ওটা তোমার কোনো কাজে লাগবে না—

—ঠিক থাকবে, সব ঠিক থাকবে।

'তোমাকে আমি ছাড়বো না!'

সুচা সিং জানলা থেকে সরে যাবার পর কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, লোকটা পাগল হয়ে গেছে! একটা পাগলের জন্য আমার এত পরিশ্রম হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে।

আমরা কাছে এসে কাকাবাবুর পাশে খাটের ওপর বসলাম। আমি জিগ্যেস করলাম, কাকাবাবু, তোমাকে কী করে নিয়ে এলো এখানে?

কাকাবাবু অদ্ভুত ভাবে হেসে বললেন, আমাকে ধরে আনা খুবই সহজ। আমি তো দৌড়োতেও পারি না, মারামারিও করতে পারি না। পোস্ট অফিসের দিকে যাচ্ছিলাম, একটা গাড়ি আসছিল আমার গা ঘেঁষে। দুটো লোক তার থেকে নেমে আমার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ জোর করে চেপে ধরে গাড়িতে তুলে নিল। ঐখানে রাস্তাটা নির্জন, সকালে বিশেষ লোকও থাকে না—কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। আমিও চ্যাঁচামেচি করিনি, তাতে কোনো লাভও হতো না—কারণ একজন আমার পাঁজরার কাছে একটা ছুরি চেপে ধরেছিল!

—গাড়িতে করে সোজা এখানে নিয়ে এলো?

—না। কাল সারাদিন রেখে দিয়েছিল ওদের গ্যারেজের পেছনে একটা ঘরে। সুচা সিং-এর বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গেছে, আমি কোনো গুপ্তধন কিংবা সোনার খনি আবিষ্কার করেছি। সেই যে কাঠের বাক্সটা ওকে দেখতে দিইনি, তাতেই ওর সন্দেহ হয়েছে। এমনিতে ও আমার সঙ্গে বিশেষ কিছু খারাপ ব্যবহার করেনি, শুধু বারবার এক কথা—ওকে আমি গুপ্তধনের সন্ধান বলে দিলে ও আমাকে আধা বখরা দেবে।

সিদ্ধার্থদা জিগ্যেস করলেন, আপনার হাতে লাগলো কী করে?

—একবার শুধু ওর একজন সঙ্গী আমার হাতে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছে। সুচা সিং বলেছিল কাছে এনে ভয় দেখাতে, লোকটা সত্যি সত্যি ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিল। সুচা সিং তখন বকলো লোকটাকে। সুচা সিং আমার ওপর ঠিক অত্যাচার করতে চায় না। ওর কায়দা হচ্ছে, ভালো ব্যবহার করে আমাকে বশে আনা, ভোরবেলা আমাকে নিয়ে এসেছে এই বাড়িতে।

—কিন্তু আপনাদের তাঁবু লণ্ডভণ্ড করেও তো ও কিছুই খুঁজে পায়নি। পাথরের মূর্তিটা দেখে ও তো কিছুই বুঝবে না। তাহলে এখনও আটকে রেখেছে কেন?

—বললাম না, ও পাগলের মতন ব্যবহার করছে। মুণ্ডুটার ভেতর দিকে কতকগুলো অক্ষর লেখা আছে। ওর ধারণা ওর মধ্যেই আছে গুপ্তধনের সন্ধান। সিনেমা-টিনেমায় যে রকম দেখা যায় অনেক সময়! বিশেষত, মূর্তিটার জন্য আমার এত ব্যাকুলতাই ওর প্রধান সন্দেহের কারণ। আমার সামনে ও মুণ্ডুটা আছাড় মেরে ভেঙে ফেলতে গিয়েছিল, আমি ওর পা জড়িয়ে ধরেছিলাম!

সিদ্ধার্থদা বললেন, ও যদি মুণ্ডুটার কোনো ক্ষতি করে, আমি

ওকে খুন করে ফেলবো!

কাকাবাবু বললেন, ওকে দমন করার কোনো সাধ্য আমাদের নেই। ওর সঙ্গে আরও দুজন লোক আছে।

সিদ্ধার্থদা জানালার কাছে গিয়ে সিকগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর বললেন, জানালাটা ভাঙা বোধহয় খুব শক্ত হবে না। আমরা চেষ্টা করলে এখান থেকে পালাতে পারি।

কাকাবাবু বিষণ্ণ ভাবে বললেন, ঐ মুণ্ডুটা ফেলে আমি কিছুতেই যাবো না। তার বদলে আমি মরতেও রাজী আছি। তোমরা বরং যাও—

কাকাবাবুকে ফেলে যে আমরা কেউ যাবো না, তা তো বোঝাই যায়। সিদ্ধার্থদা ওভারকোট খুলে ভালো করে বসলেন। স্নিগ্ধাদি আর রিণি এতক্ষণে শ্রীনগরে পৌঁছে নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তা করছে। আমরা কবে এখান থেকে ছাড়া পাবো, ঠিক নেই। কিংবা কোনো দিন ছাড়া পাবো কি না—

একটু রাত হলে সুচা সিং দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো। তার সঙ্গে আরও দুজন লোক। একজনের হাতে একটা মস্ত বড় ছুরি, অন্যজনের হাতে খাবারদাবার। সুচা সিং বললো, কী প্রোফেসারসাব, মত বদলালো?

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, সিংজী, তোমাকে সত্যিই বলছি, আমি কোনো গুপ্তধনের খবর জানি না!

সুচা সিং ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বললো, আপনারা বাঙালীরা বড্ড ধড়িবাজ! এত টাকা পয়সা খরচ করে, এত কষ্ট করে আপনি শুধু ঐ মুণ্ডুটা খুঁজতে এসেছিলেন? এই কথা আমি বিশ্বাস করবো?

—ওটার জন্য আসিনি। এমনি হঠাৎ পেয়ে গেলাম।

—ঠিক আছে, ওটা কোথায় পেয়েছেন, সে কথা আমাকে বলুন। ওটা কীসের মুণ্ডু? কোনো দেওতার মুণ্ডু? আপনারা যেখানে গিয়েছিলেন: সেখানে কোনো মন্দির নেই, আমি খোঁজ নিয়েছি। ওখানে পাথরের মুণ্ডু এলো কোথা থেকে? বাকি মূর্তিটা কোথায়? বলুন সে কথা!

ওকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না ভেবে কাকাবাবু চুপ করলেন। সিদ্ধার্থদা তেজের সঙ্গে বললেন, আমরা ওটা যেখানে পাই না কেন? তার জন্য তুমি আমাদের আটকে রাখবে? দেশে আইন নেই? পুলিশের হাত থেকে তুমি বাঁচতে পারবে?

সুচা সিং-এর সঙ্গী ছুরিটা উঁচু করলো। সুচা সিং তাকে হাত দিয়ে বারণ করে বললো, আমাকে পুলিশের ভয় দেখিও না। চুপচাপ থাকো। তোমার মতন ছোকরাকে আমি এক রদ্দা দিয়ে কাৎ করে দিতে পারি! যদি ভালো চাও তো চুপচাপ থাকো! আমি শুধু প্রোফেসারের সঙ্গে কথা বলছি!

কাকাবাবু বললেন, আমার আর কিছু বলার নেই!

খাবার রেখে ওরা চলে গেল। আমাদের বেশ খিদে পেয়েছিল। সিদ্ধার্থদা ঢাকনাগুলো খুলে চমকে গিয়ে বললেন, আরে, বাস্! খাবারগুলো তো দারুণ দিয়েছে! বন্দী করে রেখে কেউ এরকম খাবার দেয় কখনো শুনিনি!

বড় বড় বাটিতে করে বিরিয়ানি, ডিম ভাজা, মুরগীর মাংস, চিঁড়ের পায়েস রাখা আছে। কাকাবাবু ঠিকই বলেছিলেন। আমাদের ভালো ভালো খাবার দিয়ে ভুলিয়ে ও কাকাবাবুকে দলে টানতে চাইছে। সেইসব খাবার দেখেই আমার খিদে বেড়ে গেল। সিদ্ধার্থদা তিন-জনের জন্য ভাগ করে দিলেন। আমি সবে মুখে তুলতে গেছি, সিদ্ধার্থদা বললেন, খাচ্ছো যে, যদি বিষ মেশানো থাকে?

শুনেই আমি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলে নিলাম। কাকাবাবু বললেন, সুচা সিং সে-রকম কিছু করবে বলে মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই। তোমরা আগে খেয়ো না, আমি খেয়ে দেখছি প্রথমে। আমি বুড়ো মানুষ, আমি মরলেও ক্ষতি নেই!

সিদ্ধার্থদা হাসতে হাসতে বললেন, বিষ মেশানো থাক আর যাই থাক, এ রকম চমৎকার খাবার চোখের সামনে রেখে আমি না খেয়ে থাকতে পারবো না।

টপ করে একটা মাংস তুলে কামড় বসিয়ে সিদ্ধার্থদা বললেন, বাঃ, গ্র্যান্ড! এ রকম খাবার পেলে আমি অনেকদিন এখানে থাকতে রাজী আছি!

সত্যিই যদি আমাদের এখানে অনেকদিন থাকতে হয়, তাহলে স্নিগ্ধাদি আর রিণির কী হবে? সিদ্ধার্থদার যেন সেজন্য কোনো চিন্তাই নেই।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা বিছানা পেতে ফেললাম। খাটের তলায় আট-দশটা কম্বল রাখা ছিল। কম্বলগুলো বেশ নোংরা, কিন্তু উপায় তো নেই।

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা না ঘুমিয়ে বিছানায় শুয়ে এখান থেকে

উদ্ধার পাবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। কিন্তু কোনো পথই পাওয়া গেল না। কনিষ্কর মুন্ডুটা না পেলে কাকাবাবু কিছুতেই যাবেন না। সেটা সুচা সিং-এর কাছ থেকে কি করে উদ্ধার করা যাবে? বেশী কিছু করতে গেলে ও যদি মুণ্ডুটা ভেঙে ফেলে!

ভোরবেলা উঠেই সিদ্ধার্থদা বিছানার পাশে হাত বাড়িয়ে বললেন, কই, এখনো চা দেয়নি?

সকালবেলা বেড-টি খাওয়ার অভ্যেস, সিদ্ধার্থদা বোধহয় ভেবে-ছিলেন হোটেলের ঘরে শুয়ে আছেন। ধড়মড় করে উঠে বসে সিদ্ধার্থদা বললেন, ব্যাটারা আচ্ছা অভদ্র তো, এখনো চা দেয় না কেন? দরজার কাছে গিয়ে দুম দুম করে ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কই হ্যায়? চা লে আও!

আমি বললাম, ওরা বোধহয় চা খায় না।

সিদ্ধার্থদা বললেন, নিশ্চয়ই খায়! পাঞ্জাবীরা বাঙালীদের মতনই চা খেতে খুব ভালোবাসে।

কিন্তু কারুর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। চা তো দূরের কথা, সকালবেলা কেউ কোনো খাবারও দিতে এলো না। কাল রাত্তিরে অত খাইয়ে হঠাৎ আজ সকালবেলা এই ব্যবহার! ভাগ্যিস ঘরটার সঙ্গে একটা ছোট বাথরুম ছিল, নইলে আমাদের আরও অসুবিধে হতো।

সিদ্ধার্থদা খানিকটা বাদে ধৈর্য হারিয়ে সিক ধরে টানাটানি করছিলেন, এমন সময় একটা গাড়ি থামার আওয়াজ শোনা গেল। সিদ্ধার্থদা বললেন, নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ি। আমিও ছুটে গেলাম জানলার কাছে। কাকাবাবু নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন খাটে। সকাল থেকে কাকাবাবু একটাও কথা বলেননি।

আমাদের নিরাশ করে গাড়ি থেকে নামলো সুচা সিং আর একটা লোক। সুচা সিং একা গট গট করে উঠে এলো ওপরে। তার হাতে সেই মহামূল্যবান কাঠের বাক্সটা।

সিদ্ধার্থদা হালকা ভাবে বললেন, কী সিংজী, সকালবেলা কোথায় গিয়েছিলে? আমাদের চা খাওয়ালে না?

সুচা সিং কঠোরভাবে বললো, জানলাসে হঠ্ যাও! আমি প্রোফেসারের সঙ্গে কথা বলবো!

কাকাবাবু তখনও খাটে বসে আছেন। সুচা সিং আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এই যে খোকাবাবু, তোমার আংকেলের চশমাটা

নিন বাবু! দেখুন প্রোফেসারসাব, আপনি যা চাইছেন, তাই দিচ্ছি! এবার আমার কথা শুনবেন!

চশমাটা পেয়ে কাকাবাবু স্পষ্টভাবে খুশী হয়ে উঠলেন। বললেন, সুচা সিং, তোমার সঙ্গে আমাদের তো কোনো ঝগড়া নেই। তুমি আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা পুলিশকে কিছু জানাবো না তোমার নামে। আমি কথা দিচ্ছি!

সুচা সিং বিরক্ত ভাবে বললো, এক কথা বারবার বলতে আমি পছন্দ করি না! আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে ঠিক করুন, আমার কথা শুনবেন কি না!

সিদ্ধার্থদা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি ঘরের মধ্যে এসে বসুন, আমরা এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবো।

সুচা সিং প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললো, চোপ! তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না!

তারপর সে কাঠের বাক্স খুলে কনিষ্কর মুখটা দু আঙুলে তুলে উঁচু করে বললো, কী প্রোফেসারসাব, কিছু ঠিক করলেন?

কাকাবাবু পাথরের মুখটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, সিংজী, ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করছি, তুমি ওটাকে ও ভাবে ধরো না। সাবধানে ধরো। ওটা ভেঙে গেলে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে!

—বটে! বটে! এটার তাহলে অনেক দাম!

—সিংজী, তুমি ওটা ফেরত দাও, তোমাকে তার বদলে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেবো। তার বেশী দেবার সামর্থ্য আমার নেই।

—পাঁচ হাজার? একটা পাথরের মুণ্ডুর দাম পাঁচ হাজার! এ রকম পাথরকা চীজ তো হামেশা পাওয়া যায়। আপনি পাঁচ হাজার রুপিয়া দিতে চাইছেন! তাহলে এক লাখ রুপিয়ার কম আমি ছাড়বো না!

—এক লাখ টাকা আমার নেই, থাকলে দিতাম। ও মূর্তিটার বাজারে কোনো দাম নেই। আমার কাছেই শুধু ওর দাম।

—ওসব চালাকি ছাড়ুন। খাঁটি কথাটা কী, বলুন!

সিদ্ধার্থদা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে খপ্ করে পাথরের মুখটা চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, ছাড়বো না, কিছুতেই ছাড়বো না।

কাকাবাবু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, সিদ্ধার্থ ছেড়ে দাও, শিগগির ছেড়ে দাও! ভেঙে যাবে! ওটা বরং ওর কাছেই থাকুক!

সুচা সিং দু হাতে চেপে ধরেছে সিদ্ধার্থদার হাত। আস্তে আস্তে

পাথরের মুখটা ছাড়িয়ে নিয়ে কাঠের বাক্সে রাখলো। সাধারণ মানুষের মুখের চেয়ে দেড় গুণ বড় কনিষ্কর মুখটা। বেশ ভারী। কিন্তু সুচা সিং অনায়াসেই হাল্কা বলের মতন সেটা বাঁ হাতে ধরে মাটিতে রাখলো। তারপর সিদ্ধার্থদার হাতটা ধরে মোচড়াতে লাগলো। সিদ্ধার্থদা যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে ফেললেন। হাতটা বোধহয় ভেঙেই যাবে। আমি কাঁদো-কাঁদো মুখে সুচা সিংকে অনুরোধ করলাম, ছেড়ে দিন! ওঁকে ছেড়ে দিন! আর কখনো এ রকম করবে না—

সুচা সিং ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, বেতমীজ! আমার সঙ্গে জোর দেখাতে যায়! খুলে নেবো হাতখানা?

যন্ত্রণায় সিদ্ধার্থদার মুখ কুঁকড়ে যাচ্ছে, কিন্তু গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বার করলেন না। শেষ পর্যন্ত সুচা সিং এক ধাক্কা দিয়ে সিদ্ধার্থদাকে মেঝেতে ফেলে দিল। তারপর কর্কশ গলায় বললো, প্রোফেসার, শুনলে না আমার কথা। তাহলে থাকো এখানে! আমি জম্মুতে চললাম, ওখানে আমার এক দোস্ত্ পাথরের দোকানদার, তাকে দেখাবো জিনিসটা! তোমাদের মারবো না—কাল আমার লোক এসে তোমাদের ছেড়ে দেবে।

সুচা সিং গটমট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে গাড়িটাতে উঠলো। কাকাবাবুও নেমে এসে জানলার পাশে দাঁড়িয়েছেন। গাড়িটা ছাড়ার পর সুচা সিং আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসলো। তারপর চলে গেল হুশ করে!

গাড়িটা চলে যাওয়া মাত্র কাকাবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সিদ্ধার্থদার পাশে বসে পড়ে ব্যাকুলভাবে জিগ্যেস করলেন, সিদ্ধার্থ, তোমার হাত ভাঙেনি তো?

সিদ্ধার্থদা উঠে বসে বললেন, না, ভাঙেনি বোধহয় শেষ পর্যন্ত! শয়তানটাকে আমি শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দেবোই। এর প্রতিশোধ যদি না নিই—

—শোনো, এখন এক মিনিটও সময় নষ্ট করার উপায় নেই। শিগগির ওঠো! দরজা ভাঙতে হবে—

কাকাবাবু নিজেই খোঁড়া পা নিয়ে ছুটে গিয়ে দরজার গায়ে জোরে ধাক্কা দিলেন। পুরু কাঠের দরজা—কেঁপে উঠলো শুধু। সিদ্ধার্থদা উঠে এসে বললেন, কাকাবাবু, আপনি সরুন, আমি দেখছি!

—না, না, এসো, আমরা তিনজনে মিলেই এক সঙ্গে ধাক্কা দিই—

সিদ্ধার্থদার দেখাদেখি আমিও অনেকটা ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিলাম

দরজায়। প্রত্যেকবার শব্দ হচ্ছে প্রচণ্ড জোরে। কাকাবাবু বললেন, হোক শব্দ, তাই শুনে যদি কেউ আসে তো ভালোই!

কেউ এলো না। আমরা পর পর ধাক্কা দিয়ে যেতে লাগলাম। বেশ খানিকটা বাদে একটা পাল্লায় একটু ফাটল দেখা দিল, তাই দেখে আমাদের উৎসাহ হয়ে গেল দ্বিগুণ। শেষ পর্যন্ত যে আমরা দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারলাম, সেটা শুধু গায়ের জোরে নয়, মনের জোরে।

ঘর থেকে বেরিয়েই কাকাবাবু বললেন, আমি দৌড়োতে পারবো না, তোমরা দুজন দৌড়ে যাও। বড় রাস্তায় গিয়ে যে-কোনো একটা গাড়ি থামাবার চেষ্টা করো! যে-কোন উপায়ে থামানো চাই। আমি আসছি। পরে—

প্রথমে একটা প্রাইভেট গাড়িকে থামাবার চেষ্টা করলাম। কিছুতেই থামলো না। আর একটু হলে আমাদের চাপা দিয়ে চলে যেত। তারপর একটা বাস। এখানকার বাস মাঝরাস্তায় কিছুতেই থামে না। বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো গাড়ি নেই। ততক্ষণে কাকাবাবু এসে পৌঁছেছেন। এবার দূর থেকে একটা জিপ আসতে দেখা গেল। কাকাবাবু বললেন, এসো, সবাই মিলে রাস্তার মাঝখানে পাশাপাশি দাঁড়াই। এটাকে থামাতেই হবে।

জিপটা প্রচণ্ড জোরে হর্ণ দিতে দিতে কাছাকাছি এসে গেল। সিদ্ধার্থদা হতাশ ভাবে বললেন, এটা মিলিটারির জিপ। এরা কিছুতেই থামে না।

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, থামাতেই হবে। না হলে চাপা দেয় দিক!

জিপটা আমাদের একেবারে সামনে এসে থেমে গেল। একজন অফিসার রুক্ষভাবে বললেন, হোয়াট্স দা ম্যাটার জেণ্টেলমেন?

কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন। অফিসারটির পোশাকের চিহ্ন দেখে বললেন, আপনি তো একজন করনেল? শুনুন করনেল, আপনাকে আমাদের সাহায্য করতেই হবে। একটুও সময় নেই!

তারপর কাকাবাবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন করনেল। তারপর বললেন, হুঁ, বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আমাকে জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে।

কাকাবাবু গাড়ির সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, যতই জরুরী কাজ থাক, আপনাকে যেতেই হবে।

কাকাবাবু গভর্নমেণ্টের এক গাদা বড় বড় অফিসার, মিলিটারির অফিসারের নাম বললেন। করনেল বললেন, আপনি ওসব যতই নাম বলুন, আমার মিলিটারি ডিউটির সময় আমি অন্য কারুর কথা শুনতে বাধ্য নই।

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, মিলিটারি হিসেবে নয়, আপনাকে আমার দেশের একজন মানুষ হিসেবে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি!

করনেল একটুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে বসে রইলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, গেট ইন্!

আমরা উঠে পড়তেই গাড়ি চললো ফুল স্পীডে। করনেল পুরো ব্যাপারটা আবার শুনলেন। তারপর বললেন, ইতিহাস সম্পর্কে আমারও ইন্টারেস্ট আছে। সত্যি, এটা একটা মস্ত বড় আবিষ্কার। এটা নষ্ট হলে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে।

করনেলের নাম রণজিৎ দত্ত। বাঙালী নয়, পাঞ্জাবী। প্রথমে তিনি আমাদের নিতে রাজী হচ্ছিলেন না, পরে কিন্তু বেশ উৎসাহ পেয়ে গেলেন। ওঁর কাছেও এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার।

গাড়ি এত জোরে যাচ্ছে যে হাওয়ায় কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে। করনেল বললেন, ওদের গাড়ি অনেক দূর চলে গেছে। পাহাড়ী রাস্তায় একটা মুস্কিল, কোনো গাড়িকে ওভারটেক করা যায় না। মাঝখানে যে-সব গাড়ি পড়ছে তাদের পার হবো কী করে?

কাকাবাবু বললেন, উপায় একটা বার করতেই হবে।

সিদ্ধার্থদা বললেন, একটা উপায় আছে। উল্টো দিকের গাড়িকে পাশ দেবার জন্য মাঝে মাঝে যে কয়েক জায়গায় খানিকটা করে কাটা আছে—

করনেল দত্ত বললেন, হ্যাঁ, সেটা একটা হতে পারে বটে। অবশ্য, যদি মাঝখানের গাড়িগুলো জায়গা দেয়।

—আপনার মিলিটারির গাড়ি। আপনার গাড়ির হর্ণ শুনলে সবাই রাস্তা দেবে। আমাদের খুব ভাগ্য যে আপনাকে পেয়ে গেছি।

করনেল ড্রাইভারকে বললেন, সামনের গাড়ি দেখলেই দুবার করে জোরে হর্ণ দেবে। আপনারা সুচা সিং-এর গাড়ি চিনতে পারবেন তো?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ, সাদা জীপ গাড়ি। নম্বরও আমি মুখস্থ করে রেখেছি।

সিদ্ধার্থদা আস্তে করে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েই উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ওঁর ডান হাতে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা এখনো।

পাহাড়ী রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেছে। রাস্তাটা ওপরে উঠে গেলে নিচের রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায়। একটু বাদেই আমরা যখন পাহাড়ের ওপর দিকে উঠছি, পাহাড় পেরিয়ে নিচের দিকের রাস্তায় দেখতে পেলাম খেলনার মতন তিনটে গাড়ি। তার একটাকে বাস বলে চেনা যায়।

করনেল দূরবীন বার করলেন। আমাকে জিগ্যেস করলেন, গাড়ির নম্বরটা বলো তো, দেখি এর মধ্যে আছে কি না!

একটু দেখেই উত্তেজিত ভাবে বললেন, দ্যাটস ইট! ঐ তো সাদা জীপ!

আমরা সবাই উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলাম। এবার আর সুচা সিংকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। কিন্তু পাহাড়ী রাস্তায় খুব জোরে তো গাড়ি চালানো যায় না, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে হর্ণ দিয়ে গতি কমিয়ে দিতে হয়। একদিকে অতলস্পর্শী খাদ, অন্যদিকে পাহাড়ের দেয়াল। খাদের নিচের দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে। একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে এক পশলা, ভিজে রাস্তা বেশী বিপজ্জনক।

কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, কী সুন্দর রামধনু উঠেছে দ্যাখো। এ পাশের সারাটা আকাশ জুড়ে আছে। অনেকদিন বাদে সম্পূর্ণ রামধনু দেখলাম—সাধারণত দেখা যায় না।

আমাদের চোখ নিচের রাস্তার সেই খেলনার মতন গাড়ির দিকে আবদ্ধ ছিল। সিদ্ধার্থদা অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে ঘুরে জিগ্যেস করলেন, কাকাবাবু, আপনার এখন রামধনু দেখার মতন মনের অবস্থা আছে? আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছি না।

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, মনকে বেশী চঞ্চল হতে দিতে নেই, তাতে কাজ নষ্ট হয়। দণ্ডকারণ্যে রাম যখন সীতাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, সেই সময়ও তিনি পম্পা সরোবরের সৌন্দর্য দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।

করনেল ড্রাইভারকে বললেন, বাসটা কাছাকাছি এসে গেছে। হর্ণ দাও! হর্ণ দাও—দু বার!

বাসটা সহজেই আমাদের পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু তার পরের গাড়িটা আর কিছুতেই জায়গা দিতে চায় না। আমরা সেটার পেছন পেছন এসে অনবরত হর্ণ দিতে লাগলাম। মাইল দুয়েক বাদে রাস্তাটা

একটু চওড়া দেখেই বিপদের পুরো ঝুঁকি নিয়ে গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে গেলাম। সেই গাড়িটাতে শুধু একজন ড্রাইভার, আর কেউ নেই। সিদ্ধার্থদা বললেন, ও গাড়ির ড্রাইভারটা বোধহয় কালা—আমাদের এত হর্ণ ও শুনতে পায়নি!

করনেল বললেন, কালা লোকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয় না। কালা নয়, লোকটা পাজী।

এবার আমাদের ঠিক সামনে সুচা সিং-এর গাড়ি। বড় জোর সিকি মাইল দূরে। আমরা দেখতেও পাচ্ছি, গাড়িতে সুচা সিং আর তার একজন সঙ্গী বসে আছে। ওরাও নিশ্চয়ই দেখেছে আমাদের।

সিদ্ধার্থদা গাড়ির সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন প্রায়। ছটফট করে বললেন, ব্যাটার আর কোনো উপায় নেই, এবার ওকে ধরবোই।

আমাদের হর্ণে ও-গাড়ি কর্ণপাতও করলো না। দুটি গাড়ির মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে একটু একটু করে। ওরা মরীয়া হয়ে জোরে চালাচ্ছে। সুচা সিং খুব ভালো ড্রাইভার—আমরা আগে দেখেছি।

করনেল বেল্ট থেকে রিভলবার বার করে বললেন, ও গাড়ির চাকায় গুলি করতে পারি। কিন্তু তাতে একটা ভয় আছে, গাড়িটা হঠাৎ উল্টে যেতে পারে।

কাকাবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, খবরদার, সে কাজও করবেন না। আমি সুচা সিংকে শাস্তি দিতে চাই না, আমি আমার জিনিসটা ফেরত চাই।

সিদ্ধার্থদা বললেন, আর বেশী জোর চালালে আমাদের গাড়িই উল্টে একেবারে ঝিলম নদীতে পড়বে। ঐ দ্যাখো, সন্তু, ঝিলম নদী!

আমি একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। অত নিচে তাকালে আমার মাথা ঝিমঝিম করে।

আট দশ মাইল চললো দুই গাড়ির রেস। ক্রমশ আমরাই কাছে চলে আসছি। করনেল জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুব জোরে চিৎকার করে উঠলেন, হল্ট!

সুচা সিং মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখলো। কিন্তু গাড়ি থামালো না। কাকাবাবু বললেন, করনেল দত্ত, সাবধান! সুচা সিং-এর কাছে আমার রিভলবারটা আছে।

করনেল বললেন, মিলিটারির গাড়ি দেখেও গুলি চালাবে এমন সাহস এখানে কারুর নেই।

আর কয়েকমাইল গিয়েই ভাগ্য আমাদের পক্ষে এলো। দেখতে

পেলাম উল্টোদিক থেকে একটা কনভয় আসছে। এক সঙ্গে কুড়ি-পঁচিশটা লরি। সুচা সিং-এর আর উপায় নেই। কনভয়কে জায়গা দিতেই হবে, পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই।

করনেল তাঁর ড্রাইভারকে বললেন, আমাদের গাড়ির স্পীড কমিয়ে দাও। আগে দেখা যাক্—ও কী করে!

সুচা সিং-এর গাড়ির গতিও কমে এলো! এক জায়গায় ছোট একটা বাই পাস আছে, সেখানে গাড়ি ঘুরেই থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমেই দু দিকে দৌড়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরে, আমরাও গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে ছুটে গেলাম। সুচা সিং-এর সঙ্গী প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে উল্টো দিকের রাস্তায়। তার দিকে আমরা মনোযোগ দিলাম না। সুচা সিং পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। এক হাতে সেই কাঠের বাক্স।

সিদ্ধার্থদাই আগে আগে যাচ্ছিলেন। সুচা সিং হঠাৎ রিভলবার তুলে বললো, এদিকে এলে জানে মেরে দেবো!

সিদ্ধার্থদা থমকে দাঁড়ালেন। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। শুধু করনেল একটুও ভয় না পেয়ে গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন, এক্ষুনি তোমার পিস্তল ফেলে না দিলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো!

আমি তাকিয়ে দেখলাম, করনেলের হাতে রিভলবার ছাড়াও, ওঁর গাড়ি যিনি চালাচ্ছিলেন তাঁর হাতে একটা কী যেন কিম্ভুত চেহারার অস্ত্র। দেখলেই ভয় করে। সুচা সিং সেই দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে রিভলবারটা ফেলে দিল। কিন্তু তবু তার মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি ফুটে উঠলো। কাঠের বাক্সটা উঁচু করে ধরে বললো, এটার কী হবে প্রোফেসারসাব? আমার কাছে কেউ এলে আমি এটা নিচে নদীতে ফেলে দেবো।

কাকাবাবু করনেলকে হাত দিয়ে বাধা দিয়ে বললেন, আর এগোবেন না। ও সত্যিই ফেলে দিতে পারে।

তারপর কাকাবাবু হাতজোড় করে বললেন, সুচা সিং, তোমাকে অনুরোধ করছি, ওটা ফিরিয়ে দাও!

সুচা সিং আর একটা পাথর ওপরে উঠে গিয়ে বললো, এটা আমি দেবো না। কিছুতেই দেবো না!

—ফিরিয়ে দাও সুচা সিং! গভর্নমেণ্টকে বলে তোমাকে আমি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করবো। আমি নিজে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবো বলেছি—

সুচা সিং হঠাৎ রিভলবার তুলে বলল, এদিকে এলে জানে মেরে দেবো!

—বিশ্বাস করি না। তোমরা মিলিটারি নিয়ে এসেছো। এটা ফিরিয়ে দিলেই তোমরা আমাকে ধরবে।

—না ধরবো না। তুমি বাক্সটা ওখানে পাথরের ওপর রেখে যাও। আমরা আধঘণ্টা আগে ছোঁবো না। তুমি চলে না গেলে—

—ওসব বাজে চালাকি ছাড়ো!

—না, সত্যি, বিশ্বাস করো, ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি—সুচা সিং বাক্সটা হাতে নিয়ে দোলাতে লাগলো। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। হুকুমের সুরে বললো, তোমরা এক্ষুনি গাড়িতে ফিরে যাও! না হলে আমি এটা ঠিক ফেলে দেবো!

কাকাবাবু অসহায়ভাবে করনেলের দিকে তাকালেন। ভাঙা গলায় বললেন, কী করা উচিত বলুন তো? আমাদের বোধহয় ওর কথা মতন গাড়িতে ফিরে যাওয়াই উচিত! ও যদি ফিরে যায়—

করনেল বললেন, ওর কথা বিশ্বাস করা যায় না। ওদিকে হয়তো নেমে যাবার রাস্তা আছে। ও পালাবে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে সিদ্ধার্থদা এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কেউ লক্ষ্য করেনি। আস্তে আস্তে পাথরের খাঁজে পা দিয়ে সিদ্ধার্থদা একেবারে সুচা সিং-এর সামনে পৌঁছে গেলেন। বাক্সটা ধরার জন্য সিদ্ধার্থদা যেই হাত বাড়িয়েছেন, সুচা সিং ঠেলে দিতে গেল তাঁকে। তারপর মরীয়ার মতন বললো, যাক্, তাহলে আপদ যাক্!

সুচা সিং বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নিচে।

আমরা কয়েক মুহূর্তের জন্য দম বন্ধ করে রইলাম। কাকাবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। সিদ্ধার্থদা বাঘের মতন সুচা সিং-এর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

ঝটাপটি করতে করতে দুজনেই পড়ে গেলেন পাথরের ওপাশে।

হোক ভয়ংকর, তবু সুন্দর

তারপর মাস তিনেক কেটে গেছে। কলকাতায় ফিরে এসেছি, এখন আবার স্কুলে যাই। সামনেই পরীক্ষা, খুব পড়াশুনো করতে হচ্ছে। অনেকদিন পড়াশুনো বাদ গেছে তো!

তবু প্রায়ই কাশ্মীরের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে

হয় স্বপ্নের মতন। গল্পের বইতে যে রকম পড়ি, সিনেমায় যে-রকম দেখি—আমার জীবনেও সে-রকম ঘটনা ঘটেছিল। অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না।

এক একবার ভাবি, সেই পাইথনটা গুহার একেবারে ভেতরের দিকে না থেকে যদি বাইরের দিকে থাকতো? যদি আমি পড়ে যাওয়া মাত্রই কামড়ে দিত? তাহলে এখন আমি কোথায় থাকতাম? সেই কথা ভেবে নতুন করে ভয় হয়। কিংবা তাঁবুর মধ্যে সুচা সিং-এর দলবল যখন আমার মুখ বেঁধে রেখেছিল, তখন ওরা তো আমাকে মেরে ফেলতেও পারতো!

কী সব ভয়ংকর দিনই গেছে। হোক ভয়ংকর, তবু কত সুন্দর। আমাকে যদি আবার ঐ রকম জায়গায় কেউ যেতে বলে, আমি এক্ষুনি রাজী! আবার ঐ রকম বিপদের মধ্যে পড়তে হলেও আমি ভয় পাবো না! ঐ ক'টা দিনের অভিজ্ঞতাতেই যেন আমি অনেক বড় হয়ে গেছি।

রিণি আমার ওপর খুব রেগে গেছে। আমরা ঐ রকম একটা অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছিলাম আর ওরা বসে ছিল শ্রীনগরে—এই জন্য ওর রাগ। কেন আমরা ওকে সঙ্গে নিইনি! আমি বলেছি, যা যা ভাগ্। তোকে সঙ্গে নিলে আরও কত বিপদ হতো তার ঠিক আছে! সুচা সিং-এর রাগী মুখ দেখলেই তুই অজ্ঞান হয়ে যেতিস! রিণি মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে সুচা সিং-এর রাগী মুখের একটা ছবি এঁকেছে। সেটা মোটেই সুচা সিং-এর মতন দেখতে নয়, বক-রাক্ষসের মতন।

সিদ্ধার্থদার হাতে বুকে এখনও প্লাস্টার বাঁধা। সিদ্ধার্থদা পাহাড় থেকে অনেকখানি গড়িয়ে পড়েছিলেন সুচা সিং-কে সঙ্গে নিয়ে। সুচা সিং-এর দেহের ভারেই সিদ্ধার্থদার বুকের তিনটে পাঁজরা ভেঙে গিয়েছিল, আর ডান হাতটা ছেঁচে গিয়েছিল খানিকটা। সিদ্ধার্থদা এখন আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠছেন। সিদ্ধার্থদার গর্ব এই, তবু তো তিনি একবার অন্তত সেই মহা মূল্যবান ঐতিহাসিক জিনিসটা ছুঁতে পেরেছিলেন।

সুচা সিং-ও বেঁচে গেছে। তারও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে—এখন সে জেলে। সুচা সিং-এর ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দুটির কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়। ওরা যখন বড় হয়ে শুনবে, ওদের বাবা একজন ডাকাত, তখন কি ওদের খুব দুঃখ হবে না? চোর-ডাকাতের ছেলে-মেয়েরা নিশ্চয়ই খুব দুঃখী হয়।

কাকাবাবুও সেদিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওঁকে তখন

ধরাধরি করে খুব সাবধানে নিয়ে আসা হয়েছিল কুদ নামে একটা জায়গায়। সেখানে একজন ডাক্তার পাওয়া গিয়েছিল ঠিক সময় মতন। কর্নেল দত্তা যে আমাদের কত সাহায্য করেছিলেন, তা বলে বোঝানো যায় না। কাকাবাবু অবশ্য দু' তিনদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠে-ছিলেন খানিকটা। তারপরই আবার সেই পাথরের মুখ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন।

সুচা সিং যেখান থেকে বাক্সটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেখান থেকে ওটা ঝিলম নদীতেই পড়ার কথা। কিন্তু তিনদিন ধরে ঝিলম নদীর অনেকখানি এলাকা জুড়ে খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, পাওয়া যায়নি। সেই পাহাড়টার সব জায়গাও তন্নতন্ন করে খোঁজা বাকী থাকেনি। অমন মূল্যবান জিনিসটা কোথায় যে গেল, কে জানে!

কাকাবাবু আমাকে বারণ করেছেন, ওটার কথা কারুকে বলতে। কারণ, এ রকম একটা ঐতিহাসিক ব্যাপারের সত্যি সত্যি প্রমাণ না পেলে কেউ বিশ্বাস করে না। আমার কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাতে ইচ্ছে করে।

আমার এখনও ধারণা, কাঠের বাক্সটা সহজে ডুবে যাবে না। ঝিলম নদীর তীরে কোথাও না কোথাও একদিন ওটাকে আবার খুঁজে পাওয়া যাবে। সেদিন আমাদের কথা সবাই বিশ্বাস করবে।

—

সন্তু-কাকাবাবু সিরিজ

কাকাবাবু ও চন্দনদস্যু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আ ন্দ
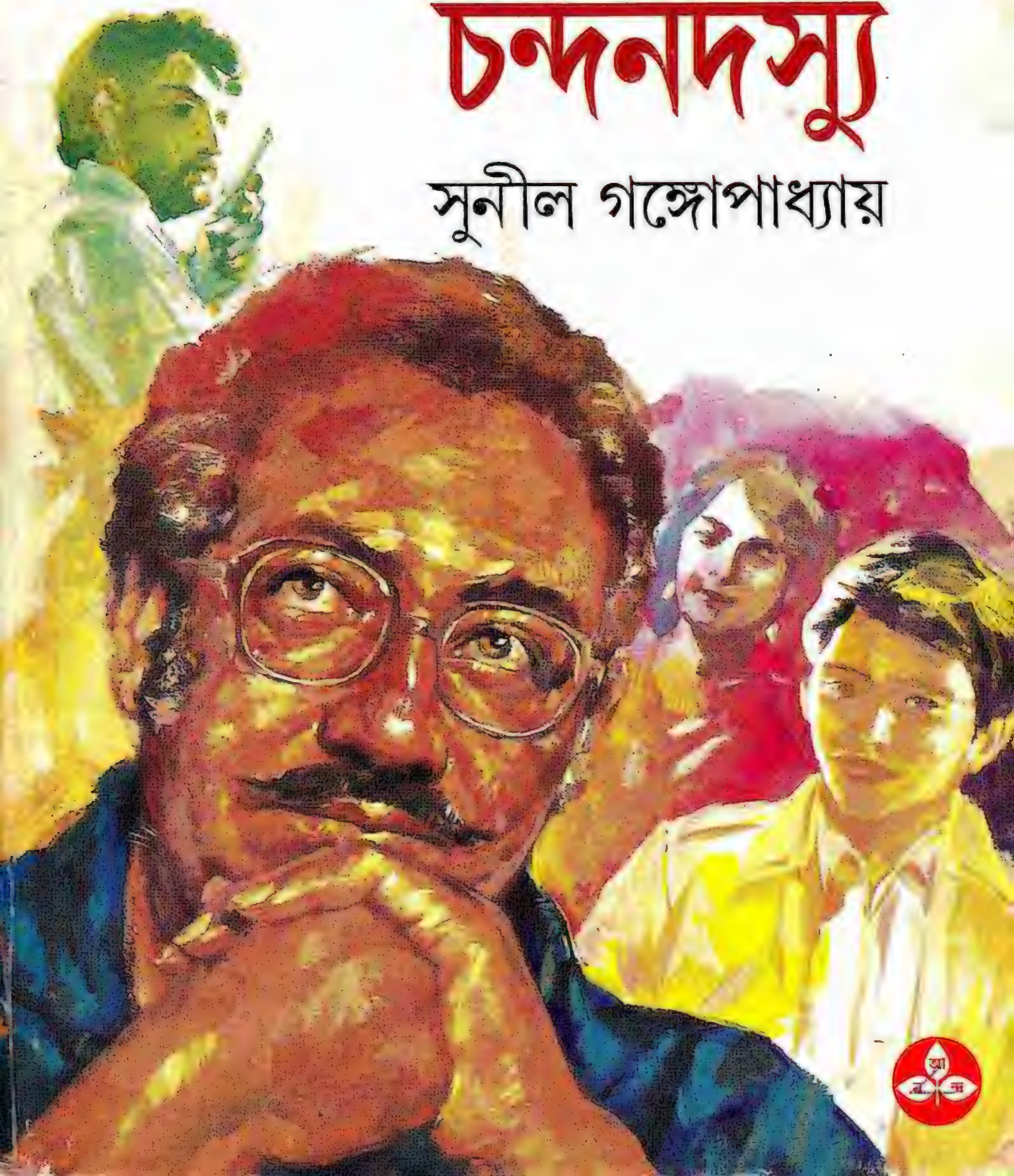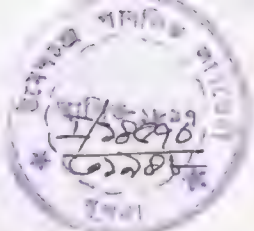
বই পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া কাকাবাবুর অভ্যেস। একটানা বেশিক্ষণ পড়তে পারেন না। বড়জোর আধঘণ্টা পড়ার পর চোখ বুজে যায়। দশ-পনেরো মিনিট সেই অবস্থায় থাকেন, কখনও সখনও একটু একটু নাকও ডাকে। তারপর আবার পড়া শুরু হয়। তাতে নাকি তাঁর আরাম হয় চোখের।

এক-একদিন সারারাত ধরে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে, খানিকক্ষণ জেগে পড়ে শেষ করে ফেলেন এক-একটা বই।

এখন বেলা এগারোটা। জোজো ঘরে ঢুকে দেখল, কাকাবাবু ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন, কোলের ওপর একটা মোটা ইংরেজি বই। চক্ষু বোজা।

কিন্তু কাকাবাবুর ঘুম খুব পাতলা। ঘরে কেউ ঢুকলেই টের পেয়ে যান। জোজো কোনও শব্দ করেনি, তবু কাকাবাবু চোখ মেলে তাকালেন।

সোজা হয়ে বসে বললেন, "এসো, এসো, জোজো মাস্টার। নতুন কী খবর বলো!"

সাদা প্যান্টের ওপর একটা হলুদ রঙের টি-শার্ট পরে আছে জোজো। দু-একদিন আগেই চুল কেটেছে। সে সবসময় বেশ ফিটফাট থাকে।

জোজো বলল, "গরমের ছুটি পড়ে গেছে। দিনগুলো নষ্ট হচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন, নষ্ট হচ্ছে কেন?"

জোজো বলল, "এখন কলকাতায় থাকার কোনও মানে হয়?

কোথাও বেড়াতে যাওয়া উচিত ছিল। বাবা অবশ্য আমাকে পাপুয়া-নিউগিনি পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সন্তু না গেলে, মানে আপনার আর সন্তুর সঙ্গে যেতেই আমার বেশি ভাল লাগে। আপনাকে এবার কোনও জায়গা থেকে কেউ ডাকেনি?"

কাকাবাবু বললেন, "না তো! অবশ্য কেউ না ডাকলেও তো এমনিই কোথাও যাওয়া যায়।"

জোজো বলল, "স্পেনে যাবেন? বার্সেলোনার আকাশে পরপর তিনদিন অন্য গ্রহের রকেট দেখা গেছে।"

কাকাবাবু সরলভাবে অবাক হয়ে বললেন, "তাই নাকি! কোন গ্রহের রকেট?"

জোজো বলল, "তা এখনও জানা যায়নি। তবে হাতির মতন শুঁড়ওয়ালা একটা মানুষকেও নাকি দেখা গেছে সেই রকেট থেকে উঁকি মারতে।"

কাকাবাবু বললেন, "গণেশ দেবতা নাকি? বোধ হয় স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে না এসে স্পেনে গেলেন কেন? ওরা তো আর ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করে না। তুমি এ খবর জানলে কী করে?"

জোজো বলল, "স্পেন দেশের কাগজে বেরিয়েছে। আমাদের বাড়িতে তো পৃথিবীর সব দেশের কাগজ আসে। আমার বাবা সাতাশটা ভাষা জানেন। চলুন না দেখে আসি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো অত ভাষা জানি না। অন্য গ্রহের প্রাণীদের সঙ্গে কোন ভাষায় কথা বলব? যদি গণেশ ঠাকুর হন, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে সংস্কৃত ভাষায়। আমি সংস্কৃতও ভাল জানি না। তা ছাড়া স্পেনে যাওয়ার অনেক খরচ।"

জোজো বলল, "তা হলে ইন্দোনেশিয়ায় চলুন। সত্যিকারের ড্রাগন দেখতে পাওয়া গেছে। মুখ দিয়ে আগুন বেরোয়। সেই

আগুনে গাছপালা পুড়িয়ে দিচ্ছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এ-খবরটা আবার কোথায় বেরিয়েছে?"

জোজো বলল, "কোথাও বেরোয়নি। অ্যামেরিকানরা জানতে পারলেই তো ড্রাগনটা কিনে নিয়ে যাবে। আমার বাবার কাছে ইন্দোনেশিয়া থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি চুপি চুপি বলে দিয়েছেন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু কোথায়? তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ। ও কাঁচা আম মাখছে। নুন আর লঙ্কা দিয়ে। আপনি খাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "শুনেই তো জিভে জল আসছে। নিশ্চয়ই খাব। এখন তো আমের সিজ্‌ন নয়। কাঁচা আম কোথায় পেল!"

জোজো বলল, "ও পায়নি। আমি এনেছি। আফ্রিকা থেকে একজন পাঠিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ! সারা পৃথিবী জুড়ে তোমার চেনাশুনো।"

জোজো এবার প্যান্টের পকেট থেকে একটা রুপোর মেডেল বার করল। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এটা দেখেছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "মেডেল? এটা কে দিয়েছে তোমায়? ইংল্যান্ডের রানি না জাপানের সম্রাট?"

জোজো হেসে ফেলে বলল, "এটা আমার নয়, সন্তুর। ও লজ্জায় আপনাকে দেখায়নি।"

কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে বললেন, "সন্তুকে হঠাৎ কে দিল?"

গোল মেডেলটির মাঝখানে লেখা :

শরৎ স্মৃতি পুরস্কার

১ম

শ্রীসুনন্দ রায়চৌধুরী

কাকাবাবু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কীসের পুরস্কার বলো তো? সাঁতারের?"

জোজো বলল, "না। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। সব কলেজের মধ্যে। সন্তু ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে। বিষয়টা ছিল, 'পৃথিবীর আয়ু কতদিন'।"

কাকাবাবু বললেন, "খুব শক্ত বিষয় তো। আমি নিজেই জানি না। পৃথিবীর আয়ু কতদিন? জোজো, এই প্রতিযোগিতায় তুমি নাম দাওনি?"

জোজো বলল, "কী যে বলেন কাকাবাবু! একই প্রতিযোগিতায় সন্তু আর আমি দু'জনে কি একসঙ্গে নাম দিতে পারি? আমি ফার্স্ট হয়ে গেলে সন্তু দুঃখ পেত না? সন্তুকে আমি অনেক পয়েন্ট বলে দিয়েছি। আসলে একটাই মেন পয়েন্ট।"

কাকাবাবু বললেন, "কী বলো তো মেন পয়েন্ট!"

জোজো বলল, "সাবজেক্টটা হল পৃথিবীর আয়ু কতদিন। এতে কিন্তু পৃথিবী নিয়ে কিছু লিখতে হবে না। লিখতে হবে, মানুষের আয়ু কতদিন। ধরুন, কোনও কারণে যদি পৃথিবী থেকে সব মানুষ শেষ হয়ে যায়, তা হলে তার পরেও পৃথিবী থাকবে কি থাকবে না, কে তার হিসেব রাখবে?"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ তো? আচ্ছা জোজো, তুমি ভূতের আয়ু কতদিন তা বলতে পারো?"

জোজো বেশ অবাক হয়ে বলল, "তার মানে?"

কাকাবাবু বললেন, "একজন মানুষ ষাট-সত্তর-আশি বছর বাঁচে। তারপর মরে গিয়ে ভূত হয়। ভূত হয়ে আবার কতদিন বেঁচে থাকে? চার-পাঁচশো বছর কি ভূতের আয়ু হতে পারে?"

জোজো ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?"

কাকাবাবু একগাল হেসে বললেন, "আগে তো করতাম না। এখন মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।"

এই সময় সন্তু একটা পাথরের বাটি হাতে নিয়ে ঢুকল। তাতে কাঁচা আম পাতলা পাতলা করে কেটে নুন আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে মাখা।

কাকাবাবু একটুখানি আমমাখা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে বললেন, "দারুণ! অনেকদিন পরে খেলাম! আর একটু দে তো!"

জোজো বলল, "বেশি খেলে দাঁত টকে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ রে সন্তু, তুই প্রবন্ধ লিখে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিস, আমাকে বলিসনি কেন?"

সন্তু লাজুকভাবে বলল, "ও এমন কিছু না।"

কাকাবাবু বললেন, "তোকে আমারও একটা প্রাইজ দেওয়া উচিত। জোজো বলছিল কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা। সেটাই প্রাইজ হতে পারে। কিন্তু আমি বিদেশে নিয়ে যেতে পারব না। তাতে অনেক খরচ। কেউ তো আমাদের ডাকছে না। এমনিই বেড়ানো হবে। কোথায় যেতে চাস বল! এমন কোথাও যাওয়া যাক, যেখানে আমরা আগে যাইনি।"

সন্তু বলল, "জয়শলমির! রাজস্থানে কখনও—"

জোজো বলল, "আমি গেছি।"

সন্তু বলল, "তা হলে রাজগির?"

জোজো বলল, "তাও আমার দেখা।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কয়েকটা জায়গার নাম বলছি, জোজো বলো তো, সেগুলো তোমার দেখা কি না! চেরাপুঞ্জি। উটকামণ্ড। কালিকট। রামটেক। পারো। মহাবলীপুরম।"

জোজো বলল, "এইসব ছোট জায়গা... না, আমার যাওয়া হয়নি।"

সন্তু বললেন, "অনেক সময় ছোট জায়গাই বেশি ভাল লাগে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে এর মধ্যেই একটা বেছে নেওয়া যাক। কোথায় যাবে ঠিক করো।"

সন্তু বলল, "চেরাপুঞ্জি।"

জোজো বলল, "মহাবলীপুরম।"

কাকাবাবু বললেন, "ওভাবে হবে না। লটারির মতন একটা কিছু করা যাক।"

তিনি একটা কাগজকে ছ' টুকরো করে প্রত্যেকটাতে লিখলেন এক-একটা জায়গার নাম। তারপর কাগজগুলো উলটে দু'হাতে ধরে জোজোর দিকে এগিয়ে বললেন, "তুমি একটা টেনে নাও!"

জোজো একটা কাগজ নিয়ে পড়ে দেখে বলল, "কালিকট।"

কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর কালিকট যেতে আপত্তি আছে?"

সন্তু বলল, "ঠিক আছে কালিকটেই যাব। এটা কি সেই কালিকট, যেখানে ভাস্কো দা গামা প্রথমে এসে জাহাজ ভিড়িয়েছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "কালিকট একটাই আছে।"

জোজো বলল, "কালিকটের রাজার নাম ছিল জামোরিন। তার সঙ্গে ভাস্কো দা গামার আলাপ হয়। সেই প্রথম সমুদ্র পেরিয়ে ইওরোপের বণিকরা এসেছিল ভারতে।"

সন্তু বলল, "ভালই হল। নিশ্চয়ই ওখানে ইতিহাসের অনেক চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা জানি না। হয়তো এখন আর কিছুই নেই। যাই হোক, একটা নতুন জায়গা তো দেখা হবে!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী করে যেতে হয়? ট্রেনে?"

কাকাবাবু বললেন, "ট্রেনে যেতে অনেক সময় লেগে যাবে। প্লেনেও যাওয়া যায় নিশ্চয়ই।"

কাকাবাবুর ঘরের এক দেওয়ালে সবসময় একটা বড় ম্যাপ টাঙানো থাকে ভারতের। সেখানে উঠে গিয়ে তিনি বললেন, "এই যে দ্যাখ, কেরালায় কালিকট শহর। বম্বে দিয়ে যাওয়া যায়, ম্যাড্রাস দিয়েও যাওয়া যায়।"

জোজো বলল, "বম্বে নয়, এখন মুম্বই। ম্যাড্রাস নয়, চেন্নাই।"

কাকাবাবু বললেন, "তা বটে! মনে থাকে না। ভাগ্যিস আমাদের কলকাতার নামটাও বদলায়নি। আমরা মুম্বই দিয়েই যাব।"

একটু পরেই একজন লোক দেখা করতে এল কাকাবাবুর সঙ্গে। খাকি প্যান্ট ও খাকি শার্ট পরা। কাকাবাবুর দিকে একটা লম্বা খাম এগিয়ে দিয়ে বলল, "সার, এই আপনার প্লেনের টিকিট।"

কাকাবাবু খাম খুলে একটা প্লেনের টিকিট বার করে ভাল করে দেখলেন। তারপর বললেন, "হ্যাঁ ঠিক আছে। কিন্তু রামরতন, ঠিক এইরকম আরও দুটো টিকিট যে চাই, আমি নাম লিখে দিচ্ছি, আজ বিকেলের মধ্যেই দিয়ে যেতে হবে!"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ সার, পৌঁছে দেব।"

কাকাবাবু তাঁর প্যাডে সন্তু ও জোজোর নাম লিখে দিলেন।

লোকটি চলে যাওয়ার পর সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এটা কোথাকার টিকিট? তুমি অন্য কোথাও যাচ্ছ?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "না তো! এটা কালিকটের টিকিট। তোদের জন্যও আর দুটো টিকিট আসছে।"

সন্তু বলল, "তার মানে? কালিকট যাওয়া তো এইমাত্র ঠিক হল। আর সঙ্গে সঙ্গে কালিকটের টিকিট এসে গেল? এটা কি ম্যাজিক নাকি?"

কাকাবাবু এবার উত্তর না দিয়ে গোঁফে আঙুল বোলালেন।

জোজো বলল, "আমি যে কালিকট লেখা কাগজটা টানলাম, আমি তো অন্য কাগজও টানতে পারতাম!"

কাকাবাবু বললেন, "না। তা পারতে না। আমি একটু একটু ম্যাজিক শিখছি। ম্যাজিশিয়ানরা একটা তাসের ম্যাজিক দেখায়, দেখোনি? তুমি যে-কোনও একটা তাস টানলে, ম্যাজিশিয়ান দূর থেকেই বলে দিল সেটা কী তাস। এটা এক ধরনের হাতসাফাই, ইংরেজিতে বলে 'ফোর্সিং'। ম্যাজিশিয়ান ইচ্ছেমতন একটা বিশেষ তাস তোমাকে গছিয়ে দেবে। দেখবে খেলাটা?"

কাকাবাবু বিভিন্ন শহরের নাম লেখা কাগজগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। কয়েকবার সবক'টা ওলটপালট করার পর, আবার বিছিয়ে ধরে বললেন, "সন্তু, তুই একটা টান।"

সন্তু বেশ কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে একেবারে কোণের কাগজটা টেনে নিল।

কাকাবাবু বললেন, "ওটা উটকামণ্ড, তাই না?"

সন্তু দারুণ অবাক। সে জোজোর চোখের দিকে তাকাল। জোজো হাততালি দিয়ে বলল, "চমৎকার। কাকাবাবু আপনি আর কী কী ম্যাজিক শিখেছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আরও শিখেছি কয়েকটা। পরে দেখাব।"

জোজো বলল, "আপনি আগেই কালিকট যাবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন। তার মানে, ওখানে আপনার কোনও কাজ আছে?"

কাকাবাবু খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "না, কাজ ঠিক নেই। বেড়াতেই যাচ্ছি। তবে ফাউ হিসেবে একটা চার-পাঁচশো বছরের বুড়ো ভূতের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।"

কালিকটের প্লেন মুম্বই থেকে সকাল সাড়ে আটটায় ছাড়ে। কলকাতা থেকে ভোরের প্লেনে এলেও সেটা ধরা যায় না। তাই মুম্বই যেতে হল আগের দিন রাত্তিরে।

ওখানে কাকাবাবুর চেনাশুনো অনেক মানুষ আছে। কিন্তু কারও বাড়িতে উঠলেই সে অন্তত দু'-তিনদিন ধরে রাখতে চাইবে। কিছুতেই পরের দিন যেতে পারবেন না।

সেইজন্য কাকাবাবু কাউকে কিছু না জানিয়ে মুম্বইয়ের একটা হোটেলে টেলিফোন করে দুটো ঘর বুক করে রেখেছেন।

প্লেন মুম্বই পৌঁছল রাত সাড়ে আটটায়। মালপত্র নিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে এগোতেই একটা চোদ্দো-পনেরো বছরের মেয়ে দৌড়ে এসে কাকাবাবুর সামনে দাঁড়াল। তার দু'চোখ ভরা বিস্ময়।

সে আস্তে আস্তে বলল, "আপনি কাকাবাবু?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "হ্যাঁ, তুমি চিনলে কী করে?"

মেয়েটি বলল, "আমার বাবা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবা দেখিয়ে দিলেন।"

নিচু হয়ে সে কাকাবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

তারপর সন্তু আর জোজোর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "এদের চিনতে পারোনি? এই হচ্ছে সন্তু, আর এ জোজো। তোমার নাম কী?"

মেয়েটি বলল, "নিশা সেন।"

সে মুগ্ধভাবে জোজোর দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। কাঁধের

ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট খাতা বার করে বলল, "একটা অটোগ্রাফ দেবেন?"

জোজো সই করে দেওয়ার পর সে সন্তু আর কাকাবাবুরও সই নিল।

কাকাবাবু তার মাথায় হাত রেখে বললেন, "ভাল থেকো। এবার আমরা যাই?"

নিশা বলল, "আমরা এখানেই থাকি। কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্লেনে আপনাদের দেখতে পাইনি। একবার আমাদের বাড়িতে চলুন না। একটু চা খেয়ে যাবেন।"

কাকাবাবু কিছু বলার আগেই পাশ থেকে আর একজন লোক বলল, "তা তো সম্ভব নয় ভাই। এখন ইনি আমার সঙ্গে যাবেন।"

কাকাবাবু মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন কাছেই দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে সন্তুর কাছ থেকে একটা ব্যাগ নিতে যাচ্ছে।

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "আরে, অমল? তুমিও এই প্লেনে ফিরলে নাকি?"

সেই যুবকটি পরে আছে সাদা প্যান্ট আর সাদা শার্ট। মুখে মিটিমিটি হাসি।

সে বলল, "না। আমি আপনাদের নিতে এসেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে? আমরা যে আজ এখানে আসছি, তা তুমি জানলে কী করে?"

সে বলল, "বাঃ, আপনি বম্বে আসছেন, আমি জানব না? বম্বের বহু লোক জেনে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাজে কথা বোলো না, আমি কাউকেই জানাইনি। তুমি কী করে খবর পেলে?"

সে বলল, "ধরে নিন ম্যাজিক।"

কাকাবাবু সন্তু আর জোজোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আজকাল দেখছি অনেকেই ম্যাজিকের চর্চা করছে। আসল ব্যাপারটা কী বলো তো?"

সে বলল, "আসল ব্যাপারটা খুব সোজা। আমি সন্ধেবেলা আপনার বাড়িতে ফোন করেছিলাম। আপনার দাদা ফোন ধরে বললেন, রাজা আর সন্তু তো আজই বম্বে গেল। একটু আগে রওনা হয়েছে। ব্যস, আমি বুঝে গেলাম, আপনারা কোন ফ্লাইটে আসছেন। আরও অনেকে জানে, এটা কেন বললাম জানেন? আপনি তো রিজেন্ট হোটেলে ফোন করে দুটো ঘর বুক করেছেন, তাই না? সেই হোটেলের ম্যানেজার বাঙালি, তার নাম শেখর দত্ত, আমার খুব চেনা। সেও একটু আগে আমায় ফোন করে বলল, অমলদা, রাজা রায়চৌধুরীর নাম শুনেছেন তো? যাঁকে সবাই কাকাবাবু বলে। তিনি আজ আসছেন আমাদের হোটেলে। দেখা করবেন নাকি? আমি শেখরকে বললাম, দেখা করব তো বটেই। তবে, তোমার হোটেলের বুকিং ক্যানসেল করে দাও। উনি হোটেলে থাকবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন, আমরা হোটেলে..."

অমল বলল, "অসম্ভব। আপনাদের কে হোটেলে যেতে দিচ্ছে? আমার বাড়ি একদম খালি।"

নিশা নামের মেয়েটিকে তার বাবা ডাকছে, সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

অমল এর মধ্যেই সন্তু আর জোজোর কাছ থেকে ব্যাগ দুটো নিয়ে নিয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, "তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম অমল ভট্টাচার্য। এঞ্জিনিয়ার আর কবি। অনেকদিন আফ্রিকায় ছিল। এখানে ও একটা ছাপার কালির কোম্পানিতে কাজ করে। তাই না অমল?"

অমল বলল, "কালি, রং, এরকম অনেক কিছু।"

কাকাবাবু বললেন, "সেইজন্যই ও সবসময় সাদা শার্ট-প্যান্ট পরে।"

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে অমল নিজের গাড়িতে সব মালপত্র তুলল। কাকাবাবু বসলেন সামনে।

গাড়ি ছাড়ার পর অমল বলল, "একটা মজার জিনিস লক্ষ করলেন কাকাবাবু। ওই যে নিশা মেয়েটি, ও কিন্তু সন্তুর আগে জোজোর অটোগ্রাফ নিল। এমনকী আপনারও আগে। তার মানে কি জোজো আপনাদের দু'জনের চেয়েও জনপ্রিয়?"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো হতেই পারে। আমি খোঁড়া মানুষ, আর সন্তু সবসময় লাজুকের মতন আড়ালে থাকে। আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকলে প্রথমে জোজোর দিকেই সকলের চোখ পড়ে। জোজোর অমন সুন্দর চেহারা, মেয়েরা তো ওকে বেশি পছন্দ করবেই।"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "শুধু মেয়েরা নয়, অনেক ছেলেও আমার অটোগ্রাফ নেয়। একটা মজার ঘটনা শুনবেন? মারাদোনার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?"

অমল বলল, "মারাদোনা মানে, ফুটবল খেলার রাজা? তার নাম কে না শুনেছে?"

সন্তু প্রতিবাদ করে বলে উঠল, "মারাদোনাকে মোটেই ফুটবলের রাজা বলা যায় না। রাজা হচ্ছেন পেলে। অল টাইম গ্রেট। মারাদোনাকে বড়জোর সেনাপতি বলা যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "ও তর্ক থাক। মজার ঘটনাটা কী শুনি?"

জোজো বলল, "আগেরবার যে ফুটবলের ওয়ার্ল্ড কাপ হল, সেটা তো আমি দেখতে গিয়েছিলাম। একদিন মারাদোনার মুখোমুখি পড়ে যেতেই আমি অটোগ্রাফ চাইলাম। মারাদোনা

এমনিতে কাউকে অটোগ্রাফ দেয় না। অনেক টাকা চায়। আমাকেও প্রথমে দেবে না বলেও একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর সই করে দিয়ে ফস করে নিজের পকেট থেকে একটা অটোগ্রাফ খাতা বার করে বলল, তুমিও আমাকে একটা সই দাও। তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে তুমি একজন বিখ্যাত লোক হবে!"

কাকাবাবু বললে, "বাঃ। মারাদোনার কথা এর মধ্যেই অনেকটা মিলে গেছে।"

সন্তু বলল, "তোর কাছে মারাদোনার অটোগ্রাফ আছে? একদিন আমায় দেখাস তো!"

জোজো বলল, "দুঃখের কথা কী জানিস, সেই অটোগ্রাফ খাতাটা কিছুদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছি না। তার মধ্যে আরও কত বড় বড় লোকের সই ছিল।"

অমল বলল, "তোমারটা হারিয়ে গেলেও মারাদোনা নিশ্চয়ই তার অটোগ্রাফ খাতা হারায়নি। তার মধ্যে তোমার সই রয়ে গেছে। শুধু সই করেছিলে, না কিছু লিখেও দিয়েছিলে?"

জোজো বলল, "বাংলায় লিখে দিয়েছিলাম, 'চালিয়ে যা পগ্গা!'"

অমল হো হো করে হেসে উঠে বলল, "চমৎকার! জোজোর তুলনা নেই। কাকাবাবু, এই রত্নটিকে কোথায় পেলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "জোজোর সত্যি অনেক গুণ আছে।"

জোজো বলল, "সন্তু, ওই যে মেয়েটি অটোগ্রাফ নিল, নিশা নামের মানে কী রে?"

সন্তু বলল, "রাত্রি। নিশা, নিশি, নিশীথিনী, সব মানেই এক।"

অমল বলল, "রবীন্দ্রনাথের গান আছে, ভরি দিয়া পূর্ণিমা নিশা, অধীর অদর্শন তৃষা—"।

সুর করে সে গানটা গেয়ে উঠল।

গান থামতে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অমল, তোমার সঙ্গে যে আর একজন লোক ছিল, সে গাড়িতে উঠল না?"

অমল বলল, "আমার সঙ্গে তো আর কেউ ছিল না।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার পাশেই একজন দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের পেছন পেছন গাড়ির কাছাকাছিও এল—"

সন্তু বলল, "আমিও লক্ষ করেছি, জুলপিদুটো বেশ বড়, মাথার সামনের দিকে একটু টাক।"

অমল বলল, "আমার সঙ্গে আসেনি। হয়তো অন্য কোনও বাঙালি আপনাদের চিনতে পেরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "একটা চকোলেট রঙের গাড়ি অনেকক্ষণ ধরে আমাদের পেছন পেছন আসছে।"

অমল বলল, "তাই নাকি? কাকাবাবু, আপনি বুঝি সবসময় রহস্য খোঁজেন? আমাদের কে ফলো করবে?"

কাকাবাবু বললেন, "কোনও কারণ নেই। তবে অনেকক্ষণ ধরে গাড়িটা দেখছি ঠিকই।"

আর খানিকটা বাদে অমলের গাড়ি থামল একটা উনিশতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে। কাকাবাবু নামতেই পাশ দিয়ে একটা চকোলেট রঙের গাড়ি বেরিয়ে গেল। কাকাবাবু সেদিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন।

অমল থাকে সতেরোতলায়। তার বউ, ছেলে-মেয়েরা গেছে কলকাতায়, ফ্ল্যাটটা ফাঁকা।

অমল দু'হাত ছড়িয়ে বলল, "আমি রান্নাবান্না সব করে রেখেছি। আপনারা আরাম করে বসুন। এখন জমিয়ে গল্প হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি রান্না করতেও জানো নাকি?"

অমল বলল, "বাংলায় একটা কথা আছে, যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না? সেইরকমই বলা যায়, যে কবিতা লেখে, সে কি রাঁধতে

পারে না? রান্নার জন্য আমি বন্ধুবান্ধব মহলে বিখ্যাত।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কবিতা লিখতেও পারি না, রান্নাও জানি না। আচ্ছা অমল, তুমি আজ কলকাতায় আমাকে ফোন করেছিলে কেন?"

অমল বলল, "অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। তা ছাড়া একটা বই পড়ছিলাম, একটা জায়গা বুঝতে পারিনি। তাই ভাবলাম, কাকাবাবুকে ফোন করলে উনি ঠিক বলে দিতে পারবেন। আমার এমন সৌভাগ্য, ফোনে কথা বলার বদলে আপনাকে সশরীরে পাওয়া গেল। অফিস থেকে কাল-পরশু ছুটি নিচ্ছি, আপনাদের সারা বম্বে ঘুরিয়ে দেখাব। কাছাকাছি অনেক সুন্দর জায়গা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা তো বম্বে বেড়াতে আসিনি। কাল সকালে কালিকট যাব।"

"কয়েকদিন পরে সেখানে যাবেন।"

"প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে।"

"টিকিট পালটানো খুব সোজা। কাল সকালেই ফোন করে দেব।"

"কিন্তু আমি ওদের কালিকট দেখাব বলে নিয়ে এসেছি। কী রে, তোরা কি বম্বেতে থাকতে চাস?"

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, "আমি এখানে অন্তত দশবার এসেছি। দেখার কিছু নেই।"

সন্তু বলল, "আমি একবার এসেছি অবশ্য। সেবারেই অনেক কিছু দেখা হয়ে গেছে। কালিকট গেলেই ভাল হয়।"

অমল কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে ওদের দিকে চেয়ে থেকে বলল, "কালিকটে কী আছে? সেখানে তো কেউ বেড়াতে যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা ঠিক করেছি, বড় বড় শহরের বদলে মাঝে মাঝে আমরা ছোটখাটো জায়গায় ঘুরে আসব।"

অমল বলল, "অফিসের কাজে আমাকে দু'-একবার যেতে হয়েছে কালিকটে। ওখানে দেখার মতন কিছু নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "অফিসের কাজে গেলে তো আর বেড়ানো হয় না!"

হঠাৎ অমলের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। নতুন কিছু আবিষ্কার করার মতন আনন্দে সে চেঁচিয়ে উঠল, "ও বুঝেছি! বুঝেছি! নতুন অভিযান। কালিকটে নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটেছে, আপনি তার সমাধান করতে যাচ্ছেন। আমি যাব, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব! কাকাবাবু, আমি সাঁতার জানি, বক্সিং জানি, বন্দুক চালাতে জানি, ঘোড়ায় চড়তেও জানি!"

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, "তুমি কবিতা লেখা ছাড়াও এত কিছু জানো! কারও সঙ্গে লড়াই করতে গেলে তোমাকে তো সঙ্গে নিতেই হবে। কিন্তু কালিকটে সেরকম কোনও সম্ভাবনাই নেই। তুমি শুধু শুধু অফিস কামাই করবে কেন?"

অমল তবু জোর দিয়ে বলল, "না কাকাবাবু, আমি যাবই আপনাদের সঙ্গে। আমার অনেক ছুটি পাওনা আছে।"

এবার জোজো বলল, "আসল ব্যাপার কী জানেন তো? কালিকটে আমার এক মাসির বাড়ি। আমার এই মাসি সাউথ ইন্ডিয়ান বিয়ে করেছেন। অনেকদিন দেখা হয়নি, অনেকবার আসতে বলেছেন। নায়ারমামা চমৎকার লোক, ভাল বাংলা জানেন, বড় ব্যবসায়ী। আমরা সেখানে যাচ্ছি।"

অমল বলল, "মাসির বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছ খুব ভাল কথা। কিন্তু ভাই মাসির বর তো মামা হয় না!"

জোজো বলল, "ও সরি সরি, নায়ারমেসো। ভুল করে মামা বলে ফেলেছি।"

অমল বলল, "আমাকে বলেছ বলেছ, ওখানে গিয়ে যেন অমন

ভুল কোরো না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা বরং ওখান থেকে ফেরার সময় তোমার এখানে দিন দু-এক থেকে যাব।"

অমল বলল, "তা তো থাকতেই হবে। জানেন কাকাবাবু, বেশিরভাগ লোকেরই কালিকট বন্দরের নাম শুনলেই ভাস্কো ডা গামার নাম মনে পড়ে। সবাই ইতিহাসে পড়েছে। এখনকার কালিকটে কিন্তু সেসব ইতিহাসের কোনও চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওখানে দেখার মধ্যে আছে শুধু নারকোল গাছ। আর এই সময়টায় অসহ্য গরম!"

কাকাবাবু আর কিছু না বলে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

সকালবেলা অমলই পৌঁছে দিয়ে গেল এয়ারপোর্টে। প্লেন ছাড়ল ঠিক সময়ে। জোজো জানলার ধারে বসেছে। তারপর সন্তু, একপাশে কাকাবাবু।

সন্তু ফিসফিস করে বলল, "কাকাবাবু, সেই বড় জুলপিওয়ালা লোকটাও এই প্লেনে উঠেছে।"

জোজো বলল, "কোথায়? কোথায়?"

সন্তু বলল, "আমাদের পেছনে, দুটো সারি পরে।"

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো ব্যাপারটা কাকতালীয়।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এই কাকতালীয় কথাটা বইতে মাঝে মাঝে পড়ি। কথাটার ঠিক মানে কী?"

কাকাবাবু বললেন, "মানে জানো না? তোমাদের দোষ নেই। যে

ছেলেমেয়েরা শুধু শহরেই থাকে, তারা তালগাছ আর নারকোল গাছের তফাত বোঝে না। শহরের লোকেরা তাল খায়ও না। আগে আমরা অনেক তাল খেয়েছি, তালের বড়া, তালের ক্ষীর—"

সন্তু বলল, "আমরা তালশাঁস খাই। খুব ভাল খেতে।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ তালশাঁসও ভাল। লোকে পাকা তাল পছন্দ করে না বলে কাঁচা অবস্থায় তালশাঁস বের করে নেওয়া হয়। পাকা কাঁঠালের বদলে আমরা যেমন এঁচোড়ের তরকারি খাই। তাল-কাঁঠাল নিয়ে এক সময় বাংলায় বেশ সুন্দর সুন্দর কথা তৈরি হয়েছিল। যেমন, তিলকে তাল করা। তাল পাকলে কাকের কী? গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। সাধলে জামাই খায় না কাঁঠাল ভুচড়ো নিয়ে টানাটানি! এইসব কথার মধ্যে বেশ একটা করে গল্প আছে। কিন্তু ফলগুলো সম্বন্ধে ভাল করে না জানলে সেই গল্প ঠিক বোঝা যায় না।"

সন্তু বলল, "তুমি শেষেরটা যা বললে, সাধলে জামাই না কি, ওটা কখনও বইতেও দেখিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "এখনকার লেখকরা নিজেরাই এসব জানেন না, তাই লেখেনও না। ওটার গল্পটা বেশ মজার। জামাই-আদর কাকে বলে জানিস তো? বাড়িতে জামাই এলে তাকে খুব খাতিরযত্ন করতে হয়। সেইরকমই গ্রামের এক বাড়িতে জামাই এসেছে। সে জামাই খুব লাজুক। তাকে যাই খেতে দেওয়া হয়, সে খাবে না খাবে না বলে। তার জন্য গাছ থেকে একটা পাকা কাঁঠাল পেড়ে আনা হয়েছে। জামাই কাঁঠাল খেতে ভালবাসে, কিন্তু কাঁঠাল খাওয়ার জন্য তাকে যখন সাধাসাধি করা হল, সে লজ্জায় না না বলতে লাগল। তখন বাড়ির লোকরাই কাঁঠালটা খেয়ে ফেলল। কাঁঠালের কোয়াগুলো বার করে নিলেও মোটা খোসাটার মধ্যে সরু সরু এক ধরনের জিনিস থাকে, তাকে বলে ভুচড়ো। সেগুলো কেউ

খায় না। মাঝরাত্তিরে শাশুড়ি উঠে এসে দেখেন কী, বাড়ির উঠোনে ফেলে দেওয়া সেই কাঁঠালের খোসাটা থেকে ভুচড়োগুলো তুলে তুলে খাচ্ছে সেই জামাই।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আর, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল?"

কাকাবাবু বললেন, "কাঁঠালের মধ্যে আঠা থাকে, হাত দিয়ে ছাড়াতে গেলে চটচট করে। তাই যে কাঁঠাল ছাড়ায়, সে হাতে তেল মেখে নেয়। এখন, একটা গাছে একটা কাঁঠাল ঝুলছে, তাই দেখে একজন লোকের খুব লোভ হয়েছে। সে হাতে তেল-টেল মেখে রেডি হয়ে আছে, কিন্তু না পাকলে খাবে কী করে? হাতের তেল গোঁফে লাগিয়ে সে কাঁঠালের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। এইসব কথার এখন অনেকরকম মানে হয়। যাকগে, কথা হচ্ছিল কাকতালীয় নিয়ে।"

জোজো বলল, "তালীয় মানে তালের ব্যাপার? মানে তাল ফল? আমার ধারণা ছিল গানের তাল। কিংবা এক হাতে তালি বাজে না, সেই তালি।"

কাকাবাবু বললেন, "না। পাকা তাল গাছ থেকে আপনি আপনি খসে পড়ে। মনে করো, একটা তালগাছে একটা কাক বসে আছে। এক সময় কাকটা যেই উড়ে গেল, অমনই ধুপুস করে একটা পাকা তাল খসে পড়ল। কাকটা ভাবল, সে উড়ল বলেই খসে পড়ল তালটা। তা কিন্তু নয়, ওই সময় তালটা এমনই পড়ত। অর্থাৎ একই সঙ্গে দু'টো ঘটনা ঘটল, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। ইংরেজিতে যাকে বলে কয়েনসিডেন্স।"

জোজো বলল, "ও কয়েনসিডেন্স? এরকম তো অনেকই হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "সেইরকমই, বড় জুলপিওয়ালা লোকটাকে কাল এয়ারপোর্টে দেখা গেছে, আজ আবার সে আমাদের সঙ্গে এই প্লেনে চেপেছে, এর মধ্যে হয়তো কোনও যোগাযোগ নেই। যেতেই

তো পারে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "সাধলে জামাই... পুরো কথাটা কী রে সন্তু?"

সন্তু বলল, "সাধলে জামাই খায় না কাঁঠাল, ভুচড়ো নিয়ে টানাটানি।"

জোজো বলল, "বেশ কথাটা! আমার মনে পড়ল, একবার স্পেনের রাজা আমাদের নেমন্তন্ন করেছিল, কী দারুণ দারুণ সব খাবার। বাবা বলে দিয়েছিলেন, হ্যাংলার মতন সবকিছু খাবে না, আর কোনও জিনিসই দু'বার দিতে এলে নেবে না। বাবা যেগুলো না না বলছেন, আমিও লাগবে না বলছি। একটা খাবার দেখে এমন লোভ হয়েছিল, ছোট ছোট হাঁস, আস্ত রোস্ট করা, বাবা মাথা নেড়ে দিতেই বাধ্য হয়ে আমিও..."

সন্তু বলল, "রাত্তিরে বুঝি সেই হাঁসের পালকগুলো খেলি?"

এর মধ্যেই ঘোষণা করা হল, "প্লেন কালিকটে নামছে।"

সন্তু আর জোজো জানলা দিয়ে তাকাল বাইরে।

পরিষ্কার রোদঝলমলে দিন। নীচে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র। একদিকে ভারতের সীমারেখা। ম্যাপে যেরকম দেখা যায়। এখানে এত সবুজ গাছপালা যে, বাড়িঘর চোখেই পড়ে না।

এয়ারপোর্ট থেকে কাকাবাবু একটা গাড়ি ভাড়া করলেন।

সন্তু সেই বড় জুলপিওয়ালা লোকটির দিকে নজর রেখেছে। সে ওদের দিকে তাকাচ্ছেই না। গাড়িতে ওঠার আগে সন্তু ইচ্ছে করে লোকটির পাশে গিয়ে একটা ধাক্কা লাগিয়ে বলল, "খুব দুঃখিত, মাপ করবেন।"

লোকটি হিন্দিতে বলল, "ঠিক হ্যায়, কুছ নেই হুয়া।"

ফিরে এসে গাড়িতে উঠে সন্তু বলল, "লোকটি বাঙালি নয়। তবু কাল রাত্তিরে এয়ারপোর্টে অমলদার পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা

শুনছিল কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "শুনছিল, না দেখছিল?"

সন্তু বলল, "কী দেখছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি খোঁড়া লোক বলে অনেকেই আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।"

জোজো বলল, "ছাড় তো সন্তু। তুই লোকটাকে নিয়ে বেশি বেশি ভাবছিস। কাকতালীয়ই ঠিক।"

আগে থেকে হোটেল ঠিক করা ছিল না। দু-তিনটে হোটেল ঘুরে একটা পছন্দ হয়ে গেল। হোটেলটা একেবারে নতুন, সেইজন্যই ঝকঝকে পরিষ্কার। ঘরগুলো বড় বড়। একটা ঘরের নাম ফ্যামিলি রুম, সেখানে চারজন শুতে পারে। সেই ঘরটাই নেওয়া হল।

জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলার পর কাকাবাবু বললেন, "গাড়িটা সারাদিনের জন্য ভাড়া করা হয়েছে, চল, এই শহরটা আর কাছাকাছি জায়গাগুলো একটু ঘুরে দেখে আসি।"

ড্রাইভারের নাম অ্যান্টনি। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়েস, কুচকুচে কালো গায়ের রং, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। সে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি জানে।

শহরটাতে সত্যি দেখার মতন কিছু নেই। ছোট শহর যেমন হয়। কিছু অফিস-টফিস, দোকানপাট আছে। শহরের বাইরেটা ঢেউখেলানো। ছোট ছোট পাহাড় আর প্রচুর নারকোল গাছ। এক এক জায়গায় মনে হয় যেন নারকোল গাছের জঙ্গল।

গরমও প্রচণ্ড। সেইসঙ্গে ঘাম। গাড়ির সবকটা জানলার কাচ নামানো, কিন্তু হাওয়া নেই, দরদর করে ঘামতে হচ্ছে।

জোজো বলল, "অমলদা তো ঠিকই বলেছিল। এখানে নারকোল গাছ আর গরম ছাড়া কিছুই নেই। খুব জলতেষ্টা পাচ্ছে।"

রাস্তার ধারে ধারে ডাব বিক্রি হচ্ছে। এক জায়গায় গাড়ি থামানো

হল।

ডাবওয়ালা দৌড়ে এসে বলল, "টেন্ডার কোকোনাট। ভেরি গুড।"

তার মানে ডাবের জল খাওয়ার পর সেটা কেটে দিল। ভেতরে নরম লেওয়া। খেতে খুব ভাল।

ড্রাইভার অ্যান্টনি বলল, "আপনারা চিকিৎসা করাতে এসেছেন তো? আমি খুব ভাল নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে পারি।"

কাকাবাবু সন্তুদের বললেন, "শুনেছিলাম বটে যে এখানকার কাছাকাছি একটা জায়গায় খুব ভাল কবিরাজি চিকিৎসা হয়। সারা ভারতের দূর দূর জায়গা থেকে শক্ত শক্ত অসুখের রুগিরা এখানে চিকিৎসা করাতে আসে। আমার খোঁড়া পা দেখে ধরে নিয়েছে, আমি এটা সারাতে এসেছি।"

তিনি অ্যান্টনিকে বললেন, "সেখানে পরে যাওয়া যাবে। এখন গরমে আর টেকা যাচ্ছে না, তুমি হোটেলে ফিরে চলো।"

হোটেলের ঘরটা এয়ার কন্ডিশনড। সেখানে ফিরে বেশ আরাম হল।

কাকাবাবু বললেন, "এ যা দেখছি, সারাদিন ঘরেই বসে থাকতে হবে। এ গরমে ঘোরাঘুরি করা যাবে না। সন্ধের পর গরম কমে কি না দেখা যাক।"

জোজো বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

সন্তুও দমে গেছে খানিকটা। এ-জায়গাটা সত্যিই বেড়াবার মতন নয়। বিশেষত গরমকালে। এর চেয়ে চেরাপুঞ্জি গেলে কত ভাল লাগত। সেখানে গরম নেই, যখন-তখন বৃষ্টি হয়। তবু কাকাবাবু এখানেই এলেন কেন?

সে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, তুমি সত্যিই ভূতে বিশ্বাস করো?"

কাকাবাবু বললেন, "বিশ্বাস থাক বা না থাক, ভূতের গল্প শুনতে বেশ ভাল লাগে। তাই না?"

জোজো বলল, "আমি কিন্তু ভূত দেখেছি। তিনবার। একবার মেক্সিকোতে, একবার কাঠমাণ্ডুতে, আর একবার... ইয়ে অস্ট্রেলিয়ায়..."

সন্তু জোজোর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "তুই বাঙালি ভূত দেখিসনি?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, কাঠমাণ্ডুর ভূতটা বাংলায় কথা বলছিল। তবে মজা কী জানিস, বাবা আমাকে মন্ত্রপড়া একটা সুপুরি দিয়েছেন, সেটা তুলে ধরলেই ভূতগুলো একেবারে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়।"

সন্তু বলল, "কাচের মতন?"

জোজো বলল, "অনেকটা কাচের মতন, তবে দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। হাতে ধরা যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ। সেই সুপুরিটা সঙ্গে এনেছ তো? এখানে কাজে লাগতে পারে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমি আগে কক্ষনও তোমার কাছে ভূত-টুতের কথা শুনিনি। কেউ ভূতের কথা বললে, তুমি হেসে উড়িয়ে দিতে।"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষ মরে গেলে তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, কিংবা কবর দেওয়া হয়। সেখানেই সব শেষ। তার পরেও কিছু আছে কি না, তার কোনও স্পষ্ট প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সেইজন্যই অনেকে ভূত-পেত্নি, স্বর্গ-নরক— এসবে বিশ্বাস করে না। আবার অনেকে মনে করে, মৃত্যুতেই সব শেষ নয়, পুনর্জন্ম আছে, স্বর্গ-নরক আছে। আমি প্রথম দলে। কিন্তু অনেক লোক মিলে যদি বলে তারা একজন মৃত মানুষকে চলাফেরা করতে

দেখেছে, সেই অনেক মানুষের মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষিত, দায়িত্বপূর্ণ লোকও থাকে, তা হলে সেই ঘটনাটা সঠিকভাবে জানার জন্য কৌতূহল হবে না?"

সন্তু আবার বলল, "তার সঙ্গে এখানে আসার সম্পর্ক কী?"

কাকাবাবু বললেন, "এটা কত সাল। ১৯৯৮ তো? আজ কত তারিখ? ২৩ মে? ঠিক পাঁচশো বছর আগে, অর্থাৎ ১৪৯৮ সালে, এই দিনটিতে ভাস্কো দা গামা কালিকট বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়েছিল।"

সন্তু তবু ভুরু কুঁচকে বলল, "ঠিক বুঝলাম না। তেইশে মে এখানে কোনও উৎসব হয়?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, উৎসব হবে কেন? ভাস্কো দা গামা ভারতের বহু ক্ষতি করেছে, বহু লোককে মেরেছে, তাকে নিয়ে আবার উৎসব কীসের?"

জোজো বলল, "বুঝলি না, ভাস্কো দা গামা ভূত হয়ে এই দিনটায় ফিরে আসে।"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো ঠিক ধরেছে। এখানে অনেকের ধারণা, প্রতি বছর তেইশে মে ভাস্কো দা গামাকে দেখা যায়। বেশ অনেকক্ষণ ধরে। গত বছর প্রায় দেড়শোজন লোক দেখেছে। তাদের মধ্যে আছে একজন ইতিহাসের অধ্যাপক, একজন পুলিশের কর্তা, দু'জন সাংবাদিক, একজন ডাক্তার। অন্তত চোদ্দো-পনেরোজন চিঠি লিখে কিংবা টেলিফোন করে ঘটনাটা আমাকে জানিয়েছে। এই লোকেরা কি নেহাত একটা আজগুবি কথা রটাবে?"

সন্তু বলল, "এরা সবাই... এত দূর থেকে তোমাকে ঘটনাটা জানাল কেন? তুমি তো ভূত ধরার ওঝা নও।"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "ঠিক বলেছিস। আমার

বদলে বরং জোজোকে জানানো উচিত ছিল। জোজো মন্ত্র পড়া সুপুরি দেখিয়ে ভাস্কো দা গামার ভূতকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিত। তবে জোজোকে তো এরা এখনও চেনে না। আমাকে জানাবার একটা কারণ আছে অবশ্য। তোরা তো জানিস, আমি ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনো করতে ভালবাসি। মাঝে মাঝে দু-একটা প্রবন্ধও লিখি। গত বছর আমি বম্বের একটা কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম, সেটার নাম ছিল, 'ভাস্কো দা গামা কি খুন হয়েছিলেন?' খুব আলোচনা হয়েছিল সেটা নিয়ে। অনেক লোক আমার পক্ষে-বিপক্ষে চিঠি লিখেছিল।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ভাস্কো দা গামা সত্যি খুন হয়েছিলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "স্পষ্ট কোনও প্রমাণ নেই। তবে এদেশে তার অনেক শত্রু ছিল। আরব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তার ঝগড়া মারামারি হয়েছে অনেকবার। লোকটা ছিল খুব অহঙ্কারী আর নিষ্ঠুর ধরনের। এমনকী তার নিজের দেশের অনেক লোকও তাকে পছন্দ করত না। পর্তুগিজরা ক্রমে ক্রমে কোচিন, গোয়া এইসব জায়গা দখল করে বসে। সেখানে অনেক পর্তুগিজ কর্মচারী ছিল, তারা অনেকে ভাস্কো দা গামার ব্যবহার সহ্য করতে পারত না। ভাস্কো দা গামা মারা যায় কোচিনে, এক ক্রিসমাসের দিনে। জানিস তো, ক্রিসমাসের আগের রাত্তিরে খুব বড় পার্টি হয়। মদ খেয়ে হইহল্লা করার সময় কেউ তার পেটে একটা ছুরি বসিয়ে দিতেও পারে।"

সন্তু বলল, "ভাস্কো দা গামা মারা গেল কোচিনে। ভূত হয়ে থাকলে তো তাকে সেখানেই দেখতে পাওয়ার কথা। এখানে আসবে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "কোচিনেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে তার হাড়গোড় সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পর্তুগালে। সেখানে আবার কবর দেওয়া হয়।

সেখান থেকে সাগর পেরিয়ে ভূতটা আসে, প্রথম যেখানে এসেছিল।"

সন্তু বলল, "পাঁচশো বছরের বুড়ো ভূত!"

কাকাবাবু বললেন, "ভূতেরা নাকি বুড়ো হয় না। এখানে যারা দেখেছে, তারা নাকি ভাস্কো দা গামাকে আগের চেহারাতেই দেখেছে।"

জোজো বলল, "ভাস্কো দা গামার ভূতটাকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়, তুমি কি খুন হয়েছিলে? না এমনি এমনি মরেছ?"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ। আজ মাঝরাত্তিরে একবার যেতে হবে পোর্টে, সেখানেই যাকে বলে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যাবে।"

জোজো বলল, "কী বললেন? কী বললেন? ওই কথাটার মানে কী?"

সন্তু বলল, "এর মানে আমি জানি। কান আর চোখ। লোকে অনেক কিছু বলে, তা আমরা কান দিয়ে শুনি কিন্তু চোখে তা দেখা না গেলে বিশ্বাস হয় না। এই নিয়ে চোখ আর কানের ঝগড়া। কানে যা শোনা যায়, চোখের দেখাতেও তা মিলে গেলে ঝগড়া মিটে যায়। তাকে বলে বিবাদ ভঞ্জন।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা আগেকার বাংলা, এখন আর বিশেষ কেউ বলে না বা লেখে না। তবে মাঝে মাঝে শুনতে বেশ লাগে। তোদের খিদে পায়নি? এবারে কিছু খেলে হয়।"

জোজো বলল, "খিদে পায়নি মানে? পেটে আগুন জ্বলছে। এখানে নিশ্চয়ই চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়?"

কাকাবাবু বললেন, "দেখা যাক। পাওয়া উচিত।"

তিনি বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিতে গেলেন। বেয়ারাটি বলল, "এই হোটেলে ঘরে খাবার এনে দেওয়ার

নিয়ম নেই। একতলায় ডাইনিং হল আছে, সেখানে গিয়ে খেতে হবে।"

ঘর বন্ধ করে ওরা নেমে এল নীচে।

মস্ত বড় ডাইনিং হল। কয়েকটা টেবিলে কিছু লোক খেতে শুরু করেছে। কোণের একটা টেবিলে এক ঝলক তাকিয়েই সন্তু বলল, "সেই বড় জুলপিওয়ালা লোকটা এখানেও এসেছে।"

সত্যিই সেই লোকটি আর দু'জন লোকের সঙ্গে বসে আছে। সামনে জলের গেলাস, এখনও টেবিলে খাবার দেয়নি।

সন্তু বলল, "এটাও কি কাকতালীয়?"

কাকাবাবু বললেন, "হতেও পারে। হয়তো এই হোটেলের খাবার বিখ্যাত। অনেকেই খেতে আসে।"

খাবারের তালিকা দেখে জোজো খুব নিরাশ হয়ে গেল।

চিংড়ি মাছ তো নেই-ই, কোনওরকম মাছ-মাংসই পাওয়া যাবে না। এই হোটেলে সবই নিরামিষ। ইডলি, ধোসা, সম্বর এইসব, ভাতও আছে।

কাকাবাবু বললেন, "এবেলা এইসবই খেয়ে দেখা যাক। বাইরে অনেক রেস্তরাঁ আছে। রাত্তিরে সেরকম কোনও জায়গা থেকে খেয়ে এলেই হবে।"

সন্তু বলল, "আমি ধোসা খুব পছন্দ করি।"

খাবারগুলোর বেশ স্বাদ আছে। ভাতের সঙ্গে একটা তরকারি ছিল, টক-টক-ঝাল-ঝাল, চমৎকার খেতে। জোজো তিনবার চেয়ে

নিল সেই তরকারি।

সন্তু মাঝে মাঝে চোরা চোখে দেখছে কোণের টেবিলটা, বড় জুলপিওয়ালা লোকটি এদিকেই তাকিয়ে আছে, তার সঙ্গীদের কী যেন বলছে ফিসফিস করে।

সন্তুদের খাওয়া শেষ হওয়ার পরেও ওরা বসে রইল।

হাত ধুয়ে ওপরে উঠে আসার পর কাকাবাবু বললেন, "তোরা দু'জনে গড়িয়ে নিতে চাস তো নে। আমাকে কয়েকটা ফোন করতে হবে।"

কাকাবাবু ব্যাগ থেকে নোটবইটা খুঁজতে লাগলেন। এই সময় দরজায় টক টক শব্দ হল।

সন্তু দরজা খুলে অবাক হলেও মুখে কোনও ভাব দেখাল না।

সেই বড় জুলপিওয়ালা লোকটি ও আর দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

বড়জুলপি হিন্দিতে বলল, "একটু ভেতরে আসতে পারি? তোমার আঙ্কেলের সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলতে চাই।"

সন্তু দরজার পাশ থেকে সরে দাঁড়াল।

প্রথমে বড়জুলপি ভেতরে ঢুকে কাকাবাবুর দিকে হাত তুলে নমস্কার করে খুব বিনীতভাবে বলল, "সার, খুবই দুঃখিত, অসময়ে এসে আপনাকে ডিসটার্ব করলাম। হয়তো এখন বিশ্রাম নিতেন। খুব বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। যদি অনুমতি করেন—"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, ঠিক আছে। বসুন। কী ব্যাপার বলুন।"

ঘরে একটিমাত্র চেয়ার। বড়জুলপি বসল সেখানে। অন্য দু'জন খাটে।

বড়জুলপি পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে বলল, "সার,

আমার নাম এস. প্রসাদ। আমি একটা ফিল্ম কোম্পানির প্রোডাকশান ম্যানেজার। বম্বে থেকে এসেছি। এখানে আমাদের একটা হিন্দি ফিল্মের শুটিং চলছে। সেই ব্যাপারে আপনার একটু সাহায্য চাই।"

কাকাবাবু বললেন, "ফিল্মের শুটিংয়ের ব্যাপারে আমি কী সাহায্য করব তা তো বুঝতে পারছি না?"

প্রসাদ বলল, "আপনার সঙ্গে যে ছেলেদুটি এসেছে, এদের একজনকে পেলে বড় উপকার হয়।"

সে জোজোর দিকে ফিরে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "ও কী করবে?"

সে বলল, "ব্যাপারটা কী হয়েছে, একটু খুলে বলি। আজকের রাত্তিরের শুটিংয়ে এই ছেলেটির বয়েসী একটি ছেলের পার্ট আছে। যে ছেলেটির সেই পার্ট করার কথা, আজ সকাল থেকে তার কলেরা শুরু হয়ে গেছে, তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। সে কিছুতেই পারবে না। শুটিং বন্ধ রাখলে আমাদের বহু টাকা লোকসান হয়ে যাবে। তাই বলছিলাম কী, এই ছেলেটি যদি পার্টটা করে দেয়, তা হলে বেঁচে যাই। ওই পার্টে ওকে খুব মানাবে।"

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, " ও, এই ব্যাপার! তা হলে ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক। কী হে জোজো, সিনেমার পার্ট করবে নাকি?"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "কী ধরনের পার্ট আগে শুনি?"

প্রসাদ বলল, "হিরোইন একটা খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকবে। রাত্তিরে ডাকাতের দল ঘুমোবে। শুধু পাহারায় থাকবে একজন। তুমি পেছন দিক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আসবে। পাহারাদারটাও ঝিমোচ্ছে। তুমি হিরোইনের বাঁধন খুলে দেবে। তারপর তার হাত ধরে দৌড়াবে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দৌড়বে দৌড়বে। কাট। বাস,

তারপর হিরো ঘোড়ায় চড়ে এসে হিরোইনকে তুলে নেবে।"

জোজো অবজ্ঞার সঙ্গে ঠোঁট উলটে বলল, "এইটুকু পার্ট! এর মধ্যে আমি নেই।"

প্রসাদ বলল, "একটু করে দাও না ভাই!"

জোজো বলল, "হলিউড থেকে স্পিলবার্গ কতবার আমাকে অনুরোধ করেছে। আমি বলেছি, ছোট পার্ট কক্ষনও করব না। যদি সিনেমায় পার্ট করতেই হয়, প্রথমেই হিরো হব।"

প্রসাদ বলল, "তোমার বয়েসে তো হিরো হতে পারবে না। আগে ছোটখাটো পার্ট করার পরই হিরো হতে পারবে। এটায় যদি তোমার পার্ট চোখে লেগে যায়—"

জোজো বলল, "না, না, যারা ছোটখাটো পার্ট করে, তারা চিরকালই ছোটই থেকে যায়।"

প্রসাদের সঙ্গী একজন বলল, "টাকার কথাটা বলো।"

প্রসাদ বলল, "মাত্র একদিনের শুটিং, তিন-চার ঘণ্টা, তার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হবে।"

জোজো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "টাকার দরকার নেই আমার। হলিউডে ওইটুকু পার্ট করলে পাঁচ লাখ টাকা দেয়, সেটাই আমি নিইনি—'

লোকটি আরও কয়েকবার অনুরোধ করল, জোজো কানই দিল না।

তখন সে সন্তুর দিকে ফিরে বলল, "তা হলে তুমি করে দেবে পার্টটা? তোমাকে দিয়েও চলবে।"

সন্তু বলল, "আ-আ-আমি তো-তো-তো-তোতলা। ক-ক-ক-কথা বলতেই পা-পা-পা-পারি না!"

প্রসাদ একটু চমকে গেলেও বলল, "তাতে ক্ষতি নেই। ডায়ালগ খুব কম। পরে ডাব করে নেওয়া যেতে পারে।"

সন্তু বলল, "আ-আ-আ-আমা-র ভ-ভ-ভ-য় করে। ক্যা-ক্যা-ক্যা-মেরা দেখলেই ভ-ভ-ভয় করে।"

প্রসাদ কাকাবাবুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "ওরা রাজি না হলে আর আমি কী করতে পারি বলুন! আমাকে দিয়ে তো আর ওই পার্ট হবে না।"

লোক তিনটি নিরাশ হয়ে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করার পরই কাকাবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "শেষ পর্যন্ত এই? সিনেমায় পার্টের ব্যাপার। ওরে সন্তু, তোর ওই বড়-জুলপিওয়ালাটা তো নিরীহ সিনেমার লোক!"

সন্তু জোজোকে বলল, "তুই রাজি হলি না কেন রে? আমরা বেশ শুটিং দেখতে যেতাম।"

জোজো বলল, "ওইসব এলেবেলে পার্ট আমি করি না।"

সন্তু বলল, "হিরোইনের সঙ্গে পার্ট ছিল। হিরোইনের হাত ধরে দৌড়োতি। তাতেই লোকে তোকে হিরো বলত!"

জোজো বলল, "তোকেও তো বলেছিল। তুই নিলি না কেন? তুই হঠাৎ তোতলা সাজতে গেলি?"

সন্তু বলল, "পাঁচ হাজার টাকা পেলে আমার ভালই হত। রাজি হতাম। কিন্তু লোকটা আগে তোকে বলেছে, আমায় তো বলেনি! সেইজন্যই আমার রাগ হয়ে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "আমায় তো পার্ট দিতে চাইলই না। কলেজে পড়ার সময় দু'-তিনবার নাটকে অভিনয় করেছি! খোঁড়া লোককে আর কে চান্স দেবে!"

কাকাবাবু এবার টেলিফোন তুলে একটা লাইন চাইলেন।

একটু পরে অপারেটর জানাল যে, নম্বরে নিশ্চয়ই কিছু ভুল আছে। কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।
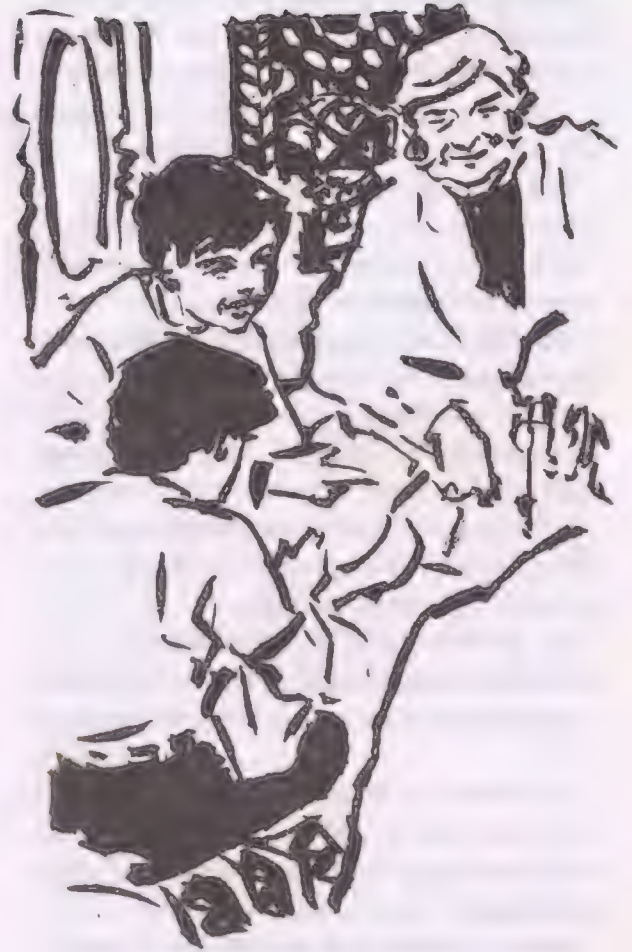
কাকাবাবু বললেন, "ভুল আছে? এঁর নাম আবু তালেব, ইতিহাসের অধ্যাপক। আমাকে দু-তিনবার ফোন করেছেন এখান থেকে, নিজে এই নম্বর দিয়েছেন। তা হলে কি নম্বর বদলে গেল?"

অপারেটর জানালেন, "টেলিফোন বইতে আবু তালেবের নাম নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "মুশকিল হল, লোকটিকে খুঁজে পাব কী করে?"

তিনি বললেন, "আর একটা নম্বর দেখুন। বিক্রমন নায়ার। ইনি একজন সাংবাদিক। এটা ওঁর বাড়ির ফোন।"

এবারে রিং হল বটে। কিন্তু একজন কেউ ধরে বলল, "এখানে বিক্রমন নায়ার নামে কেউ থাকে না।"

কাকাবাবু খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইলেন। তারপর একজন পুলিশ অফিসারের নম্বর দিলেন, তাতেও কোনও লাভ হল না. সাড়া পাওয়া গেল না।

কাকাবাবু বললেন, "এখানকার সব টেলিফোন নাম্বার বদলে গেল নাকি? এরাই বলতে গেলে আমাকে ডেকে এনেছে। এদের দু-একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার।"

ক্রাচ দুটো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি সন্তুদের বললেন, "এই গরমে তোদের আর বেরোতে হবে না। আমি একটু ঘুরে আসছি।"

নীচে এসে তিনি অ্যান্টনিকে বললেন, "চলো তো এখানকার বড় থানায়।"

গরমের জন্য রাস্তা একেবারে সুনসান। থানার সামনেও বেশি লোকজন নেই। কাকাবাবু সোজা ভেতরে ঢুকে গেলেন, কেউ বাধা দিল না। বড়সাহেবের ঘরের দরজা খোলা, সেখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভেতরে আসতে পারি?"

কাকাবাবুর চেহারাতেই এমন একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে যে

কেউ তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে না। অফিসারটি বললেন, "হ্যাঁ, আসুন, বসুন।"

কাকাবাবু ভেতরে এসে বললেন, "নমস্কার। সার্কল অফিসার বাসুদেবন-এর সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি?"

অফিসারটি বললেন, "কোন বাসুদেবন?"

কাকাবাবু বললেন, "এস. কে. বাসুদেবন।"

অফিসারটি বললেন, "ওই নামে তো এখানে কেউ নেই।"

কাকাবাবু বললেন. "নেই? তা হলে কি ট্রান্সফার হয়ে গেছেন? আমি পনেরোদিন আগেও টেলিফোনে কথা বলেছি।"

অফিসারটি বললেন, "আমি এখানে আড়াই বছর আছি। ওই নামে কোনও সার্কল অফিসার কিংবা কোনও অফিসারই ছিল না। আপনি যার সঙ্গে কথা বলেছেন, সে কি পুলিশ হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। ফোন করেছেও থানা থেকে। বেশ কয়েকবার।"

অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?"

কাকাবাবু নাম বললেন, পরিচয় দিলেন। অফিসারটি চিনতে পারলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি ওই বাসুদেবন নামের লোকটিকে কখনও এই থানায় ফোন করেছেন কলকাতা থেকে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, তা অবশ্য করিনি। উনি নিজেই করতেন।"

অফিসারটি খুবই কৌতূহলী হয়ে বললেন, "ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। একজন লোক মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আপনাকে ফোন করেছে। কী মতলব? কী বলেছে আপনাকে?"

কাকাবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন। তাতে পনেরোজন লোকের নাম লেখা। সেই কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখুন তো, এঁদের কাউকে আপনি চেনেন কি না?"

অফিসারটি দু'-তিনবার সেই তালিকায় চোখ বুলিয়ে বললেন, "এইসব নামের কোনও লোক কালিকটে থাকে না। আপনি নামগুলোর পাশে পাশে লিখেছেন, কেউ অধ্যাপক, কেউ সাংবাদিক, কেউ ডাক্তার। অন্তত কয়েকজনকে আমার চেনা উচিত ছিল। সাংবাদিকদের প্রত্যেককে চিনি। বিক্রমন নায়ার নামে কোনও সাংবাদিক এখানে থাকে না। তা জোর দিয়ে বলতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "আশ্চর্য, বিক্রমন নায়ার নামে একজন আমাকে এখান থেকেই ফোন করেছে।"

আর একজন তরুণ পুলিশ অফিসার এই সময় একটা ফাইল নিয়ে ঢুকে টেবিলের কাছে এসে থমকে গেলেন। কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আপনি....আপনি রাজা রায়চৌধুরী না?"

কাকাবাবু মাথা নাড়লেন।

সেই অফিসারটি বললেন, "দিল্লিতে নরেন্দ্র ভার্মার বাড়িতে আপনাকে দেখেছি। আমি ওঁর বোনের ছেলে। অর্থাৎ উনি আমার মামা। ওঁর কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি। আমার নাম ওম প্রকাশ।"

কাকাবাবু বললেন, "নরেন্দ্র ভার্মা আমার বিশেষ বন্ধু।"

ওম প্রকাশ অন্য অফিসারের দিকে ফিরে বললেন, "সার, রাজা রায়চৌধুরী বিখ্যাত লোক। অনেক দারুণ রহস্যের সমাধান করেছেন। বহু অভিযানে গেছেন। এঁর একটা ডাকনাম আছে, অনেকেই এঁকে কাকাবাবু বলেন।"

অফিসারটি কাকাবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,

"আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম। আমার নাম রফিক আলম। আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুবই খুশি হব।"

ওম প্রকাশ বললেন, "কাকাবাবু, আপনি কি এখানে কোনও রহস্য সমাধান করতে এসেছেন?"

কাকাবাবু এবারে চেয়ারে হেলান দিয়ে হাসলেন।

ওম প্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সেরকম কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। কিন্তু আসবার পরে খুব ধাঁধায় পড়ে গেছি। কালিকট থেকে বেশ কয়েকজন লোক ফোন করে একটা ব্যাপার জানিয়েছে। ফোন করেছে, চিঠিও লিখেছে। কিন্তু রফিক আলম সাহেব বলছেন, এখানে সেরকম কোনও লোকই নেই। বাসুদেবন নামে একজন লোক এখানকার পুলিশ অফিসার বলে পরিচয় দিয়েছেন।"

ওম প্রকাশ কাগজটা নিয়ে নামগুলো পড়তে পড়তে বললেন, "আমিও তো এদের কাউকেই চিনি না। বাসুদেবনটা আবার কে?"

রফিক আলম বললেন। "এই লোকেরা ফোন করে আপনাকে কী বলেছে?"

কাকাবাবু বললেন, "সে ব্যাপারটা শুনলে হয়তো আপনারা হাসবেন। আমি বম্বের একটা কাগজে ভাস্কো দা গামা সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে অনেকে ধরে নিয়েছে, আমি ভাস্কো দা গামা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। সেইজন্যই কালিকট থেকে কয়েকজন লোক বারবার আমাকে একটা কথা জানিয়েছে।"

আলম বললেন, "সেই কথাটা কী?"

কাকাবাবু বললেন, "প্রতি বছর এই দিনটাতে নাকি এখানকার বন্দরে ভাস্কো দা গামার ভূত দেখা যায়।"

আলম আর প্রকাশ পরস্পরের দিকে তাকালেন।

কাকাবাবু বললেন, "জানি, আপনারা ভাবছেন, ভূতের গল্পে বিশ্বাস করে আমি এতদূর ছুটে এসেছি, তার মানে আমি একজন

বোকা লোক! বিশ্বাসের কোনও প্রশ্নই নেই। তবে একজন-দু'জন নয়, পনেরোজন লোক, তারা সমাজের বিশিষ্ট লোক, এরা সবাই মিলে একই কথা বললে খটকা লাগে না? এরা অনেকেই জানিয়েছে যে, এরাও ভূত-টুতে বিশ্বাস করে না, কিন্তু নিজের চোখে দেখেছে ভাস্কো দা গামার ভূত। আবার সেই ভূত নাকি বিড় বিড় করে কীসব কথাও বলে।"

আলম বললেন, "আমরা তো এরকম কখনও কিছু শুনিনি। প্রতি বছর এরকম কিছু ঘটলে পুলিশের কানে আসত না?"

প্রকাশ বললেন, "যে-লোকগুলোর নাম লিখে এনেছেন, তাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। এরাই তো দেখছি আসল ভূত!"

আলম বললেন, "ফোন নম্বর রয়েছে। ফোন করে দেখা যেতে পারে। আমরা না চিনলেও যদি কেউ থাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "কয়েক জায়গায় আমি ফোন করেছি। প্রত্যেকটি নম্বরই ভুল। এখন বোঝা যাচ্ছে, কেউ আমার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছে। এতবার ফোন করে, চিঠি লিখে এতদূর টেনে এনে বোকা বানিয়েছে।"

আলম বললেন, "আপনি এখানে আসবার আগে একবার ফোন করে কনফার্ম করেননি?"

কাকাবাবু বললেন, "না, করিনি। আমি তো জানিই, এ-ভূতের গল্প সত্যি হতে পারে না। হয়তো নকল কাউকে ভূত-টুত সাজায়। এমনিই কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই ভাবলাম, একবার এখানে এসে মজাটা দেখাই যাক না! এখন বুঝতে পারছি, আমাকে নিয়েই অন্য কেউ কেউ মজা করেছে।"

আলম বললেন, "এবারে একটু চা খাওয়া যাক। যে আপনার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছে, সে নিশ্চয়ই পরে আপনার সঙ্গে দেখা করে খুব হাসবে।"

চা বিস্কুট খেতে খেতে কিছুক্ষণ গল্প হল।

হোটেলে ফিরে কাকাবাবু দেখলেন, সন্তু আর জোজো দিব্যি ঘুমোচ্ছে। তিনি ওদের জাগালেন না। গরম থেকে এসে হোটেলের ঠাণ্ডা ঘরে বেশ আরাম হল, তিনিও শুয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙল সন্ধেবেলা।

জোজো সবচেয়ে আগে উঠেছে, সে একটা কেক খাচ্ছে।

কাকাবাবুকে চোখ মেলতে দেখে সে বলল, "দুপুরে নিরামিষ খেয়েছি তো, তাই খিদে পেয়ে গেল। হোটেলের সামনেই একটা দোকানে কেক পাওয়া যায়। কিনে আনলাম। কেকের মধ্যেও নারকোল। এটা একেবারে নারকোলের দেশ!"

সন্তু একটা কেকে কামড় দিয়ে বলল, "খেতে খারাপ নয়!"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, দুপুরের স্বপ্ন কি সত্যি হয়?"

কাকাবাবু বললেন, "দুপুরে কী স্বপ্ন দেখেছ তুমি?"

জোজো বলল, "ভাস্কো দা গামাকে স্বপ্ন দেখলাম। একেবারে স্পষ্ট। বন্দরে একটা মস্ত বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। তার ডেকের ওপর একলা ভাস্কো দা গামা, এক হাতে তলোয়ার, সারা গা দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পর্তুগিজ ভাষায় কী যেন বলছে!"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আগেই দেখে ফেললে? হয়তো তোমার স্বপ্নটা সত্যি হতেও পারে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই কী করে বুঝলি পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলছে? তুই পর্তুগিজ জানিস?"

জোজো বলল, "ভাস্কো দা গামা পর্তুগিজ ভাষা না বলে কি বাংলা বলবে?"

সন্তু বলল, "ভূতেরা সব ভাষা জেনে যায়! গল্পে সেরকমই থাকে।"

জোজো বলল, "কয়েকবার পাঁউ পাঁউ শব্দটা বলছিল। পর্তুগিজ ভাষায় পাউ মানে রুটি, জানিস না? সেই থেকেই আমরা বলি পাউরুটি।"

সন্তু বলল, "আহা রে, ভূতটার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছিল। না হলে পাউরুটির কথা বলবে কেন?"

এমন সময় জানলার কাছে পটাপট শব্দ হতেই সবাই সেদিকে তাকাল।

বৃষ্টি নেমেছে খুব জোরে। সেইসঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া।

কাকাবাবু জানলার কাছে এসে বাইরের বৃষ্টি দেখতে দেখতে বললেন, "আঃ বাঁচা গেল, এবার গরমটা আশা করি কমবে।"

সন্তু বলল, "ভাস্কো দা গামা মে মাসে এসেছিল। এই সাঙ্ঘাতিক গরম সহ্য করেছিল কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "স্পেন-পর্তুগালে এক-এক সময় খুব গরম পড়ে। ওদের গরম সহ্য করার অভ্যেস আছে।"

সন্তু বলল, "গরমের মধ্যেও অত জামাকাপড় পরে থাকত?"

কাকাবাবু বললেন, "অভিজাত লোকদের ওরকম পরতেই হত, না হলে সাধারণ লোকরা তাদের মানবে কেন?"

সন্তু বলল, "অভিজাত লোকদের বুঝি ঘামে গেঞ্জি ভিজে যায় না?"

জোজো বলল, "তা তো যায়ই, সেইজন্য ওদের খুব সর্দি হয়। স্বপ্নে দেখলাম, কথা বলতে বলতে ভাস্কো দা গামা কয়েকবার হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করে উঠল।"

সন্তু বলল, "ভূতের সর্দি।"

সন্ধের পর সত্যিই গরম অনেক কমে গেল।

বৃষ্টি একেবারে থামেনি, মাঝে মাঝেই পড়ছে। আটটা বাজার পর ওঁরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

অ্যান্টনি জিজ্ঞেস করল, "সার, একটা চার্চ দেখতে যাবেন? একটু দূরে একটা ভাল চার্চ আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "চার্চ কাল দেখব। একবার চলো তো বন্দরটা দেখে আসি।"

অ্যান্টনি বলল, "সেখানে তো দেখার কিছু নেই। এই পোর্টে এখন আর কোনও বড় জাহাজ থামে না। মাছধরার কিছু বোটের জন্য ব্যবহার করা হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "তা জানি। তবু একবার দেখে আসতে চাই।"

কালিকট যে এককালে বিখ্যাত বন্দর ছিল, তা এখন দেখে কিছুই বোঝা যায় না। কেমন যেন নিষ্প্রাণ অবস্থা। টিম টিম করে আলো জ্বলছে, লোকজন প্রায় দেখাই যায় না। বেশ কিছু নৌকো আর দু'-একটা স্টিমার রয়েছে।"

কাকাবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন, "হুঁ।"

তারপর গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে বললেন, "মাঝরাত্তিরে আর একবার আসতে হবে। ভূতের দেখা না পেলেও অন্য কারও দেখা পাওয়া যেতে পারে। চলো, এখন খেয়ে নেওয়া যাক।"

অ্যান্টনি এবার অন্য একটা হোটেলে নিয়ে গেল। সেখানে

মাছ-মাংস সবই পাওয়া যায়।

কাকাবাবু বললেন, "আগে দেখা যাক, জোজোর জন্য চিংড়ি মাছ।"

জোজো বলল, "চিংড়ি মাছ আমি একাই ভালবাসি না। সন্তুও ভালবাসে। এখানে কাঁকড়া পাওয়া যায় না?"

কাকাবাবু বললেন, "মেনুতে তো কাঁকড়া দেখছি না।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, এখানে দেখছি, হোটেলের বেয়ারা আর ম্যানেজার, সবাই লুঙ্গি পরে।"

জোজো বলল, "লুঙ্গিটাই এদের জাতীয় পোশাক।"

সন্তু বলল, "লক্ষ করেছিস, এখানে কেউ পাঞ্জাবি পরে না। লুঙ্গির ওপর শার্ট।"

জোজো বলল, "পাঞ্জাবি পরে না?"

সন্তু বলল, "আমি সারাদিনে একজনও পাজামা পাঞ্জাবি পরা লোক দেখিনি। এখানে বোধ হয় কেউ পাজামা পরে বাইরে বেরোয় না।"

জোজো নিজেই সন্ধেবেলা পাজামা আর লাল পাঞ্জাবি পরে বেরিয়েছে। সে অন্য টেবিলের লোকদের দেখে নিয়ে বলল, "তাই তো!"

বেয়ারা টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে, এই সময় কিছু দূরে খুব জোরে দুম দুম করে দু'বার শব্দ হল। বোমা কিংবা কামান দাগার মতন।

কাকাবাবু বেয়ারাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "ও কীসের শব্দ?"

বেয়ারাটি বলল, "সিনেমার শুটিং হচ্ছে সার। হিন্দি সিনেমা। দু'জন হিরোইন।"

সন্তু জোজোর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোর বদলে অন্য একজনকে পেয়ে গেছে।"

জোজো বলল, "আমার সিনে তো কামান দাগা ছিল না। এটা অন্য সিন।"

অ্যান্টনি অন্য টেবিলে বসে খেয়ে নিয়েছে। কাকাবাবু তাকে বললেন, "তুমি আবার সাড়ে এগারোটার সময় এসো। এখন আমরা কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াব।"

বৃষ্টি থেমে গেছে, গরমও নেই। খাওয়ার পর খানিকটা হাঁটতে ভালই লাগে।

রাস্তায় লোকজন প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। আলোও জোরালো নয়। আকাশ মেঘলা, চাঁদ আছে কি না বোঝার উপায় নেই।

ওঁরা গল্প করতে করতে হাঁটতে লাগলেন। এক জায়গায় পথ একেবারে নির্জন, কাকাবাবুর ক্রাচের খট খট শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ দুটো গাড়ি এসে থামল ওঁদের সামনে আর পেছনে। টপাটপ নেমে পড়ল পাঁচ-ছ'জন লোক, তাদের মুখে কালো রুমাল বাঁধা, হাতে রিভলভার। একজন ইংরেজিতে বলল, "হাত তোলো!"

কাকাবাবু বললেন, "কী ব্যাপার? তোমরা কারা?"

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে এসে কাকাবাবুর পকেট থাবড়াতে লাগল।

কাকাবাবু নিজের রিভলভার সবসময় সঙ্গে রাখেন। বার করার সময়ই পেলেন না। লোকটি কাকাবাবুর রিভলভারটা নিয়ে বলল, "গাড়িতে ওঠো।"

অন্য দু'জন সন্তু আর জোজোকে ঠেলতে শুরু করেছে।

বাধা দেওয়ার প্রশ্ন নেই। হুড়মুড়িয়ে গাড়িতে উঠতে হল। কাকাবাবুর একটা ক্রাচ পড়ে গেল বাইরে, তিনি বললেন, "আরে, আরে, ওটা তুলতে হবে।"

সন্তু কোনওরকমে ক্রাচটা তুলে নিল।

গাড়িটা একটা ভ্যানের মতন। ভেতরটা অন্ধকার। কাকাবাবুদের ভেতরে ঠেলে দিয়ে দু'জন রিভলভারধারী বসল দরজার কাছে।

কাকাবাবু বললেন, "ব্যাপারটা কী হল বল তো? আমাদের এখানে কোনও শত্রু নেই, কারও কোনও কাজে বাধা দিতেও আসিনি। তবে শুধু শুধু আমাদের ধরে নিয়ে যাবে কেন?"

সন্তু বলল, "এক হতে পারে। জোজোকে দিয়ে জোর করে সিনেমায় পার্ট করাবে।"

জোজো বলল, "ইস! হাজার জোর করলেও আমি ওই ছোট পার্ট করব না।"

সন্তু বলল, "যদি কপালের কাছে রিভলভার ছুঁইয়ে সেটে নিয়ে যায়?"

জোজো বলল, "ওই অবস্থায় কেউ পার্ট করতে পারে নাকি? মুখ দেখেই তো বোঝা যাবে।"

কাকাবাবু পাহারাদারদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে, তোমরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমাদের কাছে কিন্তু টাকা পয়সা বিশেষ কিছু নেই।"

একজন বলল, "শাট আপ!"

গাড়িটা চলল অনেকক্ষণ। আন্দাজে মনে হল এক ঘন্টার বেশি। তারপর থামল এক জায়গায়।

পেছনের দরজা খুলে একজন হুকুম দিল, "নামো!"

একটা দোতলা বাড়ি, সামনে বাগান। বাইরে একটা আলো জ্বলছে। ওদের দোতলায় উঠিয়ে একটা ঘরে এনে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল বাইরে থেকে।

সেই ঘরের মেঝেতে দুটো বড় শতরঞ্চি পাতা। খাট বা চেয়ার-টেবিল কিছু নেই। অন্য দিকে আর একটা দরজা, সেটা খুলে দেখা গেল বাথরুম। জানলায় লোহার গরাদ।

সন্তু বলল, "সিনেমায় পার্ট করতে গেলে মুখে রং-টং মেখে মেক আপ নিতে হয়। জোজো, এবার বোধ হয় তোকে মেক আপ দিতে নিয়ে যাবে।"

জোজো বলল, "তোর অত গরজ, তুই ওই পার্ট কর না। আমি তো করবই না বলে দিয়েছি।"

বসে থাকতে থাকতে এক সময় তিনজনেরই ঘুম পেয়ে গেল। আর কেউ এল না।

জানলা দিয়ে ভোরের আলো এসে ওদের ঘুম ভাঙাল।

বেলা বাড়তে লাগল, তবু কারও দেখা নেই। কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না।

দু'দিকের দুটো জানলা দিয়ে বাগান আর দূরে অসংখ্য নারকোল গাছ দেখা যায়।

জোজো বলল, "টুথপেস্ট-টুথব্রাশ নেই, মুখ ধোব কী করে?"

সন্তু বলল, "শুধু জল দিয়ে ধুয়ে নে।"

জোজো বলল, "সকালবেলা ব্রেকফাস্ট দেবে না?"

কাকাবাবু বললেন, "আর কিছু না হোক, এক কাপ চা কিংবা কফি বিশেষ দরকার।"

সন্তু বলল, "জোজো, তোর দিবাস্বপ্নটা সত্যি কি না মিলিয়ে দেখা হল না।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছিস। এতদূর এলাম, ভূতের গল্পটা কতখানি বানানো কিংবা কারা বানিয়েছে, সেটাও জানা গেল না।"

ভাল করে রোদ্দুর উঠতেই আবার গরমে গা চিটচিট করতে লাগল।

দশটার সময় দরজা খুলল।

দু'জন লোকের হাতে রিভলভার, তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সেই বড় জুলপিওয়ালা লোকটি।

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে সিনেমাওয়ালাদেরই ব্যাপার! মিস্টার প্রসাদ, আমাদের জোর করে আটকে রাখবার দরকার নেই। সন্তু রাজি হয়েছে, ওকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিন। সন্তু মোটেই তোতলা নয়।"

প্রসাদ বলল, "শাট আপ!"

আর একজন লোক একটা ট্রে-তে করে কিছু পরোটা আর ঢ্যাঁড়স-টম্যাটোর তরকারি রেখে গেল।

জোজো বলল, "আমি ঢ্যাঁড়স খাই না। আমার জন্য টোস্ট আর ডিম সেদ্ধ আনতে বলুন।"

প্রসাদ বলল, "শাট আপ!"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা সিনেমা কোম্পানির লোক। কাউকে জোর করে রাস্তা থেকে ধরে আনা যে বেআইনি, তা জানেন না?"

প্রসাদ একই সুরে আবার বলল, "শাট আপ!"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু শাট আপ, শাট আপ বললে চলবে কী করে? কাল তো বেশ নরম সুরে কথা বলছিলেন।"

কাকাবাবু দরজার দিকে একটু এগোতেই প্রসাদ হিংস্র গলায় বলল "আর এক পা কাছে এলে আমি গুলি করতে বাধ্য হব!"

কাকাবাবু থমকে গেলেন।

তারপর খানিকটা হালকাভাবে বললেন, "হঠাৎ কী অপরাধ করলাম আমরা। যে-জন্য এত খারাপ ব্যবহার? মশাই, একটা কিছু কারণ জানাবেন তো!"

প্রসাদ কোনও উত্তর না দিয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

কাকাবাবু দু' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "অদ্ভুত! কারও সঙ্গে শত্রুতা হয়, তা হলেও বুঝি! আমরা তো কিছুই করিনি।"

সন্তু একটা পরোটা তুলে নিয়ে বলল, "নে জোজো, খেতে শুরু

কর।"

জোজো বলল, "বললাম না, আমি ঢ্যাঁড়স খাই না!"

সন্তু বলল, "তুই যে সিনেমা স্টারের মতন হুকুম করলি, তোকে টোস্ট আর ডিম দিতে হবে! আমরা তো বন্দি, যা দেয় তাই খেতে হবে।"

জোজো বলল, "ওসব বাজে জিনিস আমি খাব না।"

সন্তু বলল, "দ্যাখ, আমরা এইরকমভাবে আরও অনেক জায়গায় বন্দি হয়েছি। এই অবস্থায় যা খাবার পাওয়া যায়, তাই খেয়ে নিতে হয়। পরে যদি আর কিছুই না দেয়?"

কাকাবাবুও খেতে শুরু করেছেন।

সন্তু একটা পরোটার মধ্যে খানিকটা তরকারি দিয়ে রোল বানিয়ে জোজোকে বলল, "নে, একটু খেয়ে দ্যাখ।"

জোজো একটা কামড় দিয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, "এঃ! একে তো ঢ্যাঁড়স, তাতে আবার নুন বেশি!"

তারপর অবশ্য সে পর পর তিনটে পরোটা খেয়ে ফেলল।

সন্তু বলল, "দিব্যি তো খেয়ে নিলি দেখছি।"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "খিদে পেলে বাঘেও ঘাস খায়।"

সন্তু বলল, "তোকে বাঘের মতনই দেখাচ্ছে বটে।"

জোজো কাকাবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "আমরা কতক্ষণ এইভাবে বন্দি থাকব?"

কাকাবাবু গোঁফ পাকাতে পাকাতে বললেন, "কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এরা আমাদের ধরে এনেছে কেন? তোমরা সিনেমায় পার্ট করতে রাজি হওনি বলে জোর করে গুম করবে, এ কখনও হয়? ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে ধাঁধা মনে হচ্ছে।"

সন্তু বলল, "সিনেমায় পার্ট করার ব্যাপারটাই বোধহয় বাজে কথা। প্রথমে ওই লোভ দেখিয়ে আমাদের ধরে নিয়ে যেতে

চাইছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “তা হতে পারে। কিন্তু আমাদের ধরে এনে ওদের কী লাভ? ওই প্রসাদ নামের লোকটিকে আগে কখনও দেখিনি। আমরা ওর কোনও ক্ষতিও করিনি।”

জোজো বলল, “কাকাবাবু একটা কিছু করুন। আমার এখানে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না।”

কাকাবাবু বললেন, “কী করা যায় বলো তো? লোকটা তো কোনও কথারই উত্তর দিচ্ছে না। রিভলভার তুলে ভয় দেখাচ্ছে।”

জোজো বলল, “ওই রিভলভারটা ফল্‌স। সিনেমার লোকদের কাছে আসল রিভলভার থাকে নাকি? খেলনা পিস্তল থাকে।”

সন্তু বলল, “যদি এরা সিনেমার লোক না হয়? আমার কিন্তু রিভলভারটা দেখে আসলই মনে হল।”

জোজো বলল, “একটা কাজ করতে হবে। এর পর যখন লোকটা আসবে, সন্তু তুই আর আমি দরজার দু'পাশে লুকিয়ে থাকব। কাকাবাবু কথায়-কথায় ভুলিয়ে লোকটাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসবেন, আমরা দু'জনে দু'দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নেব!”

কাকাবাবু বললেন, “অনেক গল্পের বইয়ে এরকম থাকে। অনেক সিনেমাতেও দেখা যায়। এরা কি সেইসব সিনেমা দেখে না?”

জোজো বলল, “আপনি কথা বলে বলে লোকটাকে ভুলিয়ে দেবেন। তারপর আমরা ঠিক ওকে ঘায়েল করে ফেলব।”

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক আছে, আমি আমার পার্ট যতদূর সম্ভব ভাল করার চেষ্টা করব। আসুক লোকটা।”

এর পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, আর কারও দেখা নেই। কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থেকেও একটা লোককেও দেখা যায় না।

জোজো কয়েকবার দরজার ওপর দুম দুম করে ধাক্কা দিল, তাতেও এল না কেউ।

সন্তু বলল, “জোজো অন্ত্যাক্ষরী খেলবি? গানের লাইনের শেষ কথাটা দিয়ে—”

জোজো বলল, “ধ্যাত, কিছু ভাল লাগছে না।”

কাকাবাবু বললেন, “মেজাজ খারাপ না করে অন্যদিকে মন ফেরানোই ভাল, আমি বেশি গান জানি না। অন্য খেলা করা যাক, সময় কাটাবার জন্য। কে এটা দশবার ঠিক ঠিক বলতে পারবে? 'জলে চুন তাজা, তেলে চুল তাজা'।”

জোজো প্রথমেই বলল, “কী বলতে হবে? জলে চুল তাজা, তেলে চুন তাজা?”

কাকাবাবু বললেন, “না, ঠিক এর উল্‌টো।”

সন্তু আর জোজো দু'জনেই চেষ্টা করল বলতে। পর পর দশবার তাড়াতাড়ি ঠিক বলা মোটেই সহজ নয়। নানারকম মজার মজার ভুল হয়। জোজো একবার বলল, 'জলে তুন তাজা তেলে চুল চাজা!'

কাকাবাবুই জিতলেন এ খেলায়। তারপর বললেন, “ইংরেজিতে একটা আছে, সেটা চেষ্টা করে দ্যাখো। She sells sea-shells on the sea-shore. এটাও, তাড়াতাড়ি বলতে হবে দশবার। শি সেল্‌স সি-সেল্‌স অন দ্য সি-শোর।”

দু-তিনবার বলতে বলতেই দরজাটা খোলার শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে জোজো আর সন্তু তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজার দু'পাশে গিয়ে লুকোল।

এবারেও রিভলভার হাতে প্রসাদ, আর দু'জন গাঁট্টাগোট্টা লোক।

কাকাবাবু কিছু বলার আগেই প্রসাদ বলল, “ছেলে দুটো গেল কোথায়? দরজার পাশে লুকিয়েছে? সামনে আসতে বলুন। বেশি

চালাকি করলে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি গুলি চালাব!"

কাকাবাবু হেসে ফেলে সন্তু আর জোজোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওরে আয় রে, আমাদের জন্য খাবার এনেছে।"

একজন লোক দুটো প্লেট নামিয়ে রাখল। একটাতে একগোছা রুটি, আর একটাতে সেই সকালবেলারই মতন তরকারি।

জোজো আর্তনাদ করে উঠল, "আবার ঢ্যাঁড়স! এ দেশে কি আর কিছু পাওয়া যায় না?"

প্রসাদ বলল, "শাট আপ!"

কাকাবাবু বললেন, "ওগো শাট আপ বাবু, একটু খাবার জলও কি পাওয়া যাবে না?"

প্রসাদ বলল, "বাথরুমের কলে জল আছে। সেই জল খাবে।"

দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

জোজো বলল, "আমি খাব না। খাব না, খাব না, কিছুতেই আর ঢ্যাঁড়স খাব না।"

সন্তু বলল, "খিদে পেলে বাঘ ঢ্যাঁড়স খায়!"

জোজো বলল, "কলের জল খেলে আমার পেট খারাপ হবে।"

সন্তু বলল, "তেষ্টা পেলে বাঘে কাদাজলও খায়।"

জোজো বলল, "তুই বারবার বাঘ বাঘ করবি না তো?"

সন্তু বলল, "তুই-ই তো প্রথমে বলেছিস।"

জোজো রাগ করে বলল, "তুই ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছিস? আমরা এখানে দিনের পর দিন বন্দি হয়ে থাকব?"

কাকাবাবু বললেন, "এরা দিনের পর দিন আমাদের রুটি-তরকারি খাইয়ে আটকে রাখবে, এরকম মনে হয় না। একটা কিছু ঘটবেই।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি তো হিপনোটিজ্‌ম জানেন। হিপনোটাইজ করে ওই জুলপিওয়ালাটাকে ঘুম পাড়িয়ে

রিভলভারটা কেড়ে নিতে পারেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "তা হয়তো পারা যায়। কিন্তু মুশকিল কী জানো, আমি যাঁর কাছে ওই বিদ্যেটা শিখেছি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করা আছে, আমি নিজে থেকে আগে কারও ওপর ওটা প্রয়োগ করব না। কেউ আমাকে হিপনোটাইজ করার চেষ্টা করলে তবেই আমি—"

জোজো বলল, "বাঃ, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ওই প্রতিজ্ঞা ভাঙা যায় না? বিপদে পড়লে মানুষ সব কিছু করতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "প্রতিজ্ঞা ভাঙলেও এখানে বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না। ওরা তিনজন ছিল। একসঙ্গে তিনজন লোকের দিকে তাকিয়ে হাত ঘুরিয়ে অজ্ঞান করে দেওয়া সম্ভব নয়। ওটা গাঁজাখুরি ব্যাপার। একজন-একজন করে করতে হয়, তাও সময় লাগে। প্রসাদের সঙ্গের একটা লোকের হাতে লোহার ডাণ্ডা ছিল। আমি প্রসাদকে হিপনোটাইজ করতে গেলে ওই লোকটা যদি ডাণ্ডা দিয়ে আমার মাথায় মারত, তা হলেই আমার সব জারিজুরি ভেঙে যেত।"

জোজো অসহায় ভাবে বলল, "তা হলে কি কোনওই উপায় বার করা যাবে না?"

সন্তু বলল, "আয়, আগে খেয়ে নিই। তারপর একটু ঘুমোই। তারপর বুদ্ধি খেলাতে হবে। দরজার পাশে লুকিয়ে থাকার বুদ্ধিটা তো খাটল না।"

এক ঘণ্টা পরে আবার দরজা খুলে গেল।

এবারেও প্রসাদ, আর তার সঙ্গে দু'জন লোক। তীক্ষ্ণ নজরে সারা ঘরটা দেখে নিয়ে সে কাকাবাবুকে বলল, "তুমি বেরিয়ে এসো। শুধু তুমি। ছেলেদুটো এখানেই থাকবে।"

কাকাবাবু বললেন, "যাক বাঁচা গেল। বন্ধ ঘরে বসে থেকে থেকে

দম আটকে আসছিল। চলো, কোথায় যেতে হবে?"

কাকাবাবু বেরিয়ে এলেন। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে হল নীচে। প্রসাদ তাঁর ঘাড়ে রিভলভারটা ঠেকিয়ে আছে।

কাকাবাবু বললেন, "রিভলভারটা সরাও। অত কিছুর দরকার নেই। আমি খোঁড়া মানুষ, আমি কি দৌড়ে পালাতে পারব নাকি?"

প্রসাদ বলল, "শাট আপ।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি বুঝি আর কোনও ইংরিজি কথা জানো না?"

প্রসাদ কাকাবাবুকে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, তিনি আর একটু হলে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। কোনওরকমে সামলে নিয়ে বললেন, "আমার ওপর এত রাগ কেন বাপু? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি, সেটা বলবে তো!"

প্রসাদ আবার বলল, "শাট আপ!"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, তাই বলে যাও!"

একতলায় একটা ঘরে কাকাবাবুকে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রসাদ দরজা বন্ধ করে দিল পেছন থেকে। সে নিজে ঘরে ঢুকল না।

ঘরটি বেশ বড়, সোফা দিয়ে সাজানো। একদিকে একটা সিংহাসনের মতন লাল ভেলভেট দিয়ে মোড়া চেয়ার। তার ওপরে বসে আছে একজন মহিলা। তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়েস হবে, খুবই সুন্দর চেহারা। দুধে-আলতা গায়ের রং, একটা সাদা সিল্কের শাড়ি

পরা, সারা গা ভর্তি গয়না। এমন ঝকমক করছে যে, মনে হয়, সবগুলোই হিরের, তাকে দেখাচ্ছে রানির মতন।

কাকাবাবু তাকে চিনতে পারলেন না। হাত জোড় করে বললেন, "নমস্কার।"

মহিলাটি কিন্তু নমস্কার করল না। তার ভুরু কুঁচকে গেল, অমন সুন্দর মুখখানা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বলল, "এইবার রাজা রায়চৌধুরী, তোমাকে বাগে পেয়েছি। কুকুর দিয়ে তোমার মাংস খাওয়াব!

কাকাবাবু খুবই অবাক হয়ে বললেন, "আপনাকে তো আমি চিনি না। আমার ওপর এত রাগ করছেন কেন? আমি কি আপনার কোনও ক্ষতি করেছি?"

মহিলাটি বলল, "চিনতে পারছ না? ন্যাকামি হচ্ছে। আমার পোষা ডালকুত্তা যখন তোমার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, তখন ঠিক চিনবে!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার মাংস কী এমন সুস্বাদু যে, আপনার ডালকুত্তার পছন্দ হবে? বাজারে অনেক পাঁঠার মাংস পাওয়া যায়, কুকুররা সেই মাংসই বেশি পছন্দ করে। আমার ওপর আপনার এত রাগ কেন? আপনি কে?"

মহিলাটি বলল, "আমি তোমার যম। আমার হাতেই তুমি মরবে।"

কাকাবাবু বললেন, "যম তো মেয়ে নয়, পুরুষ। আমি মেয়েদের সঙ্গে কক্ষনও লড়াই করি না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সেই সুন্দরী মহিলাটি রাক্ষুসির মতন হিংস্র মুখ করে বলল, "পাঁচ বছর ধরে আমি রাগ পুষে রেখেছি। তোমাকে ধরার অনেক চেষ্টা করেছি। এইবার বাগে পেয়েছি। আজ চোখের সামনে তোমাকে একটু একটু করে মরতে দেখে, তারপর রাত্তিরে শান্তিতে ঘুমোব!"

কাকাবাবু নকল দুঃখের ভাব করে বললেন, "অনেকেই এই কথা বলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি মরি না। কী করব বলো! আজও তোমার শান্তিতে ঘুম হবে না!"

এই সময় পাশের দরজা দিয়ে আর একজন লোক ঢুকল। সে যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। মাথায় বাবরি চুল, নাকের নীচে শেয়ালের লেজের মতন মোটা গোঁফ। একটা ঝলমলে জরি বসানো কোট পরা, কোমরে ঝুলছে তলোয়ার।

কাকাবাবু দেখামাত্র সেই লোকটিকে চিনতে পারলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, "মোহন সিং।"

তারপর মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার তোমাকেও চিনতে পেরেছি। সিনেমার নায়িকা। তোমাদের মুখের চেহারা আর সাজপোশাক এত বদলে যায় যে, চেনা মুশকিল। আমি তো সিনেমাটিনেমাও বিশেষ দেখি না। তোমার সঙ্গে সেই বিজয়নগরে দেখা হয়েছিল, তাই না? কী যেন তোমার নাম?"

মোহন সিং একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলল, "কস্তুরীকে চিনতে পারোনি? ও এখন হিন্দি ফিল্মের দু'নম্বর নায়িকা।"

কস্তুরী বলল, "দু'নম্বর না, এক নম্বর!"

মোহন সিং বলল, "হ্যাঁ, এই নতুন ফিল্মটা রিলিজ করলে তুমি নিশ্চিত এক নম্বর হবে। যাকগে, আসল কথায় আসা যাক। রাজা রায়চৌধুরী, তোমাকে কস্তুরী বেশি বেশি ভয় দেখাচ্ছিল। অবশ্য ওর অত রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। তুমি তো আমাদের কম ক্ষতি করোনি! তবু তোমাকে আর একবার বাঁচার চান্স দেব।"

কাকাবাবু নিজেও এবার একটা সোফায় বসে পড়ে হাঁফ ছেড়ে বললেন, "যাক এবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এতক্ষণ ধাঁধার মধ্যে ছিলাম। কারা আমাদের ধরে এনেছে, কেন আমার ওপর এত রাগ, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তোমরাই ভাস্কো দা গামার ভূতের

ধোঁকা দিয়ে আমাকে কালিকটে টেনে এনেছ?

মোহন সিং হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "কেমন ফাঁদ পেতেছি, বলো! এর আগেও অনেকবার তোমাকে টেনে আনার চেষ্টা করেছি। একবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, মুম্বইয়ে একটা খুনের তদন্ত করে দিলে তোমাকে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়া হবে, তুমি আসোনি। রাজস্থানের একটা মন্দিরের মূর্তি চুরি যাওয়ার কথা জানালেও তুমি পাত্তা দাওনি। তারপর ভাস্কো দা গামা বিষয়ে তোমার প্রবন্ধটা ছাপা হওয়ার পর একজন আমাকে বুদ্ধি দিল, ওই ভূতের গুজবটা আস্তে আস্তে ছড়াও, বড় বড় লোকেদের নাম করে ফোন করাও, চিঠি লেখাও, তাতে ও টোপ গিলতে পারে। সেই বুদ্ধিটা ঠিক কাজে লেগে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "অন্যের বুদ্ধি! তোমার অত বড় মোটা মাথা থেকে যে এই সূক্ষ্ম বুদ্ধি বেরোবে না, তা বোঝাই যায়। প্রথম রাউন্ডে আমি হেরে গেছি, ধরা পড়ে গেছি। এবার কী হবে বলো!"

মোহন সিং বলল, "তোমাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি, তুমি আমাদের বিজয়নগরের হিরেটা ফেরত দাও।"

কাকাবাবু বললেন, "বিজয়নগরের হিরেটা তোমাদের হল কী করে? যে-কোনও ঐতিহাসিক জিনিসই ভারত সরকারের সম্পত্তি।"

মোহন সিং বলল, "ওই হিরেটা উদ্ধার করার জন্য আমরা প্রায় কুড়ি লাখ টাকা খরচ করেছি।"

কস্তুরী চিৎকার করে বলল, "শুধু টাকা! কত অপমান সয়েছি। এই পাজি, শয়তান, খোঁড়া লোকটা আমাকে নদীর জলে চুবিয়ে আমার কাছ থেকে হিরেটা কেড়ে নিয়েছে। ওই হিরে আমার চাই—চাই—চাই! যেমন করে হোক!"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "অত হিরের লোভ ভাল নয়। শোনো,

ওই হিরেটা তোমাদের নয়, আমারও নয়। হিরেটা উদ্ধার করেছি আমি, কিন্তু নিজের কাছে তো রাখিনি। ভারত সরকারের কাছে জমা দিয়েছি। দিল্লিতে একটা মিউজিয়ামে কড়া পাহারা দিয়ে রাখা আছে। ওই বিশ্ববিখ্যাত হিরেটা দেখতে বহু লোক যায়। তোমরাও গিয়ে দেখে আসতে পারো।"

মোহন সিং বলল, "ওসব আমরা জানি। ছেলে দুটোকে জামিন রেখে তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব। তুমি দিল্লিতে গিয়ে ওই হিরেটা আমাদের জন্য নিয়ে আসবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি দিল্লিতে গেলেও হিরেটা আমাকে ফেরত দেবে কেন?"

মোহন সিং বলল, "তোমার অনেক খাতির, তুমি হিরেটা এক সময় দেখতে চাইবে। তারপর ওখানে একটা নকল ঠিক ওইরকম হিরে বসিয়ে আসলটা নিয়ে চলে আসবে। খুব সোজা।"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে আমাকে চুরি করতে বলছ? তোমাদের কি মাথাখারাপ হয়েছে! তোমাদের জন্য আমি হিরে চুরি করতে যাব কেন? আমাকে ছেড়ে দিলেই তো আমি পুলিশ সঙ্গে এনে সন্তু আর জোজোকে উদ্ধার করব। তোমাদেরও ধরিয়ে দেব।"

মোহন সিং বলল, "আমরা কি এতই বোকা? তোমার ওপর নজর রাখা হবে। তুমি পুলিশের কাছে গেলেই আমরা ওই ছেলে দুটোর গলা কেটে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলব! পুলিশ এলেই বা কী হবে? আমরা যে তোমাদের ধরে এনেছি তার কোনও প্রমাণ আছে? আমরা তো এখানে সিনেমার শুটিং করতে এসেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু আর জোজোকে যদি কেউ মারে, তা হলে সে পৃথিবীর কোনও জায়গাতেই লুকোতে পারবে না, আমি ঠিক তাকে খুঁজে বার করব, নিজের হাতে তার গলা টিপে মারব।"

কস্তুরী চেয়ার ছেড়ে নেমে এসে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল,

"কী, তোর এত সাহস, এখনও আমাদের ভয় দেখাচ্ছিস? তোকে এখনই যদি মেরে ফেলি, তুই কী করবি?"

সে খুব জোরে কাকাবাবুর দু'গালে দুটো চড় কষাল।

চড় খেয়েও কাকাবাবু একটুও নড়লেন না। প্রায় এক মিনিট স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন কস্তুরীর মুখের দিকে।

তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন, "ছিঃ, এভাবে কাউকে মারতে নেই। কাউকে মারলে তুমি নিজেও যে কখনও এরকম মার খেতে পারো, সে-কথা ভাব না কেন?"

মোহন সিং ফস করে একটা রিভলভার বার করে বলল, "সাবধান কস্তুরী। ওর কাছ থেকে সরে এসো। ও লোকটা খোঁড়া হলেও ওর গায়ে অসম্ভব জোর। ও তোমাকে একবার ধরলে ছিঁড়ে ফেলতে পারে।"

কাকাবাবু মোহন সিংয়ের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "আমি মেয়েদের গায়ে হাত তুলি না, তাই ও বেঁচে গেল!"

কস্তুরী সত্যি যেন ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল খানিকটা।

মোহন সিং বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, তুমি আমার দিকে এগোবার চেষ্টা করলেই আমি গুলি করব। এখানে আরও পাঁচজন পাহারাদার আছে। তুমি পালাতে পারবে না কিছুতেই। এর পরেও তুমি আমাদের কথা শুনবে না?"

কাকাবাবু বললেন, "বিজয়নগরের হিরেটা পাওয়ার আশা ত্যাগ করো। ওটা জাতীয় সম্পত্তি। আমাদের আটকে রেখে তোমাদের কোনও লাভ নেই।"

কস্তুরী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "হিরেটা যদি না পাই, তা হলে তোমাকে আমি পুড়িয়ে মারব। তাতেও আমার শান্তি হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "একবার বলছে কুকুর দিয়ে খাওয়াবে, একবার বলছে পুড়িয়ে মারবে। এর দেখছি মন স্থির নেই।

মোহন সিং বলল, "আমি ব্যবসাদার লোক। কুড়ি লাখ টাকা খরচ করেছি, সে টাকা আমি উসুল করবই। রাজা রায়চৌধুরী, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি না হলে কী ভুল করবে, পরে বুঝবে।"

তারপর সে চিৎকার করে ডাকল, "প্রসাদ। প্রসাদ!"

সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদ আর দু'জন লোককে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

মোহন সিং বলল, "প্রসাদ, একে নিয়ে যাও। তিনজনেরই হাত বেঁধে রাখবে।"

কস্তুরী বলল, "এদের কিছু খেতে দেবে না। কিচ্ছু না। জলও দেবে না।"

প্রসাদের হাতে রিভলভার, অন্য দু'জনের হাতে লোহার ডাণ্ডা। তারা ঠেলতে ঠেলতে কাকাবাবুকে নিয়ে চলল।

আগের ঘরটায় ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা।

সন্তু আর জোজো উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে ছিল। কাকাবাবু বললেন, "একটা ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিত হওয়া গেছে। কারা আমাদের ধরে এনেছে, সেটা জানা গেল। শত্রুপক্ষকে চিনতে না পারলে লড়াইয়ের পদ্ধতিটা ঠিক করা যায় না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এরা কারা?"

কাকাবাবু বললেন, "তোদের সেই বিজয়নগরের কথা মনে আছে? মোহন সিং, কস্তুরী, ওরা সিনেমা তোলার ছুতোয় বিজয়নগরের বিশ্ববিখ্যাত হিরেটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছিল?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ মনে, আছে। সেবারে রিঙ্কুদি আর রঞ্জনদা সঙ্গে ছিল। ওরা পারেনি, বিজয়নগরের হিরে আমরাই উদ্ধার করেছিলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের মুখের গ্রাস আমরা কেড়ে নিয়েছি। ওদের চোখে ধুলো দিয়ে হিরেটা আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই রাগ ওরা পুষে রেখেছে।"

সন্তু বলল, "সেইজন্য প্রতিশোধ নিতে আমাদের ধরে রেখেছে?"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু প্রতিশোধ নয়। ওরা হিরেটা ফেরত চায়। কিন্তু সেটা আমি দেব কী করে? সেটা তো আমি গভর্নমেন্টের কাছে জমা দিয়ে দিয়েছি।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "তা হলে ওরা এখন কী করবে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। তবে জোজো, তোমার জন্য একটা ভাল খবর আছে। তোমাকে আর ভিণ্ডি মানে ঢ্যাঁড়সের ঘ্যাঁট খেতে হবে না।"

জোজো খানিকটা উৎসাহিত হয়ে বলল, "তা হলে কী দেবে? ভাল খাবার দেবে?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছুই দেবে না। খাবার বন্ধ।"

জোজো ভুরু তুলে বলল, "কাকাবাবু, এটাকে আপনি ভাল খবর বলছেন?"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "জলও দেবে না বলেছে। তবে বাথরুমের কলের জল আছে, তা দিয়ে তেষ্টা মেটানো যেতে পারে।"

জোজো বলল, "এইরকম সময়েও আপনি হাসছেন কী করে বলুন তো?"

কাকাবাবু বললেন, "হাসির বদলে মুখ ব্যাজার করে থাকলে কি কোনও লাভ হবে?"

সন্তু বলল, "এইজন্যই তো তোকে বলেছিলাম, বন্দি অবস্থায় যে-কোনও খাবার পেলেই চট করে খেয়ে নিতে হয়।"

জোজো বলল, "রাখ তো খাওয়ার কথা। আমি উপোস করতে মোটেই ভয় পাই না। কিন্তু এখান থেকে উদ্ধার পাব কী করে? আমাদের কাছে কোনও কিছু অস্ত্রও নেই। ইস, হোটেল থেকে

খানিকটা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো যদি আনতাম! সেবারে খুব কাজে লেগেছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "অস্ত্র নেই কে বলল? একটা অস্ত্র তো সব সময়ই আমাদের সঙ্গে থাকে।"

জোজো অবাক হয়ে বলল, "তার মানে? কী অস্ত্র আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি এত বুদ্ধিমান, এটা বুঝলে না?"

কাকাবাবু নিজের মাথায় টোকা দিয়ে বললেন, "এই যে অস্ত্র!"

সত্যিই, সারাদিনে আর কোনও খাবার দিল না।

বেচারি জোজো খিদের জ্বালায় কাহিল। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে আর মাঝে মাঝে উঃ-উঃ করছে। কাকাবাবু বসে আছেন এক দিকের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে। চোখ বোজা।

সন্তু দাঁড়িয়ে আছে জানলার কাছে। গান গাইছে গুন্‌গুন করে।

জোজো উঠে গিয়ে বাথরুমের কলে জল খেয়ে এল। এই নিয়ে পাঁচবার।

সন্তু মুখ ফিরিয়ে বলল, "অত জল খাচ্ছিস কেন? জল খেলে খিদে পায় না।"

জোজো বলল, "আমি মোটেই খিদে গ্রাহ্য করি না। এত গরমে যা ঘাম হচ্ছে, জল না খেলে শরীরে জল কমে যাবে।"

সন্তু বলল, "সারাক্ষণ চুপচাপ থাকার কোনও মানে হয় না। আয় জোজো, কবিতা মুখস্থ বলার কম্পিটিশন দিবি?"

জোজো মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, "ধ্যাত! এখন কবিতা টবিতা কিচ্ছু ভাল লাগছে না।"

কাকাবাবু চোখ বুজেই বললেন, "খিদের রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, তাই না? পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি! চাঁদ উঠেছে নাকি রে সন্তু?"

সন্তু বলল, "আকাশ মেঘলা।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আকাশে কি টক-টক গন্ধ?"

সন্তু বলল, "মনে হচ্ছে এক্ষুণি বৃষ্টি নামবে। তখন সব মিষ্টি হয়ে যাবে।"

বৃষ্টি নামল না। একটু পরেই নীচে একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল। খুব জোরালো হিংস্র মতন ডাক।

কাকাবাবু নড়েচড়ে বসে বললেন, "এইবার মনে হচ্ছে একটা কিছু শুরু হবে। কস্তুরী বোধ হয় মন ঠিক করে ফেলেছে।"

জোজো বলল, "তার মানে?"

কাকাবাবু বললেন, "ওই কস্তুরী নামের নায়িকাটি একবার বলেছিল, কুকুর দিয়ে আমার মাংস ছিঁড়ে খাওয়াবে। তারপর বলল, আগুনে পোড়াবে। আবার বলল, না খাইয়ে মারবে। এখন বোধ হয় ঠিক করেছে, কুকুর দিয়েই খাওয়াবে।"

জোজো অবাক হয়ে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্তু বলল, "এই সবকিছুর জন্য ওই ভাস্কো দা গামা নামে লোকটাই দায়ী। সেই সময় আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি করেছে। এই পাঁচশো বছর পরেও ওর ভূতের জন্য আমাদের এই জ্বালাতন সহ্য করতে হচ্ছে। কাকাবাবু, তুমি ওকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গেলে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "তখন কি জানি, তার ফল এই হবে? খুব বুদ্ধি খাটিয়ে এরা আমাদের কালিকটে টেনে এনেছে!"

জোজো বলল, "এর চেয়ে চেরাপুঞ্জি বেড়াতে গেলে কত ভাল হত?"

দড়াম করে দরজা খুলে গেল। এবারে পাঁচজন লোক। প্রসাদ রিভলভার দোলাতে-দোলাতে বলল, "তোমাদের হাত বাঁধা হবে। কেউ নড়াচড়া করলেই মাথা ফাটবে!"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকক্ষণ আগেই তো হাত বাঁধার কথা ছিল। ভুলে গিয়েছিলে বুঝি?"

প্রসাদ বলল, "শাট আপ!"

কাকাবাবু বললেন, "ওই এক কথা শুনতে-শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। শোনো, আমার হাত বাঁধার দরকার নেই। আমি পালাব না। হাত বাঁধা থাকলে আমি ক্রাচ নিয়ে হাঁটব কী করে?"

দু'জন লোক দু' দিক থেকে এসে কাকাবাবুর হাত চেপে ধরল। তাদের একজন বলল, "তোমার আর ক্রাচ দরকার হবে না।"

কাকাবাবু সন্তুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এরা দেখছি ভারী অভদ্র। সারাদিন খেতে দেয় না, খোঁড়া মানুষকে ক্রাচ নিতে দেয় না!"

ওদের তিনজনকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে যাওয়া হল ঘরের বাইরে। ক্রাচ ছাড়া কাকাবাবুকে এক পায়ে লাফাতে হচ্ছে।

গেটের বাইরে একটা বড় ভ্যান গাড়ি। বাগানে একটা মস্ত বড় কুকুরের চেন ধরে দাঁড়িয়ে আছে কস্তুরী, কুকুরটা ডেকেই চলেছে।

কস্তুরী বলল, "এইবার, রায়চৌধুরী? আমার কুকুরটা দু'দিন না খেয়ে আছে। আমি চেন ছেড়ে দিলেই তোমার মাংস খুবলে-খুবলে খাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি! অত সোজা? রাজা রায়চৌধুরী একটা সামান্য কুকুরের কামড় খেয়ে মরবার জন্য জন্মেছে? নাঃ, তা

বোধ হয় ঠিক নয়। কুকুরটাকে ছেড়ে দাও তো, দেখি কী হয়?"

বাড়ির ভেতর থেকে মোহন সিং এই সময় বেরিয়ে এসে বলল, "না, না, কস্তুরী, কুকুরটা ধরে রাখো। রায়চৌধুরীকে..."

কস্তুরী তবু হি-হি করে হেসে হাতের চেন খুলে দিল। কুকুরটা ধারালো দাঁত বার করে ঘাউ-ঘাউ করে ডেকে তেড়ে গেল কাকাবাবুর দিকে।

জোজো ভয়ে চোখ বুজে ফেলল।

কাকাবাবু কুকুরটার চোখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আস্তে-আস্তে শিস দিতে লাগলেন। খুব মিষ্টি সুর।

কুকুরটা কাকাবাবুর খুব কাছে এসে থেমে গেল। এখনও জোরে-জোরে ডাকছে, কিন্তু কাকাবাবুর চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছে না। কাকাবাবু শিস দিয়েই চলেছেন।

ক্রমে কুকুরটার লাফালাফি কমে এল, হঠাৎ ডাক বন্ধ হয়ে গেল। শুয়ে পড়ল কাকাবাবুর পায়ের কাছে।

কাকাবাবু বললেন, "কুকুর খুব ভাল প্রাণী। শুধু-শুধু মানুষকে কামড়াবে কেন? কই হে কস্তুরী, তোমার আরও কুকুর থাকে তো নিয়ে এসো।"

কস্তুরী চোখ গোল গোল করে বলল, "এই লোকটা জাদু জানে!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আরও অনেক কিছু জানি। এখনও আমাকে চিনতে তোমাদের ঢের বাকি আছে।"

মোহন সিং কাছে এসে বলল, "ওরকম ভেলকি আমি অনেক দেখেছি। যাও রায়চৌধুরী, ওই গাড়িতে গিয়ে ওঠো!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ক্রাচ দুটো এনে দিতে বলো!"

মোহন সিং ধমক দিয়ে বলল, "ক্রাচ-ফ্রাচ পাবে না। ওঠো গাড়িতে।"

কাকাবাবু আরও জোরে ধমক দিয়ে বললেন, "আগে আমার

ক্রাচ আনো, নইলে আমি কিছুতেই গাড়িতে উঠব না।"

সন্তু-জোজোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোরাও উঠবি না।"

মোহন সিং বলল, "ছেলেমানুষি কোরো না রায়চৌধুরী, তোমার দিকে তিনটে রিভলভার তাক করা আছে। এক্ষুণি ফুঁড়ে দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "চালাও গুলি!"

মোহন সিং নিজের রিভলভার তুলে কাকাবাবুর কপালের দিকে তাক করল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাল না। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যেতে লাগল।

একটু পরেই সে অন্য কিছু ভেবে একজনকে বলল, "এই, ওর ক্রাচ দুটো নিয়ে আয়!"

একজন দৌড়ে গিয়ে ক্রাচ আনার পর সবাইকে গাড়িতে তোলা

হল। মোহন সিং আর কস্তুরী উঠল না।

গাড়িটা চলতে শুরু করার পর জোজো বলল, "সন্তু, সত্যি করে বল তো, কুকুরটা যখন কাকাবাবুর দিকে তেড়ে এল, তুই ভয় পাসনি?"

সন্তু বলল, "তা একটু ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই। তবে আমি রেডি ছিলাম। কুকুরটা কাকাবাবুকে কামড়াবার জন্য লাফ দিলেই আমি লাথি কষাতাম ওর পেটে!"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আপনি বুঝি মন্ত্র পড়ে কুকুরটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না, মন্ত্র-টন্ত্র তো আমি জানি না। অন্য একটা উপায় আছে। লক্ষ করোনি, কুকুরটা আমার চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছিল না? আর ওই যে শিস দিচ্ছিলাম, ওটা শুনলেই ওদের ঘুম পায়।"

জোজো বলল, "আপনি মোহন সিংকে কী করে বললেন গুলি চালাতে? যদি সত্যিই গুলি চালিয়ে দিত? ওরা যেরকম নিষ্ঠুর লোক!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি জানতুম, ও গুলি চালাবে না। ওর আগের কথাটা লক্ষ করোনি? ও কস্তুরীকে কুকুরটা ছাড়তে বারণ করছিল। তার মানে, আমাকে এখন মারতে চায় না, ওর অন্য মতলব আছে।"

জোজো বলল, "আমাদের এখন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!"

দরজার ধারে দু'জন বন্দুকধারী পাহারাদার বসে আছে। তাদের দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এদের তো জিজ্ঞেস করলেই বলবে শাট আপ। ওরা কিছু বলতে জানে না। দেখাই যাক, কোথায় নিয়ে যায়!"

গাড়িটা চলছে তো চলছেই। প্রায় ঘণ্টাচারেক বাদে থামল এক

জায়গায়। সেখানে নামতে হল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে।

ছায়ামূর্তির মতন কয়েকজন লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। তারা কাকাবাবুদের হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। গাড়িটা ফিরে গেল।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। একটা লোক মাঝে-মাঝে টর্চ জ্বেলে পথ দেখাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, চারপাশে নিবিড় জঙ্গল। আগের লোকগুলো কাকাবাবুর ক্রাচদুটো ছুড়ে দিয়ে গেছে, কিন্তু কাকাবাবুর হাত বাঁধা বলে তা ব্যবহার করতে পারছেন না। লাফিয়ে-লাফিয়ে যেতে তাঁর খুবই অসুবিধে হচ্ছে। একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই সেই টর্চধারী কাছে এসে কাকাবাবুকে দেখল। তারপর তাঁর হাতের বাঁধন খুলে দিল।

কাকাবাবু বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

প্রায় আধঘণ্টা হাঁটার পর একটা ফাঁকা জায়গায় সবাই থামল। সেখান থেকেও খানিকটা দূরে এক জায়গায় কয়েকটা মশাল জ্বলছে, মনে হয় প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন লোক গোল হয়ে বসে আছে।

একটা মশাল তুলে এনে কাকাবাবুদের দিকে এগিয়ে এল দু'জন লোক।

কাছে আসতে দেখা গেল, তাদের একজনের চেহারা মোহন সিংয়ের মতনই লম্বা-চওড়া। কিন্তু সে মোহন সিং নয়, তার মুখখানা বাঘের মতন, মোটা জুলপি নেমে এসেছে প্রায় চিবুক পর্যন্ত, মোটা গোঁফ মিশে গেছে দু'পাশের জুলপিতে। কপালে লম্বা-লম্বা তিনখানা চন্দনের দাগ। টকটকে লাল রঙের একটা আলখাল্লা পরে আছে।

লোকটি কাকাবাবুদের দিকে কয়েকবার চোখ বুলিয়ে দেখল।

কাকাবাবু ইংরিজিতে বললেন, "শুভ সন্ধ্যা। আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। আপনার নাম জানতে পারি?"

লোকটি তার কোনও উত্তর না দিয়ে পাশের একজনকে কী

একটা ভাষায় যেন কিছু নির্দেশ দিল। তারপর পায়ের আওয়াজে মাটি কাঁপিয়ে ফিরে গেল আগের জায়গায়।

অন্য একজন লোক সন্তু আর জোজোর হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে তিনজনকেই নিয়ে গেল কাছাকাছি একটা কুঁড়েঘরে। ঘরের বেড়া গাছের ডালপাতা দিয়ে তৈরি, মেঝেতে খড় পাতা। একটা হ্যারিকেনও রয়েছে।

একটু পরেই আরও দু'জন লোক এসে একগোছা রুটি, একটা ডেকচি ভর্তি গরম মুরগির মাংস রেখে গেল। সঙ্গে এক জাগ জল। মাংস থেকে এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

জোজো বলল, "এরা আবার কারা? এত খাতির?"

সন্তু বলল, "যারাই হোক, খুব খিদে পেয়েছে। আয়, আগে খেয়ে নিই।"

কাকাবাবু বললেন, "মনে হচ্ছে, এরা একটা অন্য দল। যে ভাষায় কথা বলল, খুব সম্ভবত সেটা তেলুগু। এরা বেশ ভদ্র বলতে হবে। দ্যাখ, হাত বাঁধেনি, ভাল খাবার দিয়েছে। দরজাটাও খোলা। খোলা মানে কী, এ ঘরের দেখছি দরজাই নেই।"

জোজো বলল, "জঙ্গলের ডাকাত!"

কাকাবাবু খানিকটা রুটি ছিঁড়ে নিয়ে খেতে-খেতে বললেন, "কাপালিকও হতে পারে। হয়তো আমাদের নরবলি দেবে। শুনেছি কোথাও-কোথাও এখনও নরবলি হয়। বলি দেওয়ার আগে আমাদের ভাল করে খাইয়ে নিচ্ছে।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? আমি কি অতই ছেলেমানুষ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, ভয় দেখাচ্ছি না। ওই লোকটি লাল রঙের আলখাল্লা পরে আছে কিনা, তাই কাপালিক বলে মনে হল।"

সন্তু তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়ে হাত ধুয়ে ফেলল। তারপর

দরজার খোলা জায়গাটার কাছে গিয়ে উঁকি মারল বাইরে।

ঘরটার দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেই। বাইরে কোনও পাহারাদারও নেই।

দূরে যেখানে মশালগুলো জ্বলছে, সেখানে এখনও বসে আছে অনেক লোক। মৃদু হল্লা শুনে মনে হয়, ওরা খাওয়াদাওয়া করছে।

জোজো সন্তুর পাশে এসে বাইরেটা দেখে নিয়ে বলল, "এখান থেকে পালানো তো সোজা।"

সন্তু বলল, "নিশ্চয়ই কাছাকাছি কেউ আড়াল থেকে আমাদের ওপর নজর রাখছে।"

জোজো বলল, "আমরা যদি চট করে জঙ্গলের মধ্যে সটকে পড়ি, তা হলে আমাদের আর ধরতে পারবে?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "একটা গন্ধ পাচ্ছিস?"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কীসের গন্ধ?"

সন্তু বলল, "ঘোড়া-ঘোড়া গন্ধ। আমি দু-একবার ফ-র-র ফ-র-র করে ঘোড়ার নিশ্বাস ফেলারও শব্দ শুনেছি। এদের ঘোড়া আছে। ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের অনায়াসে ধরে ফেলবে।"

জোজো বলল, "আমি ঘোড়ার চেয়েও জোরে ছুটতে পারি ইচ্ছে করলে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কাকাবাবু তো দৌড়োতে পারবেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "যদি ঘরের দরজা খোলা থাকে, আর কাছাকাছি কোনও পাহারাদার না থাকে, তা হলে সেখান থেকে কক্ষনও পালাবার চেষ্টা করতে নেই। এরা তো বোকা নয়। নিশ্চয়ই কোনও ফাঁদ পাতা আছে। পালাতে গেলে আরও বিপদ হবে।"

জোজো তবু ঘর ছেড়ে দু'-একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। চারদিকে তাকিয়েও কিছু দেখতে পেল না।

সন্তুকে সে বলল, "তবু তো খোলা হাওয়ায় খানিকটা নিশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে। এতক্ষণে বেশ স্বাধীন স্বাধীন মনে হচ্ছে।"

কাছাকাছি কীসের একটা খসখস শব্দ হতেই সে তড়াক করে এক লাফ দিয়ে ঢুকে এল ঘরের মধ্যে।

কাকাবাবু বললেন, "ওরা পাহারা না দিলেও আমাদের কিন্তু পালা করে রাত জেগে পাহারা দিতে হবে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "যদি রাত্তিরবেলা ওদের কেউ এসে কিছু করতে চায়? সেজন্য সাবধান থাকা দরকার। জন্তু-জানোয়ারও আসতে পারে। সাপ আসতে পারে। এই গরমের সময় খুব সাপ বেরোয়। তোমরা এখন ঘুমিয়ে নাও, আমি জাগছি। পরে এক সময় তোমাদের একজনকে ডেকে দেব।"

জোজো বলল, "না, না, শেষ রাত্তিরে জাগতে আমার খুব কষ্ট হয়। আমি প্রথমে জাগছি। আপনারা শুয়ে পড়ুন।"

সন্তু আর কাকাবাবু শুয়ে পড়লেন। জোজো বলল, "একখানা গল্পের বই থাকলে ভাল হত। এরা বোধ হয় বইটই পড়ে না!"

কাকাবাবু বললেন, "তুমিই মনে মনে গল্প বানাও না!"

আধঘণ্টা ঘুমিয়েই চোখ মেললেন কাকাবাবু। জোজো এর মধ্যেই বসে বসে ঘুমে ঢুলছে। কাকাবাবু উঠে এসে আস্তে আস্তে তাকে শুইয়ে দিলেন। তারপর নিজেই জেগে কাটিয়ে দিলেন সারারাত।

সকালবেলার খাবারও বেশ লোভনীয়। হাতে-গড়া রুটি, কলা, ডিম সেদ্ধ আর কফি।

হাত-মুখ ধুয়ে, সেসব খেয়ে তিনজনেই বাইরে এসে দাঁড়াল, কাছাকাছি কোনও পাহারাদার নেই।

এবার জায়গাটা ভাল করে দেখা গেল।

চারপাশে বড় বড় গাছের ঘন জঙ্গল, মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। যে-ঘরটায় কাকাবাবুরা রাত কাটালেন, সেরকম আরও কয়েকটা ঘর রয়েছে এদিকে-ওদিকে। দেখলেই বোঝা যায়, ঘরগুলো সব নতুন বানানো হয়েছে। বেশ কিছু বড় বড় গাছ কাটা হয়েছে, মাটিতে ছড়ানো রয়েছে গাছের গুঁড়ি। একটু দূরেও গাছ কাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কয়েকজন লোককেও দেখা গেল মাটিতে পড়ে থাকা গাছগুলোর ডাল-পাতা ছাঁটার কাজে ব্যস্ত, তারা কেউ কাকাবাবুদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না।

এক জায়গায় একটা উনুন জ্বলছে, সেখানে কিছু রান্না করছে দুটি মেয়ে। মনে হয় যেন, একদল যাযাবর অস্থায়ী আস্তানা গেড়েছে এই জঙ্গলে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আমরা এই জঙ্গলের মধ্যে একটু ঘুরে দেখে আসব?"

কাকাবাবু বললেন, "যা, না। আস্তে আস্তে হাঁটবি। কেউ বারণ করলে ফিরে আসবি। আমাদের এখানে কেন নিয়ে এল, তাও তো বোঝা যাচ্ছে না।"

সন্তু আর জোজো জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। কাকাবাবু ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে খানিকক্ষণ ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করলেন। মাটিতে শুয়ে পড়ে কোমর বেঁকিয়ে উঠতে গিয়ে দেখলেন পাশে একটা ছায়া পড়েছে। একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকটির সারা মুখে দাড়ি, মাথায় জটলা চুল। খালি গা, কিন্তু প্যান্ট পরা, কোমরের বেল্টে রিভলভার, সে কাকাবাবুকে তার সঙ্গে

যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করল।

কাকাবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে অনুসরণ করলেন তাকে।

জঙ্গলের আর-একদিকে কিছুটা ঢুকে দেখা গেল, দুটো বড় গাছের মধ্যে একটা দোলনা টাঙানো হয়েছে। সেই দোলনায় শুয়ে আছে লাল আলখাল্লা পরা সেই বিশাল চেহারার লোকটি, গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে তামাক টানছে। তার পাশেই একটা মোড়ায় বসে আছে একজন ছোট্টখাট্টো মানুষ, মাথা ভর্তি টাক।

অন্য লোকটি কাকাবাবুকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

কাকাবাবু লাল আলখাল্লা পরা লোকটির দিকে চেয়ে ইংরেজিতে বললেন, "নমস্কার। আপনার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ। আপনার নামটি এখনও জানা হয়নি। আমার নাম কালকেই বলেছি, রাজা রায়চৌধুরী।"

সেই লোকটি কাকাবাবুর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে তেলুগু ভাষায় বেঁটে লোকটিকে কিছু বলল।

বেঁটে লোকটি চোস্ত ইংরেজিতে বলল, "মিস্টার রায়চৌধুরী, আমাদের লিডার ইংরেজি জানেন না। আপনার যা বলবার আমাকে বলুন। আপনি কি এঁকে চেনেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না, এঁর সঙ্গে আমার আগে দেখা বা পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি।"

বেঁটে লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আপনি বিক্রম ওসমানের নাম শোনেননি?"

কাকাবাবু চমকে গিয়ে বললেন, "বিক্রম ওসমান? হ্যাঁ, এ নাম অবশ্যই শুনেছি। মানে, চন্দনদস্যু বিক্রম ওসমান?"

লোকটি বলল, "দস্যু বলছেন কেন? খবরের কাগজের লোকরা মিথ্যেমিথ্যি দস্যু বলে লেখে। আমরা ব্যবসায়ী। চন্দন কাঠের ব্যবসা করি।"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে এই যে গাছগুলো কাটা রয়েছে, এগুলো চন্দন গাছ? এটা চন্দনের বন?"

লোকটি বলল, "সব নয়। তবে এই বনে অনেক চন্দনগাছ আছে, তা ঠিক।"

বিক্রম ওসমান গম্ভীর গলায় বেঁটে লোকটিকে কিছু একটা আদেশ দিল।

সে বলল, "হ্যাঁ, এবারে কাজের কথা হোক। আমার নাম ভুড়ু। আমি পুরো নাম কাউকে জানাই না। আমি ওসমান সাহেবের সেক্রেটারির কাজ করি। শুনুন মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনার সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। আপনারা এখানে ভালভাবে থাকবেন, খাবেন, কাছাকাছি বেড়াতেও পারেন। আপনাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে নিছক ব্যবসায়িক কারণে। আপনাকে একটা চিঠি লিখতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "চিঠি? কার কাছে?"

এই সময় একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণী ছুটতে ছুটতে সেখানে এল। সে পরে আছে একটা রঙিন ঘাঘরা আর কাঁচুলি, মুখখানি বেশ সুন্দর।

সে উর্দু ভাষায় বলল, "আস্‌সালামু আলাইকুম সর্দার। আপ্পা রাওকে তুমি বারণ করো। সে আমার কোনও কথা শোনে না।"

ওসমান জিজ্ঞেস করল, "আপ্পা রাও আবার কী করেছে?"

মেয়েটি বলল, "এই বাবুটির সঙ্গে যে ছেলে দুটি এসেছে, আপ্পা রাও তাদের ধরে বেঁধে রেখেছে। আমি বললাম, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, তো সে আমাকে ধমকে বলল, তুমি বলার কে?"

কাকাবাবু উর্দু ভাষা বেশ ভালই জানেন, সব বুঝতে পারছেন, তিনি বললেন, "ছেলে দুটিকে বেঁধে রাখবে কেন? ওরা তো পালাবার চেষ্টা করেনি।"

ভুডু বলল, "আপনি কী করে বুঝলেন, ওরা পালাবার চেষ্টা করেনি?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে ছেড়ে ওরা কিছুতেই পালাবে না।"

ভুডু বলল, "এখানে অনেকটা জায়গা আমাদের লোক দিয়ে ঘেরা আছে। ওসমান সাহেবের হুকুম ছাড়া কেউ ঢুকতেও পারবে না, বেরুতেও পারবে না।"

ওসমান তরুণীটিকে বলল, "ঠিক আছে কুলসম, তুমি যাও। আমি আপ্পা রাওয়ের সঙ্গে পরে কথা বলব। আমরা এখন কাজে ব্যস্ত আছি।"

কুলসম মাথা নেড়ে বলল, "না, এখনই বলে দাও। ছোট ছেলেদের বেঁধে রাখা আমি একদম পছন্দ করি না। ওরা কি জানোয়ার নাকি?"

ওসমান বলল, "আচ্ছা, আপ্পা রাওকে আমার নাম করে বলো ওদের ছেড়ে দিতে। যেন চোখে-চোখে রাখে।"

কুলসম ঝুঁকে পড়ে ওসমানের হাতে একটা চুমু খেয়ে আবার ছুটে চলে গেল।

ভুডু বলল, "রায়চৌধুরী, তা হলে চিঠিটা লিখে ফেলুন! কাগজ-কলম দিচ্ছি।"

কাকাবাবু বললেন, "কীসের চিঠি, কাকে লিখব, সেটা আগে বলবে তো!"

ভুডু বলল, "আগেই বলেছি, এটা ব্যবসার ব্যাপার। মোহন সিং কুড়ি লাখ টাকার জামিনে আপনাকে পাঠিয়েছে। আমরা পঞ্চাশ লাখ পেয়ে গেলেই আপনাকে ছেড়ে দেব। আপনি চিঠি লিখে পঞ্চাশ লাখ টাকা আনিয়ে নিন।"

কাকাবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

ওদের দু'জনের ভুরু কুঁচকে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা মোহন সিং-কে কুড়ি লাখ টাকা আগেই দিয়ে দিয়েছ নাকি? এই রে, খুব ঠকে গেছ! তোমাদের নকল জিনিস গছিয়ে গেছে।"

ভুডু বলল, "নকল মানে? তুমি রাজা রায়চৌধুরী নও?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আসল রাজা রায়চৌধুরী ঠিকই। কিন্তু আমার জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকা কে দেবে?"

"কেন, তুমি ভারত সরকারের বড় অফিসার।"

"বড় অফিসার ছিলাম, এখন নই। পা ভাঙার জন্য আগেই রিটায়ার করে গেছি। জানোই তো, যতই বড় অফিসার হোক, রিটায়ার করার পর আর কেউ পাত্তা দেয় না। আমি মরি কি বাঁচি, তা নিয়ে গভর্নমেন্ট মাথা ঘামাতে যাবে কেন?"

"তা হলে তোমার বাড়ির লোককে লেখো।"

"বাড়ির লোক মানে, আমি আমার দাদার বাড়িতে থাকি। দাদা সাধারণ মধ্যবিত্ত। পঞ্চাশ লাখ তো দূরের কথা, পাঁচ লাখও দিতে পারবে না।"

"তবে যে শুনেছি, তুমি পশ্চিমবাংলায় খুব নামকরা লোক?"

"নাম আছে, দাম নেই। আমার জন্য কেউ অত টাকা দেবে না।"

কাকাবাবু এবার ওসমানের দিকে তাকিয়ে উর্দুতে বললেন, "বিক্রম ওসমান, আপনি খুব ঠকে গেছেন। মোহন সিং ধাপ্পা দিয়েছে। কোনও বড় কোম্পানির মালিক কিংবা কোনও মন্ত্রীর ছেলেকে ধরে আনলে টাকা আদায় করতে পারবেন।"

ওসমান ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, "কী? মোহন সিং আমাদের ধোঁকা দিয়েছে? তার কল্‌জেটা ছিঁড়ে নেব তা হলে!"

কাকাবাবু বললেন, "তাই করুন। মোহন সিংকে ধরে আনুন, আমাকে ধরে রেখে কোনও লাভ নেই।"

ভুড়ু বলল, "কিন্তু একটা মুশকিল হল, তোমাকে নিয়ে এখন কী করা যায়? তোমাকে তো এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "টাকা না পেয়েও যদি আমাদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে চাও, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। এই চন্দনের বনে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে আমার ভালই লাগবে!"

ভুড়ু বলল, "খাওয়ানোর প্রশ্ন নয়। তোমার মুণ্ডুটা যে কেটে ফেলতেই হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "ছি ছি, এ কী কথা! কারও সামনে তার মুণ্ডুটা কেটে ফেলার কথা কেউ বলে? সত্যজিৎ রায়ের একটা গান আছে, 'মুণ্ডু গেলে খাবটা কী, মুণ্ডু ছাড়া বাঁচব না কি, বাবারে...', তোমরা বোধ হয় গানটা শোনোনি?"

ভুড়ু বলল, "কেন তোমার মুণ্ডু কাটতে হবে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাজারে আমাদের একটা সুনাম আছে, আমরা কথায় যা বলি, কাজেও তা করি। কোনও একজনকে ধরে এনে তার জন্য টাকা চেয়ে চিঠি পাঠাই। টাকা না পেলে দশ দিনের মধ্যে মেরে ফেলা হবে, তা জানিয়ে দিই। সেই ভয়ে তারা টাকা দিয়ে দেয়। তোমাকে যে ধরে আনা হয়েছে, তা এ-লাইনের অনেকেই জেনে যাবে। তোমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দিলে সবাই ভাববে, আমরা নরম হয়ে গেছি। আর আমাদের ভয় পাবে না। সেইজন্যই তোমার মুণ্ডুটা কেটে জঙ্গলের বাইরে ফেলে রাখতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, " তোমরা শুধু চন্দনগাছ কাটো না, মানুষ গুম করাও তোমাদের ব্যবসা?"

ভুড়ু বলল, "এটা আমাদের সাইড ব্যবসা। আমরা নিজেরা মানুষ ধরে আনি না, অন্যরা ধরে এনে আমাদের কাছে কম দামে বিক্রি করে দেয়, আমরা বেশি টাকা আদায় করি, আমাদের খরচও তো কম নয়, গ্রামের লোকদের টাকা দিতে হয়, যাতে পুলিশ আসবার

আগেই তারা আমাদের খবর দিয়ে দেয়।"

কাকাবাবু বললেন, "টাকা পাওয়া যায়নি, এজন্য আগে কারও মুণ্ডু কেটেছ?"

ভুড়ু বলল, "হ্যাঁ। তিনজনের মুণ্ডু কাটা গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার জন্যও টাকা পাওয়ার কোনও আশাই নেই। সুতরাং আমারও মুণ্ডুটা কাটতেই হবে?"

ভুড়ু হাসতে হাসতে বলল, "উপায় কী বলো, ব্যবসার খাতিরে কাটতেই হচ্ছে। তুমি নিজে না লিখতে চাও, আমরাই সরকারের কাছে পঞ্চাশ লাখ টাকা চেয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। দশ দিনের মধ্যে টাকাটা না এলে—"

কাকাবাবু হঠাৎ বজ্রমুষ্টিতে ভুড়ুর ঘাড়টা চেপে ধরে বেঁকিয়ে দিলেন। যে যন্ত্রণায় আঁ আঁ করে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "তুমি হাসতে হাসতে মানুষের মুণ্ডু কাটার কথা বলছ। নিজের মুণ্ডুটা কাটা গেলে কেমন লাগে তা ভাবো না? এক্ষুনি আমি তোমার ঘাড় মটকে দিতে পারি।"

বিক্রম ওসমান রেগে ওঠার বদলে মহাবিস্ময়ে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হেসে উঠল বাতাস কাঁপিয়ে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে এমন হাসতে লাগল যে, মনে হল যেন দোলনা থেকে পড়েই যাবে।

কাকাবাবু ভুড়ুর গলাটা ছেড়ে দিয়ে দু'হাত ঝাড়লেন।

ভুড়ু কাকাবাবুর বদলে ওসমানের দিকে হতভম্বের মতন তাকিয়ে রইল।

হাসি থামিয়ে ওসমান বলল, "আরে ভুড়িয়া, তোর মুখখানা কী মজার দেখাচ্ছিল। হাসি সামলাতে পারিনি।"

তারপর কাকাবাবুকে বলল, "শাবাশ বাবুজি! আমার সামনে আমার কোনও শাগরেদের গায়ে কেউ হাত তোলে, এ আমি আগে

কখনও দেখিনি। তুমি এত সাহস দেখালে কী করে? আমি যদি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় গুলি করতাম?"

কাকাবাবু হালকাভাবে বললেন, "গুলি খেলেও আমি মরি না। আমি গুলি হজম করে ফেলতে পারি।"

ওসমান বলল, "পরখ করে দেখব নাকি? দেখি তো কেমন গুলি হজম করতে পারো।"

ওসমান কোমর থেকে রিভলভার বার করতেই কাকাবাবু একটা ক্রাচ তুলে বিদ্যুতের মতন বেগে সেই হাতটার ওপর মারলেন। রিভলভারটা ছিটকে দূরে পড়ে গেল।

ওসমান এবারও রাগ না করে ভুরু তুলে বলল, "হ্যাঁ বাবুজি, তোমার খুব এলেম আছে। কিন্তু এই করেও তো তুমি বাঁচতে পারবে না। তুমি খোঁড়া মানুষ, দৌড়বার ক্ষমতা নেই। আমি হাঁক দিলে দশজন লোক ছুটে আসবে, তোমাকে শেষ করে দেবে। তুমি এখান থেকে পালাতে পারবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি পালাতে চাইলে দৌড়বার দরকার হয় না। তোমরা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করলে আমার এখন পালাবার ইচ্ছেও নেই।"

মাটিতে পড়ে-থাকা রিভলভারটা তুলে নিয়ে সেটা দোলাতে দোলাতে কাকাবাবু বললেন, "এটা যদি আমি এখন তোমার বুকের ওপর চেপে ধরি, তা হলে তোমার দশজন লোক ছুটে এসেও কি আমার গায়ে হাত দিতে সাহস করবে?"

ওসমান বলল, "হাঁ। তাতেও তোমার কোনও লাভ হবে না। আমি জানের পরোয়া করি না। আমার পরে কে সর্দার হবে, তা ঠিক করাই আছে। আমার হুকুম দেওয়া আছে, আমাকে যদি কেউ কখনও ধরেও ফেলে, তা হলেও ওরা গুলি চালাবে। আমাকে বাঁচাবার জন্য দলের ক্ষতি করা যাবে না।"

কাকাবাবু রিভলভারটা লক করে ওসমানের কোলের ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, "এই নাও, আমি শুধু শুধু কাউকে ভয় দেখাই না। তবে, আমার হাতে রিভলভার থাকলে দশজন লোকও আমাকে আটকাতে পারবে না। আমি দৌড়তে পারি না, কিন্তু ঘোড়া চালাতে জানি।"

রিভলভারটা হাতে নিয়ে ওসমান কাকাবাবুর দিকে একটুক্ষণ বিস্মিত ভাবে চেয়ে রইল। তারপর বলল, "তুমি একটা অদ্ভুত মানুষ বটে। পিস্তলটা পেয়েও ফেরত দিলে? এরকম আগে দেখিনি। কিন্তু বাবুজি, ভুড়ু কিছু ভুল বলেনি। আমরা এমনি এমনি কাউকে ছেড়ে দিই না। তুমি সরকারকে চিঠি লিখে দেখোই না, টাকাটা দিয়ে দিতেও পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "না। আমি নিজের জন্য কারও কাছেই টাকা চাইব না।"

ওসমান বলল, "ঠিক আছে, আমরাই চিঠি পাঠাচ্ছি। দশ দিনের মধ্যে টাকা না পেলে তখন একটা কিছু ব্যবস্থা নিতেই হবে। এই দশ দিন তোমার ছুটি। খাও দাও, মজা করো। তুমি দাবা খেলতে জানো?"

কাকাবাবু বললেন, "তা বেশ ভালই জানি।"

ওসমান বলল, "ঠিক আছে, পরে তোমার সঙ্গে দাবা খেলব।"

ভুড়ু এতক্ষণ গলায় হাত বুলোতে বুলোতে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। এবারে সে বলল, "ওসমানজি, এই রায়চৌধুরীকে বাঁচিয়ে রাখার একটাই উপায় আছে। ও আমাদের দলে যোগ দিক। লোকটার বুদ্ধিও আছে, গায়ের জোরও আছে। দলের অনেক কাজে লাগবে। কী রায়চৌধুরী, তুমি থাকবে এই দলে?"

কাকাবাবু বললেন, "ভুড়ু, তুমি আমাকে পুরোপুরি চিনতে পারোনি। এখনও অনেক বাকি আছে।"

চালাঘরটায় ফিরে এসে কাকাবাবু দেখলেন, সন্তু আর জোজো বসে বসে একবাটি করে ক্ষীর খাচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, "এ আবার কোথায় পেলি?"

জোজো বলল, "কুলসম দিয়ে গেল। খুব ভাল মেয়ে। আপনার জন্যও নিয়ে আসবে।"

কাকাবাবু বললেন, "কুলসমকে আমিও দেখেছি। দেখলেই মনে হয়, মেয়েটির বেশ দয়ামায়া আছে। হ্যাঁ রে সন্তু, তোদের নাকি বেঁধে রেখেছিল? হঠাৎ শুধু শুধু বাঁধতে গেল কেন?"

জোজো বলল, "শুধু শুধু? সন্তু যা কাণ্ড করেছিল!"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে চেয়ে রইলেন। সন্তু লাজুকভাবে বলল, "সেরকম কিছু করিনি। আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি, এই সময় কে যেন আমাদের চেঁচিয়ে কী বলল। লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি না, ভাষাও বুঝতে পারছি না। আর একটু এগোতেই একটা লোক একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল, তারপর আমার গালে একটা চড় মারল। অমনই আমার রাগ হয়ে গেল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ওকে তুলে একটা আছাড় দিলাম!"

জোজো বলল, "অতবড় চেহারার লোকটাকে যে সন্তু তুলে ফেলে আছাড় দেবে, তা ও কল্পনাই করেনি। একেবারে কুংফু স্টাইল। তারপর আরও চার-পাঁচজন লোক এসে ঘিরে ফেলে আমাদের হাত-পা বেঁধে ফেলল।"

কাকাবাবু বললেন, "বাকিটা আমি জানি। তোদের বেশিক্ষণ বাঁধা

থাকতে হয়নি। কুলসম নামের ওই মেয়েটি এসে ছাড়িয়ে দিল।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু আপনাকে আমি বলেছিলাম না, এরা জঙ্গলের ডাকাত? ঠিক তাই। এরা ডাকাতি করে আর চন্দনগাছ সব কেটে কেটে সাবাড় করে দিচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু তাই-ই নয়। এরা এক ধরনের মানুষ কেনাবেচার ব্যবসা করে। মোহন সিং আমাদের কুড়ি লাখ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে গেছে। এরা এখন তার বদলে পঞ্চাশ লাখ টাকা আদায় করতে চায়।"

সন্তু বলল, "পঞ্চাশ লাখ টাকা? কে দেবে?"

কাকাবাবু বললেন, "কেউ দেবে না!"

জোজো বলল, "বাবাকে চিঠি লিখব? বাবা নেপালের রাজাকে বলে দিলে তিনি এককথায় দিয়ে দেবেন!"

কাকাবাবু বললেন, "খবর্দার, ওরকম কথা উচ্চারণও কোরো না। নেপালের রাজার নাম শুনলেই এরা পঞ্চাশ লাখের বদলে পঞ্চাশ কোটি টাকা চাইবে!"

সন্তু বলল, "জোজো, তোদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথের চেনা নেই?"

জোজো বলল, "তিনবার দেখা হয়েছে। বাকিংহাম প্যালেসে ডিনার খেয়েছি। কাকাবাবু, এক কাজ করলে হয় না? নেপালের রাজা কিংবা ইংল্যান্ডের রানির কাছে টাকা চেয়ে চিঠি লেখা যাক। ওঁরা টাকা পাঠান বা না পাঠান, মাঝখানে কয়েকদিন সময় তো পাওয়া যাবে। সেই সুযোগে আমরা এখান থেকে পালাব!"

কাকাবাবু বললেন, "এটা গভীর জঙ্গল। এখান থেকে পালানো খুব সহজ হবে না।"

একজন লোক কাকাবাবুর জন্য একবাটি ক্ষীর নিয়ে এল। এক চামচ মুখে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, চমৎকার খেতে।

অনেকদিন ক্ষীর খাইনি, খাওয়ার কথা মনেও পড়ে না। এরা যদি এত ভাল ভাল খাবার দেয়, তা হলে এখান থেকে পালাবার দরকারটাই বা কী? দিব্যি আছি।"

দুপুরবেলাও এল রুটি, মাংস আর দই।

বিকেলবেলা কফির সঙ্গে তিনরকম বিস্কুট।

সন্ধেবেলা অন্ধকারে ওরা তিনজন বাইরে বসে আছে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর। একটা হ্যারিকেন নিয়ে এল কুলসম। ঘাঘরার বদলে সে এখন একটা কালো শাড়ি পরেছে।

কাকাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "বাবুজি, তুমি উর্দু বোঝো?"

কাকাবাবু ঘাড় নাড়তে সে বলল, "কাল খুব ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে তোমরা তৈরি থাকবে। আমি দুটো ঘোড়া জোগাড় করে আনব, তাইতে তোমরা পালাবে। সূর্য দেখেই তোমরা চিনতে পারবে পুব দিক। সোজা পুব দিকে ঘোড়া ছোটালে তোমরা পৌঁছে যাবে জঙ্গলের বাইরে।"

কাকাবাবু খানিকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমাদের পালাবার ব্যবস্থা করে দেবে? কেন?"

কুলসম বলল, "তুমি জানো না, এরা সাঙ্ঘাতিক লোক। যখন-তখন মানুষ খুন করতে পারে। আমি শুনেছি, টাকা না পেলে এরা তোমায় খতম করে দেবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমায় যদি খতম করে দেয়, তাতে তোমার আপত্তি হবে কেন? তুমিও তো এই দলেরই।"

কুলসম কাতরভাবে বলল, "না, বাবুজি, আমার খুব কষ্ট হয়। আমার তো আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। সর্দার আমাকে কোথাও যেতে দেবে না। তাই আমাকে এখানে থাকতেই হবে। তোমরা পালাও।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আমাদের পালাতে সাহায্য করছ, এটা জানতে পারলে এরা তোমায় শাস্তি দেবে না?"

কুলসম বলল, "জানতে পারবে না। জানলেও সর্দার বড়জোর বকুনি দেবে, কিন্তু আমায় প্রাণে মারবে না। আমি সর্দারের তৃতীয় পক্ষের বউ।"

কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, সন্তু, পালাবি নাকি?"

সন্তু বলল, "আমি জোজোকে আমার ঘোড়ায় তুলে নিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, কাকভোরে তোরা তৈরি হয়ে থাকিস। আমি যাচ্ছি না। আমার এখানে এখনও কিছু কাজ আছে।"

জোজো বলল, "কাজ আছে? এখানে আপনার কী কাজ?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "আছে আছে, পরে জানতে পারবে। তোমরা কালিকটের হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম নাও।"

সন্তু বলল, "তা হলে আমরাও এখান থেকে যাচ্ছি না।"

কাকাবাবু কুলসমকে বললেন, "কালকেই দরকার নেই, বুঝলে। দু-তিনদিন পরে আমরা তোমাকে জানাব।"

কুলসম খানিকটা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

এর পর কেটে গেল দু'দিন। কিছুই তেমন ঘটল না। দিব্যি তিনবেলা খাওয়া আর ঘুমনো। মাঝে মাঝে কাকাবাবু সন্তু আর জোজোকে নিয়ে বেড়াতে যান জঙ্গলে। কেউ কিছু বলে না। কোনও লোকও দেখা যায় না। জঙ্গলের মধ্যে একটা ছোট্ট নদী আছে, জল খুব কম, পায়ে হেঁটেই পার হওয়া যায়। সকালবেলা সন্তু সেই নদীতে নামতেই কোথা থেকে একটা লোক এসে হাজির হল। তার হাতে একটা বর্শা।

সে কাকাবাবুকে বলল, "ওই ছেলেটি জলে নেমেছে নামুক।

স্নানও করতে পারে। কিন্তু নদীর ওপারে যেন না যায়। আপনি দেখছেন। আপনি দায়ী রইলেন।"

লোকটির ব্যবহার রুক্ষ নয়। নরমভাবে এই কথা বলে আবার একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিক্রম ওসমানকে এই দু'দিন দেখতে পাওয়া যায়নি। লোকজনও কিছু কম। শুধু জঙ্গলের চন্দন গাছ কাটা চলছেই। রাত্তিরবেলা কারা যেন গাছগুলো নিয়েও চলে যাচ্ছে।

তৃতীয় দিন দুপুরবেলা একজন লোক এসে কাকাবাবুকে ডেকে নিয়ে গেল।

আজ আর দোলনা নয়। দুটো কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর তক্তা পেতে টেবিল বানানো হয়েছে, তার ওপর দাবার ছক পাতা। বিক্রম ওসমান সেই লাল আলখাল্লাটার বদলে এখন পরে আছে জিন্‌স আর টি শার্ট। কোমরে রিভলভার।

সে বলল, "এসো বাঙালিবাবু, দেখা যাক তুমি কেমন দাবা খেলতে জানো।"

কাকাবাবু বসে পড়লেন একদিকে। প্রথম চাল দিয়ে বললেন, "তোমাদের এই জায়গাটা ভারী সুন্দর। শুধু গাছ কাটার শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। এত যে গাছ কাটা হচ্ছে, এগুলো কেনে কারা?"

ওসমান বলল, "শহরের ব্যবসায়ীরা কেনে।"

কাকাবাবু বললেন, "এইসব গাছ কাটা বেআইনি জেনেও তারা কেনে?"

ওসমান ফুঁসে উঠে বলল, "কীসের বেআইনি? সরকারের জঙ্গল নিয়ে আইন বানাবার কী এক্তিয়ার আছে? সৃষ্টিকর্তা যেমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেইরকম গাছপালাও সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার প্রয়োজনে গাছ কাটবে। ব্যস!"

কাকাবাবু বললেন, "সৃষ্টিকর্তা এত গাছপালার সৃষ্টি করেছেন তো মানুষেরই প্রয়োজনে। গাছ কেটে ফেললে তো মানুষেরই ক্ষতি হবে।"

ওসমান বলল, "তার মানে? মানুষের কী ক্ষতি হবে?"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবী থেকে সব গাছপালা যদি শেষ হয়ে যায়, তা হলে মানুষও আর বাঁচবে না।"

"কেন?"

"আমরা এই যে শ্বাস নিচ্ছি, তাতে অক্সিজেন থাকে। সেই জন্যই আমরা বেঁচে থাকি। গাছপালাই অক্সিজেন তৈরি করে দেয়। গাছপালা শেষ হয়ে গেলে অক্সিজেনও ফুরিয়ে যাবে, মানুষরা সব দমবন্ধ হয়ে মরবে।"

"ওসব তোমাদের বই পড়া কথা, আমি বিশ্বাস করি না।"

"আমাদের দেশে এমনিতেই অনেক গাছ কমে গেছে। তুমি তার ওপর এইসব বড় বড় গাছ কেটে সারা দেশের ক্ষতি করছ!"

"বাজে কথা রাখো। চাল দাও, তোমার রাজাকে সামলাও!"

সেই দানটায় ওসমান বাজিমাৎ করে দিল, কাকাবাবু হারলেন।

আবার ঘুটি সাজানো হল।

ওসমান বলল, "তিন দান খেলা হবে, তুমি প্রত্যেকবার হারবে। আমার সঙ্গে দাবা খেলায় কেউ পারে না।"

কাকাবাবু একটু খেলার পর জিজ্ঞেস করলেন, "ওসমান সাহেব, তুমি মোহন সিংকে কতদিন চেনো?"

ওসমান বলল, "অনেকদিন। দশ বছর হবে। আমার সঙ্গে অনেকবার কারবার করেছে।"

"লোক ধরে এনে তোমার কাছে বিক্রি করে দেয়?"

"আমরা নিজেরা কাউকে ধরি না। মোহন সিংয়ের মতন আরও লোক আছে। তারাই ধরে আনে।"

"মোহন সিং আগে যাদের বিক্রি করে গেছে, তোমরা তাদের জন্য বেশি টাকা পেয়েছ?"

"প্রত্যেকবার। ও যে-দামে বিক্রি করে, আমরা তার অন্তত তিনগুণ টাকা আদায় করি।"

"আমাদের জন্য মোহন সিংকে কুড়ি লাখ টাকা দিয়ে দিয়েছ?"

"দশ লাখ দিয়েছি, আর দশ লাখ পরে পাবে। আমরা কথার খেলাপ করি না।"

"তার মানে ওই দশ লাখ টাকাই তোমাদের লোকসান। আমাদের জন্য তোমরা তো এক পয়সাও পাবে না। মোহন সিং জেনেশুনেই তোমাদের ঠকিয়ে গেছে।"

"জেনেশুনে? তা হতে পারে না। আমাদের এই কারবারে কেউ বেইমানি করে না।"

"শোনো ওসমান সর্দার। তোমাকে একটা কথা বলি। একেবারে খাঁটি সত্যি কথা। মোহন সিংয়ের খুব রাগ আছে আমার ওপরে। ও আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। তার বদলে তোমাকে দিয়ে খুন করাবে বলে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। দশ লাখ টাকাও পেয়ে গেল, ওর হাতে রক্তও লাগল না। আমি খুন হলে পুলিশ এলে তোমাকেই এসে ধরবে, মোহন সিং-কে কেউ সন্দেহও করবে না।"

"কোনও পুলিশের সাধ্য নেই আমাকে ছোঁয়।"

"সে-কথা হচ্ছে না। দোষটা তোমার ঘাড়েই চেপে থাকবে। মোহন সিং তোমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙল। তুমি তাকে কিছুই করতে পারবে না।"

"মোহন সিংকে আমি ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারি, তুমি যা বলছ তা সত্যি কি না।"

"তুমি ডাকলেই মোহন সিং আসবে? সে আর ধরাছোঁয়া দেবে না। তোমাকে দশ লাখ টাকা ঠকিয়ে গেল, এটা তো সত্যি? আমার

মুন্ডু কাটো আর যাই-ই করো, টাকাটা তো ফেরত পাচ্ছ না!"

"টাকা ফেরত দেবে না মানে? আলবাত ফেরত দেবে!"

"সে একবার মুম্বই চলে গেলে তারপর তুমি আর তাকে ছুঁতেও পারবে না।"

"আমি ইচ্ছে করলে তাকে মুম্বই থেকেও এখানে টেনে আনতে পারি।"

"এটা আমি বিশ্বাস করি না, ওসমানসাহেব। তুমি জঙ্গলের রাজা হতে পারো। কিন্তু মুম্বইয়ের মতন বড় শহরে তোমার জারিজুরি খাটবে না। মোহন সিংয়ের অনেক দলবল আছে।"

"তুমি কি ভাবছ, আমি জঙ্গলে থাকি বলে শহরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই? অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী, পুলিশ অফিসার, মন্ত্রী পর্যন্ত আমায় খাতির করে। আমি ইচ্ছে করলেই মোহন সিংকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে আনতে পারি।"

"কিন্তু আমি যা দেখেছি, তোমার চেয়ে মোহন সিংয়ের ক্ষমতা অনেক বেশি!"

"বাঙালিবাবু, আমি তোমার চোখের সামনে এই জঙ্গলে মোহন সিংকে এনে হাজির করালে তুমি বিশ্বাস করবে, কার ক্ষমতা বেশি? খালি কথাই তো বলে যাচ্ছ, মন দিয়ে খেলো!"

"খেলছি, খেলছি! তবে, মুখে তুমি যতই বড়াই করো, মোহন সিংকে এখানে ধরে আনা তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি!"

ওসমান এবার রেগে গিয়ে বলল, "ফের ওই এক কথা? তুমি খেলবে কি না বলো?"

এর পর কাকাবাবু কিছুক্ষণ মন দিয়ে খেললেন, আবার হেরে গেলেন। তিনি বললেন, "তুমি তো সত্যি বেশ ভাল খেলতে পারো দেখছি?"

ওসমানের মুখে জয়ের হাসি ফুটে উঠল। গর্বের সঙ্গে বলল, "দাবা খেলায় কেউ আমার সঙ্গে পারে না। আরও খেলার সাহস আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "আর এক দান খেলে দেখি, তোমায় হারাতে পারি কি না।"

কিন্তু সে খেলাটা আর হল না। দু'-এক দান দিতে-না-দিতেই একজন লোক ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকে চলে এল। এক লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ওসমানের কাছে এসে কানে কানে কিছু বলতে লাগল উত্তেজিতভাবে।

ওসমানও চঞ্চল হয়ে দাবার ছক গুটিয়ে ফেলে বলল, "চলো বাঙালিবাবু, এ-জায়গা ছেড়ে এক্ষুণি চলে যেতে হবে। একটা বড় পুলিশবাহিনী আসছে, তুমি ঘোড়া চালাতে জানো বলেছিলে। ঘোড়ায় চেপে যেতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার সঙ্গের ছেলেদুটো?"

ওসমান বলল, "ওদের ব্যবস্থা হবে। চিন্তা কোরো না।"

সবাই ছোটাছুটি করে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগল। ভেঙে ফেলা হল কুঁড়েঘরগুলো।

কাকাবাবু চাপলেন একটা ঘোড়ায়। যতজন লোক তত ঘোড়া নেই, তাই এক ঘোড়ায় দু'জন করে যেতে হবে। কাকাবাবুর ঘোড়ায় উঠে পড়ল ভুডু।

বনের মধ্যে ছুটল ঘোড়া। কাকাবাবুর পাশে পাশে আরও তিনটি ঘোড়া, তারাই রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পার হতে হচ্ছে ছোট ছোট নদী, তারপর পাহাড়ি রাস্তায় এসে ঘোড়ার গতি কমে এল।

ভুডু নিজে ঘোড়া চালাতে জানে না। সে সামনে খানিকটা সিঁটিয়ে বসে আছে।

কাকাবাবু এক সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম ভুডু কেন?"

ভুডু বলল, "ওটা মোটেই আমার নাম নয়। আমার আসল নাম কাউকে বলি না।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার ইংরেজি শুনলে মনে হয়, তুমি বেশ লেখাপড়া জানো। তুমি এই ডাকাতের দলে ভিড়লে কেন?"

ভুডু বলল, "ডাকাত কী বলছেন মশাই। বড় বড় ব্যবসাদারদের মতন এরাও ব্যবসা করে। আমি এদের কাছে চাকরি করি।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো, এইসব চন্দনগাছ কাটা বেআইনি। এরা মানুষ কেনা-বেচা করে। মানুষ খুনও করে।"

ভুডু বলল, "সেসব আমি কী জানি! আমি নিজের হাতে গাছও কাটি না, মানুষও খুন করি না। আমার কোনও দায় নেই।"

"বাঃ, বেশ কথা। কিন্তু যখন এরা পুলিশের হাতে ধরা পড়বে, তখন এদের দলের লোক হিসেবে তুমিও শাস্তি পাবে।"

"এরা কখনও ধরা পড়বে না। কিছু পুলিশকে টাকা খাওয়ানো আছে। তারাই আগে থেকে খবর দিয়ে দেয়।"

"তা হলে এখন পালাতে হচ্ছে কেন?"

"মাঝে মাঝে এরকম চোর-পুলিশ খেলা হয়। খবরের কাগজে লেখা হবে যে, পুলিশ কত চেষ্টা করছে ওসমানের দলকে ধরবার!"

"তবু এরকম দল বেশিদিন টিকতে পারে না। তুমি রবিন হুডের নাম শুনেছ?"

"শুনব না কেন? সিনেমাও দেখেছি।"

"রবিন হুডকেও দল ভেঙে দিতে হয়েছিল। তুমি শিক্ষিত লোক হয়ে এই খুনিদের সঙ্গে ভিড়ে আছ, তোমার লজ্জা করে না?"

"রায়চৌধুরীবাবু, তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ? তুমি নিজের প্রাণটা আগে বাঁচাও। এখান থেকে তোমার পালাবার কোনও উপায় নেই।

এরা হাসতে হাসতে মানুষ খুন করে। তুমি ভাবছ, ওসমান তোমার সঙ্গে দাবা খেলছে বলে তোমাকে দয়া করছে? মোটেই না। ঠিক দশদিন পর, লোককে দেখাবার জন্য সে এক কোপে তোমার মুন্ডুটা কেটে ফেলবে। তিনদিন কেটে গেছে, মনে রেখো।"

"তুমি এর আগে কারও গলা ওইভাবে কাটতে দেখেছ?"

"হ্যাঁ। দু'বার। ওসমানের যা হাতের জোর, এক কোপের বেশি দু' কোপ লাগে না।"

"আমার কী ইচ্ছে হচ্ছে জানো? এক ধাক্কা দিয়ে তোমাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিই, তারপর তোমার বুকের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিই।"

"তাতে কোনও লাভ নেই। অন্য ঘোড়সওয়াররা চাবুক মেরে মেরে তোমাকে তক্ষুনি শেষ করে দেবে।"

একটা পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় সব ঘোড়া থামল।

এ-পাহাড়ে গাছ বেশি নেই। তবে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে লুকোবার অনেক জায়গা। ওদের দলের সবাই এখনও এসে পৌঁছয়নি। ওসমানকে দেখা যাচ্ছে না। কাকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে সন্তু আর জোজোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

খানিক পরে ওসমান এল কুলসমকে নিয়ে। সন্তু আর জোজোকে দেখা গেল না। আরও অনেকে আসেনি মনে হল।

তিনি ভুডুকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাকি লোকরা কোথায় গেল?"

ভুডু বলল, "সবাই একসঙ্গে আসে না। নানাদিকে ছড়িয়ে যায়। একটা দল পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য অন্যদিকে নিয়ে যায়। একজন নতুন লোক পুলিশের বড়কর্তা হয়েছে, তাকে এখনও ঘুষ খাওয়ানো যায়নি। কয়েকদিন পরেই ঠান্ডা হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু ওসমানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার

সঙ্গের ছেলে দুটি কোথায় গেল?"

ওসমান তার সহচরদের কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল, সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিল, "ওদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মানে? কোথায়?"

ওসমান বলল, "ওরা কালিকট পৌঁছে যাবে। কোনও চিন্তা নেই।"

কাকাবাবু রেগে গিয়ে বললেন, "তার মানে? আমাকে কিছু না জানিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিলে কেন?"

ওসমান এবার চোখ গরম করে বলল, "আমি কী করব না করব, তার জন্য তোমার অনুমতি নিতে হবে নাকি? ছোট ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ঘোরায় অনেক ঝামেলা।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা মোটেই ছোট নয়।"

ওসমান বলল, "মোহন সিং তোমাকে বিক্রি করে গেছে। ওই ছেলেদুটি ফালতু। ওদের আমি রাখতে যাব কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা যদি আবার মোহন সিংয়ের খপ্পরে গিয়ে পড়ে? আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য মোহন সিং ওদের ওপর অত্যাচার করবে। ওসমান সাহেব, তুমি এটা কী করলে? মোহন সিংকে ধরার ক্ষমতা তোমার নেই, তুমি আমার ছেলেদুটোকে ওর দিকে ঠেলে দিলে?"

রাগে চোখ-মুখ লাল করে ওসমান বলল, "বাঙালিবাবু, তুমি আমাকে ওই কথা বারবার বলবে না। আমি যা করেছি, বেশ করেছি!"

কুলসম কাকাবাবুর কাছে এসে ব্যাকুলভাবে বলল, "বাবুজি, আপনার ওই ছেলেদুটোর কোনও ক্ষতি হবে না। ওরা ভালভাবে পৌঁছে যাবে, আপনি বিশ্বাস করুন। আপনাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা আমি সর্দারকে বলতে পারি না। সেটা ওদের ব্যবসার ব্যাপার। কিন্তু

ওরা তো কোনও দোষ করেনি। এখানে থাকলে ওদের অনেক অসুবিধে হত। আমি কসম খেয়ে বলছি, ওদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হবে।

কাকাবাবু একদৃষ্টিতে কুলসমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।
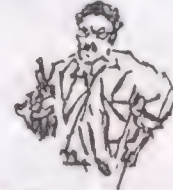
জোজো আর সন্তু বসে ছিল জঙ্গলের মধ্যে ছোট নদীটার ধারে। ছোট ছোট মাছ আছে নদীতে, মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে।

জোজো জলে হাত ডুবিয়ে সেই মাছ ধরার চেষ্টা করছে, একটাও ধরা যাচ্ছে না।

এক সময় সে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে সন্তু, এখনও কি কেউ ঝোপের আড়ালে বসে আমাদের ওপর নজর রাখছে?"

সন্তু বলল, "হতেও পারে। এদের ব্যবস্থাটা বেশ ভাল। আমাদের এরা আটকে রেখেছে বটে, কিন্তু মোটেই বন্দি-বন্দি লাগে না। বেশ খোলামেলা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো যায়।

জোজো বলল, "তা হলেও এইভাবে কতদিন থাকব? যতই ভাল খেতে দিক। কাকাবাবু এখান থেকে পালাবার কোনও উপায় বার করছেন না কেন রে?"

সন্তু বলল, "বোধ হয় এখনও সময় হয়নি।"

পেছনে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ হতেই ওরা ফিরে তাকাল।

ঘোড়ায় চেপে তিনজন লোক আসছে। এরা এই দলেরই লোক, মুখ চেনা।

একজন কী একটা ভাষায় কিছু বলল, ওরা বুঝল না। অন্য

একজন ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, "আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। ঘোড়ায় উঠুন।"

সন্তুও ভাঙা হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "চলে যেতে হবে মানে, কোথায় যাব?"

সে বলল, "এখানকার ডেরা তুলে দিতে হচ্ছে। পুলিশ আসছে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু?"

লোকটি বলল, "তিনিও যাবেন। সবাই চলে যাবে। এখানে কিছু থাকবে না।"

ওদের দু'জনের কাঁধে রাইফেল, একজনের কোমরে রিভলভার। কথা বলার ভঙ্গিটা রুক্ষ নয়।

সন্তু বলল, "ঠিক আছে। আমি আর আমার বন্ধু এক ঘোড়ায় যেতে পারি।"

সেই লোকটি বলল, "আর ঘোড়া নেই। আপনারা দু'জন দুটো ঘোড়ায় উঠুন।"

সন্তু আর জোজো ঘোড়ায় চড়ে বসার পর সেই লোকটি বলল, "আমাদের ওপর হুকুম আছে, আপনাদের চোখ বেঁধে নিতে হবে।"

জোজো বলল, "কেন, চোখ বাঁধতে হবে কেন?"

লোকটি বলল, "সেইরকমই হুকুম।"

তর্ক করে লাভ নেই। কালো কাপড় দিয়ে ওদের দু'জনের চোখ বেঁধে দেওয়া হল।

ঘোড়াগুলো চলতে শুরু করার পর জোজো জিজ্ঞেস করল, "কী রে সন্তু, কিছু দেখতে পাচ্ছিস?"

সন্তু বলল, "না, সব অন্ধকার।"

জোজো বলল, "এরা ডাকাত বলে মনেই হয় না। কোনও ডাকাত আপনি-আপনি বলে কথা বলে? সেইজন্যই তো চোখ বাঁধতে রাজি হয়ে গেলাম।"

সন্তু বলল, "তুই, তুই বললে কী করতি?"

জোজো বলল, "আমিও তুই বলতাম। একবার কী হয়েছিল জানিস, বাবার সঙ্গে আমাজন নদীর জঙ্গলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন ডাকাত ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে তুলে নিয়ে গেল। এইরকম ভাবে চোখ বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে পালাচ্ছিল। যে ডাকাতটা আমায় ঘোড়ায় তুলেছিল, সে প্রথম থেকেই আমাকে তুই-তুই করছিল। আমিও তাকে তুই বলতে লাগলাম। তাতে সে খুব রেগে গেল। আমি তাকে আরও রাগিয়ে দিচ্ছিলাম।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী ভাষায় কথা হচ্ছিল?"

জোজো বলল, "স্প্যানিশ ভাষায়। তুই যেমন একটু-একটু হিন্দি জানিস, আমিও তেমনই একটু-একটু স্প্যানিশ জানতাম। মানে, ওখানে গিয়ে শিখে নিয়েছিলাম আর কী! এখন ভুলে গেছি। তারপর শোন না, ডাকাতটা তো রেগে দাঁত কিড়মিড় করছিল। তখন আমি ঘোড়াটাকে একটা রাম চিমটি কাটলাম। ঘোড়াটা অমনই লাফিয়ে উঠল। ঘোড়াটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠতেই ডাকাতটা তাল সামলাতে না পেরে নীচে পড়ে গেল। আমি তখন ঘোড়াটাকে চালিয়ে ভোঁ ভাঁ!"

"তুই এখন ঘোড়াকে চিমটি কাটবি নাকি?"

"এদের কাছে যে রাইফেল আছে। গুলি করবে। হ্যাঁ রে সন্তু, এরা বাংলা বোঝে না তো?"

"মনে হয়, না।"

"তুই এদের কাছ থেকে একটা রাইফেল কেড়ে নিতে পারবি না?"

"চোখ বাঁধা অবস্থায় রাইফেল কাড়ব কী করে?"

"তাও তো বটে। এর আগে তো কক্ষনও চোখ বাঁধেনি। পুলিশের ভয়ে এরা পালাচ্ছে। আমরা যদি তখন চেঁচিয়ে পুলিশ ডাকতাম—"

"জোজো, পুলিশ কথাটা ওরা বুঝতে পারবে। সব কথা বাংলায় বল।"

"পু...... মানে, ওই কথাটার বাংলা কী?"

"সরকারি প্রহরী বলতে পারিস।"

"হ্যাঁ, ইয়ে, মানে, আমাদের উচিত ছিল সরকারি প্রহরীদের সাহায্য নেওয়া।"

"কাকাবাবু অন্য জায়গায় ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হল না, আমরা নিজেরা ঠিক করব কী করে?"

পাশাপাশি দুটো ঘোড়া চলছে। বোঝাই যায় যে জঙ্গলের পথ, তাই জোরে ছুটতে পারছে না। জোজো আর সন্তু দিব্যি গল্প করতে করতে যেতে লাগল। যারা ওদের নিয়ে যাচ্ছে, তারা বাধাও দিল না, নিজেরাও কিছু বলছে না।

যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, কতটা সময় যে কেটে গেল তা বোঝা যায় না। দু'-আড়াই ঘণ্টা তো হবেই। ঝোপঝাড় ভেদ করে যেতে হচ্ছে, ওদের গায়ে লাগছে গাছের ডালপালা।

একটা সময় থামল ঘোড়া। সন্তু জোজোকে নামিয়ে দেওয়া হল। ওরা কিছু বোঝবার আগেই বেঁধে দেওয়া হল ওদের হাত।

জোজো জিজ্ঞেস করল, "এ কী, হাত বাঁধলেন কেন! আমরা তো চোখের বাঁধন খোলার চেষ্টা করিনি!"

কেউ উত্তর দিল না। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে বোঝা গেল, ওদের দু'জনকে রেখে ঘোড়াগুলো দূরে সরে যাচ্ছে।

তারপর আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

জোজো বলল, "এ কী ব্যাপার হল রে সন্তু?"

সন্তু বলল, "আমাদের নামিয়ে নিয়ে চলে গেল। কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না।"

জোজো বলল, "এ জায়গাটাই বা কীরকম?"

চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা, জোজো একটু এদিক-ওদিক যাওয়ার চেষ্টা করতেই গুঁতো খেল একটা গাছে। সে উঃ করে উঠল।

সন্তু হাত দুটো মুখের কাছে এনে বাঁধন খোলার চেষ্টা করল। খুব শক্ত বাঁধন। নাইলনের দড়িতে দাঁতও বসানো যাচ্ছে না।

সন্তু বলল, "জোজো, আগে চোখের বাঁধনটা খোলা দরকার। কাপড়ের গিঁট খোলা শক্ত হবে না। তুই আমার পেছনে এসে দাঁড়া। আমার বাঁধনটা খোলার চেষ্টা কর।"

জোজো বলল, "তুই কোথায়?"

সন্তু বলল, "এই তো এখানে। গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছিস না?"

জোজো সন্তুর কাছে আসতে গিয়ে আরও দু'বার গাছে গুঁতো খেল। তারপর ধাক্কা খেল সন্তুর সঙ্গে।

সন্তু বলল, "এবার আস্তে-আস্তে আমার পেছনে চলে আয়।"

জোজো পেছনে গিয়ে গিঁট খোলার চেষ্টা করল।

সন্তু বলল, "এ কী রে, তুই আমার কান কামড়ে দিচ্ছিস কেন?"

জোজো হেসে ফেলে বলল, "দুর ছাই, কোনটা কান আর কোনটা গিঁট, বুঝব কী করে।"

জোজো আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও পারল না।

সন্তু অস্থির হয়ে বলল, "তোর দ্বারা কিছু হয় না। তুই আমার সামনে আয়, আমি তোরটা খুলে দিচ্ছি।"

এই সময় বেশ কাছেই গুলির আওয়াজ হল পরপর দু'বার।

ওরা চমকে গিয়ে থেমে গেল।

এরপর মনে হল যেন একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

জোজো বলল, "কারা যেন আসছে।"

সন্তু বলল, "আসুক। তুই এসে দাঁড়া, তাড়াতাড়ি কর, তোর বাঁধনটা খুলে দিই, তারপর তুই দেখে দেখে..."

সে সময় আর পাওয়া গেল না। কাছেই একটা গাড়ি থামল, তার থেকে কয়েকটি লোক নেমে দৌড়ে ওদের ঘিরে দাঁড়াল।

প্রথমে একজন কিছু একটা জিজ্ঞেস করল, সে ভাষা বোঝা গেল না।

সন্তু বলল, "প্লিজ স্পিক ইন ইংলিশ। অর ইন হিন্দি।"

জোজো বলল, "অথবা বাংলায়।"

এবার একজন ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল। "তোমরা কে?"

প্রশ্ন শুনেই সন্তু বুঝতে পারল, এরা ডাকাত নয়।

সে বলল, "আগে আমাদের বাঁধন খুলে দিন, সব বুঝিয়ে বলছি!"

লোকগুলো ওদের শুধু চোখের বাঁধন খুলে দিল, হাত খুলল না।

সন্তু দেখল, ওরা চারজন লোক। তিনজন খাকি হাফপ্যান্ট ও হাফশার্ট পরা। আর একজন ফুলপ্যান্ট। এরা ফরেস্ট গার্ড, একজন অফিসার।

সন্তু বলল, "বিক্রম ওসমানের নাম জানেন নিশ্চয়ই। আমাদের আটকে রেখেছিল। হঠাৎ এখানে কেন ছেড়ে দিয়ে গেল জানি না।"

জোজো বলল, "বিক্রম ওসমান সাঙ্ঘাতিক ডাকাত। চন্দনগাছ কেটে বিক্রি করে, মানুষ খুন করে।".

ফরেস্ট গার্ডরা নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করল। তাদের মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে।

অফিসারটি বললেন "তারা তোমাদের ধরে নিয়ে গিয়েও ছেড়ে দিল কেন?"

জোজো বলল, "সেটা তো আমরাও বুঝতে পারছি না।"

সন্তু বলল, "আমাদের কাকাবাবু এখনও ওদের সঙ্গে আছেন। নিশ্চয়ই তাঁকে ছাড়েনি।"

একজন গার্ড অফিসারটিকে কী যেন বলল। অফিসারটি সন্তুকে

বললেন, "কাছেই আমাদের বনবিভাগের চেক পোস্ট। সেখানে চলো, তারপর তোমাদের সব কথা ভাল করে শুনব।"

সন্তু বলল, "কিন্তু কাকাবাবু.... ওখানে রয়ে গেছেন, তাঁকে খুঁজতে যেতে হবে। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন?"

অফিসারটি বললেন, "তাকে খুঁজতে বিক্রম ওসমানের ডেরায় যাব? মাথা খারাপ নাকি? আমরা এই ক'জন গিয়ে মরব নাকি? পুলিশবাহিনীকেই বিক্রম ওসমান গ্রাহ্য করে না। আমাদের কাছে তো তেমন কিছু অস্ত্রই নেই। ওদের কাছে সাব মেশিনগান পর্যন্ত আছে।"

সন্তু বলল, "আপনারা সাহায্য করবেন না? তা হলে আমরা দু'জনেই আবার ফিরে যাব!"

অফিসারটি মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু। তা চলবে না। আমরা তোমাদের দু'জনকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। তারপর তারা যা ভাল বোঝে করবে। আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই।"

সন্তু চিৎকার করে বলল, "কাকাবাবুকে ছেড়ে আমি কিছুতেই যাব না। আপনাদের সাহায্যের কোনও দরকার নেই।"

সে দৌড়ে জঙ্গলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেই দু'জন গার্ড ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরল। হাত বাঁধা অবস্থায় সন্তু ধস্তাধস্তি করেও নিজেকে ছাড়াতে পারল না।

ওদের দু'জনকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল একটা জিপ গাড়িতে।

জোজো বলল, "সন্তু, আমরা শুধু দু'জনে ফিরে গিয়ে কিছুই করতে পারব না। পুলিশের কাছে সব জানিয়েই দেখা যাক না!"

সন্তু তবু রাগে ফুঁসছে, আর কামড়ে কামড়ে হাতের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে।

চেকপোস্টের কাছে একটুখানি থেমে জিপটা আবার ছুটল।

কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়ে গেল জঙ্গল। একটা থানায় সন্তু আর জোজোকে জমা করে দিয়ে গেল বন বিভাগের লোকেরা।

থানাটা বেশ ছোট। সন্তুদের সব কথা শুনে সেখানকার দারোগা বললেন, "আমরা ওই জঙ্গলে ঢুকতে পারব না। কিছুদিন আগেই আমাদের একজন কনস্টেবল খুন হয়েছেন ওই ডাকাতদের হাতে। তোমাদের আমরা শহরে পৌঁছে দিচ্ছি।"

ওঠা হল আর একটা জিপে। তারপর আরও দু' ঘণ্টা পরে সেই জিপ শহরে পৌঁছল। সন্তু-জোজো দু'জনেই চিনতে পারল, সেই শহরটা কালিকট।

এই পুলিশের গাড়িটা ওদের নিয়ে এল বড় একটা থানায়। এখনও দু'জনের হাত বাঁধা। পাঁচ-ছ'দিন ধরে একই পোশাক পরে আছে বলে সেগুলো একেবারে নোংরা হয়ে আছে। মাথার চুলে

চিরুনি পড়েনি এই ক'দিন। ওদের অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

প্রথমে এই থানার একজন পুলিশ ওদের ঘটনা শুনল সংক্ষেপে। তারপর সে নিয়ে গেল বড় অফিসারের ঘরে।

সেখানে অফিসারের সামনে আর একজন লোক বসা। তাকে দেখে সন্তু আর জোজো দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠল, "অমলদা?"

অমল দারুণ অবাক হয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "এ কী অবস্থা হয়েছে তোমাদের! আমি হঠাৎ কয়েকদিন ছুটি পেয়ে ভাবলাম এখানে এসে পড়ে তোমাদের চমকে দেব! কিন্তু তোমাদের পাত্তাই পাই না। কোনও হোটেল কিছু বলতে পারে না। শেষকালে একটা হোটেলে গিয়ে শুনলাম, তোমরা সেখানে উঠেছিলে। কিন্তু জিনিসপত্র সব ফেলে রেখে কোথাও উধাও হয়ে গেছ! তারপর এলাম এই থানায়। ইনি মিস্টার রফিক আলম, এঁর কাছে শুনলাম, কাকাবাবু এখানে এসেছিলেন। ভাস্কো দা গামার ভূত দেখার কথা কী যেন বলেছিলেন। আসলে কী হয়েছিল বলো তো?"

রফিক আলম বললেন, "আহা আগে ওদের বসতে দিন। মুখ শুকিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ জলটলও খায়নি।"

জোজো ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, "তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে!"

এর মধ্যেই থানার সব জায়গায় রটে গেছে যে, বিক্রম ওসমানের খপ্পর থেকে কোনওরকমে পালিয়ে এসেছে দুটি হাত-বাঁধা ছেলে। বাঘের মুখ থেকেও কেউ কখনও নিস্তার পেতে পারে, কিন্তু বিক্রম ওসমানের গ্রাস থেকে কেউ এমনি এমনি ছাড়া পেয়েছে, এটা আগে কক্ষনও শোনা যায়নি।

অনেকে ভিড় করে দেখতে এল ওদের। যেন দারুণ দুই বীরপুরুষ। একজন একটা ছুরি এনে ওদের হাতের বাঁধন কেটে দিল।

জোজো দারুণ জমিয়ে ঘটনাটা বলতে শুরু করল।

সন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "অমলদা, সবটা বলতে অনেক সময় লাগবে। আসল কথা হল, কাকাবাবু এখনও ওদের ওখানে রয়ে গেছেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য আমাদের এক্ষুনি ওখানে ফিরে যাওয়ার দরকার।"

অমল বলল, "এই তো আলমসাহেব রয়েছেন। ইনি নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।"

আলমসাহেব আস্তে আস্তে দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "আমরা কী সাহায্য করব? ওই জঙ্গল আমার থানার এলাকার মধ্যে পড়ে না। এখান থেকে অনেক দূরে।"

অমল বলল, "সে কী মশাই! একজন মানুষ এত বিপদে পড়েছে শুনেও আপনারা কোনও সাহায্য করবেন না? এটাই তো পুলিশের কাজ।"

আলম বললেন, "বিক্রম ওসমানের দলের বিরুদ্ধে পুলিশ অনেকবার অনেক অভিযান চালিয়েও কিছু করতে পারেনি। ওরা জঙ্গলের ঘাঁতঘোঁত সব জানে। জঙ্গলে ঢুকলে ওদের গুলিতেই পুলিশ মারা পড়ে।"

সন্তু বলল, "তার মানে কী, কাকাবাবু ওদের কাছেই আটকে থাকবেন? ওরা যদি..."

আলম বললেন, "বিক্রম ওসমানের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গেলে বড় বড় কর্তাদের, এমনকী চিফ মিনিস্টারেরও অনুমতি লাগে। আমি হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠাব, তারপর দেখা যাক ওঁরা কী বলেন। দু'-তিনদিনের আগে কিছু হবে না।"

সন্তু আঁতকে উঠে বলল, "দু-তিনদিন! তার মধ্যে কত কিছু ঘটে যেতে পারে!"

আলম চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "আমার আর তো কিছু

করার নেই।"

সন্তুদের দিকে চেয়ে অমল বলল, "চলো, এখন আমরা হোটেলে যাই। তোমাদের একটু বিশ্রাম দরকার। এক্ষুনি তো কিছু করা যাচ্ছে না। ভেবেচিন্তে একটা কিছু উপায় বার করতে হবে।"

জোজো এর মধ্যেই ঘুমে ঢুলে পড়ছিল। তাকে টেনে তোলা হল।

ওরা ফিরে এল আগেকার হোটেলে। কাকাবাবুদের সব জিনিসপত্র বার করে নিয়ে সে ঘর ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে। আর একটা বড় ঘর অবশ্য পাওয়া গেল।

অমল বলল, "তোমরা স্নানটান করে পোশাক পালটে নাও, ততক্ষণে আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি।"

জোজো স্নান করতে গেল, সন্তু বসে রইল মুখ নিচু করে। অমল ফিরে এসে দেখল, সন্তু একই ভাবে বসে আছে।

অমল বলল, "আগে কিছু খেয়ে নাও সন্তু। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।"

সন্তু বলল, "আমি কিছু খাব না। কাকাবাবু ওদের হাতে আটকা পড়ে আছেন। আমরা রয়েছি এখানে, এটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।"

অমল বলল, "বিক্রম ওসমানের খবর প্রায়ই কাগজে বেরোয়। সাঙ্ঘাতিক লোক। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও ওদের ধরতে পারেনি। এত বড় জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে কখন লুকিয়ে থাকে!"

সন্তু বলল, "ওরা আমাদের দূরে পাঠিয়ে দিল কেন? নিশ্চয়ই এবার কাকাবাবুর ওপর অত্যাচার করবে।"

জোজো বলল, "পুলিশ যদি ধরতে না পারে, তা হলে মিলিটারি লাগাতে হবে। যদি পাঁচশোজন আর্মি একসঙ্গে জঙ্গলটা সার্চ করে—"

অমল বলল, "আর্মি তো ভারত সরকারের। এখানকার পুলিশ তো কোনও সাহায্যই করতে চাইল না। আমাদের কথায় তো আর্মি নামবে না। একটা উপায় বার করা যেতে পারে। পুরো ঘটনাটা আগে আমাকে বলো তো!"

জোজো মহা উৎসাহে বলতে শুরু করল! সন্তু মাঝে মাঝে তাকে থামিয়ে দিয়ে সংক্ষিপ্ত করতে লাগল অনেকটা।

সব শুনে অমল বলল, "অনেক বড় বড় বিপদ থেকে কাকাবাবু বেরিয়ে আসেন, সেইজন্য আমাদের খুব বেশি দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই। আবার এটাও ঠিক, বিক্রম ওসমানের মতন হিংস্র লোকের পাল্লায় তো কাকাবাবু আগে পড়েননি। একটা কাজ করা যেতে পারে, বড় বড় খবরের কাগজে খবরটা ছাপিয়ে দিলে সরকারের টনক নড়বে। মুম্বইয়ের কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে আমার চেনা আছে। তাদের আমি ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু কিন্তু খবরের কাগজ-টাগজে নিজের নাম ছাপা পছন্দ করেন না।"

অমল বলল, "কাকাবাবু পছন্দ না করলে কী হবে, এইটাই একমাত্র উপায়। কাগজে বেরুলে পুলিশ অ্যাকশন নিতে বাধ্য হবে।"

জোজো বলল, "আরে সন্তু, বুঝতে পারছিস না। এটা পাবলিসিটির যুগ! কাগজে বেরলেই কাজ হবে।"

অমল টেলিফোনের কাছে বসল। কিন্তু এখান থেকে মুম্বইয়ের লাইন পাওয়া মুশকিল। বারবার চেষ্টা করেও বিরক্ত হয়ে অমল টেলিফোনটা একবার বেশ জোরে রেখে দিতেই দরজায় ঠক ঠক শব্দ হল।

দরজাটা খোলার পর সন্তু যাকে দেখল, তাকে একেবারেই আশা করেনি। সন্তু অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

পুলিশ অফিসার রফিক আলম। মুখখানা গম্ভীর।

তিনি ভেতরে এসে বললেন, "আমি কোনও খারাপ খবরও আনিনি, ভাল খবরও আনিনি। পুলিশ হিসেবেও আসিনি। আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।"

অমল বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন, বসুন।"

আলম বললেন, "মিস্টার রায়চৌধুরীকে বিক্রম ওসমান ধরে রেখেছে শুনেও আমি কোনও সাহায্য করতে পারব না বলেছি। তা শুনে নিশ্চয়ই আপনারা আমাকে খুব বাজে লোক ভেবেছেন। সত্যিই বিশ্বাস করুন, এ-কাজ আমার এক্তিয়ারের বাইরে। আমাদের থানার কোনও ক্ষমতা নেই।"

অমল বলল, "কিন্তু রাজা রায়চৌধুরী এই কালিকটেই ছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপনারা তাঁর খোঁজ করার দায়িত্ব নেবেন না কেন?"

আলম বললেন, "ওই যে মোহন সিং না কে, ফিল্মের লোক, সে যদি ধরে রাখত, তা হলে আমি নিশ্চয়ই পুলিশ পার্টি পাঠাতাম। কিন্তু বিক্রম ওসমানকে নিয়ে এখানকার দু-তিনটে রাজ্য ব্যতিব্যস্ত। সে মুখ্যমন্ত্রীদেরও হুমকি দেয়। সাধারণ পুলিশ তার চুলও ছুঁতে পারবে না।"

সন্তু বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, "বাঃ! সে যাকে-তাকে ধরে রাখবে, আর পুলিশ কিছুই করবে না, এমন কথা কখনও শুনিনি!"

আলম সন্তুর চোখের দিকে কয়েক পলক স্থিরভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, " তুমি খুব তেজি ছেলে! আমি এখানে কেন এসেছি, সেটা বলি?"

অমল বলল, "হ্যাঁ, বলুন, বলুন!"

আলম সন্তুর দিকেই তাকিয়ে থেকে বললেন, "বিক্রম ওসমানের ডেরাটা তুমি চিনিয়ে দিতে পারবে? আমি একা সেখানে যেতে চাই।

বিক্রম ওসমানের সঙ্গে আমার নিজস্ব একটা ব্যাপার আছে।"

অমল অবাক হয়ে বলল, "আপনি একা যাবেন?"

আলম বললেন, "হ্যাঁ। থানায় কিছু বলিনি। কারণ, আমার ধারণা, প্রত্যেক থানাতেই ওই লোকটার কিছু গুপ্তচর আছে। কিছু পুলিশকে ও নিয়মিত টাকা দেয়। আমরা যখনই কোনও অ্যাকশন নেওয়ার কথা ঠিক করি, তখনই কেউ না কেউ আগে থেকে ওকে খবরটা পৌঁছে দেয়। সেইজন্য ওকে ধরা যায় না।"

অমল বলল, "কিন্তু আপনি একা গিয়ে কী করবেন?"

আলম বললেন, "আমি একবার তার মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই। তারপর যা হওয়ার তা হবে। তোমরা কি আমাকে জায়গাটা চিনিয়ে দিতে পারবে?"

জোজো বলল, "সে নাকি বারবার জায়গা বদলায়। পুলিশ এসেছে শুনেই তো আগের জায়গাটা ছাড়তে হল। সেই পুলিশ কারা?"

আলম বললেন, "তা আমি জানি না। ওরকম অনেক খেলা চলে। আগের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেই চলবে। ও নিশ্চয়ই ওখানে আবার ফিরে আসবে।"

জোজো বলল, "আমাদের চোখ বেঁধে এনেছিল। জঙ্গলের রাস্তাটা তো আমরা চিনতে পারব না।"

সন্তু বলল, "যেখানে আমাদের ছেড়ে দিয়েছিল, সেখানে গেলে নিশ্চয়ই ঘোড়া চলার পথের একটা চিহ্ন পাওয়া যাবে। অনেক গাছের ডালপালা ভেঙেছে।"

আলম সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে? তুমি শুধু দূর থেকে আমাকে জায়গাটা দেখিয়ে দেবে। তারপর আর তোমাকে থাকতে হবে না।"

সন্তু বলল, "নিশ্চয়ই! চলুন, কখন যাবেন?"

আলম বললেন, "সন্ধে হয়ে গেছে। এখন যাত্রা করে কোনও লাভ নেই। কাল ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই—"

অমল বলল, "সন্তু একা যাবে নাকি? আমিও যেতে চাই। এরকম অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ তো জীবনে পাব না। তাতে যদি আমার প্রাণটা চলে যায়, কুছ পরোয়া নেই।"

জোজো বলল, "আর আমি বুঝি একা একা এই হোটেলে বসে থাকব? তা হলে পরে সন্তু আমায় ভীরু, কাপুরুষ, কাওয়ার্ড কত কী বলবে। কাকাবাবু আর কখনও আমাকে সঙ্গে নেবেন না। আমিও যাব।"

একটা গাছের তলায় শুয়ে ছিলেন কাকাবাবু। ফুরফুরে হাওয়া, নানারকম পাখির ডাক। ওপরের আকাশ দেখতে দেখতে কাকাবাবুর ঘুম এসে গেল।

খানিক বাদে ভুডু এসে ডাকল তাঁকে।

কাকাবাবু ধড়মড় করে উঠে বসতেই ভুডু বলল, "আমার সঙ্গে আসুন, একটা মজার জিনিস দেখাব।"

কাকাবাবু ভুডুর সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন।

দুটো ছোট পাহাড়ের মাঝখানে খানিকটা উপত্যকা। সেখানে এর মধ্যেই কয়েকটা চালাঘর বানানো হয়েছে। মাঝখানটা ফাঁকা। সেখানে একটা লম্বা খুঁটি পুঁতে একজন মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে।

কাছে গিয়ে কাকাবাবু লোকটিকে চিনতে পারলেন। মোহন সিং।

কাকাবাবু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

আজ বিক্রম ওসমানের পোশাক অন্যরকম। সে পরে আছে শেরওয়ানি। কোমরে ঝুলছে তলোয়ার। মাথায় একটা পালক বসানো নীল পাগড়ি।

সে গর্বিতভাবে বলল, "কী বাঙালিবাবু, এবার বুঝলে তো, মোহন সিংকে ধরে আনার ক্ষমতা আমার আছে কি না।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তোমার ক্ষমতা আছে দেখছি!"

ওসমান বলল, "এবার দ্যাখো, ওকে আমি কী শাস্তি দিই!"

মোহন সিংয়ের সারা গায়ে জল-কাদা মাখা, জামা ছিঁড়ে গেছে। বোঝা যায় যে, ধরে আনার সময় তাকে বেশ চড়-চাপড়ও মারা হয়েছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে একে ধরে আনলে?"

ওসমান বলল, "সমুদ্রের ধারে সিনেমার শুটিং করছিল। সেখান থেকে তুলে এনেছি। এবার একটা একটা করে ওর হাত আর পা আমি কেটে ফেলব নিজের হাতে। আমার সঙ্গে বেইমানি!"

সে খাপ থেকে সড়াত করে তলোয়ারটা টেনে বার করল।

কাকাবাবু বললেন, "ওকে মেরে ফেলবে? তোমাদের সঙ্গে এতকালের সম্পর্ক। একটা মোটে ভুল করে ফেলেছে। না, না, মেরে ফেলাটা ঠিক হবে না!"

মোহন সিংয়ের চোখ রাগে জ্বলজ্বল করছিল, এবার সে অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। এই লোকটা তাকে বাঁচাতে চাইছে?

ওসমান ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "এর ওপর তোমার দয়া হল কেন? এই লোকটাই তো তোমাকে বেচে দিয়েছিল আমার কাছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হোক। তবু ওকে বাঁচিয়ে রাখলেই তোমাদের লাভ হবে।"

ভুড়ু বলল, "ঠিক বলেছেন। ও আমাদের দশ লাখ টাকা ঠকিয়েছে। ওর কাছ থেকে বিশ লাখ টাকা আদায় করতে হবে।"

এ-কথা শোনামাত্র মোহন সিং বলল, "আমি বিশ লাখ টাকা দিয়ে দিচ্ছি! আমাকে ছেড়ে দাও! শুটিং নষ্ট হচ্ছে, অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, গেলেই ওই টাকাটা পেয়ে যাবে।"

কাকাবাবু ভুড়ুর দিকে মুখ ফিরিয়ে ভুরু তুলে একটা ইঙ্গিত করে বললেন, "মাত্র কুড়ি লাখ?"

ভুড়ু বলল, "ঠিক ঠিক। আপনার জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকা ধরা হয়েছিল, সেই টাকাটা ওর কাছ থেকেই আদায় করা উচিত।"

ওসমান বলল, "ওর কাছ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকার চিঠি লিখিয়ে নে।"

কাকাবাবু এবার ওসমানের দিকে ফিরে বললেন, "ওরা হিন্দি সিনেমা বানায়। ওদের কাছে পঞ্চাশ লাখ টাকাও কিছুই না। অন্তত এক কোটি টাকা চাও!"

ওসমান বলল, "হাঁ, এটাই ঠিক কথা। পঞ্চাশ লাখ ওর মুণ্ডুর দাম, আর পঞ্চাশ লাখ ফাইন!"

মোহন সিং একটু আগে ভেবেছিল কাকাবাবু ওর জীবন বাঁচিয়ে দিচ্ছে। এবার রেগে কটমট করে তাকাল। তারপর ওসমানকে বলল, "ভাইসাব, তোমার সঙ্গে আমার এতকালের কারবার, এখন তুমি ওই শয়তান রায়চৌধুরীটার কথা শুনছ?"

ওসমান একটা আঙুল দেখিয়ে বলল, "এক কোটি! নইলে মুণ্ডু ঘ্যাচাং!"

মোহন সিং বলল, "এক কোটি টাকা জোগাড় করা কি সোজা কথা? অনেক সময় লাগবে।"

ওসমান বলল, "যতদিন না টাকাটা আসে, ততদিন তুই এই ভাবে

থাকবি! বেইমানের এই শাস্তি!"

তলোয়ারটা খাপে ভরে ওসমান হা হা করে একটা অট্টহাসি দিল।

কুলসম বলল, "এই লোকটাকে আমার কোনওদিনই ভাল লাগে না। একে কিছু খেতে দেওয়াও উচিত না।"

ওসমান বলল, "কিছু খেতে দিবি না। শুধু জল চাইলে জল দিবি।"

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "আজ মেজাজটা বেশ খুশ আছে। চলো বাঙালিবাবু, তোমার সঙ্গে দাবা খেলি!"

ওসমান ভিড়ের মধ্যে দাবা খেলা পছন্দ করে না। তাই বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গায়, গাছের ছায়ায় খেলতে বসা হল।

ওসমান বলল, "তুমি ভাল বুদ্ধি দিয়েছ। আমার এত রাগ হয়েছিল, আমি আর একটু হলে মোহন সিংকে কেটেই ফেলতাম। তা হলে আর এক কোটি টাকা পাওয়া যেত না।"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষকে কেটে ফেললে কী পাওয়া যায় জানো? জেল কিংবা ফাঁসি।"

ওসমান ঠোঁট উলটে বলল, "ওসব আমি পরোয়া করি না। আমাকে কে ধরবে?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার রাজা সামলাও। এই কিস্তি দিলাম!"

ওসমান দাবার গুটিগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মহাবিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "তুমি আমাকে এত সহজে হারিয়ে দিলে? অ্যাঁ? এর আগে তুমি বারবার হেরেছ!"

কাকাবাবু বললেন, "তখন তো ইচ্ছে করে হেরেছি।"

ওসমান বলল, "কেন, ইচ্ছে করে হেরেছ কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাকে খুশি করার জন্য। নইলে, দাবা খেলায় তুমি আমার কাছে ছেলেমানুষ!"

ওসমান বলল, "বাজে কথা। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই তুমি জোচ্চুরি করে এই দানটা জিতেছ। আর এক দান খেলে দ্যাখো!"

আবার ছক সাজানো হল। এবার কাকাবাবু আরও তাড়াতাড়ি ওসমানকে হারিয়ে দিলেন।

ওসমান হাঁ করে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। কাকাবাবু একগাল হেসে বললেন, "তোমার খেলা দেখেই বুঝেছি। তুমি আমাকে একবারও হারাতে পারবে না।"

ওসমান বলল, "আমি দাবায় চ্যাম্পিয়ান। আমায় কেউ কখনও দাবা খেলায় হারাতে পারেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে। বন-গাঁয়ে শিয়াল রাজা। তুমি হচ্ছ তাই। তুমি তো খেলো শুধু তোমার দলের লোকদের সঙ্গে। বাইরের লোকদের সঙ্গে তো খেলোনি!"

হঠাৎ ওসমানের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে সে বলল, "তোমাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না। এক্ষুনি মেরে ফেলতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আরে আরে, অত রেগে যাচ্ছ কেন? খেলায় তো হার-জিত আছেই!"

ওসমান তবু দু' হাত বাড়িয়ে এল কাকাবাবুর গলা টিপে ধরার জন্য।

কাকাবাবু সেই হাতদুটো ধরে ফেলে ঝটকা টান দিয়ে তাকে শূন্যে তুলে ছুড়ে দিলেন দূরে!

তারপর বললেন, "এখন যাকে কুংফু-ক্যারাটে বলে, আমাদের সময় সেটাকে বলা হত যুযুৎসু! সেটা আমি ভালই জানি। এক জাপানির কাছে শিখেছিলাম।"

ওসমান রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। খাপ থেকে তলোয়ারটা বার করে বলল, "এবার?"

কাকাবাবুও উঠে দাঁড়িয়ে একটা ক্রাচ ফেলে দিয়ে আর একটা ক্রাচ তুলে বললেন, "ওতেও তুমি খুব সুবিধে করতে পারবে না। আমি এটা দিয়ে লড়ব।"

ওসমান বলল, "তুমি একটা বেওকুফ। তোমার পা খোঁড়া, ওই একটা লাঠি দিয়ে তুমি আমার তলোয়ারের সঙ্গে লড়বে? এবার তুমি মরবে। আমার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না।"

কাকাবাবু বললেন, "খোঁড়া পায়ের জন্য খানিকটা অসুবিধে হয় বটে, কিন্তু তাতেও অনেকেই হেরে যায়। চেষ্টা করে দ্যাখো।"

ওসমান তলোয়ার চালাতে শুরু করলে কাকাবাবু প্রথম কয়েকবার ঠুক ঠুক করে আটকালেন শুধু। তারপর হঠাৎ যেন খেপে উঠে নিজে এগিয়ে এসে দড়াম দড়াম করে মারতে লাগলেন। একবার লাফিয়ে উঠে ওসমানের হাতে এত জোর মারলেন যে, তার হাত থেকে তলোয়ারটা ছিটকে পড়ে গেল।

ওসমান কয়েক মুহূর্ত হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দূরে একজন লোককে দেখে চেঁচিয়ে ডাকল, "আপ্পা রাও! আপ্পা রাও!"

কাকাবাবু বললেন, "এবার তোমার লোকজন ডাকবে? অনেক লোক ঘিরে ফেললে কিছু করতে পারব না, আমি দৌড়তে পারি না যে! আর বন্দুক পিস্তলের বিরুদ্ধেও খালি হাতে লড়তে পারব না। কিন্তু তুমি আমাকে মারবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন?"

আপ্পা রাও ছুটতে ছুটতে কাছে এসে দাঁড়াল।

ওসমান বলল, "একটা ঘোড়া নিয়ে এসো। চোখ বাঁধার কাপড় আর দড়িও আনবে।"

আপ্পা রাও দৌড়ে ফিরে গেল।

ওসমান বলল, "বাঙালিবাবু, আমি তোমার সম্পর্কে মত বদলে ফেলেছি। তোমায় মারব না। তোমায় মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি, তুমি বাড়ি ফিরে যাও।"

কাকাবাবু বেশ অবাক হয়ে বললেন, "সে কী! এমনি এমনি মুক্তি দিয়ে দেবে?"

ওসমান বলল, "হাঁ। মোহন সিংয়ের কাছ থেকে এক কোটি টাকা পেলে তোমার টাকাটাও ওতেই উসুল হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে আর ধরে রাখার কারণ নেই। শুধু একটা শর্ত আছে। আমি যে তোমার কাছে দাবা আর তলোয়ারে হেরেছি, এ-কথা কাউকে বলতে পারবে না।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "ঠিক আছে, সে-কথা কাউকে বলব না। কিন্তু আমি এখন মুক্তি পেতে চাই না।"

ওসমান চোখ কপালে তুলে বলল, "তুমি মুক্তি চাও না? কেন?"

কাকাবাবু চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "এই জায়গাটা আমার বেশ লাগছে। আরও কিছুদিন থেকে যেতে চাই!"

ওসমান বলল, "তোমার মাথা খারাপ? কখন রাগের চোটে আমি তোমাকে মেরে বসব তার ঠিক আছে? ছেড়ে দিচ্ছি, পালাও।"

কাকাবাবু বললেন, "পালাবার আমার একটুও ইচ্ছে নেই। বেশ আছি!"

ওসমান বলল, "এরকম কথা কোনও বন্দির মুখে আমি আগে কখনও শুনিনি। তোমাকে দেখছি জোর করে তাড়াতে হবে।"

আপ্পা রাও একটা ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এল।

আপ্পা রাওয়ের কাছে রিভলভার আছে, সুতরাং গায়ের জোর দেখিয়ে লাভ নেই। ওরা যখন তাঁর হাত ও চোখ বাঁধল, তিনি প্রতিবাদ করলেন না।

ওসমান বলল, "আপ্পা রাও, তুমি এই বাঙালিবাবুকে হলদিঝোরা

পর্যন্ত নিয়ে যাও। ওকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। দেখো যেন, কোনও অসুবিধে না হয়। গাড়ির রাস্তায় পৌঁছে যায়।"

আপ্পা রাও বেশ অবাক হলেও কোনও কথা না বলে কাকাবাবুকে ঘোড়ায় তুলে নিল।

খানিক দূর যাওয়ার পর সে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের সর্দার তোমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দিল কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো জানি না।"

আপ্পা রাও বলল, "আমি হলে তোমাকে কিছুতেই ছাড়তাম না। টাকা আদায় না হলে তোমাকে দিয়ে চাকরবাকরের কাজ করাতাম।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তুমি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো!"

আপ্পা রাও বলল, "সর্দারের হুকুম। তার ওপরে কথা বলা যায় না।"

হঠাৎ কাকাবাবুর মাথায় একটা জোরে ঘুসি মেরে সে বলল, "সোজা হয়ে বোসো! আমার গায়ে হেলান দিচ্ছ কেন?"

কাকাবাবু মোটেই হেলান দেননি। আপ্পা রাওয়ের কথা শুনলেই বোঝা যায়, রাগে তার হাত নিশপিশ করছে!

খানিক বাদে সে আবার একটা ঘুসি মেরে বলল, "এই হারামজাদা, ঘুমোচ্ছিস কেন রে? সোজা হয়ে বসে থাক। না হলে গুলি করে তোকে মেরে সর্দারকে গিয়ে বলব, তুই পালাবার চেষ্টা করছিলি!"

কাকাবাবু ঘুমোননি। কোনও উত্তরও দিলেন না।

প্রায় এক ঘন্টা চলার পর ঘোড়াটা এক জায়গায় থামল।

আপ্পা রাও বলল, "তোমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে যাব। ঝরনাটার ওপারে একটুখানি গেলেই একটা পাকা রাস্তা দেখতে পাবে। ওখান

দিয়ে মাঝে মাঝে গাড়ি যায়। কোনও গাড়ি থামিয়ে উঠে পড়ার চেষ্টা করবে। একদিন লাগতে পারে, দু'দিনও লাগতে পারে।"

সে কাকাবাবুর চোখের বাঁধন, হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, "নেমে পড়ো!"

কাকাবাবু ঘোড়া থেকে নামার বদলে ঘুমন্ত মানুষের মতন উলটে পড়ে গেলেন। আর উঠলেন না।

আপ্পা রাও নিজের মনেই বলল, "লোকটার কী হল? মরেই গেল নাকি?"

সে নিজে ঘোড়া থেকে নেমে কাকাবাবুকে টেনে তুলতে গেল।

কাকাবাবু ওসমানের মতন একেও ধরে তুলে এক আছাড় মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ওপর চেপে বসে গলা টিপে ধরে বললেন, "তুমি আমাকে অকারণে ঘুসি মেরেছ, গুলি করে মারতে চেয়েছিলে। এবার দ্যাখো, কেমন লাগে।"

আপ্পা রাও আঁ আঁ করে শব্দ করতে লাগল, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে। কাকাবাবু আরও জোরে চাপ দিলেন। ক্রমে আপ্পা রাওয়ের গোঙানি থেমে চোখ বুজে এল।

কাকাবাবু এবারে তার গলা ছেড়ে দিয়ে নাকের কাছে হাত নিয়ে বুঝলেন নিশ্বাস পড়ছে। মরেনি, অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ওর রিভলভারটা নিজের পকেটে পুরলেন কাকাবাবু। দড়ি দিয়ে হাত আর পা বাঁধলেন। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চললেন রাস্তার ধারে।

এর মধ্যে আপ্পা রাওয়ের জ্ঞান ফিরে এসেছে।

কাকাবাবু বললেন, "এবারে তুমিই কোনও গাড়ি দেখলে চেঁচিয়ে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করো। বিদায়!"

কাকাবাবু ঘোড়াটায় চেপে ফেরার পথ ধরলেন। চোখ বাঁধা ছিল, তিনি পথ চেনেন না। কিন্তু তিনি জানেন, ঘোড়াকে অন্য দিকে না

চালালে সে নিজে নিজে ঠিক ডেরাতে ফিরে যায়। তিনি রাশটা আলগা করে ধরে রইলেন।

ঘোড়াটা ঠিকই এক সময় সেই পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছল। এর মধ্যে সন্ধে হয়ে গেছে। কাকাবাবু উপত্যকা পর্যন্ত গেলেন না। এক জায়গায় একটা ছোট্ট জলাশয় আছে, তার পাশে ঘন জঙ্গল, সেখানে থামলেন। ঘোড়াটাকে এক জায়গায় বেঁধে অপেক্ষা করলেন সারারাত।

ভোরবেলা আর-একটা ঘোড়ার আওয়াজ শুনে কাকাবাবু ধড়মড় করে উঠে বসলেন। আগের দিন সকালেই তিনি দেখেছিলেন, বিক্রম ওসমান এই সময় এই নির্জন জায়গাটায় এসে প্রার্থনা করে।

কাকাবাবু একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন।

বিক্রম ওসমান ঘোড়া থেকে নেমে জলাশয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। তারপর হাঁটু মুড়ে নমাজে বসল।

কাকাবাবু অপেক্ষা করে রইলেন। নমাজ শেষ হওয়ার পর বিক্রম ওসমান উঠে দাঁড়াতেই তিনি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "এই যে, সুপ্রভাত!"

মুখ ঘুরিয়ে ভূত দেখার মতন চমকে উঠে ওসমান বলল, "তুমি! ফিরে এসেছ? কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ইচ্ছে হল, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই।"

ওসমান বলল, "তোমার দেখছি সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি যেখানে যাব, সেখানে।"

ওসমান বলল, "তুমি নিতে চাইলেই বা আমি যাব কেন? কাল তোমাকে মেরে ফেলিনি, এটাই তোমার পরম ভাগ্য। আজ তোমাকে শেষ করে দিতেই হবে। তুমি খুব জ্বালাচ্ছ।"

কাকাবাবু রিভলভারটা দেখিয়ে বললেন, "আজ যে আমার সঙ্গে

এটা আছে?"

ওসমান বলল, "ওটা থাকলেই বা কী হবে? আমি হাঁক দিলেই আমার দলের লোক ছুটে আসবে।

কাকাবাবু বললেন, "তার আগেই যদি আমি গুলি চালিয়ে দিই?"

ওসমান বলল, "তোমাকে আগেই বলেছি, আমার মৃত্যুভয় নেই। আমি মরলে পরের নেতা কে হবে, তাও ঠিক করা আছে। আমাকে মারলে আমার দলের লোক এসে তোমাকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলবে।"

কাকাবাবু বললেন, "মৃত্যুভয় নেই? দ্যাখো তো এটা কেমন লাগে।"

তিনি একটা গুলি চালালেন। সেটা ওসমানের ডান কানের সামান্য একটু অংশ ছিঁড়ে নিয়ে গেল। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল সেখান থেকে।

ওসমানের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। কানটা চেপে ধরে সে বলল, "তুমি সত্যি গুলি চালালে? নির্বোধ! গুলির শব্দ শুনে কয়েকজন ছুটে আসবেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তাদের আসতে দেখলে আমার এখনও ঘোড়া নিয়ে ছুটে পালাবার সুযোগ আছে। কিংবা ধরা পড়লেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু তার আগে কী করব জানো? আমি একটা গুলিতে তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা থেঁতলে দেব। যাতে তুমি জীবনে আর কখনও এই হাতে তলোয়ার-বন্দুক ধরতে না পারো। আর-একটা গুলিতে একটা হাঁটু গুঁড়িয়ে দেব, যাতে চিরকালের মতন খোঁড়া হয়ে থাকবে। তুমি বেঁচে থাকবে বটে, কিন্তু ডাকাত দলের সর্দারি করা ঘুচে যাবে। আমার যে কথা, সেই কাজ। এখন বলো, তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও, না ওইভাবে বাঁচতে চাও? আমি পাঁচ পর্যন্ত গুনব। এক-দুই-তিন—"

ওসমান চেঁচিয়ে বলে উঠল, "না, না, গুলি কোরো না!"

কাকাবাবু বললেন, "সকলেই ভয় পায়। নাও, এবার ঘোড়ায় উঠে পড়ে ঠিক পথে চলো। কাল ফেরার সময় আমি পথ অনেকটা দেখে রেখেছি, আমায় ঠকাতে পারবে না।"

কাকাবাবু নিজেও ঘোড়ায় চড়ে ওসমানের পাশাপাশি চলতে চলতে বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই একবার খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে কিংবা হঠাৎ অন্যদিকে বেঁকে গিয়ে আমার চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করবে? তার ফল কী হবে জানো?"

ওসমান বলল, "কী?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার হাতের টিপ খুব ভাল। পালাতে গেলেই আমি তোমার পায়ে গুলি করব। এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেব। তারপর তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা একেবারে থেঁতলে দেব ঠিকই। সুতরাং ও-চেষ্টা কোরো না।"

ওসমান বলল, "বাঙালিবাবু, আমি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছি। এমনকী তোমাকে ছেড়েও দিয়েছিলাম, তবু তুমি কেন আমায় ধরিয়ে দিচ্ছ?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আমাকে ভাল খাইয়েছ-দাইয়েছ ঠিকই। কিন্তু কাল হঠাৎ রেগে গিয়ে আমায় খুন করতে গিয়েছিলে। আমার বদলে অন্য মানুষ হলে মরেই যেত। সে জন্যও নয়। তুমি মানুষ খুন করো। জঙ্গল ধ্বংস করে তুমি সারা দেশের ক্ষতি করছ, এজন্য তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে।"

ওসমান বলল, "আমার রাগটা বেশি। যখন-তখন রাগ হয়ে গেলে আর নিজেকে সামলাতে পারি না।"

কাকাবাবু বললেন, "রাগের বশেই হোক বা যে-জন্যই হোক, যে লোক মানুষ খুন করে, তার কোনও ক্ষমা নেই!"

ওসমান বলল, "আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ো না। এখানেই গুলি করে মেরে রেখে যাও। এই অনুরোধটা অন্তত রাখো।"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষ মারা আমার কাজ নয়। তবে তোমার একটু সুবিধে করে দিতে পারি। তোমার অপরাধের জন্য তোমার ফাঁসি হওয়ারই কথা। তবে, আমি যদি না বলি যে তোমাকে ধরে এনেছি, তুমি যদি বলো যে তুমি নিজে থেকে ধরা দিতে এসেছ, আত্মসমর্পণ যাকে বলে, তা হলে তোমার শাস্তি কমে যেতে পারে। ফাঁসির বদলে জেল হবে।"

ওসমান বলল, "সারাজীবন জেলে কাটাতে হবে?"

কাকাবাবু বললেন, "আজকাল সারাজীবন কাটাতে হয় না। বড়জোর চোদ্দো বছর। ফুলন দেবীও তো ছাড়া পেয়ে গেছে। তুমিও একসময় ছাড়া পাবে!"

ওসমান বলল, "আমি ধরা দিলে আমার দলের লোকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না?"

কাকাবাবু বললেন, "ওদেরও ধরা দিতে হবে। নইলে ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরবে।"

পাহাড় ছেড়ে ঘোড়াদুটো ঢুকে গেল গভীর জঙ্গলে। কাকাবাবু বললেন, "তোমার দলের লোকরা আওয়াজ শুনতে পায়নি, কেউ তো তাড়া করে এল না।"

এর পর আর কোনও কথা হল না অনেকক্ষণ। এক সময় সেই পাকা রাস্তাটা দেখা গেল।

কাকাবাবু বললেন, "ওসমান, তুমি ঘোড়াসুদ্ধ মাঝরাস্তায় দাঁড়াও। কোনও গাড়ি এলে থামতে বাধ্য হবে।"

মিনিটদশেক পরেই একটা গাড়ি এল। তাতে শুধু একজন ড্রাইভার।

কাকাবাবু তাকে বললেন, "আমাদের একটু লিফ্‌ট দাও, সামনের

শহর পর্যন্ত।"

লোকটি বলল, "হবে না, হবে না!"

কাকাবাবু রিভলভারটা দেখালেন।

লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে দরজা খুলে দিল। ঘোড়া দুটো ছেড়ে দিয়ে কাকাবাবু ওসমানকে বসালেন ড্রাইভারের পাশে। নিজে বসলেন জানলার দিকে।

একটু গাড়ি চলার পর ওসমান ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমায় চেনো না?"

লোকটি বলল, "না।" ওসমান বলল, "বিক্রম ওসমানকে চেনে না, এই তল্লাটে এমন কেউ আছে?"

লোকটি এমনই ভয় পেয়ে গেল যে, হাত থেকে স্টিয়ারিং ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম। সে বলল, "ওরে বাবা রে, বাবা রে! আপনি বিক্রম ওসমান? আপনাকে এই লোকটা পিস্তল দেখিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে? আমি নিয়ে যেতে পারব না।"

কাকাবাবু কঠোরভাবে বললেন, "ঠিক করে গাড়ি চালাও!"

লোকটি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "আমায় মাপ করুন স্যার। এর পর ওঁর দলের লোক আমাকেই খতম করে দেবে। আমি গাড়ি থামাচ্ছি।"

কাকাবাবু বললেন, "গাড়ি থামালে আমি যে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব, সেটার কী হবে?"

লোকটি বলল, "ওরে বাবা, এ যে দেখছি মহাবিপদ! হয় আপনার হাতে মরতে হবে, না হয় ওঁর দলের হাতে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওর দলকে ভয় পাওয়ার আর দরকার নেই। আর দু'দিনেই ওর দল ভেঙে যাবে!"

জঙ্গল ফুরোবার পর আর দু-একটা গাড়ি দেখা যেতে লাগল রাস্তায়। ড্রাইভার বলল, "কতদূর যেতে হবে সার?"

কাকাবাবু বললেন, "সামনে যেখানে বড় থানা আছে, সেখানে গাড়ি ঢোকাবে।"

ওসমান বলল, "এদিককার কোনও থানা আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "দেখা যাক।"

আরও কিছুক্ষণ পরে উলটো দিক থেকে একটা গাড়ি পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখে কাকাবাবু চমকে উঠলেন। মনে হল, সেই গাড়িতে সন্তুও কাকাবাবুকে দেখতে পেয়েছে। তাদের গাড়ি থেমে গেল। সবাই এদিকে দৌড়ে এল।

কাকাবাবু ওসমানকেও নামালেন। তারপর সন্তু, জোজোর সঙ্গে অমল আর রফিক আলমকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে বললেন, "আলম সাহেব, আপনিও এসে গেছেন? এই নিন আপনার উপহার। বিক্রম ওসমানকে কিন্তু আমি জোর করে ধরে আনিনি। সে নিজে থেকে ধরা দিতে যাচ্ছে।"

আলমের চোখ-মুখ হঠাৎ কঠিন হয়ে গেল। ফস করে পকেট থেকে রিভলভার বার করে বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে বলল, "মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি সরে দাঁড়ান। ওই নরকের কুত্তাটাকে আমি নিজের হাতে শেষ করব!"

কাকাবাবু বললেন, "সে কী! আপনি মারবেন কেন? ওর বিচার হবে, তাতেই শাস্তি পাবে।"

আলম বলল, "বিচার-টিচারের দরকার নেই। আমিই ওকে শাস্তি দেব। ওকে গুলি করে খতম করে রিপোর্ট দেব যে, ও পালাবার চেষ্টা করেছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "তা আমি হতে দেব না। আইন আপনি নিজের হাতে নিতে পারেন না।"

আলম বলল, "ও কী করেছে জানেন? আমার ভাই, সেও পুলিশ

অফিসার ছিল, তাকে এই শয়তানটা মেরেছে। বিক্রম ওসমান, তোমার মনে নেই, তুমি গত বছর পুলিশ অফিসার হাসানকে গুলি করে মেরেছ?"

কাকাবাবু ওসমানকে আড়াল করে দাঁড়ালেন।

আলম বলল, "আপনি সরে যান। নইলে আমি আপনার ওপরেও গুলি চালাতে বাধ্য হব।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু!"

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আলমের গলা চেপে ধরল। তার হাত থেকে রিভলভারটা খসে পড়তেই ওসমান কাকাবাবুকে ঠেলে দিয়ে সেটা তুলতে গেল। তার আগেই জোজো এক লাথি দিয়ে সেটাকে সরিয়ে দিল দূরে।

অমল সেটা হাতে নিয়ে বলল, "আমিও কিন্তু গুলি চালাতে জানি!"

কাকাবাবু আলমের কাছে গিয়ে বললেন, "ছিঃ, অত মাথা গরম করতে নেই।"

আলম এবার কেঁদে ফেলে বলল, "ও আমার ছোট ভাইকে মেরেছে। হাসানকে আমি এত ভালবাসতাম, নতুন বিয়ে হয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "সেজন্য ওসমানকে শাস্তি পেতেই হবে।"

মুম্বইয়ে অমলের ফ্ল্যাটে সকাল থেকে আড্ডা জমেছে খুব। চা খাওয়া হয়েছে দু'বার, এখন অমল লুচি ভাজছে।

টেবিলের ওপর অনেক খবরের কাগজ ছড়ানো। জোজো একটা

কাগজ দেখতে দেখতে বলল, "কাকাবাবু, সব খবরের কাগজেই বিক্রম ওসমানের খবর আর ছবি ছাপা হয়েছে। আপনার ছবি কোথাও বেরোয়নি কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আর কী করেছি? আমি শুধু ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আত্মসমর্পণ করতে রাজি করিয়েছি।"

জোজো বলল, "আপ্পা রাওটাও ধরা পড়েছে। তাতে আমি আরও খুশি হয়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "একবার দাও তো কাগজটা?"

উলটোদিকের পাতায় একটি সুন্দরী মেয়ের খুব বড় ছবি। সেটা দেখতে দেখতে কাকাকবাবু রান্নাঘরে গিয়ে অমলকে জিজ্ঞেস করলেন, "একে তুমি চেনো?"

অমল বলল, "বাঃ, চিনব না? বিখ্যাত নায়িকা। অনেক ফিল্মে দেখেছি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এর বাড়ি কোথায় জানো?"

অমল বলল, "সবাই চেনে। এখান থেকে বেশি দূরে নয়।"

কাকাবাবু বললেন, "লুচি ভাজা এখন থাক। আমাকে একবার সেখানে নিয়ে চলো তো!"

অমল বলল, "দেখা তো করতে পারবেন না। আগে ওর সেক্রেটারির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়। তাও বড় বড় প্রোডিউসার ছাড়া কেউ দেখা পায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার সঙ্গে দেখা করবে। চেনা আছে।"

জোজো আর সন্তুকে কিছু না বলে কাকাবাবু অমলকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

কস্তুরীর বাড়ির সামনে পৌঁছে তিনি বললেন, "অমল, তুমি এখানেই অপেক্ষা করো, আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি।"

গেটে দু'জন বন্দুকধারী দরোয়ান। কাকাবাবু নিজের ঘড়ি

দেখিয়ে বললেন, "ঠিক সাড়ে ন'টায় সেক্রেটারির সঙ্গে আমার দেখা করার কথা আছে।"

তারা গেট খুলে দিল।

মোরাম বিছানো রাস্তা, একপাশে বাগান। বারান্দায় সারি সারি ঘর। একটা ঘরের দরজায় সেক্রেটারির নাম লেখা। দূরের একটা ঘর থেকে নাচের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাকাবাবু সেই দিকে এগিয়ে গেলেন।

একটা লোক কোথা থেকে এসে বিশ্রীভাবে বলল, "এই বুড়ো, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? কে তুমি?"

কাকাবাবু উগ্র মূর্তি ধারণ করে ক্রাচ দিয়ে লোকটিকে এক বাড়ি মেরে বললেন, "সরো, হঠ যাও!"

দপদপিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন নাচের ঘরে। সেখানে তবলা, সারেঙ্গি, আরও অনেক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কস্তুরী নাচের রেওয়াজ করছে। আর কয়েকটি মেয়েও রয়েছে তার পাশে।

কাকাবাবুকে দেখে কস্তুরী নাচ থামিয়ে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল। মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে।

কাকাবাবু ঝট করে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পকেট থেকে রিভলভারটা বার করলেন। অন্যদের বললেন, "কেউ নড়বে না, যেমন আছ, বসে থাকো।"

কস্তুরীকে বললেন, "আমাকে চড় মেরেছিলে, মনে আছে? কুকুর দিয়ে খাওয়াবে, না আরও কীসব করবে বলেছিলে? আমার গায়ে কেউ হাত তুললে আমি প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ি না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, মেয়েদের গায়েও আমি হাত তুলতে পারি না। কিন্তু শাস্তি তোমায় পেতেই হবে। এখন দুটো উপায় আছে। আমি পকেটে এক শিশি অ্যাসিড এনেছি। সেটা তোমার মুখে ছুড়ে দিলে মুখখানা পুড়ে সারাজীবনের মতন কালো হয়ে যাবে। আর কখনও অভিনয় করতে

পারবে না। অথবা, তুমি ক্ষমা চেয়ে মাটিতে নাকখত দাও যদি—"

কস্তুরী বিনা বাক্যব্যয়ে বসে পড়ে। মাটিতে নাক ঠেকিয়ে বলল, "ক্ষমা চাইছি!"

কাকাবাবু বললেন, "ওই কথাটা দশবার বলো, আর এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত নাকখত দাও। কান দুটো ধরে থাকো!"

কস্তুরী ঠিক তাই-ই করতে লাগল। ঘরের অন্য সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে দেখছে।

বাইরের দরজায় দুম দুম আওয়াজ হচ্ছে। যেন ভেঙেই ফেলবে।

কাকাবাবুর মুখটা রাগে লালচে হয়ে গিয়েছিল। এখন হাসি ফুটল। তিনি কস্তুরীকে বললেন, "ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। আর বেশি করলে তোমার নাক ছোট হয়ে যাবে। কেউ নায়িকার পার্ট দেবে না! উঠে পড়ো।"

কাকাবাবু দরজাটা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে কয়েকজন ঢুকে পড়ল। দুজন বন্দুকধারী চেপে ধরল কাকাবাবুকে!

কাকাবাবু কস্তুরীর দিকে ফিরে বললেন, "আবার নতুন করে এসব খেলা শুরু হবে নাকি? আমাকে ধরে রাখতে পারবে?"

কস্তুরী সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "না, না। ওকে ছেড়ে দাও। একে কেউ কিছু বলবে না। রাস্তা ছাড়ো, ওকে যেতে দাও!"

কাকাবাবু গট গট করে এমনভাবে বেরিয়ে এলেন, যেন কিছু হয়নি।

অমল জিজ্ঞেস করল, "কী কাকাবাবু, কস্তুরীকে দিয়ে সিনেমা করাবেন নাকি? বাংলা বই?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ! ও আমাকে দিয়েই একটা পার্ট করাতে চাইছিল। আমি পারব না বলে এলাম। চলো, এবার লুচি খাওয়া যাক!"

—— A.S.B

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com

সন্তু-কাকাবাবু সিরিজ

মিশর রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাইকেল চালানো শেখার জন্য সন্তুকে এখন ভোরবেলা বালিগঞ্জ লেকে আসতে হয়। ওদের পাড়ার পার্কটা মেট্রো রেলের জন্য খুঁড়ে ফেলা হয়েছে, সেখানে এখন খেলাধুলো করার উপায় নেই।

ভোরবেলাতেই বালিগঞ্জ লেকে বেশ ভিড় থাকে। বহু বয়স্ক লোক আসেন মর্নিং ওয়াক করতে। অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরা দৌড়য়। অনেকে রোয়িং করে। কালীবাড়ির উল্টো দিকের গ্রাউণ্ডটায় ফুটবলের কিক প্র্যাকটিস হয়। লেকের পেছনদিকটায় যেখানে লিলিপুল আছে, সেখানকার রাস্তাটা অনেকটা নির্জন। ওই জায়গাতেই দু'তিনটে দল সাইকেল শেখে।

সাড়ে পাঁচটার সময় সন্তু বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। সঙ্গে থাকে রকুকু। সন্তুর নিজের সাইকেল নেই। কুনালদের বাড়িতে একটা পুরনো সাইকেল ছিল। কুনালের বাবা ডাক্তার, তাঁর চেম্বারের কম্পাউণ্ডারবাবু এই সাইকেলটা ব্যবহার করতেন। কম্পাউণ্ডারবাবু চাকরি ছেড়ে দেশে চলে গেছেন তিন-চার মাস আগে, সাইকেলটা নিয়ে যাননি। কুনাল সেই সাইকেলটা নিয়ে কিছুদিন প্যাড্‌ল করতে করতে চালানো শিখে গেছে। সেই

দেখাদেখি সন্তুরও সাইকেল শেখার শখ হয়েছে।

কুনালকে ডাকতে হয় না, সে তৈরি হয়েই থাকে। কিন্তু মুশকিল হয় বাপিকে নিয়ে। বাপিদের বাড়িতে সবাই খুব দেরি করে ওঠে। ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করলেও কেউ সাড়া দেয় না। সন্তু আর কুনাল যখন রাস্তা থেকে বাপির নাম ধরে ডাকতে থাকে, তখন রকুকুও ঘেউঘেউ করতে শুরু করে দেয়।

শেষ পর্যন্ত বাপি চোখ মুছতে মুছতে দোতলার বারান্দায় এসে বলে, "এক মিনিট দাঁড়া, বাথরুম থেকে আসছি।"

তারপরেও বাপি পনেরো মিনিট কাটিয়ে দেয়। লেকে পৌঁছতে-পৌঁছতে রোদ উঠে যায়।

খুব ছেলেবেলায় সন্তু ট্রাইসাইকেল চালিয়েছিল, কিন্তু দু' চাকার সাইকেল চালানো খুব শক্ত ব্যাপার। একটু-একটু ভয়ে গা-শিরশির করে। সাইকেলটায় ওঠার পর কুনাল আর বাপি তাকে দু'দিকে ধরে থেকে ঠেলতে থাকে। তারপর দু'জনে নির্দেশ দেয়, জোরে প্যাড্‌ল কর, সামনে তাকিয়ে থাক্, শরীরটা হাল্‌কা কর, এত স্টিফ হয়ে আছিস কেন?

কুনাল আর বাপি হঠাৎ একসময় তাকে ছেড়ে দিলেই সন্তুর চোখে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন দুলতে থাকে, হাত দুটো লগ্‌বগ্ করে। সন্তু চেঁচিয়ে ওঠে, "এই, এই পড়ে যাব, ধর, ধর!"

ওরা দু'জন হাসতে-হাসতে দৌড়ে এসে আবার ধরে ফেলে।

এই রকম দু'দিন ধরে চলছে। আজ তৃতীয় দিন। আজ সন্তুর অনেকটা ভয় কেটে গেছে। সাইকেলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা আর আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে না। বাপি আর কুনাল মাঝে-মাঝে ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আজ এখানে আরও চারটে দল এসেছে, এক দলের সঙ্গে আর-এক দলের

যে-কোনও সময় ধাক্কা লেগে যেতে পারে। উল্টোদিকে অন্য কোনও দলকে দেখলেই সন্তু নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ছোটাছুটি করার পর একসময় বাপি সন্তুর পিঠে চাপড় মেরে বলল, "এইবার তুই নিজে চালা, সন্তু। এই কুনাল, ছেড়ে দে !"

সন্তুর আর হাত কাঁপল না, সে সোজা সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে গেল। দারুণ আনন্দ হচ্ছে সন্তুর, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'শিখে গেছি ; শিখে গেছি !' চিৎকার করার বদলে সন্তু ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজাতে লাগল।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার সব বদলে গেল। আবার হাত কাঁপছে, হ্যাণ্ডেলটা এদিক-ওদিক ঘুরে যাচ্ছে, পায়ে যেন জোর কমে গেছে। সন্তুর ধারণা হল, সে একা-একা অনেকটা দূরে এসে গেছে, কুনাল আর বাপি দৌড়ে এসে তাকে ধরতে পারবে না। কী হবে ? এই রে, এই রে, সাইকেলটা হেলে যাচ্ছে...

পেছন থেকে বাপি চেঁচিয়ে বলল, "ভাল হচ্ছে, চালিয়ে যা সন্তু, সামনের দিকে তাকিয়ে—"

ঠিক এই সময়ে বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে আর-একটা দল এসে পড়ল। এখন পাশ কাটাতে না-পারলেই মুখোমুখি কলিশান। সন্তু মোটে সোজা চালাতে শিখেছে, এদিক-ওদিক ঘুরতে জানে না। কুনাল বলেছিল, সাইকেলে সব সময় বাঁ দিকে টার্ন নেওয়ার চেষ্টা করবি, ডান দিকে হঠাৎ টার্ন নেওয়া ডিফিকাল্ট। কিন্তু এখানে বাঁ দিকে টার্ন নিতে গেলে যে সোজা লেকের জলে নেমে যেতে হবে।

উল্টোদিকের দলটা সন্তুর একেবারে কাছে এসে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিল, "বাঁ দিক চেপে...বাঁ দিক চেপে !"

সন্তু আর কিছু চিন্তা না করে ডান দিকে ঘুরিয়ে দিল হ্যাণ্ডেল।

পরের মুহূর্তটা সে চোখে কিছু দেখতে পেল না। কী যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল পৃথিবীতে। একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে সন্তু ছিটকে পড়ে গেল, তারপর সাইকেলটাও পড়ল তার ঘাড়ের ওপর।

কোনওরকম ব্যথা বোধ করার আগেই সন্তু ভাবল, চোখ দুটো ঠিক আছে তো? পায়ের হাড় ভেঙে গেছে?

রকুকু ছুটে আসছিল সন্তুর পেছন পেছন। সাইকেলটা পড়ে যেতে দেখে সে ভয় পেয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল।

সাইকেলটা সরিয়ে সন্তু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারল না। একজন মর্নিং ওয়াকার সাইকেলটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "খুব লেগেছে নাকি, খোকা? আমার হাত ধরে ওঠবার চেষ্টা করো।"

ততক্ষণে কুনাল আর বাপি এসে পৌঁছে গেল সেখানে।

কুনাল বলল, "এই ওঠ্, তোর কিচ্ছু হয়নি!"

বাপি বলল, "জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার/সাইকেল শেখে না কেহ না খেলে আছাড়!"

মর্নিং ওয়াকার ভদ্রলোক বললেন, "না হে, ওর বেশ ভালই লেগেছে মনে হচ্ছে, হাঁটুর কাছে রক্ত বেরোচ্ছে!"

কুনাল বলল, "আমার ওর থেকে ঢের বেশি রক্ত বেরিয়েছিল। সাইকেল শিখবে, আর একবারও রক্ত বেরুবে না?"

ভদ্রলোকটি আবার হাঁটা শুরু করে দিলেন।

কুনাল আর বাপি দু'হাত ধরে সন্তুকে টেনে তুলল। কুনাল বলল, "সাইকেলটা টাল খেয়ে গেছে শুধু, আর কিছু হয়নি ভাগ্যিস!"

সন্তু মাঝে-মাঝে ফুলপ্যান্ট পরলেও সাইকেল চালাবার জন্য পরে এসেছে শর্টস আর গেঞ্জি। তার একটা হাঁটুর নুন-ছাল উঠে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে ফোঁটা ফোঁটা। সেখানে খানিকটা জ্বালা করলেও আসল ব্যথা হচ্ছে সন্তুর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে।

এক পা চলার চেষ্টা করেই সন্তু উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল। যন্ত্রণায় প্রায় চোখে জল এসে গেল তার।

বাপি বলল, "কী রে, তুই এত সব বিপদের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার করতে যাস, আর সামান্য একটু পায়ের ব্যথায় কেঁদে ফেললি?"

সন্তু বলল, "ভীষণ লাগছে, মাটিতে পা ফেলতে পারছি না।"

কুনাল বলল, "জোর করে হাঁটার চেষ্টা কর, একটু বাদে ঠিক হয়ে যাবে!"

সন্তু বলল, "যদি ফ্র্যাকচার হয়ে থাকে?"

কুনাল বলল, "ধ্যাত, অত সহজে ফ্র্যাকচার হয় না।"

রকুকু আবার এর মধ্যে সন্তুর পা চেটে দিতে চায়। সন্তু কুনালকে বলল, "ওর গলার চেনটা বেঁধে নে।"

এর পর আর সাইকেল চালাবার প্রশ্ন ওঠে না। কুনাল সাইকেলটা ঠিক করে নিল। বাপির কাঁধে ভর দিয়ে সন্তু হাঁটতে লাগল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তার সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে আছে, কোনও কথা বলছে না।

খানিকক্ষণ চলার পর বাপি বলল, "কী রে, তুই যে এখনও ল্যাংচাচ্ছিস? জোর করে বাঁ পাটা ফেলার চেষ্টা কর।"

সন্তু ধরা গলায় বলল, "কিছুতেই পারছি না। হাড় ভেঙে গেছে নিশ্চয়ই।"

বাপি হাসতে হাসতে বলল, "যাঃ, তা হলে কী হবে? তুই তো আর কোনও অ্যাডভেঞ্চারে যেতে পারবি না। তোর কাকাবাবুর একটা পা তো, ইয়ে, মানে ডিফেকটিভ। তুই যদি খোঁড়া হয়ে

যাস, তা হলে তো তোকে আর উনি সঙ্গে নেবেন না !”

কুনাল বলল, “এই বাপি, ওরকম নিষ্ঠুরের মতন কথা বলিস না। ওর পা আবার ঠিক হয়ে যাবে।”

সন্তুর মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বাপি তো ঠিকই বলেছে। সে খোঁড়া হয়ে গেলে তো কাকাবাবুকে আর কোনও সাহায্য করতে পারবে না ! তার জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে গেল ?

খানিকটা পথ পার হবার পর কুনাল জিজ্ঞেস করল, “একটা রিকশায় উঠবি, সন্তু ?”

সন্তু দু'দিকে মাথা নাড়ল। বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামলে মা ভয় পেয়ে যাবেন। আগেই মাকে কিছু বলার দরকার নেই। বিমানদার দাদা ডাক্তার, তাঁকে দেখিয়ে নিতে হবে একবার।

সন্তুদের বাড়ির কাছেই বিমানদাদের বাড়ি। বিমানদা পাইলট, তিনি বাড়ি নেই, নিউ ইয়র্কে গেছেন। বিমানদার দাদাও নার্সিং হোমে চলে গেছেন জরুরি কল পেয়ে। দুপুরবেলা তিনি বাড়িতে খেতে আসেন, সেইসময়ে সন্তুকে আবার আসতে হবে।

কাছেই একটা স্টেশনারি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু, কী যেন কিনছেন। ক্রাচ না নিয়ে কাকাবাবু হাঁটতে পারেন না, তবু প্রত্যেক দিন সকালে তাঁর মর্নিং ওয়াকে বেরুনো চাই।

সন্তু প্রথমে কাকাবাবুকে দেখতে পায়নি। বাপি তার কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, “এই সন্তু, দ্যাখ...”

সন্তু মুখ ফিরিয়ে দেখল কাকাবাবু তার দিকেই চেয়ে আছেন। সন্তুকে খোঁড়াতে দেখে তিনি মিটিমিটি হাসছেন, মুখে কিছু বললেন না !

অন্য যে-কোনও বাড়ির বাবা-কাকারা তাঁদের বাড়ির ছেলেকে এইরকম অবস্থায় দেখলে দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে বলতেন, "অ্যাঁ, কী হয়েছে? কী করে পড়লি? হাড় ভেঙে গেছে?" ইত্যাদি ইত্যাদি। কাকাবাবু সন্তুকে ওই অবস্থায় দেখে পাত্তাই দিলেন না।

এমন কী, একটু বাদে বাড়ি ফিরেও কাকাবাবু মাকে কিছুই বললেন না।

সন্তু নিজের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। এখন দু'তিন ঘণ্টা তার পড়ার সময়, ঘর থেকে না বেরুলেও চলবে। ব্যথাটা ক্রমশই বাড়ছে, বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছটা বেশ ফুলে গেছে। একটু আয়োডেক্স মালিশ করলে হত। আয়োডেক্সের একটা টিউব ছিল যেন বাড়িতে কোথায়, কিন্তু দরকারের সময় তো সে-সব খুঁজে পাওয়া যাবে না। মায়ের কাছেও চাইতে সাহস পাচ্ছে না। সন্তু জানে, মা জানতে পারলে এক্ষুনি কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন, তারপর এক্স-রে, তারপর আরও কত কী! পায়ে প্লাস্টার করিয়ে শুইয়ে রাখবেন এক মাস। ওই প্লাস্টার জিনিসটা সন্তু একদম পছন্দ করে না! এক মাস বিছানায় শুধু-শুধু শুয়ে থাকা...অসহ্য!

বিমানদার দাদা অবনীদা নিজে খেলাধুলো করেন। তিনি নিশ্চয়ই একটা সহজ ব্যবস্থা করে দেবেন। মা সকালের দিকে অনেকটা সময় স্নান আর রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, সহজে টের পাবেন না।

বেলা এগারোটা আন্দাজ সন্তু বারান্দায় খটখট শব্দ পেয়ে বুঝল কাকাবাবু আসছেন তার ঘরে। পড়ার টেবিল থেকে সন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

দরজার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস

করলেন, "কী রে, বাড়িতে কাউকে কিছু বলিসনি তো ? পা যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, তা হলে কি এমনি-এমনি সারবে ?"

সন্তু কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

কাকাবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে ক্রাচ দুটো নামিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, "এদিকে আয়, হাঁটবার চেষ্টা কর, দেখি কতদূর কী হয়েছে !"

কাকাবাবু গুরুজন হয়ে তার পায়ে হাত দেবেন, এটা ভেবে সন্তু আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল। কিন্তু আপত্তি জানিয়েও কোনও লাভ নেই।

সন্তু এক পায়ে লাফাতে লাফাতে চলে এল কাকাবাবুর কাছে। কাকাবাবু বসে পড়ে সন্তুর বাঁ পাটা দু' হাতে ধরলেন। সন্তুর গা শিরশির করছে। ওইখানটায় হাত দিলেই ব্যথা।

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, বেশ ফুলেছে দেখছি !"

তারপর পা'টা বেশ জোরে চেপে ধরে সন্তুর চোখে চোখ রেখে বললেন, "শোন্, যতই ব্যথা লাগুক, চ্যাঁচানো চলবে না কিন্তু। দেখি কী রকম তোর মনের জোর। মন শক্ত করেছিস তো ? এক...দুই...তিন !"

কাকাবাবু স্যাট করে সন্তুর গোড়ালিটা ঘুরিয়ে দিলেন। সন্তুর মুখখানা মস্ত বড় হাঁ হয়ে গেল, তবু সে কোনও শব্দ করল না। মনে হল যেন কাকাবাবু তার পায়ের হাড় ভেঙে দিলেন মট্ করে।

কাকাবাবু বললেন, "যা, ঠিক হয়ে গেছে, আর কিছু হবে না।"

সন্তু প্রকাণ্ড বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বলল, "ঠিক হয়ে গেছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "মট্ করে একটা শব্দ পেলি না ? তাতেই তো হাড় আবার সেট হয়ে গেল। তোর গোড়ালিটা একটু ঘুরে

গিয়েছিল।”

উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু বললেন, “আমি অনেককাল পাহাড়ি লোকেদের মধ্যে কাটিয়েছি তো। সেখানে তো ডাক্তার পাওয়া যায় না, ওরা এইরকমভাবে চিকিৎসা করে। আমি ওদের কাছ থেকে শিখেছি।”

সন্তুর চোখ অটোমেটিক্যালি কাকাবাবুর পায়ের দিকে চলে গেল।

কাকাবাবু বললেন, “তুই ভাবছিস তো আমার পা'টা কেন এইভাবে সারাতে পারিনি? আমার পায়ের ওপর এই অ্যাত্তো বড় একটা পাথরের চাঁই এসে পড়েছিল, এখানকার হাড়গোড় একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। পা'টা যে কেটে বাদ দিতে হয়নি তাই যথেষ্ট। তুই এবারে একটু হাঁটার চেষ্টা করে দ্যাখ্ তো!”

আশ্চর্য ব্যাপার, পায়ে এখনও ব্যথা আছে যদিও, তবু সন্তু দু'পা ফেলে হাঁটতে পারছে।

কাকাবাবু বললেন, “আমার মনে হচ্ছে ঠিক হয়ে গেছে। তবু একবার বিমানের দাদার কাছে গিয়ে দেখিয়ে নিস।”

গরমের ছুটি, তাই স্কুল-কলেজ বন্ধ। সারাদিন সন্তু বাড়িতেই বসে রইল। পায়ের ব্যথা ক্রমশই কমে যাচ্ছে আর সন্তুরও মন ভাল হয়ে উঠছে। বিকেলে অবনীদার চেম্বারে যাবার পর তিনি ওর পা দেখে বললেন, “কই, কিছু হয়নি তো। একটু-আধটু মচ্‌কে গেলে চিন্তার কী আছে? বাড়িতে গিয়ে মাকে বলো একটু চুন-হলুদ গরম করে ওখানটায় লাগিয়ে দিতে।”

পরদিন ভোরবেলা সন্তুর ঘরের দরজায় খটখট শব্দ হল। দরজা খুলে সন্তু দেখল কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল, আজ আর সাইকেল শিখতে যাবি না?”

সন্তু আকাশ থেকে পড়ল। সাইকেল ? সাইকেল শেখার চিন্তা তো সে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেছে। ওই অপয়া সাইকেলটার জন্যই তো কাল তাকে অত কষ্ট পেতে হল। কী হয় সাইকেল শিখে ? এটা গাড়ির যুগ। আর একটু বড় হয়ে সন্তু গাড়ি চালানো শিখবে।

সন্তু বলল, "আমি আর সাইকেল শিখব না, কাকাবাবু!"

কাকাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ? সাইকেল কী দোষ করল ? তুই পড়ে গেছিস, সেটা তো সাইকেলের দোষ নয়। কিছু একটা শিখতে শিখতে মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়।"

সন্তু তবু গাঁইগুঁই করে বলল, "পায়ে এখনও একটু-একটু ব্যথা, যদি আবার লেগেটেগে যায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "আবার লেগে গেলে আবার সারবে। সাইকেল শেখাটা ভয় পেয়ে একবার ছেড়ে দিলে আর শেখা হবে না। যা, যা, বেরিয়ে পড়! সাইকেলটা একবার শিখে নিলে দেখবি ভবিষ্যতে কত কাজে লাগবে!"

সন্তু ভেবেছিল, আজ বেশ অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকবে। কাকাবাবুর তাড়নাতে তাকে বেরিয়ে পড়তেই হল। কুনালের বাড়ির দিকে যেতে-যেতে সে ভাবল, কাকাবাবু সাইকেল শেখার ওপর এত জোর দিচ্ছেন কেন ? এবারে যেখানে যাওয়া হবে, সেখানে কি সাইকেল চালানো দরকার হবে ?

সন্তুর মন বলছে, শিগগিরই কোথাও যাওয়া হবে। লম্বা, ফর্সা মতন একজন বুড়োলোক প্রায়ই আসছেন কাকাবাবুর কাছে। লোকটি ঠিক সাহেব নয়, আবার ভারতীয় বলেও মনে হয় না। লোকটি কাকাবাবুকে কোথাও নিয়ে যেতে চান। সন্তু একদিন শুনতে পেয়েছিল, বুড়ো লোকটি ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বলছেন,

"ইউ কাম্... আই উইল মেক অল অ্যারেঞ্জমেন্টস্ ।"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "দাঁড়ান, যাওয়াটা ওয়ার্থহোয়াইল হবে কি না আগে চিন্তা করে দেখি ?"

লোকটি যে কোথায় যাওয়ার কথা বলছেন, সেটা সন্তু বুঝতে পারেনি । লোকটি কি কাশ্মীরি ? কিংবা কাবুলের লোক ?
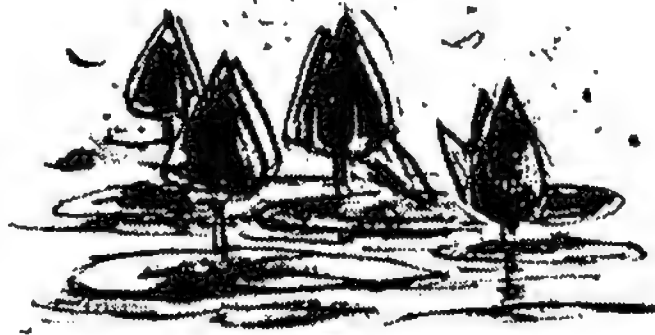
দিদির বন্ধু স্নিগ্ধাদির বর সিদ্ধার্থদা কলেজে পড়ানোর কাজ ছেড়ে ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন । এখন বাইরে-বাইরে থাকেন । সেই যে সেবার কাশ্মীরে কনিষ্কর মুণ্ডু উদ্ধার করার ব্যাপারে সিদ্ধার্থ অনেক সাহায্য করেছিলেন, তারপর থেকে আর অনেকদিন সিদ্ধার্থদার সঙ্গে সন্তুর দেখাই হয়নি । সিদ্ধার্থদারা কয়েক বছর কাটালেন বেলজিয়ামে, তারপর সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন কানাডায় । আবার যেন কোথাও বদলি হয়েছেন, সেই ফাঁকে বেড়াতে এসেছেন কলকাতাতে ।

স্নিগ্ধাদি একদিন এসেছিলেন সন্তুদের বাড়িতে । দিদি তো এখানে নেই, দিদি এখন ভূপালে । মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প করার পর স্নিগ্ধাদি সন্তুকে নেমন্তন্ন করলেন তাঁদের বাড়িতে ।

সিদ্ধার্থদা আবার শখের ম্যাজিশিয়ান । খাওয়া-দাওয়ার পর সিদ্ধার্থদা ম্যাজিক দেখাতে লাগলেন কয়েকটা । সন্তু অনেক ম্যাজিকের বই পড়েছে, সিদ্ধার্থদার সব কটা ম্যাজিকই সে ধরে ফেলতে পারত । কিন্তু ম্যাজিকের আসরে ওরকম করা উচিত নয় বলে সে চুপ করে রইল । শেষকালে একটা তাসের ম্যাজিকে

সিদ্ধার্থদা একটুখানি ভুল করে ফেলায় সন্তু আর হাসি চাপতে পারল না !

সিদ্ধার্থদা বললেন, "এই, তুমি হাসলে কেন ? দেখবে, তোমার জামার পকেট থেকে আমি একটা মুরগির ডিম বার করে দেব ?"

স্নিগ্ধাদি বললেন, "আহা, তোমার যা পচা-পচা ম্যাজিক, সন্তু ঠিক ধরে ফেলেছে !"

সিদ্ধার্থ ভুরু কুঁচকে সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সন্তু মানে ? দা গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার ? আমি তো ওকে চিনতেই পারিনি, অনেক বড় হয়ে গেছে !"

ম্যাজিক দেখানো বন্ধ করে সিদ্ধার্থদা সন্তুকে কাছে ডেকে নানান গল্প শুরু করে দিলেন। এক সময় তিনি বললেন, "জানো সন্তু, কানাডায় আমাদের এমব্যাসির ছেলেমেয়েদের জন্য একদিন 'সবুজ দ্বীপের রাজা' সিনেমাটা দেখানো হল। তুমি আর কাকাবাবু যে একেবারে আন্দামানে জারোয়ারদের মধ্যে চলে গিয়েছিলে, আমি তো জানতুমই না ! তুমি তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছিলে। আমি একেবারে থ্রিল্‌ড !"

সন্তু লাজুক-লাজুক মুখ করে রইল।

সিদ্ধার্থদা জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর আর কোথাও গিয়েছিলে ?"

সন্তু তাদের অভিযানের কাহিনী শোনাতে লজ্জা পায়। সে বলল, "এই, আরও দু'এক জায়গায়..."

সিদ্ধার্থদা বললেন, "আমার এবার পোস্টিং কোথায় জানো তো ? ইজিপ্টে। কাকাবাবুকে বলো না, সেখানে একবার চলে আসতে ? সেখানেও তো কত রহস্যময় ব্যাপার আছে, পিরামিড, স্ফিংকস, মরুভূমি..."

স্নিগ্ধাদি বললেন, "হ্যাঁ, চলো এসো, বেশ মজা হবে, আমরাও

থাকব।”

সন্তু বলল, “শুধু আমি যেতে চাইলেই তো হবে না। কাকাবাবু অন্য একটা কাজ নিয়ে এখন ব্যস্ত আছেন।”

কয়েকদিন আগে কাকাবাবু চলে গেছেন দিল্লিতে। সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্যই করেননি। যাওয়ার দিন সন্তুই নিজে থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, “কাকাবাবু, আমাকে নিয়ে যাবেন না?”

কাকাবাবু বলেছিলেন, “না রে, তুই গিয়ে কী করবি? আমি যাচ্ছি সরকারি কাজে। প্লেনে যাব, প্লেনে আসব, কোনও অসুবিধে তো নেই!”

কিন্তু সন্তুর সন্দেহ হয়েছিল, দিল্লি থেকে কাকাবাবু আর যাবেন। সেই ফর্সা, লম্বা বৃদ্ধ লোকটি এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় তুলে নিতে এসেছিলেন কাকাবাবুকে। সন্তুর বেশ মন খারাপ হয়েছিল।

সন্তুর আবার মন খারাপ হয়ে গেল, যখন শুনল যে, স্নিগ্ধাদির বোন রিনিও এবারে ওঁদের সঙ্গে যাবে ইজিপ্টে। রিনি সন্তুর চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট, এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। সে দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। রিনি সন্তুর আগেই ফরেন কান্ট্রিতে যাচ্ছে? সন্তু এ-পর্যন্ত বিদেশ বলতে শুধু নেপাল ঘুরে এসেছে। অবশ্য নেপালও খুব সুন্দর জায়গা।

সন্তুর আবার যেতে ইচ্ছে করে।

রিনি বলল, “সিদ্ধার্থদা, ইজিপ্ট থেকে গ্রিস তো খুব দূরে নয়! আমাকে একবার গ্রিস ঘুরিয়ে আনবেন তো?”

সিদ্ধার্থদা বললেন, “হ্যাঁ, গ্রিস তো ঘুরে আসাই যায়। ইচ্ছে করলে আমরা রোমেও যেতে পারি। আমার রোম দেখা হয়নি।”

গ্রিস, রোম, এইসব নাম শুনলে সন্তুর রোমাঞ্চ হয়।

আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজার এইসব নাম মনে পড়ে।

সন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এল।

সামনে অনেকদিন ছুটি, সন্তুর আর সময়ই কাটতে চায় না। কুনাল চলে গেছে ওর মামাবাড়ি ভাগলপুরে। বাপিও দার্জিলিং যাবে-যাবে করছে। খেলাধুলো জমছে না। বাড়িতে যত বই ছিল, সবই সন্তুর পড়া, নতুন বই আর যোগাড় করা যাচ্ছে না।

কিছু একটা করতে হবে তো। একদিন দুপুরবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সন্তু ঠিক করল, সে একা একাই এবার থেকে এক-একটা রহস্য সমাধানের চেষ্টা করবে। কাকাবাবুর যদিও অনেকের সঙ্গেই চেনাশুনো, তবু কাকাবাবুও তো বিশেষ কারও সাহায্য নিতে চান না।

ক'দিন ধরেই কাগজে একটা খবর বেরুচ্ছে। তিলজলায় একটা পুকুরে এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি ছেলে ডুবে গেছে। কিন্তু তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেউ জলে ডুবে গেলে কিছুক্ষণ বাদে তার মৃতদেহটা ভেসে উঠবেই। পুকুরটা বেশি বড় নয়। অথচ পোর্ট কমিশনার্সের পেশাদার ডুবুরিরাও কয়েক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করে ছেলে দুটির কোনও চিহ্ন দেখতে পায়নি।

ছেলেদুটিকে ডুবে যেতে অনেকেই দেখেছে। ঘটনা দুটিই ঘটেছে বিকেলবেলা। গরমের দিনে এই সময় অনেকেই ওই পুকুরে স্নান করতে আসে। ওই ছেলেদুটি জলে নামল, আর উঠল না, তা হলে ওরা গেল কোথায়? অনেকে বলছে, ওই পুকুরের তলায় নিশ্চয়ই গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে। অনেক কালের পুরনো পুকুর, সেই নবাবি আমলের। পেশাদার ডুবুরিরা অবশ্য কোনও সুড়ঙ্গের কথা বলেনি। এতদিন ওই পুকুরে অনেকেই স্নান করছে, কারও কিছু হয়নি, হঠাৎ এক সপ্তাহের মধ্যেই দুটি ছেলে অদৃশ্য হয়ে গেল কী করে?

সন্তু মনে-মনে এই কেসটা টেক আপ করে নিল।

তিলজলা জায়গাটা কোথায়? সন্তু কোনওদিন ওই নামের জায়গায় যায়নি, তার চেনা কেউ ওখানে থাকেও না। তিলজলা কী করে খুঁজে পাওয়া যায়? কুনাল ওর সাইকেলটা সন্তুর কাছে রেখে গেছে। ইচ্ছে করলে সন্তু এখন সাইকেলে কলকাতার যে-কোনও অঞ্চলে চলে যেতে পারে।

রাস্তার মোড়ে একটা বই-পত্রপত্রিকার স্টল আছে। সেই স্টলের মালিক গুপিদা বেশ ভালমানুষ ধরনের। সন্তু ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় থেকেই এই স্টল থেকে ম্যাগাজিন, কমিক্স, গল্পের বই কেনে। গুপিদা তাকে চেনেন।

সন্তু সেই স্টল থেকে কলকাতার একটা ম্যাপ কিনে পাশের দেওয়ালে মেলে ধরল। কিন্তু তাতেও সে তিলজলা খুঁজে পায় না। কী ব্যাপার, তা হলে কি তিলজলা কলকাতার মধ্যে নয়, বাইরে কোথাও?

গোল-গোল নিকেলের ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে গুপিদা চেয়ে ছিলেন সন্তুর দিকে। চোখাচোখি হতেই তিনি বললেন, "ভাল, নিজের শহরটাকে ভাল করে চেনা উচিত প্রত্যেকেরই।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "গুপিদা, তিলজলা জায়গাটার নাম খুঁজে পাচ্ছি না কেন?"

গুপিদা বললেন, "পাচ্ছ না? পিকনিক গার্ডেনস দ্যাখো, তার পাশেই পাবে।"

সন্তু অবাক। পিকনিকের জন্য বাগান, সেখানে সবাই পিকনিকের জন্য যায়? সন্তু তো এরকম কোনও জায়গার নামই শোনেনি।

গুপিদা ওর হাত থেকে ম্যাপটা নিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "এই দ্যাখো, ভবানীপুর, এই হাজরা

মোড়, এই হল বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, তারপর এই বণ্ডেল রোড ধরে সোজা গেলে রেল-লাইনের লেভেল ক্রসিং পাবে, তার ওপারে... ।

বেলা এখন চারটে । সঙ্গে আর কাউকে নিলে হত । বাপিকে ডাকবে ? কিন্তু বাপির এইসব ব্যাপারে কোনও উৎসাহ নেই । থাক, সন্তু একাই যাবে । সাইকেলটা না নিয়ে যাওয়াই ভাল । লোকের চোখে পড়ে যাবে । সন্তু হাঁটতে শুরু করে দিল ।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেল সহজেই । লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল বণ্ডেল রোড কোন্‌টা । কতদিনই সন্তু একলা-একলা রাস্তা দিয়ে হাঁটে । কিন্তু আজকে একেবারে অন্যরকম লাগছে । আজ সন্তু এমন একটা কাজ নিয়ে যাচ্ছে, যার কথা পৃথিবীতে আর কেউ জানে না । সন্তুর কি মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে ? রাস্তার প্রায় সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে কেন ?

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে অন্য দিকে চলে এল সন্তু । যেন কলকাতা নয়, যেন অন্য একটা নতুন জায়গায় বেড়াতে এসেছে সে । যদিও জায়গাটাতে নতুনত্ব কিছু নেই, ভাঙা, ঘিঞ্জি রাস্তা, বাস আর সাইকেল-রিকশা চলছে ।

খানিকদূর এগোবার পর আর-একটা সমস্যা মাথায় এল সন্তুর । কোন্ পুকুরে ছেলেদুটো ডুবে গিয়েছিল, তা কী করে বোঝা যাবে ? তিলজলাতে কি একটাই পুকুর আছে ? পিকনিক গার্ডেনস তার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে ? কত বড় বাগান ? সেখানেও নিশ্চয়ই পুকুর থাকবে ! ঘটনাটা কি সেখানেই ঘটেছিল ?

সন্তু একটা সাইকেল-রিকশা ডেকে উঠে পড়ল ।

চালক জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবেন ?"

সন্তু বলল, "পিকনিক গার্ডেনে ।"

সাইকেল-রিকশার চালক একটু বিরক্তভাবে বলল, "অ্যাঁ? এটাই তো পিকনিক গার্ডেন।"

সন্তু রাস্তার চারপাশে বাড়িগুলোর দিকে তাকাল। কোনও বাগান তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পুকুর কোথায়?

সন্তুর মনে হল, ইনভেস্টিগেটর হতে গেলে আগে সব রাস্তা-টাস্তাগুলো ভাল করে চেনা দরকার। এবার থেকে সে নিয়মিত কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখানে একটা পুকুর আছে?"

চালক বলল, "একটা কেন, অনেক গণ্ডা পুকুর আছে। কোথায় যাবেন সেটা বলুন না। ঠিকানা কী?"

সন্তু বলল, "ঠিকানাটা মনে নেই, আমার পিসিমার বাড়ি, কাছেই একটা পুকুর আছে...ওই যে যে-পুকুরে দুটো ছেলে ডুবে গেছে..."

চালক আর বাক্যব্যয় না করে প্যাড্‌ল ঘোরাল।

একটু বাদেই বড় রাস্তা ছেড়ে সাইকেল-রিকশাটা ঢুকল একটা মাঝারি রাস্তায়। কয়েকবার ডান-দিক বাঁ-দিক ঘুরে সেটা এসে থামল একটা পুকুরের সামনে।

চালক জিজ্ঞেস করল, "এবারে চেনা লাগছে?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, ওই তো ওই কোণের বাড়িটা!"

ভাড়া পেয়ে সাইকেল-রিকশার চালক চলে গেল উল্টো দিকে। কোনও কারণ নেই, তবু সন্তুর বুকটা এত টিপটিপ করছে। এই সেই পুকুর, যার মধ্যে রহস্যময় কিছু আছে, যে দুটো ছেলেকে টেনে নিয়েছে, আর ফিরিয়ে দেয়নি।

পুকুরটা বেশ বড়ই। কালো রঙের জল। মাঝখানটায় কিছু কচুরিপানা রয়েছে, তাতে সুন্দর হালকা-নীল রঙের ফুলও ফুটেছে। পুকুরটার তিনদিকেই বাড়ি, একটা দিক ফাঁকা।

সেখানে খানিকটা ঝোপঝাড়ের মতন হয়ে আছে, তারপর খানিকটা দূরে একটা কারখানা।

সন্তু ভেবেছিল যে, এখানে অনেক লোকজন দেখতে পাবে। পুলিশ, দমকল, খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফার... । কিন্তু কেউই নেই। খবরের কাগজ পড়লে মনে হয়, এই জায়গাটা বুঝি ভিড়ে-ভিড়াক্কার হয়ে গমগম করছে! একটা লোকও স্নান করছে না পুকুরে। রাস্তা দিয়ে দু'চারজন লোক যাচ্ছে, কিন্তু কারও কোনও কৌতূহল আছে বলেও মনে হয় না।

পুকুরটার জলের দিকে তাকিয়ে মিনিট পাঁচেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সন্তু। কাকাবাবু হলে কী করে এই রহস্যটার সমাধান করতেন? খবরের কাগজ পড়লে মনে হয়, ডুবুরিরা কিছু খুঁজে পায়নি বলে পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ছেলেদুটো তো জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না!

যে-জায়গায় কোনও ঘটনা ঘটে, সে-জায়গাটা কাকাবাবু নিজের চোখে দেখতে যান সব সময়। খবরের কাগজ পড়েই তো তিনি সুন্দরবনের নদীতে খালি জাহাজটা দেখতে গিয়েছিলেন। এখানে এসে কি কাকাবাবু জলে নেমে পড়তেন? পায়ের জখমের জন্য কাকাবাবুর সাঁতার দিতে অসুবিধে হয়। তা হলে? কাকাবাবু নিশ্চয়ই সন্তুকে বলতেন জলে নামতে।

সন্তু ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু অচেনা জায়গায় এই রকম একটা পুকুর, কালো মিশমিশে জল, এখানে নামার কথা ভাবতেই সন্তুর ভয়-ভয় করছে। কাকাবাবু সঙ্গে থাকলে কক্ষনো ভয় করে না। খোঁড়া পা দিয়ে কাকাবাবু নিজে কত সাংঘাতিক বিপদের দিকে এগিয়ে যান, শুধু মনের জোরে।

একটা লোকও এই পুকুরের জলের ধারেকাছে নেই। সবাই ভয় পেয়েছে? একটা পুকুরের জলে ভয়ংকর কী থাকতে পারে?

খবরের কাগজে লিখেছে, ডুবুরিরা জল তোলপাড় করে কিছুই দেখতে পায়নি। কোনও গোপন সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা কোনও অদ্ভুত জন্তু লুকিয়ে আছে ?

শুধু-শুধু জলের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। ফিরে যাবে ? কিছুই করা গেল না ? প্রথম কেস হাতে নিয়েই সন্তু হেরে যাবে ? যদিও কেউ জানে না, তবু সন্তুর লজ্জা লাগছে।

পুকুরটার চারপাশটা অন্তত একবার ঘুরে দেখা দরকার। রাস্তার ঠিক উল্টো দিকটায় যেখানে ঝোপঝাড় রয়েছে, সেখানে কি কোনও ঘাট আছে ? ছেলে দুটো ডুব-সাঁতারে ওপারে গিয়ে ওই ঝোপের মধ্যে যদি লুকিয়ে থাকে, তাহলে অনেকেই ভাবতে পারে ওরা ডুবে গিয়ে আর ওঠেনি। মজা করার জন্য ছেলেদুটো এরকম করতেও পারে।

সন্তু পুকুরের পাড় ধরে হাঁটতে লাগল। তিনদিকে তিনটে ঘাট আছে, তার মধ্যে একটা ঘাট বেশ বড়, থাক-থাক ইটের সিঁড়ি, দু'পাশে বসবার জায়গা।

যে-দিকটায় ঝোপঝাড়, সেই দিকটা বেশ নোংরা। বোধহয় কারখানার লোকেরা তাদের আবর্জনা এই দিকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে। ভাঙা কাচ, চায়ের খুরি, ময়লা ন্যাকড়া ছড়িয়ে আছে অনেক। অনেক বড়-বড় ঘাস গজিয়ে গেছে এখানে। একটা বা দুটো ছেলে ইচ্ছে করলে অনায়াসেই এই ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে।

এই জায়গাটার মাটি থসথসে, কাদা-কাদা। চার-পাঁচদিন আগেও যদি কেউ এ-দিকটায় এসে থাকে তাহলে তার পায়ের চিহ্ন এখনও পাওয়া যাবে। একটা বেশ গর্তও রয়েছে, কেউ মাটি কেটে নিয়ে গেছে। সন্তু এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ নজর রেখে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ সে দেখতে পেল, এক জায়গায় একটা হলদে

রঙের জামা পড়ে আছে। জামাটা দেখে খুব পুরনো বলে মনে হয় না। সন্তুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখানে একটা জামা এল কী করে?

জামাটার খানিকটা রয়েছে ঝোপের মধ্যে, খানিকটা জলে ডুবে আছে। সন্তু পা টিপে-টিপে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জামাটা তুলতে যেতেই এক কাণ্ড হল।

পায়ের তলার নরম মাটি ধসে গিয়ে সন্তু হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল জলে। ভাল সাঁতারু হলেও সে ভয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। তার মনে হল, কুমিরের চেয়েও সাংঘাতিক কোনও জন্তু এক্ষুনি তাকে কামড়ে দেবে!

সে-রকম কিছুই হল না। প্রথম পড়ার ঝোঁকে সন্তু চলে গেল অনেকখানি জলের মধ্যে। পুকুরটা খুব খাড়া আর পিছল, পা রাখা যায় না। ডুবজল থেকে উঠে আসবার পর দাঁড়াবার চেষ্টা করেও তার পা হড়কে যেতে লাগল বারবার। তারপর সে সাঁতরে পারের কাছে এসে এক গোছা ঘাস মুঠো করে ধরল, অমনি সেখানকার মাটিও খসে পড়ল।

কয়েকবার এরকম চেষ্টা করার পর সন্তু উঠে এল ওপরে। জামা প্যান্ট একেবারে জবজবে ভিজে, জুতো কাদায় মাখামাখি। মাথায় শ্যাওলা জড়িয়ে গেছে। জামার পকেটে দু'খানা দু'টাকার নোট ছিল, সে দুটি বুঝি গেছে একেবারে।

একটা গোলমাল শুনে সন্তু মুখ তুলে তাকাল। পুকুরের ওপারে রাস্তার ধারে একদল লোক জমেছে সবাই সন্তুকেই দেখছে আর কী যেন বলাবলি করছে। তারপর তারা দৌড়ে আসতে লাগল এদিকে।

তারা কাছাকাছি আসতেই সন্তু শুনতে পেল, কয়েকজন চেঁচিয়ে বলছে, 'মরা ছেলে ফিরে এসেছে! মরা ছেলে ফিরে এসেছে!

সুড়ঙ্গ দিয়ে পাতালপুরীতে চলে গিয়েছিল !'

এ-কথা শুনে সন্তুর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। এই রে, এরা কি ভেবেছে, জলে-ডোবা দুজন ছেলের মধ্যে সে একজন ? তিন-চার দিন পর কেউ জলের তলা থেকে ফিরে আসতে পারে ? এ কি রূপকথা নাকি ?

লোকগুলো সন্তুকে ঘিরে ধরে এমন চ্যাঁচামেচি করতে লাগল যে, সন্তু কোনও কথাই বলতে পারল না। অনেকেরই ধারণা, সন্তু

সেই ডুবে যাওয়া ছেলেদের একজন। কয়েকজন অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করল যে, এর পায়ে জুতো রয়েছে কেন ? জুতো পরে তো কেউ সাঁতার কাটতে নামে না। তাদের কথায় বিশেষ কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। একজন বেশ গলা চড়িয়ে বলল, "আমিই তো প্রথম দেখেছি, মাঝপুকুরে ভুশ করে জল ঠেলে উঠল, তারপর সাঁতরে-সাঁতরে এই দিকে চলে এল।"

ক্রমশই বেশি ভিড় জমছে। মজা দেখবার জন্য পাড়ার

ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ির বউরাও ছুটে আসছে। কেউ বলল, 'ওর মুখ শুকিয়ে গেছে, ওকে দুধ খাওয়াও!' কেউ বলল, 'পুলিশে খবর দাও!' কেউ বলল, 'খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফারকে ডাকো।'

একজন বয়স্কমতন ভারিক্কি চেহারার লোক সন্তুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই যে খোকা, তুমি সন্ধেবেলা এখানে কী করছিলে? কোথা থেকে এলে?"

সন্তু উত্তর দিতে পারল না।

'লোকটি বলল, "মিস্টিরিয়াস ব্যাপার। তিন দিন ধরে এই পুকুরের জল কেউ ছোঁয় না, অথচ একটা ছেলে জল থেকে উঠে এল?"

সন্তু এবারে কোনওক্রমে বলে উঠল, "আমি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম!"

বয়স্ক লোকটি বিকট গলায় হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়াল অনেক দূর। সন্তুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। পাতালপুরীতে সন্তু কী দেখেছে, তা বলবার জন্য খোঁচাতে লাগল অনেকে। এর মধ্যে এসে পড়ল পুলিশ। সন্তুকে নিয়ে চলল থানায়।

সন্তু এসেছিল গোয়েন্দাগিরি করতে, তাকে থানায় যেতে হল চোরের মতন।

থানার বড়বাবু ভিড় হটিয়ে একা সন্তুকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। বড়বাবুর গায়ের রঙ খুব ফর্সা, মাথায় অল্প-অল্প টাক, দেখলে মনে হয় সিনেমার পুলিশ। তিনি ভুরু নাচিয়ে বললেন, "নাও, লেট মি হিয়ার ইওর সং! তুমি জামা-প্যান্ট-জুতো পরে পুকুরে ডুব দিয়েছিলে কেন?"

সন্তু বলল, "বলছি, আগে এক গেলাস জল খাব!"

সন্তুর গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ। কত দুর্গম জায়গায় কত রকম বিপদ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে সে। কিন্তু আজ কলকাতা শহরের মধ্যেই সে যে বিপদে পড়েছে, তার সঙ্গে আগের কোনও কিছুরই তুলনা হয় না। লোকগুলো যদি তাকে মারতে শুরু করত ? থানায় এসে সে অনেক নিরাপদ বোধ করছে।

জল খাবার পর সন্তু মুখ তুলতেই বড়বাবু বললেন, "নাও, মাই বয়, আমি সত্যি কথা শুনতে চাই, নাথিং বাট দা ট্রুথ..."

বড়বাবুর কথার মাঝখানেই সন্তু বলল, "আপনি স্পেশাল আই. জি. মিঃ আর. ভট্টাচার্য কিংবা ডি. আই. জি. ক্রাইম মিঃ বি. সাহাকে একবার ফোন করবেন ?"

কথা বলতে-বলতে থানার বড়বাবুর মুখখানা হাঁ হয়ে গেল। তিনি ভুরু নাচাতে ভুলে গেলেন।

সেই রকম অবস্থায় প্রায় এক মিনিট থেমে থেকে তিনি বললেন, "কাদের নাম বললে ? স্পেশাল আই. জি কিংবা ডি. আই. জি. ? এঁদের ফোন করব কেন ?"

সন্তু বলল, "ওঁরা দু'জনেই আমার কাকাবাবুকে চেনেন। আমাকেও চেনেন। পুলিশ কমিশনারও একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।"

বড়বাবু হাঁক দিলেন, "বিকাশ ! বিকাশ !"

আর-একজন পুলিশ অফিসার উঁকি মারতেই বড়বাবু বললেন, "ওহে বিকাশ, এ ছেলেটি যে বড়-বড় কথা বলে ! লম্বা-লম্বা পুলিশ অফিসারদের নাম করছে।"

সন্তু বলল, "আপনারা হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। আমার পরিচয়টা জানলে আপনাদের সুবিধে হবে। সেইজন্য আমি ওঁদের ফোন করতে বলছি।"

বিকাশ নামের কালো, লম্বা চেহারার পুলিশ অফিসারটি বলল,

"তোমার গল্পটা কী আগে শুনি ?"

সন্তু বলল, "ওই পুকুরটায় নাকি দুটো ছেলে ডুবে গেছে, তাদের আর পাওয়া যায়নি, সেইজন্য আমি পুকুরটা দেখতে এসেছিলুম।"

"তারপর জামা-জুতো পরে জলে নেমে গেলে ?"

"ইচ্ছে করে নামিনি। পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম।"

বড়বাবু বললেন, "তা তো হতেই পারে। পা পিছলে কি কেউ জলে পড়ে যেতে পারে না ?"

বিকাশ বলল, "স্যার, বাইরে অনেক লোক ভিড় জমিয়ে আছে। হই-হল্লা করছে। তারা এত সহজ গল্প বিশ্বাস করবে না !"

বড়বাবু রেগে উঠে বললেন, "তাদের জন্যে কি রোমহর্ষক গল্প বানাতে হবে ? মহা মুশকিল ! এ-ছেলেটি বড় বড় পুলিশ অফিসারদের নাম করছে, যদি সত্যিই তাঁদের সঙ্গে চেনা থাকে ? ফোন করো ! ফোন করো ! ওকে খোকা,কী নাম তোমার ?"

সন্তু বলল, "আমার কাকার নাম রাজা রায়চৌধুরী। তাঁর নাম বলুন। আমাকে সন্তু নামে উনি চিনবেন।"

ফোনে ওই দু'জনের মধ্যে একজনকে পাওয়া গেল। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বড়বাবুর মুখের চেহারাটাই বদলে যেতে লাগল। চোখ দুটো হল গোল-গোল আর ভুরুদুটো উঠে গেল অনেকখানি।

তিনি বলতে লাগলেন, "অ্যাঁ ? কী বলছেন স্যার ? বিখ্যাত ? অ্যাডভেঞ্চার করে ? ওদের নিয়ে বই লেখা হয়েছে ? না স্যার, আমি বই-টই বিশেষ পড়ি না, বই পড়ার সময় পাব কখন ! হ্যাঁ। ছেলেটি আমার সামনেই বসে আছে...আপনাকে দেব, কথা বলবেন ?"

স্পেশাল আই. জি. সাহেব টেলিফোনে হাসতে-হাসতে বললেন, "কী হে সন্তু, তিলজলার পুকুরে ডুব দিতে গিয়েছিলে কেন ? ওখানে কি গুপ্তধন আছে নাকি ?"

সন্তু লাজুকভাবে বলল, "না, মানে এমনিই। পুকুরের ধার দিয়ে হাঁটছিলুম, হঠাৎ পা পিছলে..."

"হঠাৎ ওই পুকুরটার ধার দিয়েই বা হাঁটতে গেলে কেন ? তুমি কি একা-একাই গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছ নাকি ?"

"না, এমনিই বেড়াতে এসেছিলুম এদিকে..."

এরপর বড়বাবু থেকে শুরু করে থানার সমস্ত লোক দারুণ খাতির করতে লাগল সন্তুকে। বাইরের ভিড় হটিয়ে দেওয়া হল। সন্দেশ-রসগোল্লা-শিঙাড়া এসে গেল সন্তুর জন্য। সন্তু খেতে চায় না, তবু ওঁরা ছাড়বেন না।

তারপর পুলিশের গাড়ি সন্তুকে পৌঁছে দিয়ে এল তাদের বাড়ির কাছাকাছি।

সন্তুর মনটা তবু খুব খারাপ হয়ে রইল। লজ্জাও করছে খুব। প্রথমবারেই এরকম ব্যর্থতা। ছি ছি ছি!

বাড়িতে পৌঁছেই সন্তু দেখল একজন অপরিচিত লোক বসে আছেন তাদের বসবার ঘরে। বাবা তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন।

ভিজে জামা-কাপড় যাতে কেউ দেখতে না পায় তাই সন্তু পাশের বারান্দা দিয়ে সুট করে উঠে যাচ্ছিল ওপরে, পায়ের আওয়াজ পেয়ে বাবা হাঁক দিয়ে বললেন, "কে রে ? সন্তু নাকি ? এদিকে আয়... শুনে যা !"

"আসছি", বলেই সন্তু এক দৌড়ে চলে গেল ওপরে। তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট বদলে আবার নীচে নেমে এল।

বাবা বললেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? এই ভদ্রলোক তোর জন্য কখন থেকে বসে আছেন ! দ্যাখ, রাজা তোর নামে চিঠি

পাঠিয়েছে।”

সন্তু তাড়াতাড়ি কাকাবাবুর চিঠিটা নিয়ে খুলল। চিঠিটা এসেছে দিল্লি থেকে। কাকাবাবু লিখেছেন :

স্নেহের সন্তু,

একটা কাজের জন্য দিল্লি এসেছিলাম। দু' চারদিনের মধ্যেই ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরশু থেকে খুব জ্বরে পড়ে গেছি। বেশ কাবু করে দিয়েছে। কাজটা শেষ না করে ফিরে যেতে চাই না। ভেবেছিলাম এবার তোর সাহায্যের কোনও দরকার হবে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, তোকে সঙ্গে আনাই উচিত ছিল। দিন দশেকের জন্য কলকাতা ছেড়ে এলে কি তোর পড়াশুনোর ক্ষতি হবে? দাদা আর বৌদিকে জিজ্ঞেস করবি। যদি কোনও অসুবিধে না থাকে, তাহলে আগামীকালই চলে আসতে হবে। যে ভদ্রলোকের হাতে এই চিঠি পাঠাচ্ছি, তিনিই প্লেনের টিকিট পৌঁছে দেবেন। দিল্লি এয়ারপোর্টে তোকে রিসিভ করার জন্য লোক থাকবে। দাদাকেও আলাদা চিঠি দিলাম। ইতি

কাকাবাবু

পুনশ্চ : তোর একটা পাসপোর্ট করানো হয়েছিল, মনে আছে? সেটা সঙ্গে নিয়ে আসবি।

চিঠিটা পড়তে পড়তেই সন্তু আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। এতক্ষণের মনখারাপ আর লজ্জা এক নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

বাবার দিকে তাকাতেই বাবা বললেন, “হ্যাঁ, চলে যা! অসুখে পড়েছে, একা-একা আছে! কী অসুখ সে-কথাও লেখেনি!”

আগন্তুকটি বললেন, “আমি তাহলে টিকিটের ব্যবস্থা করে রাখছি। কাল বিকেলের ফ্লাইটে...”

ওপরে এসে সন্তু কাকাবাবুর চিঠিখানা যে কতবার পড়ল তার

ঠিক নেই। অতি সাধারণ চিঠি, তবু দুটো জিনিস বোঝা গেল না। কাকাবাবু কোন্ কাজে দিল্লি গেছেন ? আর পাসপোর্ট নেবার কথা লিখলেন কেন ? দিল্লি যেতে পাসপোর্ট লাগবে কেন ?

প্লেনে চড়া সন্তুর পক্ষে নতুন কিছু নয়, তবে আগে কখনও সে একা কোথায় যায়নি। এয়ারবাস-ভর্তি লোক, একজনও সন্তুর চেনা নয়। বেশ কয়েকজন বিদেশিও রয়েছে।

সময় কাটাবার জন্য সন্তু একটা বই এনেছে সঙ্গে, কিন্তু বই পড়ায় মন বসছে না। সে যাত্রীদের লক্ষ করছে। বিমানটা আকাশে ওড়ার খানিক পরেই অনেকে সিট বেল্ট খুলে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। কারও কারও ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় প্লেনে চড়া তাঁদের কাছে একেবারে জলভাত। মিনিবাসে চেপে রোজ অফিসে যাবার মতন প্লেনে চেপে রোজ দিল্লি বা বোম্বে যান।

কয়েকদিন আগেই শ্রীনগরে একটা প্লেন হাইজ্যাকিং হয়েছে। এয়ারপোর্টে বাবা এসেছিলেন সন্তুকে পৌঁছে দিতে, তিনি বারবার ওই কথা বলছিলেন। বাবা ভয় পাচ্ছিলেন, হঠাৎ যদি প্লেনটা হাইজ্যাকিং হয়ে কোনও বিদেশে চলে যায়, তাহলে সন্তু একা-একা কী করবে!

সন্তুর কিন্তু হাইজ্যাকিং সম্পর্কে মোটেই ভয় নেই। বরং মনে-মনে একটু ইচ্ছে আছে, সেরকম একটা কিছু হলে মন্দ হয় না! এখন সে যাত্রীদের মুখ দেখে বোঝবার চেষ্টা করছে, এদের মধ্যে কেউ কেউ কি হাইজ্যাকার হতে পারে ? বাথরুমের কাছে

তিনটে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের মধ্যে দুজনের মুখে দাড়ি, একজন পরে আছে একটা চামড়ার কোট। ওরা যে-কোনও মুহূর্তে রিভলবার বার করতে পারে। চোখের দৃষ্টিও বেশ সন্দেহজনক।

আধঘণ্টার মধ্যেও কিছুই হল না। সন্তু জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগল। পাতলা-পাতলা মেঘ ছাড়া আর কিছুই দেখবার নেই। মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছি ভাবলেই মনটা কী রকম যেন হাল্‌কা লাগে।

সন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ মাইক্রোফোনে কিছু একটা ঘোষণা হতেই সে দারুণ চমকে উঠল। তাহলে কি এবারে শুরু হল নাটক?

না, সেসব কিছু না। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে সবাইকে সিটবেল্ট বেঁধে নিজের নিজের জায়গায় বসতে। বাইরে ঝড় হচ্ছে।

সন্তু মুখ ফিরিয়ে সেই সন্দেহজনক চরিত্রের তিনটি ছেলেকে দেখতে পেল না! জানলা দিয়ে তাকালেও বাইরে ঝড় বোঝা যায় না।

শেষ পর্যন্ত প্লেন হাইজ্যাকিংও হল না, ঝড়ের জন্য কিছু বিপদও ঘটল না। বিমানটি নিরাপদে এসে পৌঁছল দিল্লিতে।

প্লেন থেকে নেমে সন্তু লাউঞ্জে এসে দাঁড়াবার একটু পরেই পাইলটের মতন পোশাক-পরা একজন লোক এসে বলল, "এসো আমার সঙ্গে।"

সন্তু একটু অবাক হল। লোকটিকে সে চেনে না। লোকটি তার নামও জিজ্ঞেস করল না। কিন্তু লোকটি এমন জোর দিয়ে বলল কথাটা যে, অমান্য করা যায় না। সন্তু চলল তার পিছু-পিছু।

লোকটি একেবারে এয়ারপোর্টের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সন্তু বলল, "আমার সুটকেস ? সেটা নিতে হবে যে !"

লোকটি বলল, "হবে। সব ব্যবস্থা হবে।"

বাইরে আর-একজন লোককে আঙুলের ইশারায় ডেকে সেই পাইলটের মতন পোশাক-পরা লোকটি বলল, "একে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসাও, আমি ওর সুটকেসটা পাঠিয়ে দিচ্ছি !"

সন্তু এবারে বলল, "দাঁড়ান, আপনারা কার কাছ থেকে এসেছেন ? আমার নাম কি আপনারা জানেন ?"

প্রথম লোকটি এবারে মুখ ঘুরিয়ে চার দিকটা দেখে নিয়ে বলল, "নাম-টাম বলার দরকার নেই। তোমাকে তোমার কাকাবাবুর কথামতন পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। চট করে গাড়িতে গিয়ে বসে পড়ো।"

কাকাবাবুর কথা শুনে সন্তু আর আপত্তি করল না। দ্বিতীয় লোকটির সঙ্গে গিয়ে একটা ফিয়াট গাড়িতে উঠে বসল। একটুক্ষণের মধ্যেই সুটকেসটা দিয়ে গেল একজন, গাড়িটা স্টার্ট নিল।

অনেকদিন আগে কাশ্মীর যাওয়ার পথে সন্তুরা দিল্লিতে নেমেছিল একদিনের জন্য। সেবারে দিল্লি ভাল করে দেখা হয়নি। দিল্লিতে কত কী দেখার আছে। কিন্তু এখন রাত হয়ে গেছে, রাস্তার দু'পাশে বিশেষ কিছু চোখে পড়ছে না।

গাড়িতে যে লোকটি সঙ্গে চলেছে, সে একটাও কথা বলেনি সন্তুর সঙ্গে। বাঙালি কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না।

সন্তু নিজে থেকে যেচে কথা বলতে পারে না অপরিচিত লোকের সঙ্গে। সে-ও চুপ করে রইল। কিন্তু একটু যেন অস্বাভাবিক লাগছে। সে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে না পৌঁছতেই যেন তাড়াহুড়া করে নিয়ে আসা হল তাকে। পাইলটের মতন পোশাক

পরা লোকটা কী করে চিনল সন্তুকে ? সে কেন বলল, কোনও নাম বলার দরকার নেই ?

অনেক রাস্তা ঘুরে, একটা আলো-ঝলমলে পাড়ার মধ্যে একটা পাঁচতলা বাড়ির সামনে থামল গাড়িটা। গাড়ির চালক নিজে না নেমে বলল, "আপ উতরিয়ে !"

সন্তু গাড়ি থেকে নামতেই গাড়িটা ভোঁ করে চলে গেল। সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, আমার সুটকেস !"

বাড়ির ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে বলল, "আপ অন্দর আইয়ে !"

সন্তু বলল, "হামারা সুটকেস লেকে ভাগ গিয়া !"

লোকটি হেসে বলল, "ফিক্‌র মাত কিজিয়ে, সুটকেস পৌঁছে জায়গা !"

লোকটির হাসির মধ্যে যথেষ্ট ভরসা আছে। তাই সন্তু আর কিছু না বলে চলে এল ওর সঙ্গে। লিফ্‌টে পাঁচতলায় পৌঁছে লোকটি একটা ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা মারল।

দরজা যিনি খুললেন, তাঁকে দেখে সন্তুর মুখটা খুশিতে ভরে গেল। যাক, তা হলে তাকে ঠিক জায়গাতেই আনা হয়েছে। আর সুটকেসের জন্য চিন্তা করতে হবে না।

ছিপছিপে লম্বা লোকটির নাম নরেন্দ্র ভার্মা। দিল্লিতে সি. বি. আই-এর একজন বড়কর্তা। কাকাবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। সন্তুকেও ইনি ভালই চেনেন। এই তো গত বছরেই ত্রিপুরায় ইনি এসেছিলেন কাকাবাবুকে সাহায্য করতে। নরেন্দ্র ভার্মা কলকাতায় লেখাপড়া করেছেন বলে বাংলা মোটামুটি ভালই জানেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এসো, সনটু ! কেমুন আছ ? রাস্তায় গোলমাল হয়নি তো কিছু ? টায়ার্ড ?"

সন্তু মাথা নেড়ে বলল, "না, একটুও টায়ার্ড নই। আপনি ভাল

আছেন তো ?”

নরেন্দ্র ভার্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, “ভাল কী করে থাকব ? তোমার আংকল দিল্লিতে এসে এমুন ঝোন্‌ঝাট বাধাল, অথচ আমি কিছুই জানি না ! আমাকে আগে কোনও খবরই দেয়নি। এ-সব কী বেপার বলো তো ?”

সন্তু আকাশ থেকে পড়ল। সে তো কিছুই জানে না।

ঘরের চার দিকে চোখ বুলিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, “কাকাবাবু কোথায় ?”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “এখানে নেই। সেফ জায়গায় আছে। আচ্ছা সনটু, তুমি বলো তো, আ ক্যাট হ্যাজ নাইন লাইভ্‌স। তোমার এই কাকাবাবুর কখানা জীবন ?”

“কেন, কী হয়েছে আবার ?”

“আরে ভাই, ডেল্‌হিতে আসবার আগে আমাকে একটা চিট্‌ঠি দিল না, এখানে এসে ভি খবর দিল না। আমি খবর পেলাম মার্ডার অ্যাটেম্‌পট্‌ হবার পর !”

“অ্যাঁ ! মার্ডার অ্যাটেম্‌ট ? কার ওপর ?”

“তোমার কাকাবাবুর ওপর ! আবার কার ? কেন, তোমাকে চিট্‌ঠি লেখেননি ?”

“চিঠিতে তো লিখেছেন, ওঁর জ্বর হয়েছে !”

“হাঁ হাঁ, তা তো লিখবেনই। আসল কথা লিখলে তোমার মা-বাবা বহোত দুশ্চিন্তা করতেন তো ! এবারে বড় রকম ইনজুরি হয়েছে, খুব জোর বেঁচে গেছেন !”

“আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে চাই।”

“তা হবে না। তোমার কাকাবাবুই বলেছেন, তোমাকে সাবধানে রাখতে। কারা মারল তা তো বোঝা গেল না। তোমার কাকাবাবুর অনেক এনিমি, তবে কে হঠাৎ দিল্লিতে এসে মারতে

যাবে ? রায়চৌধুরী আমাকে বলল, তোমাকেও সাবধানে রাখতে। তোমার ওপর অ্যাটেম্‌ট হতে পারে। রায়চৌধুরীর উপর ভি ফিন্ অ্যাটাক হতে পারে...।"

সন্তুর কাঁধে হাত রেখে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "বেশি চিন্তা কোরো না। এখন ভাল আছেন তোমার কাকাবাবু। এবারে বলো তো, কী কেস নিয়ে এসেছেন দিল্লিতে ?"

সন্তু বললে, "আপনি জানেন না, আমি জানব কী করে ? আমায় তো কিছুই বলেননি।"

"গর্ভনমেন্টের কোনও কেস হলে আমি ঠিকই জানতুম। সে সব কিছু না। শুনলাম কী একজন আরবের সঙ্গে তোমার কাকাবাবুর খুব দোস্তি হয়েছে।"

"আরব ?"

"হ্যাঁ। মিড্‌ল ইস্টের কোনও দেশের লোক। লোকটাকে আমি দেখিনি এখনও। রায়চৌধুরীও কিছু ভাঙ্‌ছে না আমার কাছে। বলছে, ই সব তোমাদের গভর্নমেন্টের কিছু বেপার নয়।"

"কলকাতাতেও কাকাবাবুর কাছে একজন লোককে আসতে দেখেছি। যাকে দেখে সাহেবও মনে হয় না। ভারতীয়ও মনে হয় না।"

"প্রোবাব্‌লি দ্যাট ইজ আওয়ার ম্যান। লোকটাকে ধরতে হবে। কোন্ চক্করে ফাঁসিয়ে দিয়েছে তোমার কাকাবাবুকে।"

সন্তুর ভুরু কুঁচকে গেছে। দিল্লিতে এসে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না, এটা সে চিন্তাই করতে পারেনি।

সে জিজ্ঞাসা করল, "নরেন্দ্রকাকা, আমি কি এখানেই থাকব নাকি ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "না, একঘণ্টা বাদ তোমাকে আর এক

গেস্টহাউসে নিয়ে যাওয়া হবে। দেখতে হবে কি, তোমায় কেউ ফলো করছে কি না। অন্য গেস্টহাউসে তোমার সুটকেস পেয়ে যাবে।"

"কাকাবাবুর সঙ্গে একবার টেলিফোনে কথা বলা যায় না ?"

"আজ অসুবিধে আছে। কাল হবে। আজ রাতটা ঘুমোও।"

ঘণ্টাখানেক বাদে সন্তুকে আবার আর একটি গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে যাওয়া হল অন্য একটি বাড়িতে। এটা একটা মস্ত বড় গেস্টহাউস। অনেক লোকজন। নরেন্দ্র ভার্মা নিজে সন্তুকে দিয়ে গেলেন একটি ঘরে। সেখানে আগে থেকেই তার সুটকেস রাখা আছে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার রাতের খাবার এই ঘরেই এসে যাবে। আর কিছু লাগলে বেল বাজিয়ে ডাকবে বেয়ারাকে। পয়সার চিন্তা কোরো না। আর, আজ রাতটা একলা বাইরে যেও না !"

নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর সন্তু বিছানার ওপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। একটা অচেনা জায়গায় সে একদম একা। কাকাবাবু চিঠি পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন, অথচ কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

গতকাল প্রায় এই সময় সন্তু তিলজলার কাছে একটা থানায় বসেছিল, আর আজ সে দিল্লিতে একটা গেস্টহাউসে। আগামীকাল আবার কী হবে কেউ বলতে পারে না।

রাত্তিরটা এমনিই কেটে গেল। ভাল ঘুম হয়নি সন্তুর, সারা রাত প্রায় বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে। ভোরের আলো ফুটতেই সে বেরিয়ে এল বাইরে।

এখনও অনেকেই জাগেনি। বাড়িটার সামনের বাগানে অনেক রকম ফুল। গেটের বাইরে খুব চওড়া একটা রাস্তা। খুব সুন্দর

একটা সকাল, কিন্তু সন্তুর মনটা খারাপ হয়ে আছে।

সন্তু বড় রাস্তাটায় খানিকটা হেঁটে বেড়াল। বেশি দূর গেল না। দিল্লির রাস্তা সে কিছুই চেনে না।

নরেন্দ্র ভার্মা এলেন ন'টা বাজার খানিকটা পরে। সন্তু তখন নিজের ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। এখানে ব্রেকফাস্টে অনেক কিছু দেয়, ফলের রস, কর্নফ্লেকস, দুধ আর কলা, টোস্ট আর ওমলেট, আর একটা সন্দেশ।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কী সন্তু, ইউ আর ইন ওয়ান পিস? কেউ তোমাকে গুলি করেনি কিংবা কিডন্যাপ করার চেষ্টাও করেনি?"

সন্তু বলল, "কেউ আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "চলো, তৈয়ার হয়ে নাও। রাজা তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

সন্তুর তৈরি হয়ে নিতে পাঁচ মিনিটও লাগল না।

দিনের আলোয় দিল্লি শহরটাকে ভালভাবে দেখল সন্তু। রাস্তাগুলো যেমন বড় বড়, তেমনি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। দু'পাশে বড়-বড় বাড়ি। দিল্লির নাম শুনলেই সন্তুর মনে পড়ে লালকেল্লা আর কুতুব মিনারের কথা। কিন্তু সে-দুটো দেখা যাচ্ছে না। তবে একটা প্রকাণ্ড, গোলমতন বাড়ি দেখে সন্তু চিনতে পারল। ছবিতে অনেকবার দেখেছে, ওটাই পার্লামেন্ট ভবন।

নরেন্দ্র ভার্মার গাড়ি এসে থামল একটা নার্সিং হোমের সামনে। তিনতলার একটা ক্যাবিনের দরজা খুলতেই কাকাবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

সন্তু দেখল, কাকাবাবুর পেট আর বাঁ হাত জড়িয়ে মস্ত বড় ব্যান্ডেজ। মুখে কিন্তু বেশ হাসিখুশি ভাব। ক্যাবিনটা বেশ বড়, হোটেলের সুইটের মতন। সামনের দিকে বসবার জায়গা, দুটি

সোফা ও দুটি চেয়ার রয়েছে, পেছন দিকে খাট আর একটা ছোট টেবিল। কাকাবাবু বসে আছেন একটা সোফায়, অন্যটিতে বসে আছেন একজন লম্বামতন লোক। সন্তু চিনতে পারল, এই লোকটিকেই কলকাতায় তাদের বাড়িতে কয়েকদিন আসতে দেখেছে। এঁরা দু'জনে মনোযোগ দিয়ে কী যেন আলোচনা করছিলেন। সন্তুদের দেখে থেমে গেলেন।

কাকাবাবু সন্তুকে ডেকে বললেন, "আয় সন্তু, কাল রাত্তিরে তোর একা থাকতে খারাপ লাগেনি তো?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "দু'জন গার্ড পোস্টেড ছিল ওর ঘরের দিকে নজর রাখার জন্য, সন্তু তা টেরই পায়নি।"

সন্তু বেশ অবাক হল। সত্যি সে কিছু বুঝতে পারেনি তো!

কাকাবাবু বললেন, "আর কিছু হবে না। আমাকে কোনও উটকো ডাকাত মারতে এসেছিল বোঝা যাচ্ছে। এটা কোনও দলের কাজ নয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "উট্‌কো? উট্‌কো কথাটার মানে কী আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "এই, সাধারণ একটা কেউ।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমাকে গুলি করে পালাল, ঘর থেকে কিছু জিনিসপত্র নিল না, এ কি সাধারণ ডাকাত?"

অপরিচিত লোকটি মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। এবারে মুখ তুলে বললেন, "আই ফিল গিল্‌টি!"

কাকাবাবু ইংরিজিতে বললেন, "না, না, আপনার কোনও দায়িত্ব নেই। আমি তো নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি!"

তারপর সন্তুদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন...এঁর নামটা মস্ত বড়, সবটা বললে মনে থাকবে না, সবাই এঁকে আল মামুন বলে ডাকে। ইনি

একজন ব্যবসায়ী।”

ভদ্রলোক সন্তুর দিকে মাথা নাড়িয়ে বললেন, “গুড মর্নিং, হাউ ডু ইউ ডু?”

তারপরই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “আই মাস্ট গো! মিস্টার রায়চৌধুরী, আই উইল গেট ইন টাচ উইথ ইউ!”

বেশ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন। স্পষ্ট মনে হল, ওঁর মুখে যেন একটা ভয়ের ছাপ।

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি করলেন, তারপর তিনিও বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কাকাবাবু বললেন, “সন্তু, তুই অমনভাবে তাকচ্ছিস কেন? এই ব্যান্ডেজটা দেখতেই এত বড়, আসলে বিশেষ কিছু হয়নি। পাঁজরা ঘেঁষে একটা গুলি চলে গেছে, কিন্তু পাঁজরা-টাজরা ভাঙেনি কিছু। ব্যাটারা কেন যে এরকম এলোপাথারি গুলি চালায়! টিপ করতেই শেখেনি!”

সন্তু একদৃষ্টিতে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। পেটে গুলি লেগেছে, তা নিয়েও কাকাবাবু ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে পারেন!

নরেন্দ্র ভার্মা তক্ষুনি ফিরে এসে বললেন, “আমার লোক লাগিয়ে দিয়েছি, তোমার পাখি কোন্ বাসায় থাকে তা ঠিক জেনে আসবে।”

কাকাবাবু হাসলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “এবারে সব খুলে বলো তো রাজা! তুমি আমার ওপরেও ধোঁকা চালাচ্ছ? আমাদের না জানিয়ে ও লোকটার সঙ্গে তোমার কিসের মামলা?”

কাকাবাবু সে-রকমই হাসতে হাসতে বললেন, “আরে সেরকম কিছু না। এর মধ্যে কোনও ক্রাইম বা ষড়যন্ত্র বা বড় ধরনের রহস্যের ব্যাপার নেই। ওই লোকটা একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল,

তাই আমি কৌতূহলী হয়ে এসেছি দিল্লিতে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বলল, "ক্রাইম কিছু নেই? তবে গুলিটা চালাল কে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা অবশ্য আলাদা ব্যাপার। আমি যেজন্য দিল্লিতে এসেছি তার সঙ্গে এর হয়তো কোনও সম্পর্ক নেই। আবার থাকতেও পারে। আচ্ছা, আমি সব বুঝিয়ে বলছি, সুস্থির হয়ে বোসো।"

সন্তুর দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুই জানিস, হিয়েরোগ্লিফিকস কাকে বলে?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ!"

কাকাবাবু আর নরেন্দ্র ভার্মা দু'জনেই অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন।

কাকাবাবু বললেন, "অ্যাঁ? তুই জানিস? বল তো কাকে বলে?"

সন্তু বলল, "হিয়েরোগ্লিফিক্স হচ্ছে একরকম ছবির ভাষা। মিশরের পিরামিডে কিংবা অন্য-সব স্মৃতিস্তম্ভে ছবি এঁকে এঁকে অনেক কথা লেখা হত!"

"অনেকটাই ঠিক বলেছিস। এ তুই কোথা থেকে শিখলি?"

"একটা কমিক্সে পড়েছি।"

"তা হলে তো কমিক্সগুলো যত খারাপ ভাবতুম তত খারাপ নয়!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি যে শব্দটা বললে, আমি নিজেই তো তার মানে জানতাম না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তুমিও কমিক্স পড়তে শুরু করে দাও! আচ্ছা, এবার তাহলে ঘটনাটা গোড়া থেকে বলি। এই যে আল মামুন নামে ভদ্রলোককে দেখলে, ইনি কলকাতায় গিয়ে

আমার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছিলেন। একটা ব্যাপারে আমার সাহায্য চান। উনি কয়েকটা লম্বা-লম্বা হলদে কাগজ নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে লাল রঙের অনেক ছোট-ছোট ছবি আঁকা। দেখলে মনে হয়, যে এঁকেছে, তার আঁকার হাত খুবই কাঁচা, এবং সম্ভবত একজন বুড়ো লোক। আল মামুন বলেছেন, ওই ছবিগুলো এঁকেছেন তাঁর এক আত্মীয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সেই ছবিগুলো, ওই যে কী নাম বললে, সেই ভাষায় লেখা?"

সন্তু বলল, "হিয়েরোগ্লিফিক্‌স!"

কাকাবাবু হাহা করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "কয়েক হাজার বছর আগে লুপ্ত হয়ে গেছে এই ভাষা। এখন কি আর এই ভাষায় কেউ লেখে? লিখলেও বুঝতে হবে সে-লোকটি পাগল।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "ছবিগুলো তোমার কাছে নিয়ে যাবার মানে কী? তুমি কি ওই ভাষার একজন এক্সপার্ট?"

কাকাবাবু বললেন, "তা বলতে পারো। এক সময় আমি ওই নিয়ে চর্চা করেছি। তোমার মনে নেই, নরেন্দ্র, বছর দশেক আগে আমি টানা ছ'মাস ইজিপ্টে ছিলাম? মিশরের সব হিয়েরোগ্লিফিক্‌সের পাঠ আজও উদ্ধার করা যায়নি। অনেকেই চেষ্টা করছেন। আমি কিছু-কিছু পড়তে পারি। এ সম্পর্কে আমার লেখা কয়েকটা প্রবন্ধও বিদেশি কাগজে বেরিয়েছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা জানতে চাইলেন, "ওই আল মামুন কোন্ দেশের লোক?

'ইজিপশিয়ান। ব্যবসা সূত্রে প্রায়ই আসতে হয় এদেশে। এখান থেকে উনি চা, সেলাইকল, সাইকেল, এইসব জিনিস নিয়ে যান নিজের দেশে।"

“তা একজন ব্যবসায়ীর এরকম ইতিহাসে উৎসাহ ?”

“সেটাও একটা মজার ব্যাপার। ওই ভদ্রলোক প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানেন না। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ছবিগুলো বোধহয় ইজিপ্টের কোনও পিরামিডের দেওয়াল থেকে কপি করা। কিন্তু তা-ও নয়। আল মামুন কোনও দিন পিরামিড চোখেও দেখেনি !”

‘অ্যাঁ ? ইজিপ্টের লোক অথচ পিরামিড দেখেনি !”

“এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ? ভারতবর্ষের সব লোক কি তাজমহল দেখেছে ? হিমালয়ই বা দেখেছে ক'জন ? আল মামুন দূর থেকে হয়তো একটা দুটো পিরামিড দেখে থাকতে পারেন। কিন্তু ভেতরে কখনও যাননি। উনি বলছেন যে, এই দিল্লিতেই ওঁর এক আত্মীয় থাকেন, ছবিগুলো তিনি এঁকেছেন।”

নরেন্দ্র ভার্মা বিরক্ত হয়ে বললেন, “ধেত্ ! কী তুমি সব ছবি-টবির কথা বলছ, কোন্ বুড়ো কী এঁকেছে, তাতে আমি কোনও আগ্রহ পাচ্ছি না।”

কাকাবাবু বললেন, “সেইজন্যই তো তোমাকে আগে এসব বলতে চাইনি।”

“কিন্তু এর সঙ্গে তোমাকে মার্ডার করার সম্পর্ক কী ? মানে বলছি কী, তোমাকে হঠাৎ কেউ মারতে এল কেন ?”

“সম্পর্ক একটাই থাকতে পারে। আল মামুন ওই ছবিগুলোর অর্থ করে দেওয়ার জন্য আমাকে এক লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিলেন।”

নরেন্দ্র ভার্মা হুই-ই করে শিস দিয়ে উঠে বললেন, “এক লাখ টাকা ? কয়েকটা ছবি পড়ে দেবার জন্য ? কী আছে ওই ছবির মধ্যে ? তুমি মানে বুঝেছিলে ?”

“আগে আর-একটা ব্যাপার শোনো। আল মামুনের ওই যে

আত্মীয়, তাঁর নাম মুফতি মহম্মদ। তিনি খুব ধার্মিক ব্যক্তি, তাঁর অনেক শিষ্য আছে। তাঁর বয়েস নাকি সাতানব্বই, শরীর বেশ শক্তসমর্থ। শুধু গত বছর থেকে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেছে। একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারেন না। তাঁকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে দিল্লিতে।"

"সাতানব্বই বছর বয়েস ? তাঁর আবার চিকিৎসা ?"

"এটা দেখা যায় যে, সন্ন্যাসী-ফকিররা অনেক দিন বাঁচেন। তাঁদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। সাধক মুফতি মহম্মদের শুধু কথা বন্ধ হয়ে গেছে।"

"সাতানব্বই বছর বয়সে তিনি ছবি আঁকছেন ?"

"আল মামুনের মুখে যা শুনেছি, উনি লিখতে জানেন না। আগে কখনও ছবিও আঁকেননি। মুসলমান সাধকেরা কেউ ছবি আঁকেন না। ইনি ছবি আঁকছেন ঘুমের ঘোরে।"

"অ্যাঁ ? গাঁজাখুরি গল্প শুরু করলে রাজা ?"

"আর-একটু ধৈর্য ধরে শোনো, নরেন্দ্র ! আমি যা শুনেছি, তা-ই বলছি। ধর্মীয় গুরু বলে মুফতি মহম্মদকে হাসপাতালে রাখা হয়নি, রাখা হয়েছে আলাদা একটা বাড়িতে। এক-একদিন মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে উঠে বসে ওই ছবিগুলো আঁকছেন।'

"হলদে কাগজে, লাল কালিতে ? ঘুমের মধ্যে তিনি সে-সব পেলেন কোথায় ?"

"লাল কালি নয়, লাল পেন্সিল। উনি যে ঘরে থাকেন, তার পাশের ঘরের টেবিলে অনেক রকম কাগজ আর পেন্সিল থাকে। সেটা আল মামুনের অফিস-ঘর। মুফতি মহম্মদ সাহেব ঘুমের মধ্যেই পাশের ঘরে উঠে এসে, বেছে বেছে হলদে কাগজ আর লাল পেন্সিলে ছবিগুলো আঁকছেন। ছবিগুলো যে হিয়েরোগ্লিফিক্‌সেরই মতন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিছু

কিছু পরিষ্কার অর্থ পাওয়া যায়।"

"কী মানে বুঝলে?"

"সেটা এখন বলা যাবে না। খুব গোপন ব্যাপার। সাধক মুফ্‌তি মহম্মদের অনেক শিষ্য এই দিল্লিতেই আছেন। আল মামুন তাঁদের কিছু জানাতে চান না। গুরুদেব কী লিখছেন সেটা তিনি নিজে আগে জেনে নিতে চান।"

"সেইজন্য দিতে চান এক লাখ টাকা? উনি কি ভাবছেন, এটাই গুরুর বিষয়-সম্পত্তির উইল?"

"গুরুর উপদেশও অনেকের কাছে খুব মূল্যবান।"

"তুমি তবে এক লাখ টাকা পেয়ে গেছ, আর টাকার লোভেই দুশমন তোমাকে গুলি করতে এসেছিল?"

"সেই টাকা পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। ওই কাগজে কী লেখা হয়েছে, তা আমি আল মামুনকে বলিনি এখনও!"

"বলোনি? ওকেও বলোনি কেন?"

কাকাবাবু মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এক লাখ টাকা দিতে চায়, তবু ওকে তুমি দু'চারটা ছবির মানে বলে দাওনি?"

কাকাবাবু বললেন, "না। ওকে কিছু বলিনি, তার কারণ আমি আল মামুনের কোনও কথা বিশ্বাস করিনি।"

সন্তু এতক্ষণ প্রায় দম বন্ধ করে শুনছিল, এবারে সে একটা বড় নিশ্বাস ফেলল। টাকার লোভে কাকাবাবু কোনও কাজ করবেন, তা সে বিশ্বাসই করতে পারে না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "ওই ছবির ভাষা থেকে আমি যা বুঝেছি, তা এখনকার কোনও ব্যাপারই নয়। অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার একটা ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। তাও শেষ হয়নি। আমি পেয়েছি মাত্র চারখানা হলদে কাগজ। এর পরে

যেন আরও আছে। সেইজন্য আমি আল মামুনকে বলেছিলুম আমি গুরু মুফ্‌তি মহম্মদকে নিজের চোখে দেখতে চাই। সেইজন্যই আমার দিল্লি আসা।”

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, “দেখা হয়েছে?”

কাকাবাবু বললেন, “না। সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। এতদিন দিল্লি এসে বসে রইলুম, তবু আল মামুন সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন না। কখনও বলেন যে, ওঁর গুরুর মেজাজ ভাল না থাকলে বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে চান না। আবার কখনও বলেন যে, অন্য শিষ্যরা সব সময় ঘিরে থাকে, সেইজন্য সুযোগ হচ্ছে না।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “তোমার ওই আল মামুন কোথায় থাকে আমি আজই জেনে যাচ্ছি। আমি ওকে ফলো করার জন্য লোক লাগিয়ে দিয়েছি। এবারে বলো, তোমার ওপর যে-লোকটা গুলি চালাতে এসেছিল, সে লোকটা কেমন? সেও কি পরদেশি? তার মুখ তুমি নজর করেছিলে?”

কাকাবাবু, বললেন, “হ্যাঁ, মুখ দেখেছি, কিন্তু একপাশ থেকে। আমার ধারণা সে একটা ভাড়াটে খুনি। কেউ তাকে টাকা দিয়ে বলেছে আমাকে সাবাড় করে দিতে। দ্যাখো, আমার ওপর অনেকের রাগ আছে। কত পুরনো শত্রু আছে। তাদেরই কেউ দিল্লিতে আমায় চিনতে পেরে খতম করে দিতে চেয়েছে। ও ঘটনায় গুরুত্ব দেবার কিছু নেই!”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “তুমি কী বলছ, রাজা? একটা লোক তোমাকে খতম করে দিতে এসেছিল, আর তাতে কোনও গুরুত্ব নেই? তাজ্জব! লোকটা যদি আবার আসে? শুনেছ, সনটু, তোমার কাকাবাবু কেমুন ছেলেমানুষের মতন কথা বলেন!”

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, “আরে, ও সব নিয়ে মাথা

ঘামাতে গেলে তো কোনও কাজই করা যায় না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "লোকটা কি রাত্তিরবেলা ঘরের মধ্যে এসে গুলি করেছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "তখন রাত বেশি না, এগারোটা হবে বড়জোর। হোটেলের ঘরে বসে আমি পড়াশুনো করছিলাম। ঘরের পাশেই একটা ছোট বারান্দা, তার দরজাটা খোলা। একটা শব্দ হতেই চোখ তুলে দেখি যে, বাইরে থেকে বারান্দায় একটা লোক লাফিয়ে উঠে এল। তার হাতে রিভলভার। আমারও বালিশের তলায় রিভলভার থাকে, তুই জানিস। কিন্তু আমি বসে ছিলাম, বালিশটা থেকে বেশ দূরে। হাত বাড়িয়ে সেটা নেবার সময় পেলাম না। লোকটা এসেই কোনওরকম কথাবার্তা না বলে রিভলভারটা তুলল আমার কপাল লক্ষ করে। যদি ঠিক টিপ করে গুলি চালাত, তা হলে আমি সেই মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতাম। তখন বাঁচার একটাই উপায়। আমি প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে বললুম, "ব্লাডি ফুল! লুক বিহাইন্ড!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কপালের সামনে রিভলভারের নল দেখেও তুমি চিৎকার করতে পারলে? তোমার নার্ভ আছে বটে!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আগেও অনেকবার এই রকম চেঁচিয়ে সুফল পেয়েছি। হঠাৎ খুব জোরে শব্দ হলে পাকা-পাকা শিকারিদেরও টিপ নষ্ট হয়ে যায়। এখানেও তাই হল। আমার ধমক শুনে লোকটার হাত কেঁপে গেল একটু, তার গুলি লাগল আমার পাঁজরায়। আমি সাঙ্ঘাতিক আহত হবার ভান করে ঝাঁপিয়ে পড়লুম বিছানায়। সঙ্গে-সঙ্গে বালিশের তলা থেকে আমার রিভলভারটা বার করে এনেছি। লোকটাকে আমি তখন গুলি করতে পারতুম। কিন্তু আমি দেখতে চাইলুম লোকটা এর পর কী করে! কোনও জিনিসপত্তর নিতে চায় কি না। লোকটা

কিন্তু আর কিছু করল না। সে ভাবল বোধহয় যে, একটা গুলি চালিয়েই তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আবার টপ করে বারান্দা ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ, ভাড়াটে খুনি বলেই মালুম হচ্ছে। দিল্লিতে এরকম অনেক আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, যে ওকে ভাড়া করেছিল, সে ওকে পুরো টাকা দেয়নি। এত কাঁচা কাজের জন্য ওর পাঁচ টাকার বেশি পাওয়া উচিত নয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "লোকটা সাকসেসফুল হয়নি বলে তোমার আফসোস হচ্ছে মনে হচ্ছে!"

কাকাবাবু আবার জোরে হেসে উঠলেন। নরেন্দ্র ভার্মাও হাসতে লাগলেন।

এই সময় বাইরের রাস্তায় একটা হইচই আর দুম দাম শব্দ হতে লাগল। সন্তু চলে এল জানলার কাছে।

কী যেন একটা কাণ্ড হয়েছে রাস্তায়। লোকজন ছোটাছুটি করছে। একটা বাসে আগুন লেগে গেছে।

নরেন্দ্র ভার্মা উঠে এসে উঁকি দিয়ে বললেন, "ওঃ! এমন কিছু নয়। বাস বোধহয় একটা লোক চাপা দিয়েছে, তাই পাবলিক রেগে গিয়ে বাসটাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! এ সব তোমাদের ক্যালকাটাতে আগে হত, এখন আমদানি হয়ে গেছে দিল্লিতেও!"
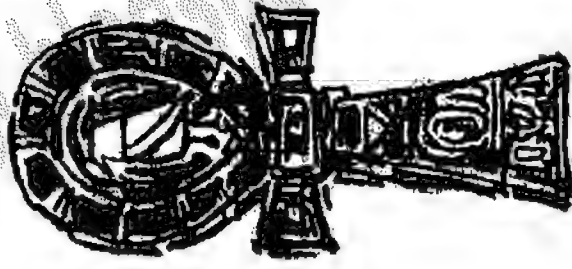
সেদিন দিল্লি শহরের অনেক রাস্তাতেই খুব গণ্ডগোল, মারামারি চলল। পরের দিন কারা যেন ডেকে বসল হরতাল। বাস, ট্যাক্সি, অটো রিকশা সব বন্ধ। সকালের দিকে কয়েকটা প্রাইভেট গাড়ি বেরুলেও লোকেরা বন্ধ করে দিল ইট-পাটকেল মেরে। দিল্লির চওড়া-চওড়া রাস্তাগুলো একেবারে ফাঁকা।

এত বড় একটা ব্যস্ত শহরকে দিনের বেলা একেবারে শুনশান দেখলে কেমন অদ্ভুত লাগে!

আগের রাত্তিরে সন্তু ফিরে এসেছিল গেস্ট হাউসে। সকাল থেকে সে ছটফট করছে। কী করে সেই নার্সিংহোমে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে? গাড়ি বন্ধ বলে নরেনকাকাও আসতে পারবেন না। সন্তু যে রাস্তা চেনে না। না হলে সন্তু হেঁটেই চলে যেতে পারত।

বেলা এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর সন্তু আর থাকতে পারল না, বেরিয়ে পড়ল। সন্তু জানে, হরতালের দিন রাস্তা দিয়ে হাঁটলে কেউ কিছু বলে না। কয়েকটা সাইকেলও চলছে।

বেশিদূর যেতে হল না, একটু পরেই একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল সন্তুর পাশে। ড্রাইভারের পাশ থেকে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "উঠে পড়ো সনটু! একলা কোথা যাচ্ছিলে?"

একটু বাদেই ওরা পৌঁছে গেল নার্সিং হোমে।

কাকাবাবু খুব উদ্গ্রীব হয়ে বসে ছিলেন। ওদের দেখেই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "এসেছ? আমি ভাবছিলাম যে কী করে আসবে!

শোনো নরেন্দ্র, রফি মার্গ কোথায় ? এখান থেকে হেঁটে যাওয়া যায় ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রফি মার্গ ? সে তো এখান থেকে অনেক দূর। এটা চিত্তরঞ্জন পার্ক আর রফি মার্গ সেই কনট প্লেসের আছে। হেঁটে যাওয়া অসম্ভব !"

কাকাবাবু বললেন, "নেপোলিয়ন কী বলেছিলেন জানো না ? অসম্ভব বলে কিছু নেই তাঁর ডিক্‌শনারিতে।"

"সেটা নেপোলিয়নের বেলা সত্যি হতে পারে। কিন্তু সকলের পক্ষে নয়। কী ব্যাপার, তুমি রফি মার্গ পর্যন্ত হেঁটে যেতে চাও নাকি ?"

"হ্যাঁ। আর দেরি করে লাভ নেই। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।"

কাকাবাবু উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন, নরেন্দ্র ভার্মা বাধা দিয়ে বললেন, "আরে, ঠারো, ঠারো ! হঠাৎ রফি মার্গ হেঁটে যেতে হবে কেন সেটা শুনি !"

কাকাবাবু বললেন, "আল মামুন ফোন করেছিল একটু আগে।"

"তোমার এ-ঘরে তো ফোন নেই ?"

"দোতলায় আছে। সেখানে নেমে গিয়ে আমি ফোন ধরেছি।"

"এখনও তোমার ব্যান্ডেজ বাঁধা, এই অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্যায় করেছ। যাই হোক, তারপর কী বলল, টেলিফোনে ?"

"গুরু মুফ্‌তি মহম্মদ আবার ঘোরের মাথায় ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। আজ আর ওখানে কোনও লোকজন নেই। আমরা এখন গেলে দেখতে পারি।"

"এই যে শুনেছিলুম উনি মাঝরাতে ছবি আঁকেন ?"

"মাঝরাতেই যে আঁকবেন, তার কোনও মানে নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে আঁকতে শুরু করেন। শুনলুম যে, উনি কাল সারা রাত ঘুমোননি, বিছানার ওপর ঠায় বসেছিলেন, ঘুমিয়েছেন সকাল আটটায়। চলো, চলো, আর দেরি করে লাভ নেই।"

"শোনো রাজা, নেপোলিয়ান যাই-ই বলুন, তোমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব। ডাক্তার তোমাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই বারণ করেছেন। আর তুমি ক্রাচ নিয়ে অতদূর যেতে চাও ?"

"আরে ডাক্তারদের কথা সব সময় মানলে চলে না। আমি ভাল আছি বেশ। অনায়াসে যেতে পারব !"

"পাগলামি কোরো না, রাজা। আমাদের মতন লোকেরই হেঁটে যেতে তিন-চার ঘণ্টা লাগবে। আর তুমি ক্রাচ নিয়ে কতক্ষণে পৌঁছবে ? পুলিশের গাড়িটা ছেড়ে দিলাম...ঠিক আছে টেলিফোনে আর-একটা গাড়ি আনাচ্ছি, সেই গাড়িতে যাব।"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, তা চলবে না। সে-কথা আগেই ভেবেছিলাম। আল মামুনকে আমি বলেছিলাম, আজ তো গাড়িঘোড়া চলছে না, যেতে গেলে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। আল মামুন তীব্র আপত্তি করে বলেছে, না, পুলিশের গাড়িতে যাওয়া কিছুতেই চলবে না। ও-বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি থামলেই সকলের চোখে পড়ে যাবে। মুফ্‌তি মহম্মদের মতন সম্মানিত মানুষের কাছে পুলিশ এসেছে, এ-কথা জানলে তার শিষ্যরা চটে যাবে খুব !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তাও একটা কথা বটে। পরদেশি নাগরিক, ঝটাক্‌সে ওদের কাছে পুলিশের গাড়ি যাওয়া ঠিক নয়। তা হলে কী উপায় ?

"হেঁটেই যেতে হবে। শুধু-শুধু দেরি করছ কেন ?"

"রাজা, তুমি বুঝতে পারছ না, ক্র্যাচ দিয়ে হেঁটে পৌঁছতে

তোমার কম সে কম চার ঘণ্টা লেগে যাবে। ততক্ষণ কি তোমার ওই বুড়োবাবা বসে বসে ছবি আঁকবেন ?"

কাকাবাবু এবারে ব্যাপারটা বুঝলেন। মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। এ তো আর পাহাড়ে ওঠা নয়, শুধু-শুধু একটা শহরে চার-পাঁচ ঘণ্টা হাঁটার কোনও মানে হয় না !

একটু চুপ করে থেকে কাকাবাবু বললেন, "আর একটা উপায় আছে, কোনও ডাক্তারের গাড়ি যেতে পারে, তাই না ? ডাক্তারের গাড়ি কিংবা হাসপাতালের গাড়ি নিশ্চয়ই আটকাবে না ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ, তা হতে পারে। দেখি কোনও ডাক্তারের গাড়ি যোগাড় করা যায় কি না।"

সন্তু বলল, "সাইকেলেও যাওয়া যায়। আমি দেখলুম রাস্তায় সাইকেল চলছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছিস ! তা হলে দেখলি তো সাইকেল শেখারও উপকারিতা আছে। এক-এক সময় কত কাজে লাগে। ডাক্তারের গাড়ি যদি যোগাড় করা না যায়, তাহলে তুই আর নরেন্দ্র সাইকেলে চলে যেতে পারবি। পায়ের জন্য আমি তো আজকাল আর সাইকেল চালাতে পারি না।"

নরেন্দ্র ভার্মা নীচ থেকে ঘুরে এসে বললেন, "এখন তো একটাও ডাক্তারের গাড়ি নেই। তবে একটা অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান একটু বাদেই ফিরবে।"

কাকাবাবু অস্থিরভাবে বললেন, "একটু বাদে মানে কতক্ষণ বাদে ? দ্যাখো, না হয় দুটো সাইকেলই যোগাড় করো।"

শেষ পর্যন্ত তাই-ই করতে হল। নানান জায়গায় টেলিফোন করেও কোনও ডাক্তারের গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না। সবাই বলেছে, আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার মধ্যে আসতে পারে। কাকাবাবু অত দেরি করতে রাজি নন। নার্সিং হোমের
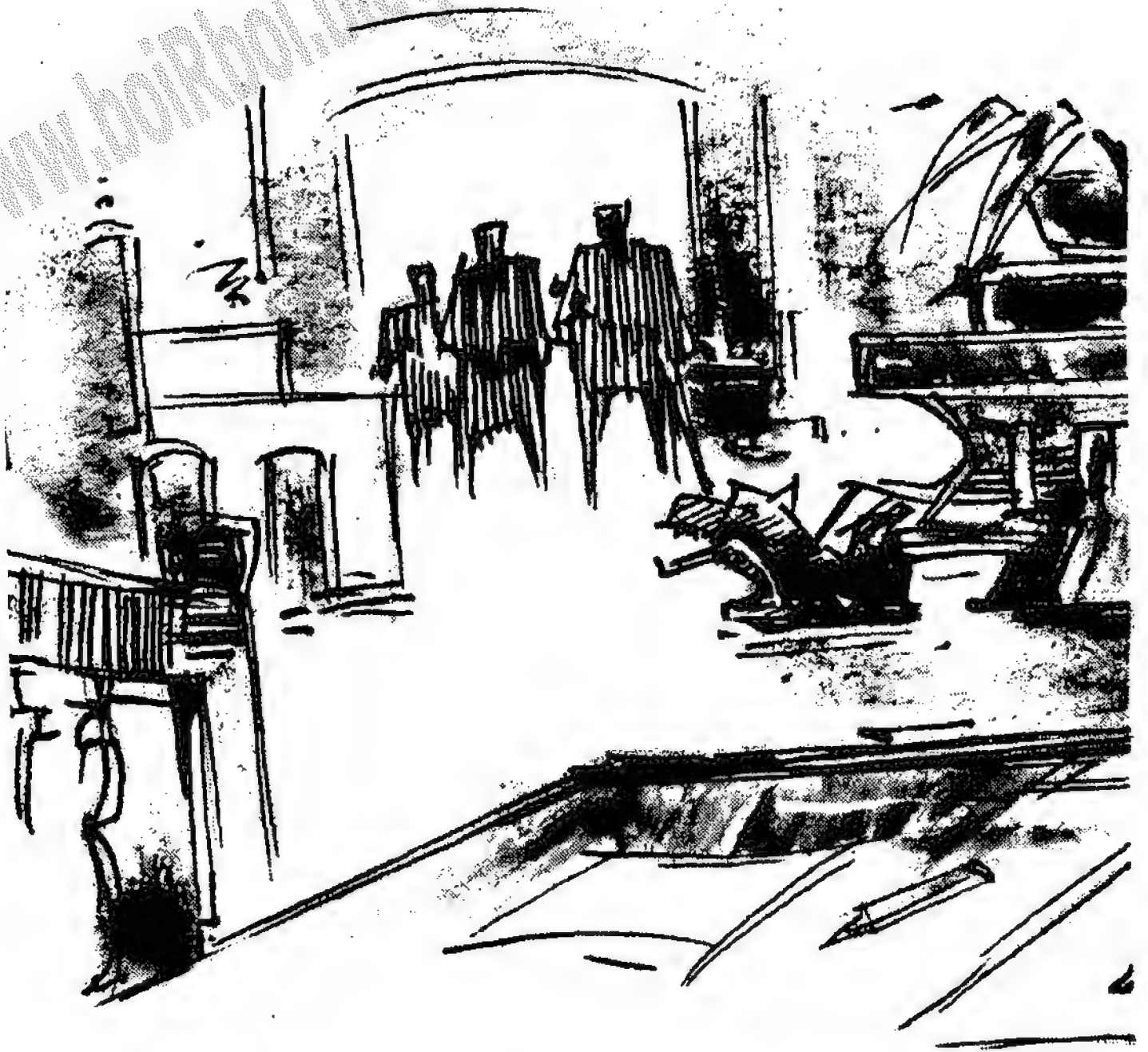
দারোয়ানদের কাছ থেকে দুটো সাইকেল যোগাড় হল, তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা।

এ রকম ফাঁকা রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে আরাম। হরতালের দিন কলকাতার রাস্তায় ছেলেরা ফুটবল খেলে কিন্তু দিল্লিতে সে-রকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় মানুষজন খুব কম।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সেই কলেজ-জীবনের পর আর

সাইকেল চালাইনি। তোমার কাকাবাবুর পাল্লায় পড়ে কত কী যে করতে হয় আমাকে! অবশ্য, খারাপ লাগছে না। আচ্ছা সন্টু, একটা সত্যি কথা বলবে?"

"হ্যাঁ, বলুন।"

"একটা বুড়া সাধু কী সব ছবি আঁকছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি কোনও মানে আছে? আমরা কি বুনো হাঁস তাড়া করছি না?"

“সব ব্যাপারটা আমি এখনও বুঝতে পারছি না, নরেনকাকা !”

“চলো, গিয়ে দেখা যাক !”

সাইকেলে রফি মার্গ পৌঁছতেই এক ঘণ্টার বেশি লেগে গেল। নরেন্দ্র ভার্মা দিল্লির সব রাস্তা খুব ভাল চেনেন, তাই ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না।

এই রাস্তার সব বাড়িই অফিসবাড়ি বলে মনে হয়। তারই মধ্যে একটি ছোট, হলদে রঙের দোতলা বাড়ি। ছোট হলেও বাড়িটি দেখতে খুব সুন্দর, সামনে, অনেকখানি ফুলের বাগান।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “এই রাস্তা দিয়ে কতবার গেছি, কিন্তু এ-বাড়িতে যে ইজিপশিয়ানরা থাকে, কোনও দিন জানতেই পারিনি। দিল্লিতে যে কত কিসিমের মানুষ থাকে !”

গেটের সামনে একজন দরোয়ান বসে আছে। তার কাছে আল মামুনের নাম করতেই সে দোতলায় উঠে যেতে বলল।

সারা বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ, কোনও মানুষ আছে বলে মনেই হয় না। দোতলাতেও সিঁড়ির মুখে কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট। ওরা সেখানে এসে দাঁড়াতেই আল মামুন একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের কোনও রকম শব্দ করতে নিষেধ করলেন। তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, “হোয়ার ইজ মিঃ রায়চৌধুরী ?”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “গাড়ি যোগাড় করা যায়নি বলে তিনি আসতে পারেননি !”

আল মামুনের মুখে একটা হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি বললেন, “আপনাদের তো ডাকিনি। আপনাদের দিয়ে কোনও কাজ হবে না। আপনারা ফিরে যান।”

এই কথা বলে আল মামুন পেছন ফিরতেই নরেন্দ্র ভার্মা গেটের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আল মামুনের একটা হাত চেপে ধরলেন।

তারপর খুব আস্তে অথচ দৃঢ় গলায় বললেন, "আমি ভারত সরকারের প্রতিনিধি। মিঃ রায়চৌধুরী আমাকে আর তাঁর ভাইপোকে পাঠিয়েছেন এখানে কী ঘটছে, তা দেখে গিয়ে রিপোর্ট করবার জন্য। এই হরতালের দিনেও আমরা কষ্ট করে এমনি-এমনি ফিরে যাবার জন্য আসিনি। গেট খুলুন।"

নরেন্দ্র ভার্মা এমনিতে হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু এক-এক সময় তাঁর মুখখানা এমন কঠিন হয়ে যায় যে, দেখলে ভয় লাগে।

আল মামুন আর দ্বিরুক্তি না করে গেট খুলে দিলেন। তারপর বললেন, "জুতো খুলে ফেলুন!"

খালি পায়ে একটা টানা বারান্দা পেরিয়ে এসে ওরা ঢুকল একটা মাঝারি সাইজের ঘরে। সে-ঘরে খাট-বিছানা পাতা, কিন্তু বিছানাতে কেউ নেই। বিছানার ঠিক পাশেই অন্য একটা ঘরে যাওয়ার দরজা।

আল মামুন ওদের ইশারা করলেন সেই দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে।

অন্য ঘরটিতে রয়েছে একটা টেবিল আর কয়েকখানা চেয়ার। একটা চেয়ারে বসে আছেন একজন খুবই লম্বা মানুষ, পরনে একটা-কালো রঙের আলখাল্লা। তাঁর মাথার চুল ধপধপে সাদা উলের মতন, আর মুখভর্তি সাদা দাড়ি পাতলা তুলোর মতন। হাতে একটা লাল ফেল্ট পেন, টেবিলের ওপর একটা বড় হলদে কাগজে তিনি ছবি আঁকছেন।

সত্যি, দেখলে মনে হয় যেন তিনি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আঁকছেন। চোখ দুটি প্রায় বোজা, হাতের কলমটা দিয়ে একটা দাগ কেটে থেমে যাচ্ছেন, তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার একটা দাগ কাটছেন।

সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা প্রায় নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

দেখতে লাগল এই দৃশ্য। একজন সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ছবি আঁকছেন, এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

মুফ্‌তি মহম্মদ একবার হঠাৎ এই দরজার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটি খোলা, তবু তিনি ওদের দেখতে পেলেন কি না বোঝা গেল না। একটুও বিরক্ত হলেন না। বরং তাঁর মুখে যেন একটা পবিত্র ভাব ফুটে আছে। দেখলেই ভক্তি জাগে।

আবার মুখ ফিরিয়ে তিনি ছবি আঁকাতে মন দিলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা সন্তুকে চোখের ইঙ্গিতে বললেন, "এবার চলো!"

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে খানিকটা আসতেই সিঁড়িতে ঠং ঠং শব্দ উঠল।

আল মামুন ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। সিঁড়ির মুখের কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট তিনি ভুল করে খোলা রেখে এসেছিলেন। তিনি গেট পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই ভেতরে ঢুকে এলেন ক্রাচ বগলে নিয়ে একজন মানুষ।

নরেন্দ্র ভার্মা কাঁধ ঝাকিয়ে বললেন, "আনডন্‌টেড রাজা রায়চৌধুরী! তাকে কেউ পেছনে ফেলে রেখে আসতে পারে না!"

কাকাবাবু হাসিমুখে বললেন, "তোমরা চলে আসার পরেই একটা অ্যামবুলেন্স পেয়ে গেলাম।"

তারপর তিনি আল মামুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "খবর কী? এখনও ছবি আঁকছেন?"

ওরা তিনজনই এক সঙ্গে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "চলো। আমি একটু দেখি। ওঁর সঙ্গে আমার কথা বলা খুব দরকার।"

আল মামুন সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, "নো নো নো, দ্যাট ইজ আউট অব কোয়েশ্চেন। ওঁকে এই অবস্থায় কিছুতেই ডিসটার্ব

করা যাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কথা বলাটা অত্যন্ত জরুরি। আপনারা বুঝতে পারছেন না, কারও সঙ্গে কথা বলার জন্যই উনি ওই ছবিগুলো আঁকছেন?"

আল মামুন বললেন, "কী করে কথা বলবেন আপনি? ওঁর গলার আওয়াজ নষ্ট হয়ে গেছে, উনি কোনও উত্তর দিতে পারবেন না। আপনার ইংরিজি প্রশ্নও উনি বুঝবেন না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমিও সেই কথা ভাবছিলুম। রাজা, উনি তোমার প্রশ্ন বুঝবেন কী করে? আল মামুন যদি বুঝিয়েও দেন, তা হলেই বা উনি কী করে উত্তর দেবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "উনি যে ভাষা বোঝেন, সেই ভাষাতেই আমি প্রশ্ন করব।"

জামার পকেট থেকে কাকাবাবু একটা ভাঁজ-করা কাগজ বার করলেন। তারপর দেখালেন সেটা খুলে। তাতেও কতকগুলো ছোট-ছোট ছবি আঁকা।

কাকাবাবু বললেন, "এই ছবির ভাষা তোমরা কেউ বুঝবে না, উনি হয়তো বুঝতে পারেন।"

কাকাবাবুকে নিয়ে আসা হল সেই ঘরে। সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। আল মামুন কাকাবাবুকে নিয়ে ঢুকলেন পাশে ঘরে।

কাকাবাবুর ক্রাচের শব্দ পেয়ে চোখ তুলে তাকালেন মুফ্‌তি মহম্মদ। আল মামুন খুব বিনীত ভাবে কিছু বললেন তাঁকে। খুব সম্ভবত কাকাবাবুর পরিচয় দিলেন।

কাকাবাবু কপালের কাছে হাত ছুঁইয়ে বললেন, "সালাম আলেকুম।"

তারপর তাঁর ছবি-আঁকা কাগজটা ছড়িয়ে দিলেন টেবিলের

ওপর।

মুফ্‌তি মহম্মদ এখন নিশ্চয়ই জেগে উঠেছেন পুরোপুরি। কেননা, সেই কাগজটা দেখেই তাঁর মুখে দারুণ অবাক ভাব ফুটে উঠল। একবার কাগজটার দিকে, আর একবার কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন তিনি।

তারপর হাতছানি দিয়ে কাকাবাবুকে কাছে ডাকলেন। কাকাবাবু তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি তাঁর লম্বা ডান হাত রাখলেন কাকাবাবুর মাথায়, নিজে চোখ বুজে রইলেন একটুক্ষণ। ঠিক যেন তিনি কাকাবাবুকে আশীর্বাদ করছেন ভারতীয়দের প্রথায়।

একটু পরে হাতটা সরিয়ে নিয়ে লাল কলমটা তুলে ছবি আঁকতে শুরু করলেন।

কিন্তু তাঁর হাত যেন চলছেই না। খুব অলস ভাবে দাগ কাটছেন, বোঝা যায় তাঁর হাত কেঁপে যাচ্ছে। একটুখানি এঁকেই তিনি তাকাচ্ছেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু ঘাড় নাড়ছেন।

মাত্র তিনটি ছবি কোনওক্রমে আঁকার পরেই তাঁর হাত থেকে কলমটা খসে পড়ে গেল মাটিতে। মুখখানা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর, তারপর একেবারে নুয়ে টেবিলের ওপর পড়ে যাবার আগেই কাকাবাবু আর আল মামুন দু'দিক থেকে ধরে ফেললেন তাঁকে।

কাকাবাবু আর সন্তুকে কড়া পুলিশ পাহারায় রাখা হয়েছে একটা সরকারি গেস্ট হাউসে। এর মধ্যে দু'বার হামলা হয়ে গেছে

কাকাবাবুর ওপর। কাকাবাবুর বন্ধুরা সবাই বলছেন ওঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে। এখানে থাকলে ওঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু কাকাবাবু সে-কথা কিছুতেই শুনবেন না।

সাধক মুফ্‌তি মহম্মদ সেদিন সেই চেয়ারে বসেই মৃত্যুবরণ করেছেন। শেষ সময়ে তাঁর মুখে কোনও যন্ত্রণার ছাপ ছিল না, বরং ফুটে উঠেছিল অপূর্ব সুন্দর হাসি। যেন তিনি খুব তৃপ্তির সঙ্গে এই জীবন শেষ করে চলে গেলেন।

সাধক মুফ্‌তি মহম্মদের অনেক শিষ্য এই দিল্লিতেই আছে। এই শিষ্যদের আবার দুটি দল। এক দলের নেতা আল মামুন, আর অন্য দলটির নেতা হানি আলকাদি নামে একজন। শিষ্যদের ধারণা, সাধক মুফ্‌তি মহম্মদের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি তাঁর শেষ উইল ছবি দিয়ে লিখে গেছেন। শুধু রাজা রায়চৌধুরীই সেই ছবির মানে জেনেছে। রাজা রায়চৌধুরী বাইরের লোক, সে কেন এই গোপন কথা জানবে? আল মামুন কেন রাজা রায়চৌধুরীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল? দ্বিতীয় দলের নেতা হানি আলকাদি অভিযোগ করেছে যে, আল মামুন নিজে নেতা হবার মতলবে সেই উইলের কথা অন্য কাউকে জানতে দিচ্ছে না।

কিন্তু মজা হচ্ছে এই, আল মামুনও রেগে গেছে কাকাবাবুর ওপর। বৃদ্ধ মুফতি মহম্মদের আঁকা ওই ছবিগুলোর যে কী মানে, তা কাকাবাবু আল মানমুনকেও বলেননি।

এমন কী, নরেন্দ্র ভার্মা বারবার জিজ্ঞেস করলেও কাকাবাবু মুচকি হেসে বলেছেন, "ধরে নাও, ওই ছবিগুলোর কোনও মানে নেই। আমি অবশ্য একরকম মানে করেছি, সেটা ভুলও হতে পারে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি কী মানে বুঝেছ, সেটাই শুনি!"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, সেটাও বলা যাবে না! মুফতি মহম্মদ

নিষেধ করে গেছেন।”

“অ্যাঁ! উনি কখন নিষেধ করলেন তোমায়? আমরা তো কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলুম!”

“কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি সব বোঝা যায়? দেখলে না, আমি মুফ্‌তি মহম্মদকে লিখে কিছু প্রশ্ন জানালুম। উনিও ছবি এঁকে তার উত্তর দিলেন।”

“তুমি কী প্রশ্ন করেছিলে?”

“আমি একটা মানে উল্লেখ করে জানতে চেয়েছিলুম, আপনি কি এটাই বোঝাতে চাইছেন? উনি তার উত্তরে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ কিছুই লিখলেন না। উনি লিখলেন, তুমি আগে নিজে যাচাই করে দেখো, তার আগে কাউকে কিছু বোলো না।”

“যাচাই করে দেখো, মানে? অন্য কোনও পণ্ডিতের পরামর্শ নেবে? না, তাও তো পারবে না। অন্য কাউকে বলাই তো নিষেধ।”

“এটা যাচাই করার জন্য আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। ইজিপ্টে!”

সন্তু বলে উঠল, “পিরামিডের দেশে?”

কাকাবাবু চোখ দিয়ে হেসে বললেন, “মনে হচ্ছে তোর এবারে বিদেশ ঘোরা হয়ে যাবে, সন্তু!”

সন্তুর মনে পড়ে গেল রিনির কথা। সিদ্ধার্থদাদের সঙ্গে রিনি কায়রো বেড়াতে গেছে। তখন সে-কথা শুনে সন্তুর হিংসে হয়েছিল। এবারে সে-ই কায়রোতে পৌঁছে রিনিদের চমকে দেবে। কাকাবাবু এইজন্যই পাসপোর্ট আনতে বলেছিলেন?

নরেন্দ্র ভার্মা চিন্তিত ভাবে বললেন, “রাজা, এখন ইজিপ্টে গেলে তুমি যে একেবারে বাঘের মুখে গিয়ে পড়বে! এখানেই তুমি দু’তিনবার বিপদে পড়েছিল। দিল্লিতে যে এত ইজিপশিয়ান থাকে

জানা ছিল না। ওখান থেকে আমাদের দেশে অনেকে পড়া-লিখা করতে আসে। বিজ্‌নেসের জন্যও আসে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি ওই যে হানি আলকাদি নামের লোকটা, ওর অনেক গোঁড়া সাপোর্টার আছে। ওর পার্টি একবার একটা প্লেন হাইজ্যাক করেছিল। মুফতি মহম্মদের সিক্রেট তুমি যদি আগে ওদের কাছে ফাঁস না করো, তা হলে ওরা তোমাকে ছাড়বে না!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঘের মুখে গিয়ে পড়তেই তো আমার ইচ্ছে করে। তুমি কি ভাবছ, পুলিশ-পাহারায় আমি এখানে বসে থাকব?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট তোমাকে এখন ইজিপ্ট পাঠাতে রাজি হবে না। ও দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের বেশ ভাল সম্পর্ক আছে, তুমি গিয়ে যদি এখন একটা গণ্ডগোল পাকাও..."

কাকাবাবু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "কিছু গণ্ডগোল পাকাব না। আমাকে গভর্নমেন্টেরও পাঠাবার দরকার নেই। আমি নিজেই যাব। তুমি বরং একটু সাহায্য করো, নরেন্দ্র। আজকের মধ্যেই আমাদের দু'জনের ভিসা যোগাড় করে দাও।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমি এখনও বলছি, তোমার ওখানে যাওয়া উচিত নয়।"

কাকাবাবু এবারে হেসে ফেলে বললেন, "তোমার হিংসে হচ্ছে বুঝি, নরেন্দ্র? আমরা বেশ ইজিপ্টে মজা করতে যাচ্ছি, তোমার যাওয়া হবে না। কিন্তু তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি না!"

"মজা? তুমি ইজিপ্টে মজা করতে যাচ্ছ? হানি আলকাদিকে আমি যতটা চিনেছি, সে একটা দুর্দান্ত টাইপের লোক!"

"আরে, দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকদের খুব সহজে বাগ মানানো যায়। যাদের বাইরে থেকে নরম-সরম মনে হয়, তাদেরই মনের

আসল চেহারাটা বোঝা শক্ত। দেখো না ওখানে কত মজা হয়। ফিরে এসে তোমাকে সব গল্প শোনাব।"

কাকাবাবু উঠে গিয়ে তাঁর হাতব্যাগ খুলে রিভলভারটা বার করলেন। সেটা নরেন্দ্র ভার্মার কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এটা তোমার কাছে জমা রইল। বিদেশে যাচ্ছি, সঙ্গে আর্মস নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা চোখ কপালে তুলে বললেন, "হানি আলকাদির দলবল তোমার ওপর সাঙ্ঘাতিক রেগে আছে জেনেও তুমি কোনও হাতিয়ার ছাড়া অত দূরের দেশে যাবে?"

কাকাবাবু নিজের মাথায় আঙুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে ইয়ার্কির সুরে বললেন, "কাঁধের ওপর যে এই জিনিসটা রয়েছে, তার থেকে আর কোনও অস্ত্র কি বড় হতে পারে?"

নরেন্দ্র ভার্মা এমন একটা মুখের ভাব করলেন, যেন তিনি বলতে চান, আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না!

সন্ধেবেলা নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "শোন্, এখানে খুব সাবধানে থাকবি। একা বাইরে বেরুবি না। ওরা যদি তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথাও আটকে রাখে, তা হলে আমার ওপর চাপ দেওয়া সহজ হবে।"

সন্তু মুখে 'আচ্ছা' বললেও তলার ঠোঁটটা এমন ভাবে কাঁপাল যাতে বেশ একটু গর্ব-গর্ব ভাব ফুটে উঠল।

সেটা লক্ষ করে কাকাবাবু বললেন, "বুঝেছি, তুই মনে মনে ভাবছিস তো, তোকে কে আটকে রাখবে! তুই ঠিক পালাতে পারবি, তাই না? তাতেই তো আমার বেশি চিন্তা। তোর মতন বয়েসি একটা ছেলেকে কেউ সহজে মারে না, কিন্তু তুই পালাবার চেষ্টা করলে নির্ঘাত গুলিটুলি ছুঁড়বে। এর আগে তুই যতবার পালাবার চেষ্টা করেছিস, ততবার বেশি বিপদে পড়েছিস, মনে

নেই ?”

সন্তু বলল, “প্রত্যেকবার নয়। সেবারে ত্রিপুরায় যে আমি পালিয়েছিলুম, আর আমায় কেউ ধরতে পারেনি !”

কাকাবাবু বললেন, “আচ্ছা ঠিক আছে। মানলুম। কিন্তু এবারে দিল্লিতে আর কায়রোতে গিয়ে সব সময় আমার সঙ্গে থাকবি। একা-একা গোয়েন্দাগিরি করবার চেষ্টা করবি না।”

সন্তুর মনে পড়ল, সে একা তিলজলায় রহস্যসন্ধান করতে গিয়ে কী কেলেঙ্কারিই না হয়েছিল। ভাগ্যিস কাকাবাবু সে-কথা জানেন না।

অবশ্য সন্তু তখনই ঠিক করল, তা বলে সে দমে যাবে না। ভবিষ্যতে আবার সে ওই রকম চেষ্টা করবে। সে একা-একা একটা রহস্যের সমাধান করে কাকাবাবুকে তাক্ লাগিয়ে দেবে।

পরদিন কাকাবাবু টেলিফোনেই অনেক কাজ সেরে ফেললেন। তার পরের দিনই তাদের ইজিপ্ট যাত্রা। নরেন্দ্র ভার্মা গোমড়া মুখে ওদের পৌঁছে দিতে এলেন এয়ারপোর্টে। ওরা ভেতরে ঢোকার আগের মুহূর্তে নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, “কী রাজা, এখনও কি মনে হচ্ছে তোমরা ওখানে মজা করতে যাচ্ছ ?”

কাকাবাবু চোখ টিপে বললেন, “হ্যাঁ, দারুণ মজা হবে। ইশ, তুমি যেতে পারলে না !”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “আমি খোঁজ পেয়েছি হানি আলকাদিও আজ সকালে অন্য একটা প্লেনে ইজিপ্ট চলে গেছে। নিশ্চয়ই এমব্যাসি থেকে খবর পেয়েছে যে, তুমি ইজিপ্টের ভিসা নিয়েছ !”

কাকাবাবু সে খবর শুনে একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, “তা তো যাবেই। নইলে মজা জমবে কেন ? আল মামুন যায়নি ? সে তো রাগ করে আমার সঙ্গে আর দেখাই করে না !”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তার খবর জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "যাবে, সেও নিশ্চয়ই যাবে। আচ্ছা নরেন্দ্র, ফিরে এসে সব গল্প হবে।"

এই তো ক'দিন আগেই সন্তু প্লেনে চেপে কলকাতা থেকে এসেছে দিল্লিতে। সেই প্লেনটা ছিল এয়ারবাস আর এটা বোয়িং। একটা শিহরন জাগছে সন্তুর বুকের মধ্যে। বিদেশ, বিদেশ! পিরামিডের দেশ। ক্লিওপেট্রার দেশ।

প্লেন আকাশে ওড়বার পরেই সন্তু সিটবেল্ট খুলে উঠে দাঁড়াল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছিস?"

সন্তু মুখ খুলে কিছু বলার আগেই কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাথরুমে যাবার কথা বলবি তো? শুধু-শুধু মিথ্যে কথা বলতে হবে না। পুরো প্লেনটা ঘুরে দেখার ইচ্ছে হয়েছে দেখে আয়। চলন্ত প্লেনে তো আর তোকে কেউ কিডন্যাপ করবে না! এক যদি প্লেনটা কেউ হাইজ্যাক করে! তা যদি করেই, তা হলে আর কী করা যাবে!"

সন্তুর আসল উদ্দেশ্য হল যাত্রীদের মুখগুলো ভাল করে দেখা। চেনা কেউ আছে কি না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আল মামুনও এই প্লেনে রয়েছে। প্রথম থেকেই ওই লোকটিকে সন্তু ঠিক পছন্দ করতে পারেনি। লোকটির সব সময় কী রকম যেন গোপন-গোপন ভাব। মনের কথা খুলে বলে না। আল মামুন প্রথমেই কাকাবাবুকে এক লক্ষ টাকার লোভ দেখিয়েছিল।

মুফতি মহম্মদ মরে যাবার পর আল মামুন খুব একটা দুঃখ পেয়েছেন এমন মনে হয়নি। তিনি কাকাবাবুকে বলেছিলেন যে, কাকাবাবু যদি সব ছবিগুলোর ভাষা শুধু আল মামুনকেই জানিয়ে দেন, তা হলে তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন।
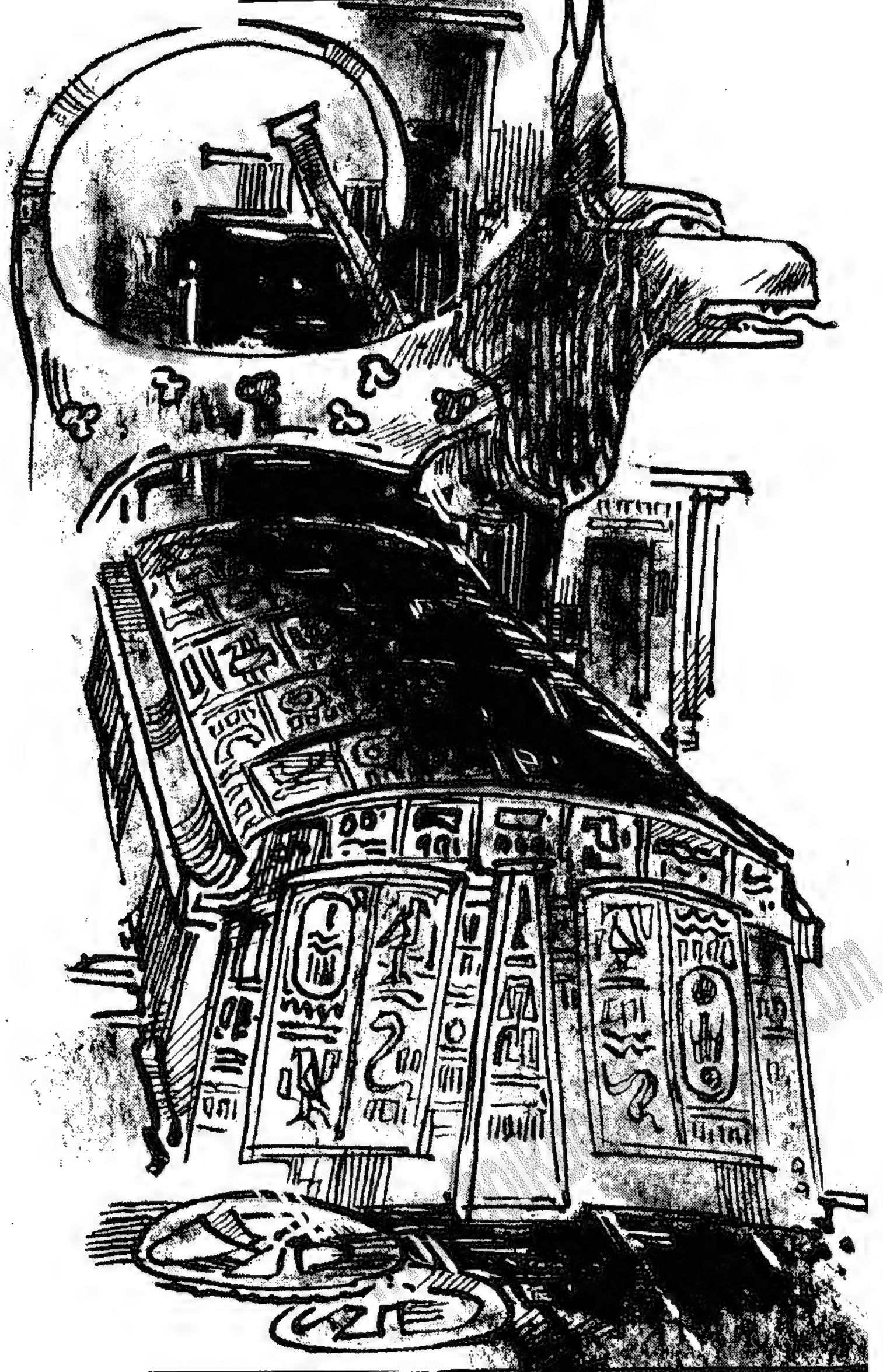
কাকাবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, “তা কী করে হবে? আপনার গুরুই যে বলতে বারণ করেছেন!”

না, প্লেনের যাত্রীদের মধ্যে একজনও চেনা মানুষ দেখতে পেল না সন্তু। কয়েকজন ভারতীয় যাত্রী রয়েছে, কিন্তু তারা কেউ বাংলায় কথা বলছে না।

তখনও সন্তু জানে না যে, তার জন্য একটা দারুণ বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

খাবার দিচ্ছে দেখে সন্তু ফিরে এল নিজের জায়গায়। টেবিলটা খুলে পেতে নিল।

খেতে খেতে কাকাবাবু বললেন, “তুই হিয়েরোগ্লিফিক্‌সের মানে বলে আমায় চমকে দিয়েছিলি। পিরামিডগুলো কেন তৈরি হয়েছিল তাও তুই জানিস নিশ্চয়ই?”

সন্তু বলল, “রাজা-রানিদের সমাধি দেবার জন্য। ভেতরে অনেক জিনিসপত্তর রাখা থাকত, রাজা-রানিরা ভাবতেন যে, তাঁরা আবার বেঁচে উঠবেন!”

“সবচেয়ে পুরনো পিরামিড কতদিন আগে তৈরি হয়েছে বল তো?”

“সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে!”

“এটা আন্দাজে বললি, তাই না?”

ধরা পড়ে গিয়ে সন্তু লাজুক ভাবে হাসল।

কাকাবাবু বললেন, “খুব পুরনো পিরামিডগুলো খ্রিস্টপূর্ব ২৬৮৬ থেকে ২১৬০ বছরের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। তা হলে বলা যেতে পারে মোটামুটি সাড়ে চার হাজার বছর আগে। যাই হোক, পিরামিড তো অনেকগুলোই আছে। এর মধ্যে গিজার পিরামিড খুব বিখ্যাত। আর একটা আছে খুফু। এটা বিরাট লম্বা। এখন তো পৃথিবীতে মস্ত-মস্ত বাড়ি তৈরি হয়েছে। এক সময় নিউ

ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ছিল সবচেয়ে বড় বাড়ি, তারপর...”

“এখন শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার সবচেয়ে বড় !”

“হুঁ, তাও জানিস দেখছি। কিন্তু ওই খুফুর পিরামিড এখনও ওই সব বড়-বড় বাড়ির সঙ্গে উচ্চতায় পাল্লা দিতে পারে। এবারে তোকে একটা ভূতের গল্প বলি শোন্! পিরামিডগুলোর আশেপাশে আরও অনেক গোপন সমাধিস্থান আছে মাটির নীচে। বাইরের থেকে সেগুলো বোঝাই যায় না। সাহেবরা একটা-একটা করে সেগুলো আবিষ্কার করেছে। সম্রাট খুফুর মায়ের নাম ছিল হেটেকেরিস। তাঁর সমাধিস্থানের কথা অনেকে জানতই না। একজন সাহেব সেটি আবিষ্কার করেন। সেখানে কোনও পিরামিড নেই, মাটির অনেক নীচে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ছিল সেই সমাধি। মমিগুলো যে কফিনের মধ্যে রাখে, তাকে বলে সারকোফেগাস। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, প্রথম যিনি সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলেন, তিনি সেখানে অনেক কিছু দেখতে পেলেও সারকোফেগাসের মধ্যে রানি হেটেকেরিসের মমি দেখতে পেলেন না।”

“কেউ মমিটা চুরি করে নিয়ে গেছে !”

“হ্যাঁ পিরামিড থেকে অনেক মমি চুরি গেছে বটে, কিন্তু রানি হেটেকেরিসের সমাধিস্থানে তো কেউ আগে ঢোকেনি। তাছাড়া, রাজা-রানিদের সমাধিস্থানে অনেক দামি দামি জিনিস থাকত। যেমন সোনার খাট, সোনার জুতো, মণিমুক্তো-বসানো পানপাত্র, আরও অনেক কিছু। প্রথম যিনি সেই সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেন, সেই চার্লস ব্রকওয়ে অনেক মূল্যবান জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন, শুধু মমিটাই ছিল না। চোরেরা আর-কিছু নিল না, শুধু মমিটাই নিল ? চোরেরা তো মমি নেয় বিক্রি করবার জন্যই !”

“তারপর ?”

"এর এক বছর তিন মাস বাদে একদল পুরাতত্ত্ববিদ আবার ওই সুড়ঙ্গে নামেন। তাঁরা কিন্তু সরকোফেগাসের মধ্যে রানি হেটেফেরিসের মমি দেখতে পান। তাঁরা সেই মমির ছবিও তুলেছিলেন। মিশর সরকারের অনুমতি ছাড়া মমি সরানো যায় না। তাই তাঁরা সেদিন আর কিছু করেননি। ওপরে পাহারা বসিয়ে রেখেছিলেন। পরদিন আবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল সারকোফেগাসের মধ্যে মমি নেই! আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাই নিয়ে সে-সময় অনেক হইচই হয়েছিল, পৃথিবীর বহু কাগজে খবরটা ছাপা হয়েছিল, এই নিয়ে বইও লেখা হয়েছে। চার্লস ব্রকওয়ে অবশ্য দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলটির বক্তব্য একটুও বিশ্বাস করেননি।"

আরও কিছু শোনবার জন্য সন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে দেখে কাকাবাবু বললেন, "তোকে এমনি একটা রহস্যকাহিনী শোনালুম। আমরা যে কাজে যাচ্ছি তার সঙ্গে রানি হেটেফেরিসের সমাধির খুব একটা সম্পর্ক নেই।"

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। এঁটো প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেল এয়ার-হস্টেসরা। তার একটু পরে একজন এয়ার-হস্টেস সন্তুর কাছে এসে ইংরিজিতে বলল, "তোমার নাম তো সন্তু, তাই না? প্লিজ কাম উইথ মি! তোমাকে আর-একবার সিকিউরিটি চেক করা হবে।"

সন্তু দারুণ অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। এয়ার-হস্টেসটি কাকাবাবুকে বলল, "আই অ্যাম সরি স্যার, এই ছেলেটি সন্দেহজনকভাবে সারা প্লেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেইজন্য ক্যাপ্টেন বললেন, ওকে একবার সার্চ করে দেখতে হবে! আমি ওকে একটু নিয়ে যাচ্ছি!"

কাকাবাবু বললেন "গো অ্যাহেড!"

সন্তু একই সঙ্গে আশ্চর্য হল, রেগে গেল, আবার বেশ মজাও পেল। এরা তাকে হাইজ্যাকার ভাবে নাকি ? সঙ্গে একটা খেলনা পিস্তল থাকলেও এদের বেশ ভয় দেখানো যেত।

এয়ার-হস্টেসটি সন্তুকে নিয়ে এল ককপিটে। সেখানকার দরজা খুলে ভেতরে ঢোকা মাত্র একজন বলে উঠল, "হ্যান্ডস আপ !"

তারপরই হেসে উঠল হোহো করে !

সন্তুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "বিমানদা !"

সন্তুদের পাড়ার যে বিমান পাইলট, সে-ই এই প্লেনের ক্যাপটেন। এরকম যোগাযোগ যে ঘটতে পারে, তা সন্তুর একবারও মনে হয়নি।

এয়ার-হস্টেস আর কো-পাইলটরা হাসছে সন্তুর ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা দেখে। এয়ার-হস্টেসটি বলল, "আমি যখন গিয়ে বললুম যে, ওকে সার্চ করা হবে, তখন এই ইয়াং জেন্টলম্যানটির মুখ একেবারে ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। পকেটে সত্যিই বোমা-পিস্তল কিছু আছে নাকি ?"

বিমান অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সন্তুর। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবুও দেখলুম রয়েছেন। তোরা কোথায় যাচ্ছিস ?"

সন্তু বলল, "ইজিপ্ট।"

বিমান বলল, "ইজিপ্ট ? সেখানে তোরা কোন্ ব্যাপারে যাচ্ছিস ? নিশ্চয়ই বেড়াতে নয় ?"

সন্তু এবারে একটু ভারিক্কি ভাব করে বলল, "সেটা এখন বলা যাবে না।"

বিমান অন্যদের বলল, "জানো, এই যাঁকে কাকাবাবু বলছি, তিনি একজন ফ্যানটাসটিক পার্সন। পৃথিবীতে যে-সব মিস্ট্রি অন্য

কেউ সল্‌ভ করতে পারে না, সেগুলো তিনি সল্‌ভ করার চেষ্টা করেন। যেমন ওঁর জ্ঞান, তেমনি সাহস !"

কো-পাইলট মিঃ কোহলি বললেন, "তাহলে আমরা সবাই তাঁকে একবার দেখতে চাই।"

বিমান বলল, "আর একটা মজা করা যাক। সন্তুকে আমরা এখানে আটকে রাখি, তা হলে কাকাবাবু নিশ্চয়ই এক সময়ে এখানে ছুটে আসবেন।"

ককপিটে বসে অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। প্লেনটা মেঘের রাজ্য দিয়ে যাচ্ছে বটে তবু মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে নীচের পৃথিবী। বিমান সন্তুকে বোঝাতে লাগল আকাশের মানচিত্র।

এক ঘণ্টা কেটে গেল, তবু কাকাবাবু সন্তুর কোনও খোঁজ করলেন না। বিমান বলল, "চল রে, সন্তু আমিই কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

দূর থেকে দেখা গেল কাকাবাবু বুকের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ওরা কাছে যাবার পর কাকাবাবুকে ডাকতে হল না, তিনি মুখ তুলে, একটুও অবাক না হয়ে, স্বাভাবিক গলায় বললেন, "কী খবর, বিমান ?"

বিমান জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জানতেন আমি এই প্লেনে থাকব ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, তা জানতুম না ! তবে জানাটা শক্ত কিছু নয়। সন্তুকে নিয়ে যাবার পরই মনে পড়ল, প্লেন টেক অফ করার পর ঘোষণা করা হয়েছিল, ক্যাপটেন ব্যানার্জি এবং তাঁর ক্রু-রা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তখন দুই আর দুইয়ে চার করে নিলুম !"

বিমান একটু হতাশ হয়ে বলল, "কাকাবাবু, আপনি কখনও চমকে যান না, বা অবাক হন না ?"

কাকাবাবু বললেন, "কেন হব না ? পৃথিবীতে অবাক হবার মতন ঘটনাই তো বেশি। তবে এত সামান্য ব্যাপারে ব্যস্ত হই না।"

"কাকাবাবু, মিশরে কী ব্যাপারে যাচ্ছেন, জানতে পারি ?"

"অতি সামান্য ব্যাপার !"

"তার মানে এখন বলবেন না ! ইশ্, আমাকে রিলিজ করছে আথেন্সে। যদি কায়রোতে নামতে পারতুম ! দেখি যদি ম্যানেজ করে চলে আসতে পারি। কায়রোতে আপনারা কোথায় উঠবেন ?"

"উঠবো তো ওয়েসিস হোটেলে। কিন্তু কায়রোতে আমরা দু' একদিনের বেশি থাকব না। মেমফিসে চলে যাব ! সেখানে কোথায় উঠব তার ঠিক নেই।"

সন্তু বলল, "বিমানদা, তুমি সিদ্ধার্থদাকে চেনো তো ? স্নিগ্ধাদির বর ? ওরা এখন কায়রোতে আছেন। তুমি ইণ্ডিয়ান এমব্যাসিতে খোঁজ কোরো ! সিদ্ধার্থদা ফার্স্ট সেক্রেটারি..."

কাকাবাবু একটু ভর্ৎসনার চোখে তাকালেন সন্তুর দিকে।

এয়ারপোর্টে যে সিদ্ধার্থ, স্নিগ্ধা, রিনি সবাই উপস্থিত থাকবে এটা অবশ্য সন্তুও জানত না। কাকাবাবু তো আশাই করেননি। এটা নরেন ভার্মার কীর্তি, তিনি কায়রোর ইণ্ডিয়ান এমব্যাসিতে টেলেক্স পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটা দেখে সিদ্ধার্থ নিজেই এসেছে।

কায়রোতে প্লেনটা এক ঘণ্টা থামে। বিমানও নেমে এসে

একবার ওদের সকলের সঙ্গে দেখা করে চলে গেল।

রিনি সন্তুকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, সন্তু, কলকাতায় যখন দেখা হল, তখন তো একবারও বললি না যে, তোরা এখানে আসবি ?"

সন্তু গম্ভীর ভাবে বলল, "আমরা কখন যে কোথায় যাব, তার তো কোনও ঠিক থাকে না। আজ কায়রোতে এসেছি, পরশুই হয়তো আবার আমরা মস্কো চলে যাব !"

রিনি ঠোঁট উল্টে বলল, "ইশ্, আর চাল মারিস না ! আমরা-আমরা করছিস কেন রে ? তুই তো কাকাবাবুর বাহন ! উনি ভাল করে হাঁটতে পারেন না, তাই তোকে সঙ্গে আনেন।"

কলকাতায় থাকতে রিনি কায়রো বেড়াতে আসছে শুনে সন্তুর ঈর্ষা হয়েছিল। এখন তার মনে হল, এইসব অবোধ মেয়ের সঙ্গে কথা বলার কোনও মানেই হয় না ! সে মুখটা ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

সন্তুকে আরও রাগাবার জন্য রিনি বলল, "তুই সেই গল্পটা জানিস না ? চাষের খেতে একটা গোরুর শিং-এ একটা মশা বসেছিল। একজন লোক সেই মশাটাকে জিজ্ঞেস করল, ওহে মশা, তুমি এখানে কী করছ ? মশা বলল, আমরা হাল চাষ করছি ! তুই হচ্ছিস সেই মশা ! হি-হি-হি-হি !"

বেশ রাগ হয়ে গেলেও সন্তুর মনে হল, রিনি এই ধরনের কথা বলছে কেন ? ও কি তিলজলার সেই কেলেঙ্কারির ব্যাপারটা জেনে গেছে ?

সন্তু রিনির কাছ থেকে সরে গিয়ে কাকাবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুর সুটকেসটা তুলে নিয়ে বললেন, "চলুন কাকাবাবু, বাড়িতে গিয়ে সব গল্প শুনব। আমার বাড়িটা খুব সুন্দর

জায়গায়, আপনার পছন্দ হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাড়ি ? না, সেখানে তো আমরা যাচ্ছি না !"

সিদ্ধার্থ নিরাশ হয়ে বলল, "সে কী ? আমার বাড়িতে যাবে না ? কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছু মনে কোরো না। আমি হোটেল বুক করেই এসেছি। আমি যে ব্যাপারে এসেছি, তাতে তোমার জড়িয়ে না পড়াই ভাল। তুমি তো সরকারি কাজ করো !"

তারপর তিনি সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "সন্তু, তুই গিয়ে ওদের সঙ্গে থাকতে পারিস। বিদেশে এসে কোনও চেনা লোকের কাছে তোর থাকতে ভাল লাগবে।"

সন্তু মুখের এমন ভাব করল যেন সে প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষত রিনি ওরকম কথা বলার পর সে আর রিনির সঙ্গে একটা মিনিটও কাটাতে চায় না।

স্নিগ্ধা অনুযোগের সুরে বলল, "কাকাবাবু, আপনি যাবেন না ? আমি আপনাদের জন্য চিংড়ির মালাইকারি রান্না করে রেখেছি। কত কষ্টে যোগাড় করলুম চিংড়ি..."

কাকাবাবু এবারে হাল্‌কা গলায় বললেন, "তুমি কী করে জানলে যে ওই আইটেমটা আমার সবচেয়ে ফেভারিট ? ঠিক আছে, সন্ধেবেলা গিয়ে খেয়ে আসব ! কিন্তু উঠতে হবে হোটেলেই।"

ওয়েসিস হোটেলটি বিশেষ বড় নয়। শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরের দিকে। গরমকাল বলে এই সময়ে টুরিস্টদের ভিড় নেই, হোটেল প্রায় ফাঁকা। সিদ্ধার্থ, স্নিগ্ধা আর রিনি সন্তুদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে একটু পরে বিদায় নিয়ে চলে গেল। কথা হল যে, সন্ধেবেলা সিদ্ধার্থ আবার এসে ওদের নিয়ে যাবে বাড়িতে।

কাকাবাবু ঘর থেকেই দু'তিনটে টেলিফোন করলেন। তারপর তিনি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে সন্তুকে বললেন, "তুই চান-টান করে নে। আজ দুপুরে আমরা ঘরেই খেয়ে নেব। দুপুরে যা চড়া রোদ ওঠে, বাইরে বেরুনোই যায় না।"

গরমে সন্তুর গা চ্যাটচ্যাট করছিল, সে ঢুকে গেল বাথরুমে। সেখানকার জানালা দিয়ে দেখল, রাস্তা দিয়ে ট্রলি বাস চলছে। ওইটাই যা নতুনত্ব, নইলে কায়রো শহরটাকে বিদেশ বিদেশ মনে হয় না, ভারতবর্ষের যে-কোনও বড় শহরেরই মতন। ইজিপ্ট দেশটা যদিও আফ্রিকার মধ্যে, কিন্তু এখানে কালো মানুষ নেই। বর্তমান ইজিপ্টের অধিবাসীরা জাতিতে আরব।

স্নান সেরে বেরিয়ে এসে সন্তু দেখল, কাকাবাবু তাঁর নোটবুকে কী সব লিখছেন। সন্তু চুল আঁচড়াতে শুরু করতেই দরজায় ঠক ঠক শব্দ হল। কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকালেন।

সন্তু দরজা খুলতেই একজন মাঝারি চেহারার লোক জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ রাজ্‌জা রায়চৌধারী হিয়ার?"

কাকাবাবু বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "মাণ্টো? কাম ইন! কাম ইন!"

লম্বা লোকটি প্রায় ছুটে এসে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। একেবারে দৃঢ় আলিঙ্গন। তারপর কোলাকুলির ভঙ্গি করে তিনি সরে দাঁড়ালেন।

এই গরমেও ভদ্রলোক একটা আলখাল্লার মতন পোশাক পরে আছেন। মাথায় ফেজ টুপি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। দাড়ি-গোঁফ কামানো।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন আলি সাদাত মাণ্টো, কায়রো মিউজিয়ামের কিউরেটর, আমার পুরনো বন্ধু।"

মান্টো ইংরিজিতে বললেন, "রায়চৌধারী, তুমি যে এই সময় কায়রোতে এসেছ, তা শুনে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি প্রথমে। তুমি কী কাণ্ড করেছ? জানো, এখানকার সব কাগজে তোমার কথা বেরিয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? তা হলে বেশ বিখ্যাত হয়ে গেছি বলো! কী লিখেছে কাগজে আমার সম্পর্কে?"

মান্টো একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন, "খুব গুরুতর অভিযোগ। এখানকার এক বিখ্যাত নেতা মুফতি মহম্মদ চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন দিল্লিতে। সেখানে তিনি কয়েকদিন আগে হঠাৎ মারা যান। শেষ মুহূর্তে তিনি যে উইল করে যান, তুমি নাকি সেটা চুরি করেছ।"

কাকাবাবু অট্টহাসি করে উঠে বললেন, "ওরে বাবা রে, একেবারে চোর বানিয়ে দিয়েছে?"

মান্টোর মুখ গম্ভীর। তিনি বললেন, "হাসির ব্যাপার নয়, রায়চৌধারী! এখানে হানি আলকাদি নামে একজন জঙ্গি নেতা আছে। সে দাবি জানিয়েছে যে, ভারত সরকারের ওপর চাপ দিয়ে তোমাকে এখানে ধরে আনাতে হবে। আর তুমি নিজেই এখানে চলে এসেছ? তোমার কতটা বিপদ তা বুঝতে পারছ না?"

কাকাবাবু তবু হাল্‌কা চালে বললেন, "উইল যদি আমি চুরি করেই থাকি, তা হলে ভারতবর্ষে বসে থেকে লাভ কী! মুফতি মহম্মদের বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু তো এ-দেশেই। তাই না?"

"রায়চৌধারি, তুমি গুরুত্ব বুঝতে পারছ না। হানি আলকাদি অতি সাঙ্ঘাতিক লোক। তার দলের ছেলেরা খুব গোঁড়া, নেতার হুকুমে তারা যা খুশি করতে পারে।"

"মান্টো, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আমি কারও উইল চুরি

করতে পারি ?"

"না, না, না, আমি সে-কথা ভাবব কেন ? তোমাকে তো আমি চিনি ! তা ছাড়া মুফ্‌তি মহম্মদের উইল নিয়ে তুমি কী করবে ? আসলে কী হয়েছে বলো তো ?"

"তার আগে তুমি আমার দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও ! মুফতি মহম্মদ লেখাপড়া জানতেন না, এ-কথা ঠিক তো ?"

"হ্যাঁ, তা ঠিক। উনি কোনওদিন স্কুল-কলেজে যাননি, পড়তে বা লিখতে জানতেন না। তবে জ্ঞানী লোক ছিলেন।"

"উইল লেখার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। অনেকদিন ধরে ওঁর গলার আওয়াজও একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাহলে উইল তৈরি হল কী করে ?"

"তাও তো বটে ?"

"এ সম্পর্কে তোমাদের কাগজে কিছু লেখেনি ?"

"না, কিছু লেখেনি। তবে হানি আলকাদি অভিযোগ করেছে যে, আল মামুন নামে একজন ব্যবসায়ী তোমার সঙ্গে মুফতি মহম্মদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর তুমি ওই কাণ্ডটা করেছ !"

"মাণ্টো, তোমাকে আমি আসল ঘটনাটা পরে বলব। তার আগে তুমি মুফতি মহম্মদ সম্পর্কে কী জানো আমাদের বলো তো ! তুমি কি ওঁকে চিনতে ?"

"হ্যাঁ, ইজিপ্টে তাঁকে কে না চেনে। ওঁর বয়েস হয়েছিল একশো বছর।"

"আমি শুনেছি সাতানব্বই।"

"তা হতে পারে। ওঁর জীবনটা বড় বিচিত্র। খুব গরিবঘরের সন্তান ছিলেন। ওঁর যখন সাত বছর বয়েস, তখন ওর বাবা আর মা দু'জনেই মারা যান। সাত বছর বয়েস থেকে উনি রাস্তায়

ভিক্ষে করতেন। একটু বড় হয়ে ওঠার পর শুরু করেন কুলিগিরি। তারপর তিনি হলেন বিদেশি ভ্রমণকারীদের গাইড। ইংরেজ আর ফরাসিরা যখন বিভিন্ন পিরামিডের মধ্যে ঢুকে ভেতরের জিনিসপত্র আবিষ্কার করতে শুরু করেন, সেই সময়ে তিনি অনেক অভিযানে ওদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। লেখাপড়া না শিখলেও উনি ভাঙা ভাঙা ইংরেজি আর ফরাসি বলতে পারতেন। আর ওঁর গানের গলাও নাকি ছিল খুব সুন্দর। এই সময় ওঁর অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। কিন্তু উনি ওখানেই থেমে থাকলেন না। গাইডের কাজ ছেড়ে দিয়ে উনি যোগ দিলেন একটা বিপ্লবী দলে। তখন ইজিপ্টের রাজা ছিলেন ফারুক। তুমি তা জানো, রাজা ফারুককে সরিয়ে দেবার জন্য এখানকার বিপ্লবীরা কত মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মুফতি মহম্মদ হয়ে উঠলেন একটা প্রধান বিপ্লবী দলের নেতা।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "সন্তু, তুই রাজা ফারুকের নাম শুনেছিস? রাজত্ব হারাবার পর এই ফারুক বলেছিলেন, এরপর পৃথিবীতে আর মোটে পাঁচজন রাজা থাকবে। তাসের চারটে রাজা আর ইংল্যান্ডের রাজা! হ্যাঁ, মান্টো তারপর বলো!"

মান্টো বললেন, "রাজা ফারুককে যে রাজত্ব ছেড়ে পালাতে হয়, তার পেছনে মুফতি মহম্মদের দলের অনেকটা হাত ছিল। রাজা ফারুকের পর এলেন জেনারেল নেগুইব। অনেকে তখন দাবি তুলেছিল যে, মুফতি মহম্মদেরই উচিত এ দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া। মুফতি মহম্মদ নিজে তা কিছুতেই হতে চাননি, তিনি বলতেন যে, তিনি এক সময় রাস্তায় ভিক্ষে করতেন, রাস্তাতেই তাঁর স্থান। এর পর জেনারেল নাসের যখন প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন মুফতি মহম্মদ ঘোষণা করলেন যে, নাসেরই সুযোগ্য ব্যক্তি, আর বিপ্লব আন্দোলন চালাবার দরকার নেই। রাতারাতি তিনি সব

কিছু ছেড়ে ফকিরের পোশাক পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। তারপর আর কোনওদিন তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। মানুষকে সৎপথে চলার উপদেশ দিতেন, নিজেও খুব সাধারণভাবে দিন কাটাতেন। দেশের মানুষ তাঁকে একজন সর্বত্যাগী মহাপুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করত।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের দেশের শ্রীঅরবিন্দের মতন। উনিও আগে বিপ্লবী ছিলেন, পরে সাধক হয়ে যান। মুফতি মহম্মদ কি কোনও আশ্রম করেছিলেন বা ওঁর অনেক বিষয়সম্পত্তি ছিল?"

মান্টো বললেন, "না, না, সে সব কিছু না। ওঁর অনেক ভক্তশিষ্য ছিল বটে। কিন্তু উনি নিজেকে বলতেন ফকির। ওঁর নিজস্ব কোনও সম্পত্তিই ছিল না।"

"তা হলে একজন ফকিরের উইল নিয়ে এত মাথা-ফাটাফাটি কেন? ফকিরের আবার উইল কী? অথচ আল মামুন সেই উইলের জন্যই আমাকে পাঁচ লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল। হানি আলকাদি আমার মুণ্ডু চাইছে। এটা তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার!"

"তার কারণ আছে, রায়চৌধারী! মুফতি মহম্মদ এক সময় একটা বড় বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। হঠাৎ সেই দল ভেঙে দেন। একটা বিপ্লবী দল চালাতে গেলে প্রচুর টাকা আর অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার রাখতে হয়। মুফতি মহম্মদের দলেও সেরকম টাকা পয়সা আর অস্ত্র ছিল। অনেকেরই প্রশ্ন, সেগুলো কোথায় গেল? তিনি নিজে কিছুই ভোগ করেননি। এখনও কয়েকটা বিপ্লবী দল এদেশে আছে, তুমি জানো নিশ্চয়ই। এই তো সেদিন এইরকম একটা দলের লোকেরা প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে খুন করেছে। আমি তোমাকে চুপিচুপি বলছি, আমার ধারণা, ওই হানি আলকাদির দলের লোকেরাই এই খুনটা করেছে। তাহলেই

বুঝতে পারছ, ওরা কত সাঙ্ঘাতিক !"

"তুমি চিন্তা কোরো না, মান্টো। হানি আলকাদি আমাকে এখন খুন করবে না, যদি তার একটুও বুদ্ধি থাকে !"

"তুমি এত নিশ্চিত হতে পারছ কী করে জানি না। আচ্ছা, এবার বলো তো, মুফতি মহম্মদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী ? তুমি তাঁর উইল চুরি করেছ, এরকম কথা উঠছে কেন ?"

"তুমি বললে, মুফতি মহম্মদ লেখাপড়া জানতেন না। তুমি কি জানো, তিনি হিয়েরোগ্লিফিকস ভাষা জানতেন ?"

মান্টো যেন হতবাক হয়ে গেলেন কথাটা শুনে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কাকাবাবুর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "আমি নিজেই তো ওই ছবির ভাষার পাঠোদ্ধার করতে পারি না। তবে, আমি তোমার কথা একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছি না। মনে পড়ছে যেন, বছর চল্লিশেক আগে মুফতি মহম্মদ একটা পিরামিডের ভেতরের লিপির মানে এক সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন। তখন অবশ্য অনেকে ভেবেছিল, উনি আন্দাজে বলেছেন। উনি তা হলে ওই ভাষায় উইল রচনা করে গেছেন ?"

"না। মুফতি মহম্মদ কোনও উইল করে যাননি। অন্তত আমি সে রকম কিছু জানি না। মৃত্যুর আগে উনি ওঁর শেষ একটা ইচ্ছে কাগজে ছবি এঁকে বুঝিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটা আমি খানিকটা ধরতে পারি। ওঁর সেই শেষ ইচ্ছেটা এতই অদ্ভুত যে, আমি বেশ অবাক হয়েছিলুম। তাতে টাকা পয়সার কোনও ব্যাপারই নেই। আমি ছবি এঁকে ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, আমি যা বুঝেছি তা সঠিক কি না। উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, তারপর ছবি এঁকে জানালেন যে, আমি আগে নিজে যাচাই না করে যেন কাউকে না বলি !"

"যাচাই করা মানে ? কী যাচাই করবে ?"

"সেটা যাচাই না করে তো বলা যাবে না। যাক, সে-সব পরে জানতে পারবে। এখন অন্য কথা বলা যাক। তোমার বাড়ির খবর কী ? বৌদি কেমন আছেন। তোমার ছেলে-মেয়ে ক'টি হল ?"

দু'একটা সাধারণ কথার পর মান্টো আবার বললেন, "রাজ্‌জা রায়চৌধারী, আমি তোমার সম্পর্কে সত্যি চিন্তিত। হানি আলকাদি তোমার ওপর রেগে আছে, আর তুমি এরই মধ্যে কায়রো এসে পড়েছ ! যদি টের পেয়ে যায়..."

কাকাবাবু বললেন, "আবার ওই কথা ! ছাড়ো তো ! শোনো, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলুম...রানি হেটেকেরিসের মমি কি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে ?"

মান্টো চমকে উঠলেন। তারপর তাঁর চোখে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "তুমি এটাও জানো ! রানি হেটেকেরিসের মমি তার সারকোফেগাসের মধ্যে এক-একবার দেখা গেছে, আবার উধাও হয়ে গেছে। সবাই বলত সেটা অলৌকিক ব্যাপার। বছর তিরিশেক ধরে অবশ্য সেই মমি আর দেখতে পাওয়া যায়নি। হঠাৎ তুমি এই প্রশ্ন করলে ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "এমনিই। প্লেনে আসবার সময় সন্তুকে ওই গল্পটা বলছিলুম কি না। তাই ভাবলুম, ও নিশ্চয়ই শেষটা শুনতে চাইবে। তিরিশ বছর ধরে রানির মমি আর দেখতে পাওয়া যায়নি ?"

মান্টো কিছু উত্তর দেবার আগেই দরজায় ঠকঠক শব্দ হল। একজন কেউ বলল, "রুম সার্ভিস। ইয়োর লাঞ্চ ইজ রেডি স্যার !"

সন্তু দরজা খুলতেই হোটেলের বেয়ারার বদলে তিনজন সশস্ত্র

লোক তাকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে এল। একজন দাঁড়াল দরজায় পিঠ দিয়ে। অন্য দু'জন লম্বাটে ধরনের রিভলভার তুলে ধরল ওদের দিকে।

মিউজিয়ামের কিউরেটার মান্টোর মুখখানা ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। দিনদুপুরে হোটেলের কামরার মধ্যে যে এরকম গুণ্ডামি চলতে পারে, তা তিনি যেন কল্পনাই করেননি কোনওদিন। এরা এসেছে যখন, নিশ্চয়ই খুন করে ফেলবে! এদের তিনজনেরই গায়ে খাকি জামা, একজনের গলায় একটা স্কার্ফ বাঁধা।

দরজায় ঠেস দেওয়া দলপতি ধরনের চেহারার লোকটি মান্টোকে বলল, "ইউ কিপ কোয়ায়েট। উই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ!"

কাকাবাবু একটুও বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি হানি আলকাদির লোক? সে কোথায়?"

গলায়-স্কার্ফ-বাঁধা লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আমরা এখানে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে আসিনি। হুকুম করতে এসেছি। প্রফেসার, পায়ে জুতো পরে নাও, আমরা তোমাকে নিয়ে যাব!"

কাকাবাবু বললেন, "প্রফেসার? কে প্রফেসার? আমি তো প্রফেসার নই। তোমরা ভুল জায়গায় এসেছ!"

লোকটি পকেট থেকে একটা ফোটো বার করে দেখিয়ে বলল, "না। আমাদের ভুল হয়নি। নাউ, গেট গোয়িং!"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, পাকা কাজ! শোনো, আমাকে ওরকম ভাবে হুকুম দেওয়া যায় না। আমার এখন এখান থেকে যাবার ইচ্ছে নেই। হানি আলকাদির সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই, তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো, আমরা একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব!"

একজন লোক রুক্ষ ভাবে কাকাবাবুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "আরে ল্যাংড়া, চল্ শিগগির !"

কাকাবাবুর চোয়াল কঠিন হয়ে গেল। চোখে জ্বলে উঠল আগুন। তিনি মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন লোক তিনটিকে। তারপর তীব্র গলায় বললেন, "দিল্লিতে আমার ওপর তিনবার অ্যাটেম্‌ট হয়েছিল, এখানেও দিনের বেলা গুণ্ডামি করতে এসেছ। তোমরা ভেবেছ কী ? আমাকে চেনো না তোমরা !"

দু'হাতের ক্রাচ দুটো তুলে তিনি বিদ্যুৎ-গতিতে মারলেন দু'জন লোকের হাতে। তাদের হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ে গেল, দু'জনেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। মান্টো ভয়ের চোটে মাটিতে বসে পড়লেন। সন্তু একটা রিভলভার তুলে নেবার চেষ্টা করতেই দরজায় ঠেস-দেওয়া তৃতীয় লোকটি শান্ত গলায় বলল, "স্টপ দ্যাট ফানি বিজ্‌নেস। আই উইল শুট টু কিল !"

কাকাবাবু সেই লোকটির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, "করো তো গুলি, দেখি তোমার কত সাহস ! আমায় গুলি করলে তোমার নিজের মাথা বাঁচবে ? হানি আলকাদি আমাকে জ্যান্ত অবস্থায় চায়। আমাকে মেরে ফেললে সে কিছুই আর জানতে পারবে না !"

তৃতীয় লোকটি বলল, "হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, তোমাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তুমি যদি যেতে অস্বীকার করো তা হলে তোমার পায়ে গুলি করে তোমার আর একটা পা'ও খোঁড়া করে দিতে কোনও অসুবিধে নেই। তুমি তাই চাও ?"

মাটিতে বসে থাকা অবস্থায় মান্টো বললেন, "রায়চৌধারী, প্লিজ মাথা গরম কোরো না ! ওরা যা বলে তাই-ই করো। ওদের কথা মেনে নাও !"

তৃতীয় লোকটি বলল, "প্রফেসার, তুমি ভালভাবে চলে এসো

আমাদের সঙ্গে। তোমার কোনও ক্ষতি করা হবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা ভদ্রভাবে আমাকে আগে অনুরোধ করলেই পারতে। ঘরে ঢুকে গুণ্ডার মতন রিভলভার ওঁচালে কেন? তোমরা গুণ্ডা না বিপ্লবী? তোমাদের দেশে আমি অতিথি হয়ে এসেছি, হানি আলকাদির উচিত ছিল নিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করা।"

তৃতীয় লোকটি অনুচ্চ গলায় হেসে উঠে বলল, "তুমি সত্যি একজন অদ্ভুত লোক, তা স্বীকার করছি। হানি আলকাদির নাম শুনলেই সবাই ভয় পায়, আর তুমি তাকে ধমকাচ্ছ!"

কাকাবাবু বললেন, "তাকে আমার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। আমি একজন ভারতীয় নাগরিক, আমার গায়ে হাত তুললে এ-দেশের সরকার হানি আলকাদিকে ছাড়বে না।"

"এখন কথা কাটাকাটি করার সময় নেই। তুমি এক্ষুনি চলো আমাদের সঙ্গে।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "কোনও ভয় নেই, সন্তু। আমি আজ রাত্তিরের মধ্যে যদি না ফিরি, তা হলে তোকে খবর পাঠাব। যদি কোনও খবর না পাস, তা হলে সিদ্ধার্থকে বলবি এখানকার হোম ডিপার্টমেন্টে খবরে দিতে।"

মান্টোকে বললেন, "আমার জন্য কিছু চিন্তা কোরো না, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে!"

তৃতীয় লোকটি সন্তুদের বলল, "আমরা এখান থেকে চলে যাবার দশ মিনিটের মধ্যে ঘর থেকে বেরুবে না। পুলিশে খবর দিয়ে কোনও লাভ নেই। তোমার আংকেলের খবর আমরা যথাসময়ে জানিয়ে দেব!"

ওরা বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিল।

মান্টো উঠে এসে সন্তুকে ধরে বললেন, "বাপ রে বাপ ! তিন তিনটে রিভলভার। আমি আগে কক্ষনো এরকম দেখিনি। যদি একটা থেকে গুলি ফসকে বেরিয়ে আসত ! তোমার আংকল কী সাংঘাতিক লোক ! আমার এখনও পা কাঁপছে !"

কাকাবাবু যে ক্রাচ দিয়ে দুটো রিভলভারধারীকে হঠাৎ অমন মারতে শুরু করবেন, তা সন্তু এক মুহূর্ত আগেও বুঝতে পারেনি। কাকাবাবুর অমন রুদ্র মূর্তি সে দেখেনি কখনও আগে। এখনও তার বুক ধড়াস ধড়াস করছে।

এরই মধ্যে সন্তু ভাবল, এখন কী করা যায় ? কাকাবাবুকে নিয়ে ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামছে, টেলিফোন তুলে হোটেলের রিসেপশানিস্টকে সে-কথাটা জানিয়ে দিলে হয় না ?

সন্তু সে-কথা মান্টোসাহেবকে বলতেই তিনি সন্তুর হাত চেপে ধরে বললেন, "খবর্দার, ওরকম কিছু করতে যেও না ! ওরা যা বলে গেল, তা-ই শুনতে হবে। তুমি জানো না ওরা কত নিষ্ঠুর। ঘরে ঢুকেই কেন যে ওরা গুলি চালাতে শুরু করল না, তাতেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। সেটাই ওদের স্টাইল। ওরা কাউকে কোনও কথা বলার সুযোগ দেয় না !'

সন্তুর গলা শুকিয়ে গেছে। সে জলের বোতল নিয়ে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে নিল।

তারপর খানিকটা চাঙ্গা হয়ে নিয়ে বলল, "কাকাবাবু জানতেন, ওরা গুলি করবে না। বুঝলেন না, সব জিনিসটাই রয়েছে কাকাবাবুর মাথার মধ্যে। উনি নিজে থেকে না বললে কেউ ওঁর কাছ থেকে জোর করে কথা বার করতে পারবে না !"

মান্টো বিরক্তভাবে বললেন, "হুঁঃ ! কী যে ঝঞ্ঝাট ! এসো, বিছানায় বসে থাকি, দশ মিনিট কাটুক। দিনের বেলা হোটেলের ঘর থেকে একজনকে ধরে নিয়ে গেল ? ছি, ছি, ছি, কী যে হয়ে

গেল দেশটা ! দশ মিনিট বাদে আমাদের এই ঘর থেকে কে বার করবে ? যদি কেউ এসে দরজা খুলে না দেয় ?”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা মিঃ মান্টো, আপনি হানি আলকাদিকে নিজের চোখে দেখেছেন কখনও ?”

“না। দেখিনি, দেখতেও চাই না ! তবে কাগজে ছবি দেখেছি অবশ্য !”

“আমার ভয় হচ্ছে। কাকাবাবুকে কেউ হুকুমের সুরে কথা বললে উনি কিছুতেই তা শুনতে চান না। সেইজন্য ওরা রাগের মাথায় যদি কাকাবাবুকে কিছু করে বসে !”

“তোমার কাকাবাবুর উচিত ছিল এরকম কাজের ভার না নেওয়া ! মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে কী ছিল, তা যাচাই করে দেখা ওঁর কী দরকার ! আচ্ছা, ইয়াংম্যান, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে কী ছিল ? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।”

সন্তু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “কাকাবাবু আমাকে কিছু বলেননি। তবে আমি অনেকটা আন্দাজ করেছি। কিন্তু মাফ করবেন, আমার আন্দাজটাও আমি আপনাকে এখন জানাতে পারব না !”
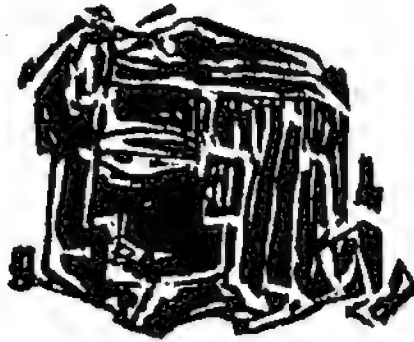
কাকাবাবু ইজিপ্টে আগে এসেছিলেন, কায়রো শহর এবং কাছাকাছি অনেকগুলো জায়গা তাঁর বেশ চেনা। এরা তাঁর চোখ বাঁধেনি। হোটেলের বাইরে এসে একটা জিপগাড়িতে তুলেছে।

পাশে কেউ রিভলভার উঁচিয়ে নেই। এরা বুঝেছে যে, এই মানুষটিকে অযথা ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না।

কায়রো শহর থেকে পাঁচ-ছ'মাইল দূরেই তিনটি পিরামিড পাশাপাশি। কাছেই জগৎ-বিখ্যাত স্ফিংকস। এখন টুরিস্ট সিজ্‌ন না হলেও স্ফিংকসের সামনে মোটামুটি ভিড় আছে। এই দুপুরে-রোদের মধ্যেও। সেখানে রয়েছে অনেক উটওয়ালা আর ক্যামেরাম্যান। এরা টুরিস্টদের একেবারে কান ঝালাপালা করে দেয়।

কাকাবাবু লক্ষ করলেন, গাড়িটা এই জায়গার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল মেমফিসের দিকে। আগেকার তুলনায় এই রাস্তায় অনেক বেশি বাড়িঘর তৈরি হয়ে গেছে। মধ্যে-মধ্যে দু'একটা উঁচু-উঁচু সরকারি বাড়ি। আগে এ-রাস্তায় অনেক খেজুরগাছ ছিল, এখন আর চোখে পড়ে না।

মেমফিস বেশি দূর নয়। কায়রো থেকে দশ-বারো মাইল। সড়ক-পথে খানিকটা যাবার পরেই শুরু হয়ে যায় মরুভূমি। গাড়িটা কিন্তু মেমফিসের দিকে গেল না, ধুধু মরুভূমির মধ্যে ছুটতে শুরু করল।

কাকাবাবু ভাবলেন, আগেকার দিনে আরবসর্দাররা মরুভূমির মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে থাকত দলবল নিয়ে। এখন আরবরা অনেক বড়লোক হয়ে গেছে, তারা এয়ার-কন্ডিশান্‌ড বাড়িতে থাকে। হানি আলকাদি কি এখনও পুরনো কায়দা বজায় রেখেছে? নইলে এই মরুভূমির মধ্যে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়? গাড়ির কোনও লোক একটিও কথা বলছে না। কাকাবাবুও তাদের কিছু জিজ্ঞেস করলেন না!

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর দূরে দেখা গেল ভাঙা দেওয়াল-ঘেরা একটা প্রাচীন প্রাসাদ। তার অনেক ঘরই ভেঙে পড়েছে। দূর

থেকে দেখলে মনে হয় সেখানে মানুষজন থাকে না। কিন্তু কাছে এলে দেখা যায়, একটা উঁচু পাঁচিলের আড়ালে দুটো উট বাঁধা আছে আর তিনখানা স্টেশন ওয়াগন।

জিপটা থামবার পর অন্যরা কিছু বলবার আগেই কাকাবাবু নিজেই নেমে পড়লেন। ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন চারদিকটা।

একজন কাকাবাবুকে বলল, "ফলো মি !"

খানিকটা ধ্বংসস্তূপ পার হবার পর ওরা এসে পৌঁছল একটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাথরের ঘরে। সেখানে খাট-বিছানা পাতা আছে। রয়েছে একটা ছোট টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। দেওয়ালের গায়ে একটা কাঠের আলমারি, সেটা বন্ধ।

সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল, সে কাকাবাবুকে বলল, "তুমি এইখানে বিশ্রাম নাও ! তোমার কি খিদে পেয়েছে ? তা হলে খাবার পাঠিয়ে দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি বিশ্রাম নিতে চাই না, আমার জন্য খাবার পাঠাবারও দরকার নেই। আমি এক্ষুনি হানি আলকাদির সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

লোকটি বলল, "অল ইন গুড টাইম। ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? এখন বিশ্রাম নাও কিছুক্ষণ। আশা করি তুমি এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে না। এই মরুভূমির বালির ওপর দিয়ে তোমার ওই ক্রাচ নিয়ে তুমি এক মাইলও যেতে পারবে না !"

লোকটা দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কাকাবাবু চোখ বুজে, কপালটা কুঁচকে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটা একটা নিষ্ঠুর সত্যি কথা বলে গেছে। একটা পা অকেজো বলে এখন আর চলাফেরার স্বাধীনতা নেই তাঁর। যে কাজের জন্য তিনি এসেছেন, তার জন্য দু'খানা জোরালো পা থাকা খুবই

দরকারি। অনেকদিন বাদে তিনি ভাঙা পা'খানার জন্য দুঃখ বোধ করলেন।

একটু বাদে কাকাবাবু শুয়ে পড়লেন খাটে। দুপুরে খাওয়া হয়নি, তাঁর বেশ খিদে পাচ্ছে, কিন্তু এদের এখানে তিনি খেতে চান না। ভেতরে ভেতরে তাঁর এখনও খুব রাগ জমে রয়েছে। একবার রাগ হলে সহজে কাটতে চায় না।

শুয়ে পড়বার পর তিনি দেখলেন বালিশের পাশে দু'খানি বই। কৌতূহলের বশে তিনি প্রথমে একটি বই তুলে নিলেন। সেটি কমপ্লিট ওয়ার্কস অব শেক্সপিয়ার। কাকাবাবু দারুণ অবাক হলেন। এই মরুভূমির মধ্যে, একটা প্রায় ভগ্নস্তূপের মধ্যে শেক্সপিয়ারের কবিতা! অন্য বইটি দেখে আরও অবাক হলেন। সেটাও ইংরেজি কবিতা, 'সং অফারিংগ্স' বাই স্যার আর এন টেগোর!

কাকাবাবু বিহ্বলভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বইটা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টালেন। বইখানি এমনি-এমনি এখানে পড়ে নেই। কেউ একজন মন দিয়ে পড়েছে। অনেক কবিতার লাইনের তলায় লাল কালির দাগ দেওয়া!

প্রায় আধঘণ্টা বই দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করবার পর একটা শব্দ শুনে কাকাবাবু মুখ তুলে তাকালেন।

দেওয়াল-আলমারিটার পাল্লা খুলে গেছে। সেটা আসলে একটা দরজা। তার পাশ দিয়ে নেমে গেছে মাটির নীচে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে একজন লোক দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে।

লোকটিকে দেখে প্রথমেই কাকাবাবুর মনে হল সিনেমার নায়ক। অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা। অন্তত ছ'ফুট লম্বা, চমৎকার স্বাস্থ্য, গৌর বর্ণ, টিকোলো নাক, মাথার চুল আধা কোঁকড়ানো।

মুখে সরু দাড়ি। সে পরে আছে একটা ব্লু জিন্‌স আর ফিকে হলদে টি শার্ট। সেই শার্টে একটা সিংহের মুখ আঁকা। তার কোমরে একটা বুলেটের বেল্ট, আর দু'পাশ দুটো রিভলভার। সে দুটোর বাট আবার সাদা। লোকটির বয়েস তিরিশ-বত্রিশের বেশি নয়।

লোকটিকে দেখে কাকাবাবুর হাসি পেয়ে গেল।

লোকটি অর্ধেক ঠোঁট ফাঁক করে হেসে নিখুঁত উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, "হ্যালো, মিঃ রায়চৌধুরী, গুড আফটারনুন। আশা করি তোমার এখানে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি ?"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে বললেন, "তুমিই হানি আলকাদি ?"

লোকটি সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে 'হ্যাঁ' বলল। তারপর মেঝেতে নেমে এসে বলল, "ঘরের মধ্যে এখনও গরম, বাইরে কিন্তু চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। চলো আমরা বাইরে গিয়ে বসি। তোমাকে আমরা ফাইনেস্ট ইণ্ডিয়ান টি খাওয়াব। সেই সঙ্গে ফিশ কাবাব ! তোমরা বেঙ্গলিরা তো ফিশ ভালবাসো !"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব প্লেজানট্রিস বন্ধ করো। আগে আমি তোমার কাছ থেকে কয়েকটা এক্সপ্লানেশান চাই। তুমি আমাকে এখানে ধরে আনিয়েছে কেন ? আমি ভারতীয় নাগরিক, আমাকে বন্দি করার কী অধিকার আছে তোমার ?"

হানি আলকাদি খুব অবাক হবার ভান করে বলল, "ধরে এনেছি ? মোটেই না ! তোমার কি হাত বাঁধা আছে ? তোমাকে আমি নেমন্তন্ন করে এনেছি। তুমিই তো শুনলুম আমার দু'জন লোককে হাতে এমন মেরেছ যে, এক বেচারির কব্জি মুচকে গেছে !"

কাকাবাবু স্থির দৃষ্টিতে হানি আলকাদির চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তোমাদের দেশে বুঝি রিভলভার উঁচিয়ে নেমন্তন্ন

করাই প্রথা ? আমি আগেও এখানে এসেছি, অনেক নেমন্তন্ন খেয়েছি, কোনওদিন তো এরকম দেখিনি ?"

হানি আলকাদি লজ্জিত ভাব করে বলল, "আরে ছি ছি ছি, হোয়াট আ শেম ! আমার লোকেরা এরকম বাড়াবাড়ি করে ফেলে ! আমি মোটেও সেরকম নির্দেশ দিইনি। অবশ্য তোমার সব কথা শুনেটুনে ওরা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। মিঃ রায়চৌধুরী, আমি সত্যি বলছি, আমরা এখানে অনেকেই ভারতীয়দের খুব পছন্দ করি। আমি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ টেগোরের খুব ভক্ত। সবাই আমাকে বিপ্লবী বলে জানে, কিন্তু আমি একজন কবিও বটে। ছদ্মনামে আমার দুটো কবিতার বই বেরিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "রবীন্দ্রনাথের কোনও ভক্ত কোমরে দুটো পিস্তল ঝুলিয়ে রাখে, এটা দেখা আমার পক্ষে একটা নতুন অভিজ্ঞতা বটে। যাক গে যাক, আমি তোমার কাছে জানতে চাই..."

হানি আলকাদি এগিয়ে এসে কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো তুলে ধরে বলল, "তুমি বড্ড রেগে আছ। এই নাও, বাইরে চলো, আকাশটা কী সুন্দর হয়ে আছে এখন, দেখলে তোমার মন ভাল হয়ে যাবে !"

অগত্যা কাকাবাবু বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেখানকার ফাঁকা চত্বরে একটা টেবিল ও দুটি চেয়ার পাতা হয়েছে। কিছু লোকজন সেখানে খাবারদাবার আর চায়ের পট সাজিয়ে দিচ্ছে। আকাশটার এক প্রান্তে টকটকে লাল। তার পরের দিকটার মেঘে অনেক রঙের খেলা। বড় অপূর্ব দৃশ্য।

কাকাবাবু তবু বললেন, "শোনো হানি আলকাদি, আমার কতকগুলো প্রিন্সিপল্ আছে। তোমার সঙ্গে বসে আমি খাবার কেন, এক গেলাশ জলও খাব না। কারণ তুমি খুনি। তুমি বিনা

দোষে আমাকে হত্যা করবার জন্য একজনকে পাঠিয়েছিলে দিল্লিতে !"

হানি আলকাদি বলল, "তোমাকে হত্যা করতে ? মোটেই না ! তা হলে এটা দ্যাখো !" বলেই চেঁচিয়ে ডাকল, "মোসলেম ! মোসলেম !"

অমনি একজন লোক বেরিয়ে এল পাশের একটা গলি থেকে । কাকাবাবু তাকে দেখেই চিনতে পারলেন । এই লোকটাই দিল্লিতে
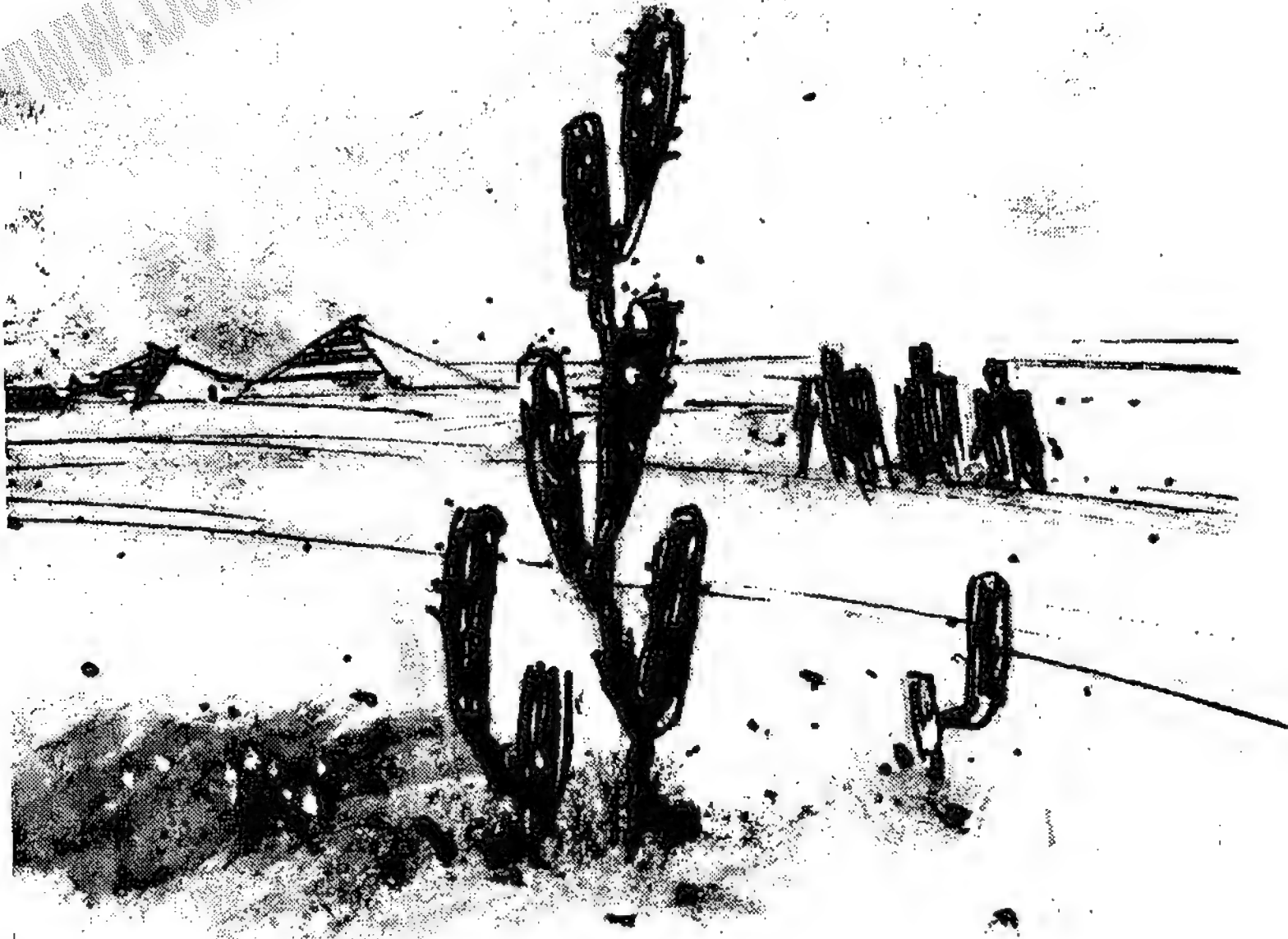
তাঁর আততায়ী হয়ে এসেছিল এক রাত্তিরে।

হানি আলকাদি অনেক দূরের একটা খেজুরগাছ দেখিয়ে সেই লোকটিকে কী যেন বলল আরবি ভাষায়। তারপর নিজের একটা রিভলভার দিল লোকটির হাতে।

লোকটি চোখ বন্ধ করে এক পাশ ফিরে গুলি করল। নিখুঁত লক্ষ্যভেদে উড়ে গেল খেজুর গাছের ডগাটা।

হানি আলকাদি যেন তাতেও খুশি হল না। লোকটির পাশে

গিয়ে ধমক দিয়ে কী যেন বলতে লাগল। লোকটি আবার রিভলভার তুলে গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি হল। ট্রিগার টিপতে যাবে এমন সময় হানি আলকাদি চেঁচিয়ে বলল, "ব্লাডি ফুল ! লুক বিহাইণ্ড !" বলেই লোকটির কাঁধের ওপর একটা থাপ্পড় কষাল।

লোকটি তবুও গুলি ছুঁড়ল এবং এবারেও খেজুরগাছটার ডগার খানিকটা অংশ উড়ে গেল।

হানি আলকাদি হাসতে-হাসতে কাকাবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "দেখলে ? দেখলে তো ? এই মোসলেম আমার বডিগার্ড। পৃথিবীতে যেখানেই যাই, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাই। ওর মাথা ঠাণ্ডা। টিপ অব্যর্থ। তোমার কাছে ওকে পাঠিয়েছিলাম শুধু তোমাকে একটুখানি আঘাত দেবার জন্য। তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলতে চাইলে ও ঠিকই মেরে আসত ! তখনও তোমার সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানতুম না। তোমাকে একটু ভয় দেখিয়ে আমাদের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলুম।"

হঠাৎ কাকাবাবুর একটা হাত জড়িয়ে ধরে হানি আলকাদি খুবই অনুতপ্ত গলায় বলল, "তোমাকে আঘাত দিতে হয়েছিল বলে আমি ক্ষমা চাইছি। ওই যে বললুম, তখন তোমার সম্পর্কে ভাল করে জানা ছিল না। আমরা ভেবেছিলুম, তুমি আল মামুনের একটা ভাড়াটে লোক !"

হানি আলকাদির এতখানি বিনীত ব্যবহার দেখে কাকাবাবু অভিভূত হয়ে গেলেন। কোমরে দু'দুটো পিস্তল থাকলেও লোকটি সত্যিই একজন কবি !

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবারে বুঝেছি। আমার অবশ্য বেশি আঘাত লাগেনি !"

"চলো, তাহলে কিছু খেয়ে নিই। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, ভাল জাতের ভারতীয় চা একটু ঠাণ্ডা হলেই

বিস্বাদ হয়ে যায়।”

দু'জনে এসে বসলেন টেবিলে। হানি আলকাদি যত্ন করে কাকাবাবুর প্লেটে খাবার তুলে দিল। চা বানাল সে নিজেই। কাকাবাবু চা পান করতে করতে আকাশে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

চা শেষ করে হানি আলকাদি একটা চ্যাপ্টা ধরনের সিগারেট ধরাল। তারপর কাকাবাবুর দিকে ডান হাত বাড়িয়ে বলল, “এবারে দাও!”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কী?”

“মুফতি মহম্মদের উইল! তারপর আমার লোকেরা তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে।”

“যদি আমি না দিই?”

“তা হলে তুমি আমাদের এখানেই সম্মানিত অতিথি হয়ে থাকবে। আমরা রোজ তোমাকে অনুরোধ করব। যাতে তুমি দিয়ে দাও! কিংবা সেগুলো কোথায় আছে তুমি বলে দাও! মিঃ রায়চৌধুরী, আমাদের গুরু মুফতি মহম্মদের সম্পদ আটকে রেখে তোমার কী লাভ? তা তো তুমি নিজে ভোগ করতে পারবে না। তুমি কি তা ইজিপ্টের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে? সে সব দিন আর নেই!”

“শোনো হানি আলকাদি, তোমাদের গুরু মুফতি মহম্মদের কোনও সম্পদ ছিল কি ছিল না তা আমি জানি না। থাকলেও তা ভোগ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। তিনি তো ফকির ছিলেন শুনেছি, তাঁর সম্পদ সম্পর্কে তোমাদের এত আগ্রহ কেন?”

“ফকির হবার আগে তিনি এক বিরাট বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর টাকা ছিল তাঁর দলের। সে সব

কোথায় গেল ?”

“তিনি তো বিপ্লবী দল ভেঙে দিয়েছেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে। এতদিনেও তোমরা তার সন্ধান পাওনি ?”

“না। কেউ তা পায়নি। ওঁকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করত না। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি নিশ্চয়ই সব বলে দিয়ে গেছেন। সেই সন্ধানই আমরা জানতে চাই! উনি যে ছবিগুলো এঁকেছিলেন, সেগুলো আমাদের দিয়ে দাও!”

“সেগুলো তো আমার কাছে নেই। আল মামুন সেগুলো শুধু আমাকে দেখতে দিয়েছে, আমাকে তো দেয়নি!”

“ইয়া আল্লা! আমরা বরাবর ভেবেছি, সেগুলো তুমিই লুকিয়ে রেখেছ। আল মামুনের একটা লোককে আমরা ধরে এনে টর্চার করেছিলুম, সেও ওই কথাই বলেছে!”

“না, তা নয়। ছবিগুলোতে কী লেখা আছে তা একমাত্র আমি জানি। ছবিগুলো আল মামুন নিজের কাছেই রেখেছে, কিন্তু ওতে কী লেখা আছে তা ও কিছুই জানে না। অবশ্য ও লন্ডনে লর্ড পেমব্রোকের কাছে ছবিগুলো নিয়ে যেতে পারে, তিনি আমার চেয়ে অনেক ভালভাবে ওগুলো ডিসাইফার করে দিতে পারবেন।”

“মিঃ রায়চৌধুরী, তুমি কি জানো না, লর্ড পেমব্রোক মাত্র দু'সপ্তাহ আগে মারা গেছেন? সুতরাং এখন পর্যন্ত শুধু তুমিই ওগুলোর অর্থ জানো! দেরি করার সময় নেই। আজই আমরা সব কিছু জানতে চাই।”

“আল মামুনও ছবিগুলোর অর্থ জানতে চেয়েছিল। তাকে বলিনি। তা হলে তোমাদের বলব কেন?”

এই প্রথম হানি আলকাদি রেগে উঠল। টেবিলের ওপর এমন জোরে একটা ঘুসি মারল যে, কাপ-প্লেটগুলো কেঁপে উঠল ঝনঝন

করে। তার ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল হয়ে গেছে।

সে বলল, "কী বলছ তুমি, আমাদের সঙ্গে ওই পিশাচটার তুলনা ? আমরা বিপ্লবী, আমরা কেউ নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবি না ! আর ওই লোকটা, ওই আল মামুন, ও তো একটা ঘৃণ্য লোভী মানুষ। ওর অনেক টাকা, তবু ওর টাকার আশ মেটে না। ও মুফতি মহম্মদকে দিল্লিতে চিকিৎসা করাতে নিয়ে গিয়েছিল শুধু এই লোভে যে, যদি মুফতি মহম্মদ শেষ পর্যন্ত ওকেই সব কিছুর সন্ধান বলে দেন ! ওকে আমি খুন করব ! নিজের হাতে।"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সে তোমরা যা ইচ্ছে করো। এর মধ্যে আমাকে জড়াচ্ছ কেন ?"

হানি আলকাদি নিজের রাগ খানিকটা সামলে নিল। তারপর সেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাকে জড়াচ্ছি, তার কারণ, তুমিই এখন পর্যন্ত মুফতি মহম্মদের উইলের অর্থ জানো। তুমি যদি আমাদের বলতে না চাও, তা হলে আর কেউ যাতে জেনে না ফেলে, সেজন্য আমরা তোমার মুণ্ডুটা কেটে ফেলতে বাধ্য হব !"

"কাকাবাবু বললেন, "ইউ আর ওয়েলকাম। আমার কাটা মুণ্ডু কোনও কথা বলবে না !"

হানি আলকাদি এবারে হঠাৎ কাকাবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, তুমি টেগোরের দেশের লোক, গান্ধীর দেশের লোক, তোমরা ভায়োলেন্সকে ঘৃণা করো, তা আমরা জানি। কিন্তু তোমরা তো আমাদের এদিককার দেশগুলোর অবস্থা জানো না ! সে যাই হোক, তোমার মুণ্ডু কাটার কথা আমি এমনিই রাগের মাথায় বলে ফেলেছি। তুমি আমাদের বলো বা না-ই বলো, আমরা তোমার কোনওই ক্ষতি করব না। তবু আমি কাতরভাবে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাদের দল এখন এমন অবস্থায় রয়েছে, প্রচুর টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র না পেলে আমরা

আর কাজ চালাতে পারব না ! সেইজন্যেই মুফতি মহম্মদের উইলের ওপর আমরা এত আশা রেখেছি !"

কাকাবাবু হানি আলকাদির কাঁধ ধরে বললেন, "ওঠো, চেয়ারে বোসো ! শোনো, তোমাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তোমাকে আমি খোলাখুলি বলছি, মুফতি মহম্মদ শেষ উইল করেছিলেন কি না, তা আমি জানি না। সত্যিই জানি না !"

"মিঃ রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি। তা হলে বলো, ছবিতে এঁকে এঁকে উনি কী বুঝিয়েছিলেন।"

"সেটা বলতে পারো এক ধরনের ছেলেমানুষি। একজন সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধের শেষ কৌতুক। সেটা জেনে তোমার বা আল মামুনের কোনওই লাভ হবে না। বরং আমার মতন যে-সব লোক ইতিহাসের ব্যাপারে কৌতূহলী, তাদেরই আগ্রহ হবে। মুফতি মহম্মদ আমাকে আদেশ করেছেন যে, সেটা আমি যাচাই করার আগে যেন কাউকে না বলি। সেটা যাচাই করার পর আমি তোমাকে বলব নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে আমাকে তোমায় কয়েকটা সাহায্য করতে হবে।"

"কী সাহায্য বলো ?"

"আমাকে একটা পিরামিডের মধ্যে ঢুকতে হবে। হয়তো একা সমাধি-কুয়োর মধ্যেও নামতে হতে পারে। এজন্য গাইড চাই, উট চাই, আরও কিছু সরঞ্জাম চাই। তুমি যদি সে-সব ব্যবস্থা করে দাও, তা হলে আমি কথা দিচ্ছি, আমি যদি কোনও গুপ্ত সম্পদের সন্ধান জানতে পারি, তবে তা তোমাকেই আগে জানাব।"

হানি আলকাদি ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "ইট্স্ আ ডিল ! তুমি কবে রওনা হতে চাও বলো ? কাল সকালে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তার আগে দু'একটা কাজ আছে। মেমফিসে ডাগো আবদাল্লা নামে পুরনো একজন গাইডকে আমি

চিনতাম। সে যদি বেঁচে থাকে, তাকে আমার দরকার হবে। আর হোটেল ওয়েসিস থেকে আমার ভাইপো সন্তুকেও আনাতে হবে এখানে। তাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি পৌঁছে দিতে পারবে?"

হানি আলকাদি বলল, "তুমি এক্ষুনি চিঠি লেখো। দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। ডাগো আবদাল্লাও বেশ বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে। তাকে আমি আনিয়ে দিচ্ছি।"

তারপরই সে তার লোকজনদের হুকুম করল কাগজ আর কলম আনবার জন্য। সে-সব এসে গেলে কাকাবাবু চিঠি লিখতে শুরু করলেন!

স্নেহের সন্তু,

আমি ভাল আছি। এরা আমাকে বেশ যত্নে রেখেছে। হানি আলকাদি লোকটি মন্দ না, তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে। এরপর এখান থেকে আমরা একটা অভিযানে বেরুব, সেজন্য তোকে আসতে হবে এখানে। তোকে যা করতে হবে তা বলছি। এই চিঠি যে নিয়ে যাবে, সে কাল সকালে তোকে একটা উট ভাড়া করে দেবে। সেই উটে চেপে তুই মেমফিসে চলে আসবি। সেখানে স্টেপ পিরামিড আছে, চিনতে তোর অসুবিধে হবে না। অন্য পিরামিডের চেয়ে এর চেহারাটা একেবারেই আলাদা। এর বাইরের গা দিয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ির মতন উঠে গেছে। তুই সেখানে এসে অপেক্ষা করবি। এখানকার লোক তোকে গিয়ে নিয়ে আসবে।

চিন্তার কিছু নেই। কাল সন্ধের মধ্যেই দেখা হবে।

ইতি কাকাবাবু

পুনশ্চ: সিদ্ধার্থকে সঙ্গে আনবার কোনওই দরকার নেই।

ওকে বুঝিয়ে বলবি। আমরা যে-কাজে যাচ্ছি, তাতে সরকারি লোকজনদের না জড়ানোই ভাল। মান্টোকে বলবি। আমি আর তিন-চারদিন পরে ওর সঙ্গে মিউজিয়ামে গিয়ে দেখা করব!

বিমান বলল, "আরে সন্তু, তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? কাকাবাবু তো চিঠিতে লিখেছেন সিদ্ধার্থদাকে সঙ্গে নিয়ে না যেতে। আমাদের কথা তো বারণ করেননি। তাছাড়া আমি তো সেই সেন্সে ঠিক টেকনিক্যালি সরকারি লোক নই!"

সন্তু মুখ গোঁজ করে বলল, "যাই বলো বিমানদা, চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে কাকাবাবু আমাকে একলাই যেতে বলেছেন। অন্য কারও সাহায্য নেবার দরকার হলে তা নিশ্চয় জানাতেন।"

বিমান বলল, "তুই কিছু বুঝিস না। বন্দি অবস্থায় কেউ অত কিছু লিখতে পারে? ওই যে কাকাবাবু লিখেছেন না 'এরা আমাকে খুব যত্নে রেখেছে', তার মানে কী বুঝলি তো? দু'পাশে দু'জন লোক লাইট মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!"

রিনি বলল, "আমি তো যাবই! শুধু ছেলেরাই বুঝি একা-একা অ্যাডভেঞ্চার করবে!"

বিমান বলল, "নিশ্চয়ই যাবি! আমি আথেন্স থেকে হুড়োহুড়ি করে চলে এলুম, তার আগেই দেখি যত সব কাণ্ড ঘটে গেছে। আমি থাকলে কি আর ওরা কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে যেতে পারত?"

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল, "তুমি থাকলে কী করতে, বিমান?

শুনলেই তো যে তিনজন লোক এসেছিল, উইথ আর্মস। কাকাবাবু দু'জনকে টিট করেছিলেন, কিন্তু থার্ড লোকটা ছিল সত্যিকারের টাফ্।”

বিমান বলল, “আমি থাকলে তাকে একখানা স্কোয়ার কাট ঝাড়তুম! জিজ্ঞেস করো না সন্তুকে, সুন্দরবনে ‘খালি জাহাজের রহস্য’ সমাধান করতে গিয়ে আমি ক'টা লোককে শায়েস্তা করেছিলুম।”

সন্তুর এ সব কথাবার্তা একদম পছন্দ হচ্ছে না। সে ছটফট করছে কখন বেরিয়ে পড়বে।

আগের দিন কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে যাবার পর সন্তু আর মান্টোসাহেব এক ঘণ্টার আগে ছাড়া পায়নি। দশ মিনিট পরে ওরা রিসেপশনে ফোন করেছিল, কেউ উত্তর দেয়নি। ফোনের লাইন কাটা ছিল। ওরা দরজায় ধাক্কা দিয়েছে, কেউ সাড়া দেয়নি। সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। শেষ পর্যন্ত এক ঝাড়ুদার দরজা খুলে দিয়েছিল।

মান্টোসাহেব একটু পরেই চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সন্তু চুপচাপ বসে ছিল ঘরের মধ্যে। সেইরকমই ছিল কাকাবাবুর নির্দেশ।

সন্ধেবেলা সিদ্ধার্থ এসে সব শুনে হতবাক। এরই মধ্যে কাকাবাবুকে গুম্ করেছে? দিনদুপুরে? সিদ্ধার্থ তক্ষুনি একটা হইচই বাধিয়ে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু সন্তু তাকে নিষেধ করেছে। আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে যে, বিপদ দেখলে একেবারে ঘাবড়ে গেলে চলে না। কাকাবাবু বলে গেছেন কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। তার মধ্যে কোনও খবর না দিলে তারপর এখানকার গভর্নমেন্টকে জানাতে হবে। এখন চুপচাপ থাকাই ভাল।

সিদ্ধার্থ সন্তুকে তখন নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল,

তাতেও সন্তু রাজি হয়নি। কাকাবাবু খবর পাঠাবেন এই হোটেলেই। এখানেই সন্তুকে অপেক্ষা করতে হবে। সিদ্ধার্থ বলেছিল, "তুমি রাত্তিরে এই হোটেলে একলা থাকবে? তা হতেই পারে না। আবার যদি হামলা হয়?"

সে-সমস্যার সমাধান হয়ে গেল একটু পরেই। রাত আটটার সময় সেই হোটেলে এসে হাজির হয়ে গেল বিমান। আথেন্স থেকে সে অন্য একটা ফ্লাইট ধরে চলে এসেছে। ঠিক হল, বিমান থাকবে সন্তুর সঙ্গে ওই হোটেল-ঘরে।

প্রায় মাঝরাত্তিরে কাকাবাবুর চিঠি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল একজন লোক। মাঝবয়েসি, মোটাসোটা গোলগাল ধরনের চেহারা। মাথাভর্তি চকচকে টাক। দেখলে বিপ্লবী বলে মনেই হয় না।

ভদ্রলোক বললেন, তিনি একটি কুরিয়ার সার্ভিস এজেন্সির লোক। তাঁর এক মক্কেল এই জরুরি চিঠি পাঠিয়েছে, এবং তাঁকে বলা হয়েছে কাল সকালে একটা উট ভাড়া করে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে। কাল ঠিক সাড়ে এগারোটায় উট তৈরি থাকবে স্ফিংকসের সামনে। এদিককার পার্টি যেন বাসে করে সেখানে ঠিক সময়ে পৌঁছে যায়।

বিমান সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনার মক্কেল কে? কোথা থেকে এই চিঠিটা এসেছে?"

ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন, "তা বলা যাবে না। বিজনেস সিক্রেট। গুড নাইট!"

চিঠি পড়েই সন্তু ঠিক করেছিল সে একাই যাবে। কিন্তু বিমান ঝামেলা বাধাল। সন্তুকে সে কিছুতেই একা ছাড়বে না। তা ছাড়া সে নিজেও অ্যাডভেঞ্চার করতে চায়। রিনিরও সেই একই আবদার।

সন্তু অনেকবার আপত্তি করার পর বিমান বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে! তুই উটের পিঠে চেপে মেমফিস যাবি, আমরা বুঝি আর একটা উট ভাড়া করে তোর পাশাপাশি যেতে পারি না! অন্য টুরিস্টরা যাবে না? যে-কেউ ইচ্ছে করলে মেমফিসের পিরামিড দেখতে যেতে পারে।"

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। স্ফিংকসের কাছে এসে সন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট উটে চাপল, বিমান আর রিনি বসল আর-একটা ভাড়া-করা উটে।

স্ফিংকস আর কাছাকাছি পিরামিডগুলোতে সকালবেলাতেই অনেক টুরিস্ট এসেছে। সন্তু সতৃষ্ণভাবে একবার স্ফিংকসের দিকে তাকাল। তার ভাল করে দেখা হল না।

বিমান বলল, "জানিস সন্তু, সন্ধেবেলা এখানে সনে-লুমিয়ের হয়। আলোর খেলাতে পুরনো মিশরের ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায়।"

রিনি বলল, "আমাদের দিল্লিতে লালকেল্লায় যে-রকম আছে?"

সন্তুর এ-সব কথায় মন লাগছে না। সে খালি ভাবছে, কখন কাকাবাবুর কাছে পৌঁছবে। সে শুনেছে, আরব গেরিলারা মানুষ খুন করতে একটুও দ্বিধা করে না।

উটের পিঠে চাপার অভিজ্ঞতাও সন্তুর এই প্রথম। সমস্ত শরীরটা দোলে। সামনে ধুধু করছে মরুভূমি। সন্তুর হঠাৎ যেন সব ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হল। সে স্বপ্ন দেখছে না তো? সত্যিই কি সে উটের পিঠে চেপে মরুভূমি পার হচ্ছে?

মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!

পাশ থেকে বিমান বলল, "দেখবি কাল গায়ে কীরকম ব্যথা

হয়। তখন উটে চড়ার মজাটা টের পাবি। বিছানায় শোবার বদলে সারা রাত ইচ্ছে করবে দাঁড়িয়ে থাকতে।"

রিনি জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি আজই ফিরে আসব ?"

বিমান বলল, "এই রে, এরই মধ্যে ফেরার চিন্তা ? চল্ তা হলে এক্ষুনি তোকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।"

রিনি বলল, "মোটেই না ! আমি সে-কথা বলছি না। আমি বলছি, পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে ?"

বিমান বলল, "দু'ঘণ্টাও লাগতে পারে, আবার সারাদিনও লেগে যেতে পারে। উটের যেরকম মেজাজ মর্জি হবে।"

রিনি জিজ্ঞেস করল, "এই সন্তু, তুই কথা বলছিস না কেন রে ? তুই গোমড়া মুখে রয়েছিস সকাল থেকে..."

গতকাল এয়ারপোর্টে রিনি যে সন্তুকে অপমান করেছিল তা বোধহয় সে নিজেই ভুলে গেছে। তারপর থেকেই সন্তুর আর কথা বলার ইচ্ছে নেই রিনির সঙ্গে।

সন্তুর উটটা যে চালাচ্ছে, তার বয়েস প্রায় সন্তুরই সমান। সে দু'চারটে ইংরেজি শব্দ মোটে জানে। সন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলে 'ইয়েস, মাস্টার, নো মাস্টার' বলে।

ওদের দুটো উট ছাড়া আর কোনও টুরিস্ট যাচ্ছে না উটের পিঠে চেপে। অসহ্য গরম, রোদ একেবারে গনগন করছে। এত গরমেও কিন্তু একটুও ঘাম হয় না।

মাত্র আধ ঘণ্টা চলার পরেই মনে হল দূর থেকে একটা বিশাল কালো রঙের ধোঁয়ার কুণ্ডলী তেড়ে আসছে ওদের দিকে। বিমান চেঁচিয়ে বলল, "এই রে, সর্বনাশ, ঝড় আসছে !"

সন্তুর উট-চালক মুখ ঘুরিয়ে বলল, "নো অ্যাফ্রেড মাস্টার ! নো ডেঞ্জার !"

দু'জন চালকই তাদের দুটো উটকে বসিয়ে দিল মাটিতে।

সন্তুরা নেমে পড়ল চটপট। সবাই মিলে উটের পিঠের আড়ালে বসল। বিমান বলল, "ঝড়ের ধুলো একদিক থেকে আসে তো, তাই একটু আড়ালে বসলেই গায়ে কিছু লাগে না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ঘূর্ণিঝড় হয় না?"

বিমান বলল, "তাও হয় মাঝে-মাঝে। তখন উপুড় হয়ে শুয়ে মুখ গুঁজে থাকতে হয় আর কান ঢাকা দিতে হয়।"

রিনি বলল, "কী দারুণ লাগছে! ঠিক সিনেমার মতন। আজই ফিরে গিয়ে মা'কে একটা চিঠি লিখব।"

বিমান বলল, "তুই এখনও ভাবছিস আজই ফিরবি? মেমফিসে তোকে একটা রেস্ট হাউসে রেখে আমি আর সন্তু যাব কাকাবাবুর কাছে।'

রিনি বলল, "আহা-হা, অত শস্তা নয়। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে!"

এর পরেই মাথার ওপর দিয়ে ঝড় এসে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক, কিছুই আর দেখা যায় না। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শনশন শব্দ। ওরা কান ঢেকে মুখ নিচু করে রইল, আর কথা বলারও উপায় নেই।

সেই ঝড় যেন আর থামতেই চায় না। কতক্ষণ যে চলল তার ঠিক নেই। উট দুটো মাঝে-মাঝে ভ-র-র-র ভ-র-র-র করে জোরে নিশ্বাস ফেলছে, শুধু সেই শব্দ ঝড়ের শব্দ ছাপিয়েও শোনা যায়।

যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনই হঠাৎ ঝড় শেষ হয়ে গেল এক সময়। আকাশ একেবারে পরিষ্কার।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। আগে মরুভূমিটা ছিল সমতল। এখন কাছাকাছি অনেকগুলো বালির পাহাড় তৈরি হয়ে গেছে। বেশি দূর পর্যন্ত আর দেখা যায় না।

বিমান বলল, "ঝড় হয়ে যাবার এই আর এক মুশকিল। এই সব স্যাণ্ড ডিউনস পার হতে উটগুলোর বেশি সময় লাগে।"

আবার ওরা চেপে বসল উটের পিঠে। আর কোনও ঘটনা ঘটল না। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একঘেয়ে যাত্রা। তারপর দূরে দেখা গেল কয়েকটি পিরামিডের চূড়া, আর মেমফিস শহরের চিহ্ন।

বিমান বলল, "জানিস সন্তু, এই মেমফিস ছিল মিশরের প্রাচীন রাজধানী। সে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। তখনও আমাদের দেশে আর্য-সভ্যতার জন্ম হয়নি।"

সন্তু মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখতে দেখতে বলল, "স্টেপ পিরামিড কোথায় ? ওই তো, ওই যে ! সত্যি দেখলেই চেনা যায়।"

রিনি বলল, "ওই পিরামিডটার ছবি অনেক বইতে দেখেছি। আচ্ছা বিমানদা, বেশির ভাগ বইতে ওই পিরামিডটার ছবিই দেয় কেন ? আরও তো কত পিরামিড রয়েছে।"

বিমান বলল, "কারণ এই পিরামিডটাই সবচেয়ে প্রাচীন। একেবারে প্রথম তৈরি করা হয়েছিল।"

সন্তু উটওয়ালাকে ওই পিরামিডের দিকে যেতে বলল।

স্টেপ পিরামিডের গায়ে ধাপে-ধাপে খাঁজ কাটা আছে। দূর থেকে সিঁড়ির মতন দেখালেও কাছে এলে বোঝা যায় ধাপগুলো অনেক উঁচুতে। সহজে বেয়ে ওঠার উপায় নেই।

ওরা উট থেকে নেমে দাঁড়াল। সেখানে আর কোনও লোক নেই।

উটওয়ালা দু'জন বলল, "গাইড কল মাস্টার ? ফিফটি পিয়াস্তা ! মি গিভ ফিফটি পিয়াস্তা !"

সন্তু বলল, "না, গাইডের দরকার নেই। আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে।"

রিনি বলল, "বাবা রে, একটাও মানুষজন নেই। আমাদের যদি এখানে মেরে পুঁতে রাখে, কেউ টেরও পাবে না।"

এতক্ষণ বাদে সন্তু রিনিকে বলল, "অতই যদি ভয়, তা হলে কে আসতে বলেছিল তোকে?"

রিনি বলল, "বেশ করেছি!"

তারপর সে ছোট্ট একটা ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগল।

বিমান বলল, "চিঠিটা জেনুইন ছিল তো? আমি কাকাবাবুর হাতের লেখা চিনি না।"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, জেনুইন। তা ছাড়া এখানে আর কে বাংলাতে চিঠি লিখবে?"

খানিকবাদে দূর থেকে একটা জিপ আসতে দেখা গেল।

সন্তু বলল, "ওই আসছে!"

রিনি বলল, "মরুভূমিতে যদি জিপগাড়ি চলে, তা হলে আর উটে চড়বার দরকার কী? আমার বিচ্ছিরি লেগেছে!"

জিপটা কাছে এসে থামতেই তার থেকে একজন বলশালী লোক নামল। লোকটি যত না লম্বা, তার চেয়ে বেশি চওড়া।

সে প্রথমেই সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সোনটু? সোনটু? মি ডাগো আবদাল্লা। মি কাম ফ্রম রায়চৌধুরী। ইউ কাম উইথ মি!"

বিমান বলল, "তোমার কাছে রায়চৌধুরীর কোনও চিঠি আছে?"

ডাগো আবদাল্লা মাথা নেড়ে জানাল, না।

বিমান বলল, "তা হলে আমরা কী করে বিশ্বাস করব!"

আচমকা যে-রকম মরুভূমিতে ঝড় উঠেছিল, ঠিক সেইরকমভাবে আচমকা একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটল।

স্টেপ পিরামিডের আড়াল থেকে খুব জোরে ছুটে এল একটা স্টেশন ওয়াগন। বিকট শব্দ করে সেটা ব্রেক কষল ডাগো আবদাল্লার ঠিক পেছনে। চাপা পড়বার আগে ডাগো একটা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশের দিকে।

গাড়ি থেকে টপটপ করে নেমে পড়ল চারজন লোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। তাদের মধ্যে একজন অতিকায় চেহারার লোক প্রায় এক হাতেই সন্তুকে একটা বেড়ালছানার মতন উঁচুতে তুলে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দিল গাড়ির মধ্যে।

রিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

একজন লোক বিমানের দিকে ফিরে বলল, "ইউ গো ব্যাক।"

আর-একজন লোক মাটিতে পড়ে থাকা ডাগো আবদাল্লার পিঠের ওপর নিজের বুটজুতোসুদ্ধ পা তুলে দিয়েছে। কর্কশ গলায় সে বলল, "হেই ডাগো, ইউ ওয়ান্ট টু ডাই?"

রাগে, অপমানে ডাগো আবদাল্লার মুখখানা অদ্ভুত হয়ে গেছে। মানুষটার অতবড় চেহারা, কিন্তু চারখানা রাইফেলের বিরুদ্ধে সে কী করবে। ডাগো ডাগো যে জিপে এসেছে, তাতে রয়েছে শুধু একজন ড্রাইভার। তার দিকেও একজন রাইফেল উঁচিয়ে আছে।

ডাগোর পিঠে যে পা তুলে আছে, সে আবার জিজ্ঞেস করল, "ডাগো, তুই মরতে চাস? আমি ঠিক পাঁচ গুনব!"

ডাগো ফিসফিস করে বলল, "নো, এফেন্ডি!"

লোকটি পা'টা সরিয়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল। সেটা ডাগোর মুখের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এটা তোর মালিককে দিবি! বলবি, বারো ঘণ্টার মধ্যে উত্তর চাই!"

ডাগো আস্তে-আস্তে মাটি থেকে উঠল। দুটো রাইফেল তাক করা রয়েছে তার দিকে। চিঠিটা হাতে নিয়ে সে আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে জিপে উঠল।

একজন হুকুম দিল, "স্টার্ট !"

জিপটা চলতে শুরু করার পরেও কিছুক্ষণ রাইফেলের নল তোলা রইল সেদিকে।

জিপটা চোখের আড়ালে চলে যাবার পর ওরা বিমান আর রিনির দিকে ফিরল। রিনি মুখে হাত চাপা দিয়ে আছে, তার সারা শরীর কাঁপছে। বিমান তাকিয়ে আছে অসহায় ভাবে। সন্তুকে নেবার জন্য দুটো দলের লোক এসেছে। এর মধ্যে কারা যে কোন্ দলের, তা সে বুঝতে পারছে না। তার নিজেরও কিছুই করার নেই। সুন্দরবনের ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করা আর আরব গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই করা তো এক কথা নয়। এরা প্লেন ধ্বংস করে, ডিনামাইট দিয়ে গোটা বাড়ি উড়িয়ে দেয়।

রাইফেলের নল দোলাতে দোলাতে একজন বলল, "গেট গোয়িং ! গেট গোয়িং !"

রিনির হাত ধরে বিমান এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেল। ওদের উটওয়ালা ততক্ষণে তার উটটাকে বসিয়ে ফেলেছে। বিমান রিনিকে নিয়ে চেপে বসল উটের পিঠে।

ওদের একজন এবার অকারণেই আকাশের দিকে রাইফেল তুলে একবার ট্রিগার টিপল। সে আওয়াজে উট দুটোই দৌড় দিল তড়বড়িয়ে।

স্টেশন ওয়ানটা সন্তুকে নিয়ে চলে গেল উল্টো দিকে।

ওদিকে হানি আলকাদি কাকাবাবুর অভিযানের সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। উটের বদলে কাকাবাবু যাবেন গাড়িতে, তাতে সময় বাঁচবে। হানি আলকাদিও যাবে অন্য একটি গাড়িতে। কাকাবাবুর সঙ্গে তার শর্ত হয়েছে যে, হানি আলকাদি তার দলবল নিয়ে অপেক্ষা করবে গিজাতে। সেখান থেকে সে আর এগুতে

পারবে না। কাকাবাবুর সঙ্গে শুধু যাবে সন্তু আর ডাগো আবদাল্লা। কাকাবাবু যদি চার ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না আসেন, তা হলে হানি আলকাদি তাঁর খোঁজ নিতে যাবে।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাকাবাবু একাই কাটিয়েছেন। হানি আলকাদির দেখা পাওয়া যায়নি। অন্য লোকজনও বিশেষ কেউ ছিল না মনে হয়। সন্ধের দিকে এক-এক করে সব আসতে লাগল। এরা বিপ্লবী হলেও দিনের বেলায় নিশ্চয়ই অন্য কাজ করে।

অন্ধকার হয়ে আসার পর কয়েকটা মশাল জ্বালা হল চত্বরে। কাকাবাবু বাইরেই চেয়ার পেতে বসে ছিলেন, এক সময় সেখানে হাতে একটা মশাল নিয়ে উপস্থিত হল হানি আলকাদি। আজ তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। জলপাই-সবুজ রঙের পোশাক পরা, মাথার চুলে একটা রিবন বাঁধা। চোখ দুটো একেবারে ঝকঝক করছে।

হাসিমুখে সে বলল, "হ্যালো, প্রফেসার! হাউ আর ইউ দিস ইভনিং?"

কাকাবাবুও হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা অনেকেই আমাকে প্রফেসার বলো কেন? আমি তো কখনও কোনও কলেজে পড়াইনি!"

হানি আলকাদি বলল, "ওঃ হো! আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাদের এখানে অনেক কলেজেই আগে ইন্ডিয়ান প্রফেসাররা পড়াতেন। সেইজন্য কোনও ডিগনিফাইড চেহারার ইন্ডিয়ান দেখলেই আমাদের প্রফেসার মনে হয়। যাই হোক, তুমি একা-একা বিরক্ত হয়ে যাওনি তো? বাইরে বসে আকাশের রং-ফেরা দেখেছিলে?"

"সূর্যাস্তের সময় এখানকার আকাশ সত্যি বড় অপূর্ব দেখায়।

দুপুরে একবার ঝড় উঠেছিল, তারপর আকাশ আবার ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেল !"

"মিঃ রায়চৌধুরী, একটা কথা বলতে পারেন ? পৃথিবীর থেকে আকাশের রং আমার বেশি সুন্দর লাগে। আকাশে নীল, সাদা, লাল সোনালি, রুপোলি, কালো সব রং-ই দেখা যায়। কিন্তু সবুজ রং কখনও দেখা যায় না কেন ? আমি প্রায়ই এ কথাটা ভাবি।"

কাকাবাবু জোরে হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, "তোমাকে দেখার আগে তোমার সম্পর্কে কত কথাই শুনেছিলুম। তুমি নাকি সাঙ্ঘাতিক এক বিপ্লবী, ভয়ংকর নিষ্ঠুর। এখন তো দেখছি তুমি একটি স্বপ্ন-দেখা নরম স্বভাবের যুবক।"

হানি আলকাদি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "যারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে জানে না, তারা কী করে বিপ্লবী হবে ?"

তারপর হাতঘড়ি দেখে বলল, "ইয়োর নেফিউ শুড বি হিয়ার এনি মিনিট। তুমি কি আজ রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়তে চাও।"

কাকাবাবু বললেন, "যতটা এগিয়ে থাকা যায়, ততটাই ভাল। কাল ভোর থেকে কাজ শুরু করা যেতে পারে।"

মশালটা বালিতে গেঁথে হানি আলকাদি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "মুফতি মহম্মদ ছবির উইলে কী লিখে গেছেন, তা জানার জন্য আমার খুবই কৌতুহল হচ্ছে। তুমি তা বলবে না, না ?"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আর একটু ধৈর্য ধরো !"

এই সময় গাড়ির শব্দ হতেই দু'জনে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

গাড়িটা হেডলাইট জ্বেলে এদিকেই আসছে। হানি আলকাদি বলল, "তোমার ভাইপো এসে গেছে !"

গাড়িটা থামতেই ডাগো আবদাল্লা ছুটে এল ওদের দিকে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল।

অতবড় চেহারার একটি লোককে শিশুর মতন কাঁদতে দেখে কাকাবাবু প্রথমে অবাক হলেও সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে গেলেন কী ঘটেছে।

হানি আলকাদি প্রায় লাফিয়ে উঠে তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ? ছেলেটাকে আনিসনি ?"

ডাগো আবদাল্লা বলল, "আমাকে যা খুশি শাস্তি দাও, এফেন্দি ! আমার চোখের সামনে থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে গেল। আমি কিছুই করতে পারিনি। ওদের চারটে রাইফেল ছিল।"

হানি আলকাদি চিৎকার করে বলল, "বেওকুফ, আগে বল, কারা নিয়ে গেছে ! তুই তাদের চিনেছিস ? কাদের এত সাহস যে, আমার লোকের ওপর হাত দেয় ?"

ডাগো আবদাল্লা বলল, "হ্যাঁ চিনি এফেন্দি। ওরাও আমাকে চিনেছে। আমার নাম ধরে ডাকল। ওরা আল মামুনের লোক !"

হানি আলকাদির সুন্দর মুখখানা এবারে রাগে একেবারে হিংস্র হয়ে উঠল। সে ডাগো আবদাল্লার চুলের মুঠি ধরে বলল, "সেই কুকুরটা তোর সামনে থেকে ছেলেটাকে নিয়ে গেল, তুই বেঁচে ফিরে এলি ? ওদের একটাকেও তুই খতম করেছিস ? আল মামুন ! আজ আমি ওকে শেষ করে দেব। নিজের হাতে ওকে একটু-একটু করে কাটব !"

ডাগোকে ছেড়ে দিয়ে হানি আলকাদি হাততালি দিয়ে নিজের লোকদের ডাকতে লাগল।

ডাগো বলল, "একটা চিঠি দিয়েছে। বলেছে, বারো ঘন্টার মধ্যে উত্তর চাই।"

কাকাবাবু আরবি ভাষা মোটামুটি জানেন। ওদের কথাবার্তা প্রায় সবটাই বুঝতে পারছিলেন। এবারে হাত বাড়িয়ে বললেন, "দেখি চিঠিটা।"

চিঠিখানা কাকাবাবুকে উদ্দেশ করে লেখা নয়। লিখেছে হানি আলকাদিকে। চিঠিটা এই রকম :

আল মামুন নিজে হানি আলকাদির মতন একজন নগণ্য, নির্বোধ লোককে চিঠি লেখার যোগ্য মনে করে না। আল মামুন তার দলের একজন লোক মারফত জানাচ্ছে যে, মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে বন্দি করে রাখার কোনও অধিকার হানি আলকাদির নেই। মিঃ রাজা রায়চৌধুরী আল মামুনের লোক। আল মামুনের কাছেই তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী আল মামুন, তার কথা সবাই মান্য করবে। যে আল মামুনের অবাধ্য হবে, সে শাস্তি পাবে। হানি আলকাদি যদি ১২ ঘন্টার মধ্যে আল মামুনের আদেশ না পালন করে, তা হলে সে কঠিন শাস্তি পাবে। মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ১২ ঘন্টা পরে হলে তাঁর ভাইপো খুন হবে, তার মৃতদেহ কেউ খুঁজে পাবে না। নির্বোধ হানি আলকাদি যেন আরও বেশি নির্বোধের মতন কাজ না করে।

চিঠিটা পড়ার সময় কাকাবাবু কোনও উত্তেজনার চিহ্ন দেখালেন না। শান্ত ভাবে চিঠিটা এগিয়ে দিলেন হানি আলকাদির দিকে।

হানি আলকাদি চিঠিটা পড়তে পড়তে যেন লাফাতে লাগল। পড়া হয়ে গেলে কাগজটা গোল করে পাকিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার ওপরে লাথি কষাল কয়েকটা। সেই সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল, "একটা আলুর বস্তার ইঁদুর! বাঁধা কপির পোকা! নর্দমার আরশোলা ওই আল মামুনটাকে আমি টিপে মেরে ফেলব! আজ রাতে আমার ফোর্স নিয়ে গিয়ে ওই বাঁদরের গায়ের উকুনটাকে আমি সবংশে শেষ করব।"

কাকাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "হানি আলকাদি, এখন

চ্যাঁচামেচি করার সময় নয়, আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই !"

হানি আলকাদি এগিয়ে আসতে-আসতে বলল, "তুমি চিন্তা কোরো না, রায়চৌধুরী, হানি আলকাদি যখন রেগে গেছে, তখন আল মামুন আজই খতম্ হবে। মরুভূমিতে বালি আজ আল মামুনের রক্ত শুষবে ! বাজপাখিরা আল মামুনের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খাবে।"

কোমর থেকে সে এমন ভাবে রিভলভার বার করল, যেন আল মামুন তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুনি সে গুলি করবে।

এর মধ্যে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে চারপাশে। তারা ডাগো আবদাল্লার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনছে।

কাকাবাবু হানি আলকাদিকে জিজ্ঞেস করলেন, "শোনো, আল মামুনকে তো আমি ব্যবসায়ী বলেই জানতাম। কিন্তু তারও কি তোমার মতন দল আছে নাকি ? সে এত রাইফেলধারী পেল কোথায় ?'

"আছে একটা ছোট দল। সে এমন কিছু না। আমার দলে হাজার-হাজার লোক আছে। ওকে আমরা, এই দ্যাখো, এইরকম ভাবে একটা মুরগির মতন জবাই করব।"

"তোমাদের দু'দলের কি আগে থেকেই ঝগড়া ছিল ?"

"ওর দলকে আমরা গ্রাহ্যই করি না। ওর দল ধর্মীয় গোঁড়ামি ছড়াতে চায়, আর আমায় দল চায় দেশের সব মানুষের উন্নতি।"

এর আগে আমরা ওদের নিয়ে মাথা ঘামাইনি, কিন্তু আল মামুনের দল যদি আমার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তা হলে আমি ওদের শেষ করে দেব। মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী ওকে কে করেছে ? আমিই মুফতি মহম্মদের আসল উত্তরাধিকারী।"

"আল মামুন বুদ্ধিমান লোক। আমার ভাইপো সন্তুকে সে

কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, তুমি কী করে খুঁজে বার করবে ?”

“আমার হাত ছাড়িয়ে পালাবার ক্ষমতা আছে আল মামুনের ? আমি আগে ওর মাথার খুলিটা গুঁড়ো করে দেব !”

“তার আগেই যদি ওরা সন্তুকে মেরে ফেলে ?”

“তুমি অযথা চিন্তা কোরো না, রায়চৌধুরী...”

“হ্যাঁ, চিন্তা আমাকে করতেই হবে। তোমাদের দু'দলের ঝগড়ার মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। আল মামুন মাত্র বারো ঘন্টা সময় দিয়েছে ! তার শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই !”

“অ্যাঁ ? কী বলছ তুমি ? ওই শয়তানের দাঁতের ময়লাটা ভয় দেখালেই আমরা ভয় পেয়ে যাব ? তা হতেই পারে না !”

“মাত্র বারো ঘন্টা সময়। এর মধ্যেই সন্তুকে আমি ফেরত চাই। কোনও ঝুঁকি নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শোনো, আমি দুটো উপায় ভেবেছি। এক হচ্ছে, আমাকে ফেরত পাঠানো। আল মামুন তার চিঠিতে শুধু আমাকেই ফেরত দিতে বলেছে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও !”

“মিঃ রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি সাহসী মানুষ বলে ভেবেছিলুম। আল মামুনের হুকুম তুমি মেনে নেবে ? তুমি কি ওর ক্রীতদাস ? তোমাকে ও হাফ মিলিয়ান ইন্ডিয়ান টাকা দিতে চেয়েছিল, তুমি তা নাওনি, সে খবরও আমি জানি !”

“শোনো আলকাদি। ওই সন্তু ছেলেটাকে আমি বড্ড ভালবাসি। ওর কোনও ক্ষতি হলে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তোমার দলের এত শক্তি, তবু তোমার আমার ভাইপোকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারলে না, মাঝপথ থেকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ওকে বাঁচাবার জন্য আমাকে ফিরে যেতে হবে।”

"যদি আমরা তোমাকে না ছাড়ি ? আল মামুনের হুকুম আমি কিছুতেই মানব না !"

"তোমাদের দুই দলের ঝগড়ার জন্য আমার ভাইপোটা মারা যাবে ? হানি আলকাদি, তোমাকে দেখে আমি যা বুঝেছি, তুমি বীর, তুমি লড়াই করতে ভালবাসো, কিন্তু কোনও ছোট ছেলেকে নিশ্চয়ই তুমি কোনওদিন মারতে পারবে না ! কিন্তু আল মামুন তা পারে।"

"তুমি দুটো উপায়ের কথা বলছিলে। দ্বিতীয়টা কী ?"

"আল মামুনকে তুমি একটা চিঠি লেখো। সে যেমন তোমাকে ধমকিয়েছে আর গালাগালি দিয়েছে, সেই রকম তুমি যত খুশি ধমক আর গালাগালি দাও। সেই সঙ্গে লেখো যে, সন্তুকে আজ রাতের মধ্যেই এখানে ফেরত পাঠাতে হবে। মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে যাচাই করতে গিয়ে যদি আমি কোনও ধন-সম্পদের সন্ধান পাই, তা হলে তুমি তার অর্ধেক আল মামুনকে দেবে ! তুমি আরব যোদ্ধা, তোমার কথার দাম আছে। তুমি কথা দিলে নিশ্চয়ই তা রাখবে !"

"অসম্ভব ! অসম্ভব ! অসম্ভব ! মুফতি মহম্মদ বিপ্লবী নেতা ছিলেন। বিপ্লবী দলের জন্যেই তিনি টাকাপয়সা সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সেইসব জিনিস এখানকার বিপ্লবী দলই পাবে। আল মামুনটা কে ? একটা অর্থলোভী শয়তান !"

"হয়তো টাকাপয়সা কিছুই নেই। তোমরা এমনি-এমনি ঝগড়া করছ ?"

"নিশ্চয়ই আছে। থাকতে বাধ্য।"

"শোনো আমার সাহায্য যদি চাও, তা হলে আমার কথা মানতেই হবে। তুমি কি এটা বোঝোনি যে, আমি যদি নিজে থেকে বলতে না চাই, তা হলে আমাকে খুন করে ফেললেও আমি

মুখ খুলব না !"

"আল মামুনকে টাকাপয়সার ভাগ দিলে আমার দলের লোকরা রেগে যাবে।"

"দলের লোকদের বোঝাও ! সন্তুকে যদি বাঁচাতে না পারো, তা হলে তোমরা কিছুই পাবে না ! সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ডাগো আবদাল্লার হাতে এক্ষুনি চিঠি লিখে স্টেপ পিরামিডের কাছে পাঠাও।"

হানি আলকাদির মুখখানা কুঁকড়ে গেছে। আল মামুনকে হত্যা করার বদলে তাকে টাকাপয়সার ভাগ দিতে হবে, এই ব্যাপারটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তার মনের মধ্যে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে।

কাকাবাবু তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "শূন্যকে যদি দু'ভাগ করা যায় ? মনে করো, মুফতি মহম্মদের ধনসম্পদ শূন্য। তার অর্ধেক আল মামুনকে দিতে তুমি আপত্তি করছ কেন ?"

হানি আলকাদি পাশ ফিরে তার দলের একজন লোককে বলল, "এই, চিঠি লেখার কাগজ আর কলম নিয়ে এসো !"

সন্তুর মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে রাত তিনটের সময়। আল মামুনের লোকেরা তাকে যখন গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তখন একটা লোহার রডে লেগে তার মাথা ফেটে যায়। মাথার চুল একেবারে ভিজে গিয়েছিল রক্তে। আল মামুনের লোকেরা তা দেখেও তার কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা

করেনি। ডাগো আবদাল্লা তাকে এখানে ফিরিয়ে আনবার পর হানি আলকাদি নিজে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে, ওষুধ লাগিয়ে, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে।

সন্তু কিন্তু বেশ চাঙ্গাই আছে। ওই আঘাতে সে একটুও কাবু হয়নি। কিংবা হলেও বাইরে তা প্রকাশ করছে না। বরং তার একটু আনন্দই হচ্ছে। দিল্লিতে পাঁজরায় গুলি খেয়ে কাকাবাবু কয়েকদিন ব্যান্ডেজ বেঁধে ছিলেন, এখন সেও অনেকটা কাকাবাবুর সমান-সমান হল।

ভোরের আলো ফোটার আগেই কাকাবাবু বেরিয়ে পড়েছেন সন্তুকে নিয়ে। সঙ্গে শুধু ডাগো আবদাল্লা। সে-ই চালাচ্ছে গাড়ি। হানি আলকাদি তার কয়েকজন অনুচর নিয়ে যাচ্ছে অন্য গাড়িতে। সন্তু সুস্থ আছে দেখে কাকাবাবু আর দেরি করতে চাননি। কাজটা তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চুকিয়ে ফেলতে চান।

গাড়িতে যেতে-যেতে কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তুই জানিস পিরামিডের মধ্যে কী করে ঢুকতে হয়? তোর কি ধারণা যে, পিরামিডের গায়ে একটা দরজা থাকে আর সেই দরজা খুলে ভেতরে ঢোকা যায়?"

এই ব্যাপারটা সন্তুর জানা নেই। দরজা না থাকলে ভেতরে ঢোকা যাবে কী করে?

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোর কি ধারণা পিরামিডের ভেতরটা ফাঁপা? ভেতরে সব ঘর-টর আছে?"

সন্তু আরও অবাক হয়ে গেল! ফাঁপা না হলে ভেতরে ঘর-টর থাকবে কী করে? অনেক ছবিতেই সে দেখেছে যে, পিরামিডের মধ্যে মস্ত-মস্ত হলঘরের মতন, তাতে অনেক জিনিসপত্র, মূর্তি, পাথরের কফিন ইত্যাদি থাকে। তা হলে কাকাবাবু এরকম বলছেন

কেন ?

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "না রে, পিরামিডের গায়ে দরজা নেই। ভেতরটা ফাঁপাও নয়, ভেতরে ঘর-টর কিচ্ছু নেই। পিরামিডগুলো হচ্ছে সলিড পাথরের ত্রিভুজ।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তা হলে রাজা-রানিদের কবর কোথায় থাকত ?"

"সেগুলো বেশির ভাগই মাটির নীচে। শুধু রাজা-রানিদের সমাধি নয়, তাঁদের ব্যবহার করা অনেক জিনিসপত্রও সেখানে থাকত। এমনকী খাট-বিছানা পর্যন্ত। অধিকাংশই সোনার। ক্লিয়োপেট্রার শোবার খাট, চটিজুতো পর্যন্ত সোনার তৈরি ছিল। এই সব মূল্যবান জিনিসপত্র যাতে চোরে চুরি করে নিয়ে না যেতে পারে, তাই ওই সব সমাধিস্থানের ঢোকার পথটাও খুব গোপন রাখা হত। পিরামিডের গা হাতড়ে কেউ সারাজীবন খুঁজলেও ভেতরে ঢোকার পথ পাবে না।"

"তাহলে সাহেবরা পিরামিডের ভেতরে ঢুকল কী করে ?"

"পিরামিডের ভেতরে না, পিরামিডের নীচে। অনেক দূরে একটা সুড়ঙ্গের মুখ থাকে। সেখান দিয়ে যেতে হয়। সাহেবরা এক-এক করে সেই সব সুড়ঙ্গের পথ খুঁজে বার করেছে। খুব কষ্ট করে ঢুকতে হয়। স্যার ফ্লিন্ডার্স পেট্রি নামে একজন ইংরেজ এই সব আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। এক-একটা পিরামিডের তলায় গিয়ে তিনি কত যে ধনরত্ন পেয়েছেন, তার ঠিক নেই। তবে স্যার ফ্লিন্ডার্সও প্রথম দু'একটা সমাধিস্থানের ভেতরে ঢুকে দেখেছিলেন, তাঁরও আগে চোরেরা অন্য দিক থেকে সুড়ঙ্গ কেটে এসে ভেতরে ঢুকেছিল। আমার ধারণা, মুফতি মহম্মদ এই স্যার ফ্লিন্ডার্সের দলে গাইডের কাজ করতেন। উনি অনেকদিন সাহেবদের কাছে প্রথমে মালবাহক কুলি, তারপর গাইডের কাজ করেছিলেন, তা তো

শুনেছিস মান্টোর কাছে !”

“হ্যাঁ। তারপর গাইডের কাজ ছেড়ে বিপ্লবী হলেন।”

“সাহেবরা পিরামিডের সুড়ঙ্গ দিয়ে ভেতরে গিয়ে সমস্ত সোনার জিনিস আর দামি-দামি জিনিস বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে দেখে এ-দেশের অনেক লোক চটে গিয়েছিল। মুফতি মহম্মদ তো নিজের চোখেই দেখেছেন, সাহেবরা মিশরের সম্পদ লুট করছে। তাই তিনি বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন, এই সব আটকাবার জন্য। হয়তো তিনি নিজেও কোনও-কোনও সমাধিস্থান থেকে সোনাদানা তুলে নিয়ে গিয়ে সেসব তাঁর দলের কাজে লাগিয়েছেন।”

“উনি ছবি এঁকে-এঁকে সেই সব সোনা কোথায় লুকোনো আছে তাই বুঝিয়ে গেছেন, তাই না ?”

“না রে, আমি মিথ্যে কথা বলি না। আমি সে সবাইকে বলেছি যে, মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছাপত্রে টাকা-পয়সা, সোনাদানার কথা কিছু নেই, তা সত্যিই। উনি সেসব কিছু জানিয়ে যাননি।”

ডাগো আবদাল্লা মুখ ফিরিয়ে বলল, “গিজার বড় পিরামিড তো এসে গেছে, এফেন্দি। এবার কোন্ দিকে যাব ?”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “হানি আলকাদির গাড়ি কোথায় ?”

ডাগো বলল, “ওদের গাড়ি একটু আগেই পৌঁছে গেছে। সামনে থেমে আছে।”

“ওদের ওইখানেই থেমে থাকতে বলো। তুমি ডান দিকে চলো।”

আর কিছুক্ষণ বাদে আর-একটি মাঝারি আকারের পিরামিডের কাছে এসে কাকাবাবুর নির্দেশে গাড়ি থামল।

গাড়ি থেকে নেমে কাকাবাবু চারদিকে তাকালেন। ধারেকাছে

কোনও লোকজন দেখা যাচ্ছে না। তবে বালির ওপর একটা গাড়ির চাকার দাগ রয়েছে। হয়তো আগের দিন কোনও টুরিস্টের গাড়ি এসেছিল।

কাকাবাবু বললেন, "ডাগো, আমি এই পিরামিডের নীচে যাব।"

ডাগো কাকাবাবুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। করুণ হয়ে এল তার মুখখানা। আস্তে আস্তে বলল, "আপনি যাবেন, এফেন্দি ?"

কাকাবাবু হাসলেন। তারপর সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "কেন ও এই কথা বলছে জানিস ? আগেরবার যখন আমি ইজিপ্টে এসেছিলাম, তখন ডাগো সব সময় আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকত। ওকে নিয়ে আমি অনেক সমাধিতে নেমেছি। তখন আমার দুটো পা'ই ভাল ছিল। ডাগো ভাবছে, এখন এই খোঁড়া পা নিয়ে আমি আর নীচে নামতে পারব না !"

কাকাবাবু ডাগোকে বললেন, "তুমি সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চয়ই পারব। আগেরবার আমরা এর মধ্যে একসঙ্গে নেমেছিলাম মনে নেই ?"

ডাগো বলল, "আপনার কষ্ট হবে, এফেন্দি !"

"তা হোক, তুমি কাজ শুরু করে দাও !"

গাড়ি থেকে কয়েকটা জিনিসপত্র নামানো হল। তিনটে শক্তিশালী টর্চ গুঁজে নেওয়া হল তিনজনের কোমরে। একটা ছোট ঝোলাব্যাগ কাকাবাবু চাপিয়ে দিলেন সন্তুর কাঁধে।

পিরামিড থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে ডাগো শুয়ে পড়ল এক জায়গায়। হাত দিয়ে বালি সরাতে লাগল। তারপর বেরিয়ে পড়ল একটা কাঠের পাটাতন। সেটা সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল একটা অন্ধকার গর্ত নেমে গেছে যেন পাতালে।

কাকাবাবু বললেন, "কাঠের পাটাতনের বদলে এখানে আগে

পাথর চাপা দেওয়া থাকত। তার ওপর অনেকখানি বালি ছড়িয়ে দিলে আর কারুর বুঝবার উপায় ছিল না। খুব সাবধানে নামবি কিন্তু সন্তু। একটু পা পিছলে গেলেই অনেক নীচে গড়িয়ে পড়ে যাবি।

ঠিক হল, ডাগো যাবে সবচেয়ে আগে, মাঝখানে কাকাবাবু, সবশেষে সন্তু। ডাগো একটা মোটা দড়ি আলগা করে জড়িয়ে দিল তিনজনের কোমরে। এখানে ক্র্যাচ নিয়ে গিয়ে কোনও লাভ নেই বলে কাকাবাবু সে-দুটো রেখে গেলেন বাইরে।

সুড়ঙ্গটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। দু'দিকের দেয়ালে দু'হাতের ভর দিয়ে বসে-বসে নামতে হয়। হাতের বেশ জোর লাগে।

সন্তু ভাবল, "নীচে নামবার কী অদ্ভুত ব্যবস্থা। অবশ্য হাজার হাজার বছর আগে এই ব্যবস্থাটাই বোধহয় সবচেয়ে সুবিধেজনক ছিল।

কাকাবাবুর যে দারুণ কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারছে সন্তু। ওঁর ভাঙা পা'টার ওপরেও জোর পড়ছে কিনা। মাঝে-মাঝে কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, "তুই ঠিক আছিস তো, সন্তু?" কাকাবাবুর মুখ ভর্তি চন্দনের ফোঁটার মতন ঘাম।

ওপরের আলো খানিকটা মাত্র ভেতরে ঢোকে, তারপরেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ডাগো কী কায়দায় যেন একটা টর্চ জ্বেলে বগলে চেপে আছে। আর মাঝে-মাঝে আরবি ভাষায় কী যেন বলে উঠছে। হয়তো কোনও প্রার্থনামন্ত্র!

মিনিট দশেক পরে ওরা পৌঁছে গেল সমতল জায়গায়। ঘড়িতে দশ মিনিট কাটলেও মনে হয় যেন কয়েক ঘন্টা লেগে গেছে।

তিনটে টর্চের আলোয় দেখা গেল সেখানে একটি চৌকো ছোট

ঘর। ঘরটা একেবারে খালি। দেওয়ালেও কোনও ছবি নেই। ঘরের একটা দেওয়ালের নীচের দিকে একটি চৌকো গর্ত। তার মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ। সেই পথ খানিকটা যাবার পর আর-একটি দেওয়াল, সেই দেওয়ালের গায়ে একটি লোহার দরজা। দেখলেই বোঝা যায়, সেই দরজাটা নতুন বসানো হয়েছে, আগে অন্য কিছু ছিল।

দরজাটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। তারপরই একটি বিশাল হলঘর। এখানকার দেওয়ালে বড়-বড় ছবি আঁকা। কিন্তু জিনিসপত্তর কিছু নেই।

কাকাবাবু বললেন, "সব নিয়ে গেছে। আগেরবার এসেও অনেক কিছু দেখেছিলাম। তাই না, ডাগো?"

ডাগো বলল, "হ্যাঁ, এফেন্দি। কিছুই থাকে না। চোরেরা সব নিয়ে নেয় বলে গভর্নমেন্ট এখন নিজেই তুলে নিয়ে গিয়ে মিউজিয়ামে রাখে।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। ডাগো, সেই ল্যাবিরিন্থটা কোথায়?"

ডাগো বিস্মিতভাবে বলল, "সেটাতেও যাবেন?"

"হ্যাঁ। সেটার জন্যই তো এসেছি।"

"আপনার আরও কষ্ট হবে। এক কাজ করি, এফেন্দি। আমি আপনাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি।"

"তার দরকার হবে না। তুমি পথটা খুঁজে বার করো। আমার জায়গাটা ঠিক মনে পড়ছে না।"

হলঘরটা পার হয়ে এক জায়গায় এসে ডাগো একটা চৌকো পাথরের স্ল্যাব সরাল। তার মতন শক্তিশালী লোক ছাড়া অতবড় পাথর সরাতে যে-সে পারবে না। তারপর একটা ছোট গোল জায়গা। সেখানে মেঝেতে শুয়ে পড়ে সে আবার একটা পাথরের

পাটাতন সরিয়ে ফেলল। এখানে আবার আর-একটা সুড়ঙ্গ।

কাকাবাবু বললেন, "এইখানে আমাদের যেতে হবে, সন্তু।"

তারপর তিনি ডাগোকে বললেন, "আর তোমাকে যেতে হবে না। তুমি ফিরে যাও!"

দারুণ চমকে উঠে ডাগো বলল, "কী বলছেন, এফেন্দি? আমি যাব না? আমাকে বাদ দিয়ে আপনি এই বাচ্চাকে নিয়ে যাবেন কী করে?"

"ঠিক পেরে যাব। তুমি বড় হলটায় অপেক্ষা করো, কিংবা ওপরেও উঠে যেতে পারো। আমরা ফেরার সময় তোমাকে ডাকব!"

"না, না, না, তা হয় না! আপনাকে এখানে ফেলে রেখে গেলে হানি আলকাদি আমায় আস্ত রাখবে না!"

"হানি আলকাদির সঙ্গে আমার এই রকমই কথা আছে। আমি যা দেখতে যাচ্ছি, তা আমি দেখার আগে, অন্য কেউ জানতে পারবে না। মুফতি মহম্মদের এটা আদেশ। এই আদেশ তো সকলকে মানতেই হবে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, ডাগো। তুমি আমাদের যা উপকার করলে, তার কোনও তুলনা নেই। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে আমি এখানে আসতে পারতুম না।"

ডাগো মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে কাকাবাবু ঢুকে পড়লেন সেই ল্যাবিরিন্থের মধ্যে।

কাকাবাবু বললেন, "তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, সন্তু। ভেতরটা খুব আঁকাবাঁকা। একটু অন্যমনস্ক হলেই মুখে গুঁতো লাগবে। আগেরবার আমার নাক থেঁতলে গিয়েছিল। এখন কি বুঝতে পারছিস যে, আমাদের মাথার ওপরে রয়েছে একটা বিরাট

পিরামিড ?

সন্তুর বুক টিপটিপ করছে। মাটির কত নীচে, জমাট অন্ধকার ভরা এক সুড়ঙ্গ। আর কি ওপরে ওঠা যাবে ? যদি হঠাৎ একটা পাথর ভেঙে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায় ? ডাগো সঙ্গে থাকায় তবু খানিকটা ভরসা ছিল।

সন্তুর কাঁধ ধরে কাকাবাবুকে লাফিয়ে-লাফিয়ে আসতে হচ্ছে। সন্তু টর্চ জ্বেলে এগোচ্ছে খুব সাবধানে। একটুখানি অন্তর-অন্তরই সুড়ঙ্গটা বাঁক নিয়েছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভয় পাচ্ছিস নাকি রে, সন্তু ?"

সন্তু শুকনো গলায় বলল, "না !"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি, তা বুঝতে পারছিস ?"

"না।"

"এক-একটা সমাধিস্থান খুব গোপন রাখা হত। কেন যে এত গোপনীয়তা তা জানা যায় না। হয়তো দামি জিনিসপত্র অনেক বেশি রাখা হত সেখানে। এটা সেইরকম একটা গোপন সমাধিতে যাবার পথ। কত কষ্ট করে এরকম সুড়ঙ্গ বানিয়েছে। হয়তো এই সমাধিতে যাবার আরও কোনও রাস্তা আছে, যা আমরা এখনও জানি না। রাজা-রানিরা কি এত কষ্ট করে যেতেন ?"

"আমরা কোন্ সমাধিতে যাচ্ছি ?"

"রানি হেটেফেরিসের গল্প তোকে বলেছিলুম, মনে আছে ?"

"হ্যাঁ, সেই যে কফিনের মধ্যে যাঁর মমি খুঁজে পাওয়া যায়নি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। লোকের ধারণা, এই জায়গাটা ভুতুড়ে। সেই মমিটাকে মাঝে-মাঝে দেখতে পাওয়া গেছে, আবার মাঝে-মাঝে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। তোর ভূতের ভয় নেই তো ?"

"অ্যাঁ ? না !"

"মুফতি মহম্মদ নামে একজন বৃদ্ধ কী সব ছবি এঁকেছিলেন, তা

দেখে আমাদের কি এত কষ্ট করে এত দূরে আসার কোনও দরকার ছিল, বল ?"

সন্তু এ-কথার কী উত্তর দেবে ! সে কিছুই বলল না ।

কাকাবাবু আবার বললেন, "আমি এলুম কেন জানিস ? ওই যে মুফতি মহম্মদ নির্দেশ দিলেন, তুমি আগে নিজে যাচাই করে দেখো, সেইজন্যই আমার কৌতূহল হল । এটা যেন বৃদ্ধের এক চ্যালেঞ্জ !"

টর্চের আলো এবারে একটা ফাঁকা জায়গায় পড়ল । সুড়ঙ্গটা শেষ হয়ে গেছে ! সুড়ঙ্গটা খুব বেশি লম্বা নয় ।

ফাঁকা জায়গাটিতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে । সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার পর একটি বেশ বড় চৌকো ঘর ।

কাকাবাবু বললেন, "এই হল রানি হেটেফেরিসের সমাধিস্থান । এক সময় নাকি এখানে অতুল ঐশ্বর্য ছিল । একজন রানির যত জিনিস ব্যবহারে লাগে, সেই সব কিছু । ওরা বিশ্বাস করত কিনা যে, রাজা-রানিরা আবার হঠাৎ একদিন বেঁচে উঠতে পারে । তখন সব কিছু লাগবে তো !"

ঘরটার ঠিক মাঝখানে একটি কারুকার্য-করা পাথরের কফিন । আরও তিন-চারটে কফিন ছড়ানো রয়েছে এদিক-ওদিকে ।

বড় কফিনটা দেখিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এই হচ্ছে রানি হেটেফেরিসের সারকোফেগাস । তার আগে দেখা যাক, এর মধ্যে রানির মমি আছে কি না ! যদি থাকে, তা হলে দারুণ একটা আবিষ্কার হবে ।"

সারকোফেগাসের ওপরে রানির ছবি আঁকা । কাকাবাবুর সঙ্গে ধরাধরি করে সন্তু ঢাকনাটা সরিয়ে ফেলল ।

ভেতরটা ফাঁকা !

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "জানতুম।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "অন্য কফিনগুলো খুলে দেখব ?"

"কোনও লাভ নেই। পৃথিবীর নানা দেশের মিউজিয়ামে মমিগুলো ভাল দামে বিক্রি হয়। চুরি যাবার ভয়ে সব মমি সেইজন্য ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

সন্তু টর্চের আলো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগল দেওয়ালগুলো। প্রত্যেক দেওয়ালেই অসংখ্য ছবি। এইগুলোই হিয়েরোগ্লিফিকস। বোধহয় রানির জীবনকাহিনী লেখা আছে। কত শিল্পী, কত পরিশ্রম করে ওই সব ছোট-ছোট ছবি এঁকেছে। কাকাবাবুও ঘুরে-ঘুরে দেওয়ালগুলো পরীক্ষা করতে-করতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন।

"এইবার সন্তু, মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছের কথা তোকে জানাতে হবে। কারণ, তোর সাহায্য ছাড়া এরপর আর কিছু করার সাধ্য নেই। তুই দেখা মানেই আমার দেখা।"

সন্তু ছিল উল্টো দিকের দেওয়ালের কাছে। সে তাড়াতাড়ি এদিকে চলে এল।

"কাকাবাবু, আমি অনেকটা আন্দাজ করেছি। এই ঘরে ঢুকেই বুঝতে পেরে গেছি।"

"তুই বুঝতে পেরে গেছিস ? কী বুঝেছিস শুনি ?"

"রানি হেটেফেরিসের মমি এখানেই কোথাও লুকোনো আছে। আর সেই লুকোনো জায়গাতেই মহম্মদ সোনা আর টাকাপয়সা লুকিয়ে রেখেছেন।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। তারপর হেসে ফেলে বললেন, "অনেকটা ঠিকই ধরেছিস তো। তবে টাকাপয়সার কথা নেই এর মধ্যে। মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছের কথা জানলে অনেকে ভাববে পাগলামি। উনি ছবি এঁকে

যা জানাতে চাইছিলেন, তা হল এই : উনি খুব সংক্ষেপে লিখেছিলেন, আমি তোকে বুঝিয়ে বলছি। উনি এক সময় সাহেবদের কাছে গাইডের কাজ করতে। সেই সময়েই আল বুখারি নামে আর-একজন গাইডের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। আল বুখারি অনেকগুলো পিরামিডের নীচে এবং গোপন সমাধিস্থানে ঢোকার রাস্তাও আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু সেইসব আবিষ্কারের কৃতিত্ব সাহেবরাই নিয়ে নিত। একজন সাহেবকে জব্দ করার জন্যই আল বুখারি মুফতি মহম্মদের সাহায্য নিয়ে রানি হেটেফেরিসের মমি এক জায়গায় লুকিয়ে রাখে। মজা করবার জন্য ওরা সেই মমিটাকে মাঝে-মাঝে বার করে এনে সারকোফেগাসের মধ্যে রেখে দিত, মাঝে-মাঝে আবার সরিয়ে ফেলত। সেই থেকে ভূতের গল্প রটে যায়। এ রকম ব্যাপার মাত্র দু'তিনবারই হয়েছিল। কিন্তু লোকে বিশ্বাস করত যে, রানির মমি প্রত্যেক বছর একবার করে ফিরে আসে। যাই হোক, আল বুখারি একটা দুর্ঘটনায় মারা যায়, মুফতি মহম্মদ গাইডের কাজ ছেড়ে বিপ্লবীদের দলে যোগ দেন। সেই থেকে মমিটা লুকোনো অবস্থাতেই আছে। মৃত্যুর আগে মুফতি মহম্মদ জানিয়ে দিতে চান যে, সেটা কোথায় আছে। কিন্তু এর মধ্যে যদি অন্য কেউ সেই গোপন জায়গাটা জেনে ফেলে মমিটা সরিয়ে ফেলে থাকে, তা হলে মুফতি মহম্মদ মিথ্যেবাদী হয়ে যাবেন। সেইজন্যই তিনি আগে আমাকে যাচাই করে নিতে বলেছেন।"

"সেই লুকোনো জায়গাটা কোথায় ?"

"সেটা তোকে খুঁজে বার করতে হবে। এই দ্যাখ, এই দেওয়ালের গায়ে মাঝে-মাঝে খাঁজ কাটা আছে। এই খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে তুই ওপরে উঠতে পারবি ? তোর কাঁধের ব্যাগটাতে দ্যাখ শক্ত নাইলনের দড়ি, লোহার হুক এই সব আমি এনেছি, যদি

কাজে লাগে ভেবে।"

সন্তু ব্যাগ খুলে জিনিসগুলো বার করল। তারপর বলল, "আমার ও-সব লাগবে না, আমি এমনিই উঠতে পারব।"

খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে সন্তু দেওয়াল বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

কাকাবাবু টর্চের আলো ফেলে বললেন, "ওই যে রানির ছবি দেখছিস, এরপর ডান দিকে পরপর নটা ছবি গুনে যা! গুনেছিস? এইবারে দশ নম্বর ছবিটার ওপর জোরে ধাক্কা দে।"

সন্তু ধাক্কা দিল, কিন্তু কিছুই হল না।

কাকাবাবু বললেন, "আরও জোরে ধাক্কা দিতে হবে। আল বুখারি আর মুফতি মহম্মদ দু'জনেই গাঁট্টাগোঁট্টা জোয়ান ছিলেন নিশ্চয়ই। তা ছাড়া বহু বছর জায়গাটা খোলা হয়নি!

সন্তু প্রাণপণ শক্তিতে দুম-দুম করে ধাক্কা দিতে লাগল। তাও কিছুই হল না।

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "দ্যাখ তো, ওই এক থেকে দশ নম্বর ছবির মতন ছবি তোর মাথার কাছে ছাদেও আঁকা আছে কি না!"

"হ্যাঁ, আছে।"

"ওইখানে ধাক্কা দে!"

এবারে ছাদের সেই জায়গাটায় ধাক্কা দিতেই সন্তুর হাত অনেকখানি ভেতরে ঢুকে গেল। সেখানকার একটা পাথর ভেতরে সরে গেছে। সেখানে আরও ধাক্কা দিতে দিতে একজন মানুষ গলে যাবার মতন জায়গা হয়ে গেল।

"টর্চ জ্বালতে পারবি? দ্যাখ তো, ওখানে কী আছে?"

"মেজেনিন ফ্লোরের মতন জায়গাটা। ভেতরে একটা কফিন আছে।"

"ওইটাই খুলে দেখতে হবে। ভেতরে ঢুকতে পারবি তো?

খুব সাবধানে।”

সন্তু মাথা গলাতেই নীচে বেশ জোরে একটা শব্দ হল। সন্তু চমকে গিয়ে আবার মাথাটা বার করে আনল। নীচের দিকে তাকিয়ে যা দেখল তাতে তার রক্ত হিম হয়ে গেল একেবারে।

যেখানে শব্দটা হয়েছিল, কাকাবাবু টর্চের আলো ঘুরিয়েছেন সেই দিকে। সেখানে একটা কফিনের ঢাকনা খুলে গেছে। তার মধ্য থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে একটা মূর্তি। একটা মমি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সেই মূর্তি দেখে টর্চসুদ্ধু কাকাবাবুর হাতটাও কেঁপে গেল একবার। তারপর তিনি অস্ফুট গলায় বললেন, “আল মামুন !”

সন্তুও এবার চিনতে পারল। কিন্তু আল মামুন এখানে আগে থেকেই এল কী করে ? কাকাবাবু তো কাউকেই বলেননি যে, তিনি কোথায় যাবেন।

আল মামুনের গায়ে একটা সাদা কাপড় জড়ানো। সেটা খুলে ফেলে সে একটা লম্বা ছুরি বার করল। তারপর হিংস্র গলায় বলল, “বিদেশি কুকুর ! নিমকহারাম ! আমি কলকাতায় গিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করেছি। আমি দিল্লিতে মুফতি মহম্মদের সঙ্গে তোদের দেখা করিয়ে দিয়েছি। আর তুই ওই কুত্তা হানি আলকাদির দলে যোগ দিয়েছিস ?”

কাকাবাবু অনেকটা আপন মনে বললেন, “একটাই ভুল করেছি আমি। মিউজিয়ামের কিউরেটর মাস্টোর কাছে রানি হেটেফেরিসের কথা বলে ফেলেছিলাম। সে বুঝি তোমার দলে, আল মামুন ? কিংবা জোর করে তার কাছ থেকে কথা আদায় করে ফেলেছ ! তুমি এত কষ্ট করে এখানে কেন এলে আল মামুন ! মুফতি মহম্মদের যদি লুকোনো টাকা পয়সা কিছু থাকেই, তুমি তো তার অর্ধেক ভাগ পাবে !

“অর্ধেক ! ওই শয়তানটাকে আমি অর্ধেক দেব ? আমি মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী। আমি তার সম্পদের সন্ধান পেয়ে গেছি। এখন তোমাকে আর ওই খোকাটাকে আমি এখানেই শেষ করে দিয়ে যাব। এই সম্পদের কথা পৃথিবীর আর কেউ জানবে না !”

“তুমি আমাদের খুন করবে ? তুমি ধর্মভীরু লোক, এরকম একটা অন্যায় করলে তোমার বিবেকে লাগবে না ?”

“কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, তাতে আবার বিবেকের কী আসে যায় !”

“আল মামুন, তোমার মতন খুনিদের আমি কিন্তু খুব কঠিন শাস্তি দিই !”

আল মামুন ছুরি তুলে এগিয়ে আসতেই কাকাবাবু মাটি থেকে নাইলনের দড়িটা তুলে নিলেন। সন্তু ভাবল; ওপর থেকে সে আল মামুনের মাথার ওপর লাফিয়ে পড়বে কি না !

কাকাবাবু দড়িটা নিয়ে শপাং করে চাবুকের মতন শব্দ করে বললেন, “আগেকার দিনে তলোয়ার আর চাবুকের লড়াইয়ের কথা শোনোনি ?”

বলেই তিনি চাবুকের মতন সেই দড়ির এক ঘা কষালেন আল মামুনের মুখে।

লড়াইটা শেষ হতে এক মিনিটও লাগল না। লম্বা দড়ির সঙ্গে ছুরি দিয়ে আল মামুন লড়তে পারলই না মোটে। কাকাবাবু তাকে অনবরত মারতে লাগলেন। আল মামুনের হাত থেকে ছুরি খসে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল সে। কাকাবাবু দড়ির ফাঁস তার গলায় লাগিয়ে হ্যাঁচকা টান দিতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। দড়ির বাকি অংশটা দিয়ে কাকাবাবু তার হাত-পা বেঁধে ফেললেন।

তারপর যেন কিছুই হয়নি এই ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তিনি সন্তুকে বললেন, "যা, ভেতরটা দেখে আয়।"

সন্তুর পা কাঁপছিল। নিজেকে একটুখানি সংযত করে সে টর্চটা মুখে চেপে নিল, তারপর দু'হাতে ভর দিয়ে মাথাটা গলাল ভেতরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ল রিনির মুখটা। রিনি তাকে ঠাট্টা করেছিল। বলেছিল গরুর শিঙের ওপর বসে থাকা একটা মশা! এখন সে একা মুফতি মহম্মদের সম্পদ আবিষ্কার করতে যাচ্ছে। কলকাতার পিকনিক গার্ডেনসের সেই থানাটার কথাও তার মনে পড়ে গেল এক ঝলক। সেই দারোগা যদি তাকে এই অবস্থায় দেখতেন!

ভেতরে ঢুকে গিয়ে সন্তু উবু হয়ে বসে টর্চ জ্বালল। তার গা ছমছম করছে। কেন যেন তার ধারণা হল, এখানে একটা অজগর সাপ থাকতে পারে। কাশ্মীরের সেই শুকনো কুয়োটার মধ্যে যে-রকম ছিল।

কিন্তু সে-সব কিচ্ছু নেই। একটা শুধু কফিন, আর এক পাটি চটি পড়ে আছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সে কফিনের ঢাকনা খুলল।

খুলেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল তার। সেখানে সত্যিই একটা মমি রয়েছে। সন্তু ভূতের ভয় পায় না, তবু তার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না সে।

তার দৃঢ় বিশ্বাস এই মমির গায়ে জড়ানো ব্যান্ডেজের মধ্যেই কিংবা এর নীচে প্রচুর ধনরত্ন আছে। কিন্তু সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সে হাত তুলতেই পারছে না।

অতি কষ্টে সন্তু চোখ বুজে হাতটা ছোঁয়াল মমির গায়ে। এবারে তার কাঁপুনি থেমে গেল। ভাল করে মমিটা পরীক্ষা

করল। কয়েকখানা হাড় ছাড়া আর কিছুই টের পাচ্ছে না। মমির তলাতেও কিছু নেই।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সন্তু বুঝে গেল, তার আশা ব্যর্থ হয়েছে। ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখা থাকলে তা তো একটু-আধটু হবে না। অনেক হবার কথা। থাকলে ঠিকই টের পাওয়া যেত।

হতাশ ভাবে ফিরে এসে সন্তু গর্তটাতে মুখ বাড়িয়ে বলল, "কাকাবাবু, কিছু নেই।"

"মমি নেই?"

"হ্যাঁ, মমি আছে। রানির মমিই মনে হচ্ছে, কিন্তু টাকাপয়সা বা সোনা-টোনা একটুও নেই!"

"মুফতি মহম্মদ তো টাকাপয়সার কথা বলেননি! তোকে আর-একটা কাজ করতে হবে। দ্যাখ্ তো, ওই ঘরের দেওয়ালে বা ছাদে বা কফিনের গায়ে কোনও ছবি আঁকা আছে কি না?"

সন্তু দেখে এসে বলল, "হ্যাঁ, আছে। কফিনের ঢাকনার ভেতরের দিকে পাঁচটা ছোট ছোট ছবি আছে।"

কাকাবাবু ঝোলাব্যাগটা সন্তুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এর মধ্যে কাগজ-কলম আছে। তুই তো একটু-আধটু ছবি আঁকতে পারিস, খুব সাবধানে ওই ছবিগুলো কপি করে নিয়ে আয় তো!"

ছবিগুলো কপি করতে সন্তুর আরও দশ মিনিট লাগল। তারপর চটিজুতোটা কুড়িয়ে নিয়ে সে নেমে এল। জুতোটা চামড়া বা রবারের নয়। কোনও ধাতুর। সোনারও হতে পারে। ওপরে শ্যাওলা জমে গেছে।

কাকাবাবু আল মামুনের মুখের ওপর টর্চ ফেলে বললেন, "তোমাকে আমি খুলে দিচ্ছি না!"

আল মামুন বলল, "আমাকে বাঁচাও। তোমাকে আমি দশ লাখ টাকা দেব!"

"তুমি আমাদের খুন করতে চেয়েছিলে! তার বদলে তুমি অন্তত একটা দিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করো!"

সন্তুকে নিয়ে কাকাবাবু সেই হলঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়লেন সুড়ঙ্গে। সেটা পার হতেই ডাগো আবদাল্লাকে দেখতে পাওয়া গেল। সে অধীরভাবে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারপর আর ওপরে উঠতে কোনও অসুবিধে হল না।

হানি আলকাদি কোথা থেকে ছুটে এসে কাকাবাবুর হাত জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, "মিঃ রায়চৌধুরী, ইউ গট ইট?"

কাকাবাবু বললেন, "শোনো, মনটা শক্ত করো। দুঃসংবাদ শুনে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেও না। মুফতি মহম্মদের গোপন কথা হচ্ছে রানি হেটেফেরিসের মমি। সেটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব তুমি নাও বা যে-ই নিক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সেখানে টাকাপয়সা বা অস্ত্রশস্ত্র কিছুই পাওয়া যায়নি। এই এক পাটি চটি পাওয়া গেছে, বোধহয় এটা সোনার তৈরি। কে এটা ফেলে গেছে জানি না। এর অর্ধেক তুমি ইচ্ছে করলে আল মামুনকে দিতে পারো। সে অবশ্য নীচে শুয়ে আছে। বিকেলের দিকে কোনও লোক পাঠিয়ে তাকে উদ্ধার করতে হবে।"

হানি আলকাদি রাগের চোটে চটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে!

কাকাবাবু বললেন, "আমার এখন বিশ্রাম দরকার একটু। আমি ক্লান্ত। এখানে একটা রেস্ট হাউস তৈরি হয়েছে না?"

আগের রাতে ঘুম হয়নি, তার ওপর এত উত্তেজনা ও পরিশ্রম। সন্তু আর কাকাবাবু দু'জনেই ঘুমোল প্রায় সন্ধে পর্যন্ত।

সন্তু জেগে উঠে দেখল, রিনি, সিদ্ধার্থ বিমান সবাই এসে বসে আছে। সিদ্ধার্থ বিমানের কাছে খবর পেয়ে কাল রাতেই এখানকার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আজ তারা খুঁজতে-খুঁজতে গিজাতে এসে পৌঁছেছে।

রিনি বলল, "সন্তু, সব ঘটনা আমি আগে শুনব। তার আগে তুই আর কাউকে বলতে পারবি না!"

কাকাবাবু ঠিক করলেন, তখুনি কায়রোর দিকে রওনা হবেন। ডাগো আবদাল্লাকে তিনি অনেক টাকা বখশিশ দিলেন। তারপর তাকে বললেন, একটু পরেই সে গিয়ে যেন আল মামুনকে মুক্তি দিয়ে আসে।

তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হানি আলকাদি কোথায়?"

ডাগো বলল, "সে তো চলে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছ থেকে সে বিদায় না নিয়ে চলে গেল? হতেই পারে না। তার খোঁজ নিয়ে দ্যাখো।"

একটু খোঁজাখুঁজি করতেই তাকে এক আরবের বাড়িতে পাওয়া গেল। সেও ঘুমোচ্ছিল। মনের দুঃখেও তো মানুষের খুব ঘুম পায়।

কাকাবাবু তাকে একলা একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি। তোমার কোনও উপকার করতে পারলুম না, সেজন্য দুঃখিত।"

হানি আলকাদি বিষণ্ণভাবে বলল, "তবু যে তুমি মুফতি মহম্মদের কথা রাখবার জন্য এত দূরে ছুটে এসে এত কষ্ট করলে, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন। তারপর বললেন, "রানির লুকোনো কফিনের গায়ে কয়েকটি ছবি আঁকা আছে। সেগুলো আসলে সংকেত-লিপি। সেটা আমি তোমার জন্য অনুবাদ করে দিয়েছি। তাতে লেখা আছে, ফারাও আসেমহেট তৃতীয়'র সমাধিস্থান। তৃতীয় কক্ষ। ডান দিকের দেওয়ালের ওপর দিকে ঠিক পাঁচটি ছবি আঁকা আছে। আমার মনে হয়, সেই ছবি আর এই কফিনের গায়ের ছবি মুফতি মহম্মদের

আঁকা। খুব সম্ভবত সেখানে কিছু লুকিয়ে রাখা আছে। রানির মমির কথা বলে তিনি সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। সেখানে কী আছে না আছে তা আমি আর দেখতে চাই না। তুমি গিয়ে দ্যাখো, যা আশা করছ তা হয়তো ওখানেই পেতে পারো। গুড লাক!"

আনন্দে চকচক করে উঠল হানি আলকাদির চোখ। সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল কাকাবাবুকে।